প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬০
প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯
মুদ্রক। শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রিট। কলিকাতা-৬

অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ পর্য্যুপস্থিতদারুণাঃ।
শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ পৃথিবী গতযৌবনা॥

—মহাভারত

(ভাবার্থ—সুখ অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং দারুণ কাল সমুপস্থিত। পাপকলঙ্কিত দিন একটির পর একটি অতিবাহিত হইবে ; পৃথিবী এখন গতযৌবনা।)

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।

—রবীন্দ্রনাথ

বাবা-মা'র স্মৃতিতে—

প্রকাশকের নিবেদন

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যজগতে আজীবন সাধনায় সাহিত্য-সাধক এবং সমালোচক হিসাবে নিজেকে বিশিষ্ট আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুখ্যতঃ তিনি অধ্যাপক এবং অধ্যাপনা-সূত্রে শিক্ষাজগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে (১৯২৮ থেকে) ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিক্ষাপরিচালক রথিবৃন্দকে অতি নিকট থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর তিনি উজ্জ্বল চরিত্র এঁকেছেন।

আলোচ্য 'তে হি নো দিবসাঃ' গ্রন্থে অধ্যাপক সেনগুপ্ত এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক কালের সময়সীমার মধ্যে এদেশের শিক্ষাজগৎ এবং শিক্ষাপরিচালনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত তার উৎস সন্ধান করেছেন। সমালোচকের কাছে 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম্' কখনই নীতি হিসাবে অনুসৃত হতে পারে না। তাই সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে লেখক যে আলোচনা করেছেন তা সম্ভবতঃ অনেকেরই মনঃপূত হবে না। সমালোচনার ধর্মই এই যে তা সব সময় সুপ্রিয় হয় না।

শিক্ষা-সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা ছাড়াও তিনি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিম-বঙ্গ ও ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন। আইনগত ও সমাজগতভাবে যে নীতিবোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যে আমরা দিন দিন নিমজ্জিত হচ্ছি, তার একটি রেখাচিত্র দিয়েছেন। লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন যে শিক্ষাজগৎ ব্যতীত অন্য বিষয়ে মতামত দেবার মতো বিশেষজ্ঞ বা অধিকারী তিনি নন ; তবু একজন নির্মোহ চিন্তাশীল ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। স্বভাবতই সকল পাঠক তাঁর অভিমতের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

প্রকাশক হিসাবে একজন শ্রদ্ধেয় সুশিক্ষিত সমালোচকের কাছ থেকে একটি সুচিন্তিত ও সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা এবং ঔচিত্য আমরা স্বীকার করি।

পাঠকসাধারণের কাছে বইটি যথাযথমূল্যে গৃহীত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে গণ্য করব।

ভূমিকা

'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'—আমাদের সেই দিনগুলি গত হইয়াছে। বুড়ো মানুষেরা প্রায়ই এই খেদোক্তি করিয়া থাকে। ইহা একেবারে অর্থহীন নয়। বুড়ো কালে পুরানো দিনের কথা নূতন আকারে দেখা দেয় ; সমগ্র জীবনের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা একটা সংহত রূপ পায়। এইভাবে চিন্তা করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াছিলাম। তবে আমার আটপৌরে পরিবেশ ও আটপৌরে জীবনের সরস বর্ণনা দিতে হইলে যে সৃজনীশক্তির প্রয়োজন তাহা আমার নাই।

সুতরাং দীর্ঘজীবনে যাহা দেখিয়াছি এবং যাহা আমার অভিজ্ঞতার বাহিরে হইলেও আমরা জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেইসকল বিষয়ের উপর আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং প্রত্যেক মন্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য ও যুক্তির সমাবেশ করিয়াছি। যেখানে শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়াছি সেইখানেও একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের সমন্বয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। নিরপেক্ষ মতপ্রকাশই আমার অভিপ্রায় বলিয়া আমার পিতৃদেব এবং গুরোরপি গরীয়ান অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করিয়াছি। অন্যান্য প্রতিকূল সমালোচনার জন্য ইহার অধিক কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না।

আমি যখন ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করি তাহার ন'-দশ বছর আগে হরিনাথ দে'র বিচার, পদচ্যুতি ও মৃত্যু হয় ; কিন্তু আমাদের আমলেও এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা শুনিতাম। কিছুকাল পূর্বে শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভাষাপথিক হরিনাথ দে' গ্রন্থখানি পড়িয়া, বিশেষ করিয়া তিনি যেসকল দলিলপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া আমি আমাদের কালের শিক্ষা-জগৎ সম্পর্কে নূতন আলোকের সন্ধান পাই। সেইজন্য ঐ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কারণ অতীত বর্তমানের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শ্রমসাধ্য কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ ; তবে ইহাও বলিতে হইবে যে আমার বিশ্লেষণ ও বিচারের সঙ্গে তাঁহার বা তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের কোন সম্পর্ক নাই।

এই গ্রন্থের নাম ঠিক করিয়া দিয়াছেন বন্ধুবর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্র ; মুখপত্রে মহাভারত হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি তাহার কৃতিত্বও তাঁহারই। এই গ্রন্থ রচনা করিতে, বিশেষ করিয়া স্মৃতিনির্ভর তথ্যাদি যাচাই করিতে বইপত্র দিয়া অনেকে সাহায্য করিয়াছেন এবং পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। তবে একজনের কাছে পৃথক্‌ভাবে ঋণ স্বীকার না করিলে অপরাধ হইবে। তিনি আমার প্রাক্তনছাত্র অধ্যাপক প্রতিভাকান্ত মৈত্র। পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ও সংশোধন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রুফ দেখা পর্যন্ত সমস্ত পর্বে তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হইত না। তাঁহার ও প্রকাশকের চেষ্টা সত্ত্বেও নানা ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গেল ; ইহার দায়িত্ব আমার এবং গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের জন্যও আর কেহ দায়ী নহেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের গ্রাম ও আমার প্রথম স্কুল

১

আজকাল শিশুরা তিন বছর বয়সে কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি, মন্টেসরি স্কুলে যায়। তাহাদের স্কুলে যাওয়া-আসা, টিফিন খাওয়া এক বিরাট সমারোহ। আমাদের আমলেও পাঠশালা ছিল ; তবে তাহা নিতান্ত আটপৌরে ব্যাপার। আমি সেই ক্ষয়িষ্ণু পাঠশালা-ব্যবস্থা দেখিয়াছি, কিন্তু কোন পাঠশালায় পড়ি নাই। প্রথমেই সাড়ে-আট বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রামের হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে (যাহাকে ক্লাস ফোর বলা হইত) ভর্তি হইলাম। ইহার পূর্বে কেমন করিয়া বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা ও যোগবিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখিয়াছিলাম তাহা ভাল করিয়া মনে করিতে পারি না। আমার বাবা হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত ফরিদপুর জেলার পালং স্কুলে হেডমাস্টার হয়েন ১৯০৮ সালে। স্টীমারে যাতায়াত করিতে হইলেও পালং খুব বেশি দূরে নয়। বাবা প্রায়ই আসিতেন ; তাঁহার কাছে মুখে মুখে ইংরেজি শিখিতাম এবং দুপুরবেলা আমাকে লিখিতে দিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন ; উঠিয়া সেই লেখা দেখিতেন। আমি ও মা দেশের বাড়িতে জেঠা-মহাশয়ের কাছে থাকিতাম। বাবা মার কাছে যে চিঠি লিখিতেন তাহার মধ্যে বাংলায় ছোট ছোট বাক্য লিখিয়া আমার জন্য একপাতা ভরিয়া দিতেন ; আমি আবার তাহার ইংরেজি তর্জমা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতাম। জেঠামহাশয়ের কাছে কিছু কিছু আঁক কষিতাম। ইহাই মনে পড়িতেছে। ক্লাস ফোরে ভর্তি হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তাহার প্রায় সবটাই নিজে নিজেই আয়ত্ত করিয়া থাকিব। মনে আছে রোজ সকালে মাদুর বা চাটাইয়ের উপর বই খাতা লইয়া বসিতাম, তারপর বই খাতা ফেলিয়া খেলিতে যাইতাম। বড়মা (জেঠাইমা) সস্নেহে তিরস্কার করিয়া উহা গুছাইয়া রাখিতেন। বড়মা আরও বলিতেন যে আমি ঠিকমতো ধুতি পরিতে পারি না এবং ভাল করিয়া আসনে বসিয়া সুষ্ঠুভাবে আহারও করিতে পারি না। তিনি কেবলই বলিতেন, 'এই ছেলে শ্বশুরবাড়ি গিয়া কি করিবে', আমারও ছেলেবেলায় ভয় করিত শ্বশুরবাড়িতে গিয়া আমি সভ্য ব্যবহার করিতে পারিব কিনা।

বাড়ির শিক্ষার একটা দিক আমার খুব বেশি মনে আছে, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে এই পথে আমি তাহার পর আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। জেঠামহাশয় প্রতিদিন প্রথমে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পরে কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িয়া রাখিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি যাহা দিনে পড়িয়া রাখিতেন তাহা গল্পাকারে বলিতেন। শ্রোতা দুই জন—আমি আর এক অন্ধ বিধবা মহিলা। এই মহিলা জাতিতে কায়স্থ ; আমাদের বাড়ির কাছেই ইঁহার বাড়ি। বাবার জেঠাইমা এবং বাড়ির কর্ত্রী পরলোকগতা আনন্দময়ীকে এই মহিলা মা ডাকিতেন। এই মহিলা অন্ধ হইয়া আমাদের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমরা পিসীমা বলিয়া ডাকিতাম এবং পরোক্ষে উল্লেখ করিতে হইলে অন্ধ পিসীমা বলিতাম। জেঠামহাশয় চিররুগ্ন লোক, কোন বিষয়েই তাঁহার কোন কৃতিত্ব ছিল না। আমাকে বাদ দিলে অন্য কাহারও কথা চিন্তাও করিতেন না। শুধু নিজের অসুখ ও চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না। আমরা অল্প কয়েকজন একটা বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ

বাড়িতে বাস করিতাম। সেইখানে রাত্রির অন্ধকারে বক্তা ও দুই শ্রোতার আসর খুব জমিত। এইভাবে গল্প শোনার পর আমি আর রামায়ণ মহাভারত পড়ি নাই। শুধু বছর দশেক পর কাব্যের আদ্য পরীক্ষার সময় (বোধহয় পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর-সম্পাদিত) বালরামায়ণ পড়িতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহার কোন কথাই আমার মনে নাই। জেঠামহাশয়ের কাছে যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা একটুও ভুলি নাই; দীর্ঘ সত্তর বৎসর ইহা আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। ইহার পরীক্ষাও রোজই আমাকে দিতে হইত। দুপুরবেলা কোন কাজ থাকিত না। আমি স্কুলে চলিয়া যাইতাম আর আমাকে দেখিলেই স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে প্রশ্ন করিত। ইহা খানিকটা খেলাও বটে, খানিকটা রীতিমত পরীক্ষাও বটে। প্রশ্ন-কর্তারা কে কি জানিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কখনও ঠকি নাই।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিবার সময় কখনও কখনও বাল্মীকি ও বেদব্যাসের রচনা দেখিতে হইয়াছে। তখন বুঝিয়াছি মূল রামায়ণ ও মহাভারত পড়া উচিত ছিল। তবে এত পঠনীয় জিনিস পড়ি নাই যে সেইজন্য আফ্‌সোস করিয়া লাভ নাই। আমি শুধু এইজন্য এত কথা বলিলাম যে এইভাবে অল্পকিছু পড়িয়া গল্প শুনিয়া ক্লাস ফোরে ভর্তি হইয়াছিলাম। খুব যে পটুত্ব লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না, কারণ স্কুলের প্রথম পরীক্ষায় (ষাণ্মাষিকীতে) অঙ্কে পাস করিতে পারি নাই—২৪ পাইয়া ফেল করিয়া জেঠামহাশয়ের কাছে খুব বকুনি খাইয়াছিলাম। তবে এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া শেষ পর্যন্ত গণিতে আর ফেল করি নাই। এত কথা বলার উদ্দেশ্য—এখনকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর যে ভয়াবহ চাপ পড়িতেছে তাহাতে আমাদের মত সেকেলেদের আতঙ্ক প্রকাশ করা। একদিকে ইংরেজির চাপ—সেইদিন আমার ৭ বছরের নাত্‌নী বলিল 'I am no impostor' (এতবড় শব্দ আমি কি চৌদ্দ বছরে জানিতাম?)—আর একদিকে মাতৃভাষার চাপ, তারপর হিন্দীর চাপ, তারপর ইতিহাস ও ভূগোল, তার উপর বিজ্ঞান ও গণিত এবং বিজ্ঞানও দুই প্রকারের—জীববিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান। আমাদের আমলে যে এত হরেক রকমের শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন না, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

২

আমাদের আমলে আমাদের গ্রাম ছিল নিষ্প্রভ, প্রায় নিষ্প্রাণ। উহার মধ্যে একটা হাই স্কুল থাকাই একটা বিস্ময়ের বিষয়। আমি যখন পড়ি, তখন ইহার খুবই জীর্ণ দশা, তবু হাইস্কুল তো বটে। এই স্কুলে আমি তিন বৎসর পড়িয়াছি—চতুর্থ (iv), পঞ্চম (v) ও ষষ্ঠ (vi) শ্রেণীতে। কিন্তু পূজার পর সপ্তাহ তিনেক আগে পালং স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়া উপরের শ্রেণী বা ক্লাশ সেভেনে উন্নীত হই।

আমার প্রথম স্কুলের প্রভাব সম্পর্কে বলিতে গেলে আমাদের গ্রামের কথা কিছু বলিতে হয়। কারণ এই স্কুলজীবনের মধ্য দিয়া আমি আমাদের সমাজের উপর আধুনিক শিক্ষার প্রভাব প্রথম অনুভব করি এবং ইহা শুধু আমার সম্পর্কেই সত্য নয়, সাধারণ ভারতবাসীর জীবনেও প্রযোজ্য। আমাদের গাঁয়ে দুই ঘর জমিদার ছিলেন—একটি বৈদ্য জমিদার। পরে আমি এই বাড়ির এক দৌহিত্রীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই। ইহার আগে আমাদের সঙ্গে ইহাদের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু যখন আমার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক হইল তখন গ্রামের অস্তিত্ব প্রায় অবলুপ্ত। আর একঘর জমিদার ছিলেন

মুসলমান। ইহাকে বলা হইত মিঞাবাড়ি এবং ঐ দিক্‌টাকে বলা হইত মিঞাপাড়া। ইঁহারা কেহই খুব ধনী নহেন কিন্তু উভয়েই গ্রামের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। পদ্মাতীরবর্তী ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমাদের গ্রামের নাম বানারি। বানারির মিঞারা ছিলেন খুব সম্ভ্রান্ত মুসলমান। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে ইঁহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বার ভুইঞাদের অন্যতম ভুইঞার বংশোদ্ভূত এবং সেই কারণেই বোধহয় আর্থিক সমৃদ্ধি না থাকিলেও আভিজাত্য ও প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল। আমাদের গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রগৃহস্থেরা অনেকেই বিদেশে থাকিতেন, গ্রামে থাকিতেন অল্পসংখ্যক কর্মহীন লোক অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং কিছু বিধবা। কোন কোন বাড়ি তো একেবারেই পরিত্যক্ত—শুধু ঘাসে আচ্ছাদিত ভিটা। ইহার মধ্যে আমরা যে নিঃশঙ্কভাবে বসবাস করিতাম ইহার একটা কারণ মিঞাদের সহজ, সরল, সর্বজনস্বীকৃত প্রতিপত্তি। স্বদেশী আমলে এবং লীগ (Muslim League) আমলে দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা গিয়াছে। উভয় আন্দোলনের সময়ই আমার গ্রামের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বানারির মিঞারা এই ব্যাপারে এমন নির্লিপ্ত ছিলেন যে কোন পক্ষ হইতেই কোন বাড়াবাড়ি সম্ভব হয় নাই। ১৯২৭ সালে পদ্মার ভাঙনে আমরা দেশছাড়া হই। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসিয়া নদীর ভাঙন থামিয়া যায়, তখন আমাদের বিস্তীর্ণ বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন স্বল্প চাষী-জমি দেখিতেন মিঞাবাড়ির মুনওয়ার আলী চৌধুরী। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে বাবার যে পত্রালাপ হইত তাহা সৌজন্য ও সহৃদয়তায় পরিপূর্ণ। তখন বানারি স্কুল পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাঁসাইলে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু স্কুলের নাম বদল হয় নাই এবং চৌধুরী সাহেবই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। স্কুলের তদানীন্তন হেডমাস্টার আমাদের নিকট-আত্মীয়। ১৯৩৭ সাল হইতে বাবা আমার কাছেই ছিলেন। সুতরাং দেশের সংবাদাদি প্রায়ই পাইতাম এবং হেডমাস্টার এই সময় কলিকাতায় আসিলে আমাদের বাড়িতেই উঠিতেন। তখন শুনিতাম, উভয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু নব্য যুবক সাম্প্রদায়িক জিগীর তুলিলেও বানারির মিঞাবাড়ির প্রভাবে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলিতে পারে নাই। এই হেডমাস্টার মহাশয়ের পূর্বে হেডমাস্টার ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যিনি ঐ তল্লাটে বানারির গান্ধী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া 'বিদ্যাশ্রম' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আমি তখন দেশছাড়া ; সুতরাং খুব প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তবে আমার মনে হয় তিনি বিপ্লবী কর্মধারা অপেক্ষা সাংগঠনিক কাজেই বেশি মন দিয়াছিলেন। যাহা হউক, পদ্মার ভাঙনে যখন তাঁহার বাড়ি বিলীন হইয়া গেল, স্কুল অন্যত্র চলিয়া গেল, তখন বানারির মিঞারাই তাঁহাকে আশ্রমের জন্য ভূমি দান করেন।

৩

হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি থাকিলেও আমাদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও যথেষ্ট ছিল এবং তাহার মূলে ছিল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য—এই দুই জাতির মধ্যে রেষারেষি। ইহা মানিতে হইবে যে বঙ্গদেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলায় বৈদ্যরাই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানাইয়াছিল এবং ইহা বিচিত্র নহে যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক গ্রামেই বি-এ পাস এবং বি-এ ফেল যুবকরা গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রণী হয়। আমাদের গ্রামে তখনকার হিন্দু জমিদারও বৈদ্য এবং তাঁহার বহির্বাটী খুব প্রশস্ত থাকায় সেইখানেই হাইস্কুল স্থাপিত হইল ১৯০১-২ সালে। আমার এই

সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা স্মৃতি নাই। তবে যতদূর মনে হয় সেক্রেটারী হইলেন মিঞা-বাড়ির তদানীন্তন প্রধান আব্দুর নূর চৌধুরী আর সহকারী সেক্রেটারী হইলেন রাধিকা-জীবন সেন, যাঁহার বাড়িতে স্কুল। ইহা সুবিদিত যে মুসলমানরা প্রথম দিকে ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করেন নাই ; কাজেই সেক্রেটারী হইলেও চৌধুরী সাহেব স্কুল সম্পর্কে খানিকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। শুধু মৌলবী সাহেব তাঁহার বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে আমার খুব মনে আছে। চেহারায় আলাপ-আচরণে তিনি সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

বদ্যিরা স্কুল করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে—ইহাতে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে রেষারেষি পূর্বেই ছিল তাহা প্রজ্বলিত হইল। ব্রাহ্মণরাই নেতা ; তবে বৈদ্য ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর হিন্দুরাও অনেকেই ব্রাহ্মণদের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লইল। ইহাতে খুব বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই, কারণ জাতিভেদ যদি মানিতেই হয় তবে ব্রাহ্মণ যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। সুতরাং বদ্যিদের বাড়াবাড়ি যদি একটু ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আপেক্ষিকভাবে তাহারাও উঠিতে পারে। বিশেষতঃ আমাদের গ্রামে তেমন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ছিল না ; অধিকাংশকেই আমাদের কর্তারা মনে করিতেন তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের ভৃত্যকুলোদ্ভব। এদিকে মিঞাদের কর্মচারীরা অধিকাংশই হিন্দু ও মিঞারা এইসকল বিষয়ে কতকটা নির্লিপ্ত, কারণ ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কেই ইঁহাদের তেমন সচেতনতা ছিল না। নিজেরা তেমন উৎসাহী না হইলেও উদ্যোগ আয়োজনের এবং কর্মী ও পরামর্শদাতার অভাব হইল না। সন তারিখ ঠিকমত বলিতে পারিব না, একদিন দুপুরে একদল লোক আসিয়া স্কুল লুঠ করিয়া মিঞাবাড়ি লইয়া গেল। এখন একটি স্কুল ভাঙিয়া দুইটি হইল। মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা না হইলেও মামলা রুজু হইল, এবং প্রচণ্ড দলাদলি হইল।

তখন মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকার খুব অনুকূল। সরকার বৈদ্য-ব্রাহ্মণের মূলী-ভূত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বুঝিতে পারিল না ; ইহা হিন্দু-মুসলমানের কলহ মনে করিয়া ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বিশেষ উৎসাহ দেখাইলেন। এদিকে কোর্টে কেস ঝুলিতেছে। কিন্তু কমিশনার সাহেব সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাপারটা খুব সহজ : দিনেদুপুরে এক দল লোক আসিয়া লুঠপাট করিয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি পূর্বের স্কুলকেই বহাল রাখিলেন—কিন্তু ইহার অধিক কোন সাজা দেওয়া হইল না। এই মীমাংসায় বোধহয় স্থির হইল যে কোর্টের মামলা তুলিয়া আনা হইবে। মিঞারা এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন : তাঁহারা কিছু মনে করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। শুধু আব্দুর নূর চৌধুরী আর স্কুলের সেক্রেটারী রহিলেন না। আর একটা সামান্য রেশ অন্যভাবে দেখিয়াছি। খানদানী মিঞাদের একজনের ছেলের নাম ছিল টুকু মিঞা। সে আমারই বয়সী হইবে, অথবা দুই-এক বছরের বড় হইতে পারে। মিঞা পাড়ার অন্য সব ছেলেরা পুরান স্কুলে—যে স্কুল লুঠ হইয়াছিল—পড়িত। কিন্তু টুকু মিঞা প্রায় এক ক্রোশ পায় হাঁটিয়া তেলিরবাগ স্কুলে যাইত। আমি চিরকালই ছা-পোষা ধরনের মানুষ, বাল্যকালেও কোথাও বিশেষ বাহির হইতাম না। দুই-একবার মিঞাবাড়ি গিয়াছি এবং সমবয়সী টুকু মিঞার সৌজন্যপূর্ণ আতিথেয়তার স্মৃতি আজও আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের অর্থাৎ খাস মিঞাবাড়ির কাহাকেও স্কুলে পড়িতে দেখি নাই।

এই যুদ্ধে আসল পরাজয় হইল ব্রাহ্মণদের এবং বদ্যিরা—তাঁহাদের মধ্যে আমার বাবা একজন—খুব উৎফুল্ল হইলেন। আমি বদ্যিদের দিক্‌টা অনেক শুনিয়াছি। কমিশনার

সাহেবের কাছে কেমন করিয়া তাঁহারা বাজিমাত করিলেন এবং অপর পক্ষের প্রধান প্রতিনিধি সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের বাগ্মিতার কাছে ঘায়েল হইলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই বিষয়টির একটি দিক ভাবিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। সন্তোষবাবু আমাদের গ্রামের অলংকারস্বরূপ ছিলেন; তিনি তাঁহার দৃঢ় অকলঙ্ক চরিত্র, বিদ্যাবত্তা এবং অধ্যাপনানৈপুণ্যের জন্য যে-কোন দেশে সমাদৃত হইতেন। তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেইখানে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততারও বহু গল্প প্রচলিত ছিল। শেষ জীবনে জ্যাকেরিয়া সাহেব হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলে তিনি ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হইয়া আসেন। আমিও এই সময় কলেজের কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসাবে প্রবেশ করি। তখন তাঁহার বেশ কাছে আসি। তিনি সরলতা এবং নিরহঙ্কার স্বভাবের জন্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি তেমন ঘোরাফেরা করিতে পারিতেন না। তাঁহার অধ্যাপনা এখানেও আদৃত হয় এবং তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আমাকে আকৃষ্ট করিত। তিনি নিজেকে কোথাও জাহির করিতে চাহিতেন না এবং সব রকম দলাদলি, মনকষাকষির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁহার মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোক কেমন করিয়া এই গ্রাম্য দলাদলিতে কৌরবদের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমি আজও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই।

এইসব ব্যাপারে আমার বাবার ভূমিকাও শ্লাঘ্য নয়। তিনি বানারি স্কুল প্রতিষ্ঠায় একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ঐ স্কুলেই বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বোধহয় লুঠপাটের সময় তিনিও স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এই কলহে অংশ গ্রহণ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি সন্তোষবাবুর মত সুদূর উত্তরবঙ্গ হইতে আসিয়া দলপতি হইতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার একটা বিষয়ে সংকীর্ণতা আমি চিরকাল লক্ষ্য করিয়াছি। পিতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব পুত্রের স্বাভাবিক ধর্ম; তবু অতিশয়োক্তি না করিয়া বলিতে পারি, আমার বাবা মোটামুটি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন আর বড় বিদ্বান্ না হইলেও তাঁহার মত বিদ্যানুরাগী লোক খুব কম দেখা যায়। একাশি বৎসর বয়সে মারা যান; মৃত্যুর তিনদিন আগেও বই নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া আমরা আলেয়ার আলো দেখার মত মনে করিয়াছিলাম এযাত্রা টিঁকিয়া গেলেন। মৃত্যুর আগে শেষের তিন বৎসর খুবই কাতর ছিলেন। আমি ও আমার মা কান দিতাম না; কাজেই প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার আমার স্ত্রীকে তাঁহার বহুমূল্য, বহুযত্নে আহৃত সম্পদের সুরক্ষার ভার দিতেন। এই সম্পদ্—হিব্রু, আরবী ইত্যাদি—নানা ভাষায় লিখিত বাইবেল। কিন্তু তাঁহার নিজের বাইবেল ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—বি-এ ও এম্-এ'র জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার এবং আগের দুই পরীক্ষার জন্য কলিকাতা গেজেট। কে ১৮৯৩ সালে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিল, কে ১৮৯৪ সালে ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছিল, কে এফ-এ'তে অতিশয় খারাপ রেজাল্ট করিয়া এম্-এ'তে ফার্স্ট হইয়াছিল, কে অল্পের জন্য এনট্রান্সে বৃত্তি পায় নাই—এই বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল এবং জ্ঞানও ছিল প্রচুর। আমিও মুখে মুখে তাঁহার কাছে শুনিয়া অল্প বয়সেই এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ হইয়াছিলাম। আমাদের গ্রামের কেহ কেহ পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। বাবা তাঁহাদের কথাও খুব বলিতেন। কিন্তু স্বগ্রামবাসী যে দুইজন ব্যক্তি তাঁহার আদর্শ পুরুষদের সঙ্গে তুলনীয় (রেবতীমোহন চক্রবর্তী ও সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়) তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহল ও উৎসাহ দেখি নাই। রেবতীমোহন চক্রবর্তী শুধু এম্-এ'তে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন; নচেৎ এন্ট্রান্স হইতে বি-এ পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় বি-এ এবং এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন; তাঁহার শিক্ষকতার

প্রসিদ্ধির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাবা তাঁহাদের কথা এড়াইয়া যাইতে চাহিতেন এবং আমাদের অর্থাৎ বৈদ্যদের মধ্যে অন্য দু'চার জন ইঁহাদের কৃতিত্বের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করিতেন। বাবার এবং আমাদের পরিবারের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না এমন নহে, অনেকের সঙ্গে তো খুবই হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু সেটা ব্যক্তি হিসাবে, ওখানকার ব্রাহ্মণসমাজের অঙ্গ হিসাবে নয়। এ যেন জোনাথান সুইফ্‌টের মানুষের সংজ্ঞার মত। মানুষ নামক প্রাণী তাঁহার ঘৃণা ও জুগুপ্সার পাত্র ; কিন্তু জন, পিটার, টমাস, টম, ডিক, হ্যারি ভাল লোক হইতে পারে। বাবা অনাথবন্ধু চক্রবর্তীকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তুলনা করিতেন, পূর্ণ আচার্য্যকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন—কিন্তু বানারির ব্রাহ্মণসমাজের কথা না বলাই ভাল।

স্কুলের হামলার ব্যাপারে বদ্যিদের জিৎ হইল ; এমন কি অপর পক্ষের প্রধান উদ্যোক্তা—কুমুদিনীকান্তবাবু বোধহয় দেশত্যাগী হইলেন, কারণ তাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তাহা হইলেও ব্রাহ্মণরা থামিলেন না—তাঁহারা নূতন এক ষড়্‌যন্ত্র আঁটিলেন। আমার বেশ মনে আছে—আমার স্কুলে ভর্তি হওয়ার বছরখানেক আগে—কার্ত্তিকপূজার দিন সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী কুলপুরোহিত আসিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের বাড়িতে পূজা করিবেন না। কি ব্যাপার? নিম্নশ্রেণীর দুই জাতির মধ্যে কলহ লাগিয়াছে ; সেই কলহে ব্রাহ্মণরা যে রায় দিয়াছেন তাহা বিনা দ্বিধায়, বিনা তর্কে গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তিনি পূজা করিবেন। হঠাৎ জেঠামহাশয় ইহা গ্রহণই বা করেন কি করিয়া? সময়ও অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি দুই-চারজন জ্ঞাতিরা পরামর্শ করিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে পুরোহিত আনাইয়া শেষ রক্ষা করিলেন। কিন্তু বৈদ্য-ব্রাহ্মণে বিরোধ ও বিভেদ থাকিয়াই গেল। সদাশয় পূর্ণ আচার্য আমাদের জন্য পাকা ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার পৃথগন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের পৌরোহিত্য করিতেন। পূর্ণ আচার্য্য নিজে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রহিয়া তাঁহাদিগকে সামলাইলেন ; আর ছোট ভাইকে বৈদ্যদের সঙ্গে থাকিতে বলিলেন। কিন্তু 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' পূর্ণ মাত্রায় চলিল। ১৯১৭ সালে আমার সোনা জেঠামহাশয় দুর্গাশংকর সেন পেনসন লইয়া দেশে আসিলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই এই অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যকর কলহ মিটমাট করিয়া দিলেন। কি লইয়া যে এই কলহ শুরু হইয়াছিল তাহাও উভয়পক্ষ তখন ভুলিয়া গিয়াছে। কাজেই সোনা জেঠামহাশয়কে মীমাংসা করিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না। যুদ্ধের পূর্বে যে যেখানে ছিল সেইখানে ফিরিয়া গেল। এখন হইতে দুর্গাপূজায় আমরা ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। সুখের কথা এই যে, বঙ্গদেশের জাতিভেদ অন্যান্য প্রদেশের casteism হইতে অনেক হালকা।

৪

এইসব গ্রাম্য দলাদলি লিখিয়া রাখিবার মত। এই পটভূমিতেই আমি ও আমাদের কালের ছেলেরা ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হইয়াছি। আমি যখন স্কুলে যাইতে আরম্ভ করি তখন হামলাবাজি থামিয়াছে, মিঞাবাড়ির স্কুল উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু হৃতসম্পত্তি ফিরিয়া আসে নাই, স্কুলের আসবাবপত্র খুবই নড়বড়ে, লাইব্রেরি বলিয়া কিছু নাই। পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচনের জন্য হেড্‌মাস্টার যে-সকল বই প্রকাশকদের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ পাইতেন তাহা হইতে কয়েকখানি বাছিয়া তিনি ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখাইতেন—ইহাই স্কুলের লাইব্রেরি। রাধিকাজীবন সেনের বহির্বাটীর একাংশে পূজার অঙ্গন ; সেখানে দুর্গামণ্ডপ ও প্রশস্ত নাটমন্দির এবং অনেকটা খালি জায়গা। দুর্গামণ্ডপে দুইটি ক্লাস হইত—নাইন

ও টেন অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। নাটমন্দিরের উত্তরাংশে দুইটি ছোট কামরা ছিল—একটিতে গ্রামের ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস, আর একটিতে শিক্ষকদের বসিবার ঘর। ইঁহাদের একজন আমার জেঠামহাশয় ; তিনি রুগ্ন বলিয়া কিছু পড়াইতেন না। তাঁহার কাজ বেতনাদি গ্রহণ করা, রেজেস্ট্রি লেখা অর্থাৎ তিনি ছিলেন কেরানী ও অ্যাকাউন্টেন্ট। প্রশস্ত নাটমন্দিরের বাকি অংশে দুইটি নীচের ক্লাস—থ্রি আর ফোর বসিত। সংলগ্ন আর একটি বড় ঘরে হইত আর চারিটি ক্লাস—ফাইভ, সিক্স, সেভেন ও এইট অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী। বানারি স্কুল হইতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে ও পাস করিয়াছে। কিন্তু হামলা ও মামলার জন্য পাঁচ বৎসর অর্থাৎ ১৯১২ পর্যন্ত কোন ছাত্র পরীক্ষায় বসে নাই। ইহার জন্যই কিনা জানি না, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের অনুমোদন কাটিয়া দিয়াছিল। অবশ্য সেইজন্য স্কুল ভয় পায় নাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের পরীক্ষার ফি'র উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সবাই জানিত ছাত্র পাঠাইতে পারিলে পরীক্ষা আটকাইবে না।

১৯১২ সালে আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই তখন প্রথম শ্রেণীতে মাত্র একজন ছাত্র ছিলেন। তাঁহাকে বেশ প্রবীণের মত দেখাইত ; শুনিয়াছি তিনি স্বদেশীতে যোগ দিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর স্বদেশী ছাড়িয়া স্কুলে পুনরাগমন করেন। শুনিতাম তিনি খুব ভাল ছাত্র এবং বৃত্তি না পাইলেও ভাল নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে যখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হই, তখন তিনি সদ্য এম-এ পাস করিয়া নোয়াখালি জেলায় হেডমাস্টারের চাকুরি পান। একদিন হিন্দু হস্টেলে আমার ঘরে আসিয়া শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন। স্কুলে শিক্ষকের প্রাচুর্য ছিল না। কখনও কখনও আমাদের মাস্টার না থাকিলে, সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর এই সরদার পড়ুয়াকে লইয়া আমাদের ক্লাসে আসিয়া তাঁহাকে আঁক কষাইতেন এবং আমাদিগকে নিঃশব্দে নিজেদের পড়া তৈরি করিতে বলিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও মাত্র কয়েকজন ছাত্র ছিল ; তারপর ক্রমান্বয়ে ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল—আমাদের শেষের দুই ক্লাস বেশ জমজমাট ছিল।

আমি এই স্কুলে যে তিন ক্লাসে পড়িয়াছি তাহার কোথাও খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারি নাই। শুধু শেষের বছর—অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে প্রত্যেক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম হইয়াছিলাম। শিক্ষক ছিলেন পূর্ণ আচার্য্য—যাঁহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমার পিতামহের কুড়ি বছর পর—বোধহয় ১৮৭৮ সালে—তিনি ও আমাদের গ্রামের গিরিশ দাস এন্ট্রান্স পাস করিয়াছিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন যে তখন নাকি অন্যান্য গ্রাম হইতে লোকেরা তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিত। তাঁহার ভাইপোরা আমার সহাধ্যায়ী ছিল ; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশ আচার্য্য 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম নায়ক এবং পরে আর. এস. পি.'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জীবনের শেষ প্রান্তে রমেশ আচার্য্য কলিকাতায় ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিতেন। এক সময়ে বানারি স্কুলে রমেশ আচার্য্য বাবার ছাত্র ছিলেন। বহুকাল পরে তিরিশের দশকে আমি যখন প্রফেসরি করি রমেশ আচার্য্য একদিন বাবার কর্মস্থল পালংগ্রামে আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। সমস্ত গল্পটা বাবার কাছে শোনা। বাবা রমেশ আচার্য্যকে সেইদিন আমাদের ওখানে আহার করিয়া যাইতে বলিলেন এবং রমেশচন্দ্রও একবাক্যে রাজী হইলেন। বাবা ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাকে কথাটা বলিয়া থাকিবেন। খানিকক্ষণ পরে রমেশবাবুকে ভিতরে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে মা নিজহাতে ঘর নিকাইয়া, বাসনপত্র মাজিয়া রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত বুঝিয়া রমেশবাবু বলিলেন যে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটাইয়াছেন,

অথবা ফেরারী হইয়া জাতি-ধর্ম-প্রদেশ নির্বিশেষে লোকের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছেন। রান্না করা তাঁহার পক্ষে শুধু অপ্রিয় নয়, প্রায় অসাধ্য। মা কিছুতেই তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে রাজি হইলেন না। তাঁহার যুক্তি, রমেশবাবু একে ব্রাহ্মণ, তদুপরি কুলপুরোহিত বংশীয় ব্রাহ্মণ ; সুতরাং রমেশবাবুকে রান্না করিয়া খাওয়াইলে তাঁহার যে পাপ হইবে, ইহাতে একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল হইবে। অগত্যা বাবা আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন, রমেশবাবু যে বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই বাড়িতেই ফিরিয়া গেলেন, মারও কোন পাপ করিতে হইল না এবং সমস্ত ব্যাপারটিতে কোথাও কোন তিক্ততা রহিল না। এখানে বানারি গ্রামের দলাদলিরও কোন ছোঁয়া লাগে নাই।

এই ক্ষুদ্র নাটকটি একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে উঠিয়া পড়িলেও বক্ষ্যমাণ বিষয়ে একেবারে অবান্তর নয়। হিন্দুধর্মে নানারূপ সাধনমার্গের কথা আছে। ইহা লইয়া হাস্যরসিক পরশুরাম কৌতুকও করিয়াছেন। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে তিনি বহুবিধ মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যায় 'মরিচমার্গ' এবং 'কাগমার্গ'। কিন্তু হিন্দুধর্মের যে অংশ আচারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় তাহাকে বলা যায় ছুঁৎমার্গ। মুসলমান ও খৃষ্টানদের কথা বাদ দিলাম ; তাহারা অন্যধর্মাবলম্বী—ম্লেচ্ছ, যবন। তাহাদের স্পর্শে যে হিন্দুর ধর্ম ভ্রষ্ট হয়, ইহাতে তাহাদের কিছু আসে যায় না। যতদূর মনে হয় 'যবন' শব্দের প্রাথমিক অর্থ ভিন্নধর্মীয় সুসভ্যজাতি। কোন কোন জায়গায় দেখিয়াছি হিন্দুরা যেমন মুসলমানের বাড়িতে আহার করে না, মুসলমানরাও হিন্দুর বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে না। কিন্তু আমাদের ছোটকালে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে জিনিসটা উৎকটভাবে দেখা যাইত তাহা হইল কাকে ছুঁইলে স্নান করিতে হইবে, কোন্ জাতির লোক ঘরে ঢুকিতে পারিবে, কে পারিবে না, কাহার হাতে জল খাওয়া যায়, কাহার হাতে জল খাওয়া যায় না, কে নিম্ন জাতীয় অতএব ঘরে ঢুকিলেও তাহাকে নিম্ন আসনে বসিতে হইবে। আমাদের গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ছিলেন কম। গ্রামে যখন প্রথম বসতি স্থাপন করা হয়, তখন এক সারিতে ব্রাহ্মণরা, তারপর এক সারিতে বদ্যিরা, তারপরের সারিতে যাহারা ছিল তাহাদের পূর্বপুরুষরা নাকি সংলগ্ন বদ্যিদের রায়ত, নফর বা প্রজা। সে অনেক দিন আগেকার কথা। আমরা যখন বড় হইয়াছি, তখন তাহারা উন্নতিশীল আর আমরা উন্নত অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় developing আর developed। তাহারা সংকায়স্থ বলিয়া নিজেদের চালাইতে চায়, আর আমাদের কর্তারা তাহাদিগকে ভৃত্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের ঠাকুমা—বাবার জেঠিমা—আনন্দময়ী বোধহয় রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ীর মতই সংস্কারমুক্ত ছিলেন, কাজেই অন্ধপিসীমা ও আমি এক চৌকির উপরে বসিয়াই সেই চৌকিতে আসীন জেঠামহাশয়ের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিতাম। কিন্তু তাহার বাড়ির অপর শরীকের কেহ আসিলে তাহাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইত না, বোধহয় এইজন্যই কেহ বড় একটা আসিত না। ইহাদের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বহির্বাটীর উঠানে খেলা করিতাম। ইহাদের সঙ্গে খুব একটা মাখামাখি করি জেঠামহাশয় তাহা পছন্দ করিতেন না। আমাদের গ্রামে একজন সুসভ্য, সম্পৎশালী চিকিৎসক ছিলেন : তিনি কিছুদিন ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িয়াছিলেন, সেই সুবাদে তাঁহাকে আমরা ডাক্তার বলিতাম, তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও করিতেন। মনে হয় তাঁহার প্রধান ব্যবসা ছিল তেজারতি। স্কুল যখন লুঠপাট হইয়া মিঞাদের বাড়িতে গেল তখন তিনি মিঞাদের দলে ছিলেন। তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে পরিবারের বন্ধু হিসাবেই জানিতাম এবং আমাদের বাড়িতে বিবাহাদির সময় কর্তারা সহজ শর্তে তাঁহার নিকট হইতে ঋণ পাইতেন। তিনি জলাচরণীয় হইলেও জেঠামহাশয়ের ঘরে ঢুকিয়া নিজ হাতে পিঁড়ি ফেলিয়া বসিতেন এবং বেশ সহৃদয়তার সহিত গালগল্প করিতেন।

স্কুলে প্রবেশ করিয়া দেখি ইহা এক ভিন্ন জগৎ। ক্লাসের সব চেয়ে সেরা ছাত্র হইল —মনিরুদ্দিন, তড়িৎ পাল, রমেশ চৌধুরী, গৌরাঙ্গ দেবনাথ, সুরথ আচার্য্য। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ মুদী, কেহ জোলা, কেহ মুসলমান। আমি তাহাদের মধ্যে একটু জায়গা করিয়া লইতে পারিব কিনা সেইটাই বড় কথা। মুসলমান ছেলেটি মুসলমান বলিয়া অন্ত্যজ ছিল না। কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষ নাকি আমাদের বাড়ির দরওয়ান জাতীয় ভৃত্য ছিল। বাস্তবিক-পক্ষে তাহার পুরো নাম ছিল মনিরুদ্দিন রাড়ি। কোন এক সময় আমাদের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। তখন কর্তারা খাজনা আদায় করিতে বাহির হইলে এই রাড়ি লাঠিহস্তে সঙ্গে যাইত। সেইজন্য সেই পদবী নামের মধ্যে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে সে কুলীন ; সব জাতির ছাত্র সমান এবং একমাত্র কৌলীন্য পড়া বলার, আঁক কষার নৈপুণ্য। শিক্ষকদের সম্পর্কেও সেই একই মানদণ্ড। ব্রাহ্মণ পূর্ণ আচার্য্য এবং কেদার উকিল (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং নাথবংশীয় ভুবন মজুমদাব—সবাই 'স্যার', সবাই ক্লাসে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়। তখন এমনভাবে যুক্তিতর্ক করি নাই কিন্তু একটা মুক্তির আস্বাদ যে পাইয়াছিলাম তাহা স্পষ্ট মনে আছে। স্কুল কারাগার ; ছুটি হইলেই আনন্দ। কিন্তু আমি দেখিতাম স্কুলেই কোন মানসিক চাপ নাই, নিঃসংকোচে সবাই একে অপরের সঙ্গে মিশিতেছে, মানুষ মানুষের সম্মান পাইতেছে। ইহার যদি কেহ ব্যতিক্রম করে, তবে সে হাস্যাস্পদ হয় বা নিন্দিত হয়। আজ মনে হয় ইহাই ইংরেজি শিক্ষার প্রধান অবদান বা কীর্তি। ইহা বিজ্ঞানভিত্তিক ; বিজ্ঞান বস্তুকে বস্তু বলিয়াই জানে, মানুষকে মানুষ বলিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করে। সংস্কৃত নাটক খুলিলেই দেখা যায় যে উচ্চশ্রেণীর লোক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এবং স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর জন্য প্রাকৃত ভাষা, কারণ তাহারা জাত্যংশেও প্রাকৃত। ইংরেজি সাহিত্য বুঝিবার বয়স তখন আমার হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, আচারে ও জাত্যভিমানের মরুবালুরাশি হইতে আমাদের বিচারের স্রোতঃপথ যে খানিকটা মুক্ত হইয়াছে ইহার প্রধান কৃতিত্ব ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আহৃত পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রাপ্য। মহাত্মাজি জাতিগঠিত কুসংস্কারকে উৎসাদিত করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন ; তাহা খুব বেশি সফল হয় নাই। কিন্তু দাসমনোভাবের পরি-পোষকতা করে এই অপরাধে তিনি যে 'অংরেজি'কে হটাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা নিঃশব্দে তাঁহার বহুবিজ্ঞাপিত আন্দোলনকে পিছে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কোন শিক্ষক কোন দিন জাতিভেদের সংকীর্ণতার উপর বক্তৃতা দেয় নাই। কিন্তু শিক্ষার মূলমন্ত্র চিত্তের প্রসার এবং বুদ্ধির নিরপেক্ষতা ; তাহার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সন্ধি অসম্ভব। মহাত্মাজির পোশাকী হরিজন নামই অপাঙ্‌ক্তেয়তার উপর আলোকপাত করে।

৫

বানারি স্কুলে যে পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম তাহা পৃথকভাবে স্মরণ করিতে পারি না। আর যে স্মৃতি এই দীর্ঘকাল জাগরূক আছে তাহা এক প্রবল ব্যক্তিত্বের। ব্যক্তিটি হইলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাসবিহারী দাশ—যাঁহার কাছে আমি সাক্ষাৎভাবে পড়ি নাই। সুদীর্ঘ জীবন ঘরের কোণে কাটাইয়াছি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে কর্মবীর, চিন্তা-নায়ক বা অন্য সকল ক্ষেত্রের বড়লোকদের খুব বেশি নিকটে আসিতে পারি নাই বা সেই চেষ্টাও করি নাই। যাঁহার কাছে আসিলেই কেমন একটা অনির্দেশ্য শক্তির স্পর্শ অনুভব করিয়াছি এমন লোক মাত্র দুই জন—রাসবিহারী দাশ ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অথচ ইঁহারা খুব ভিন্ন ধরনের লোক। প্রফুল্ল ঘোষ সবচেয়ে নামজাদা কলেজের সবচেয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক

আর রাসবিহারী দাশ এক ভাঙাচোরা স্কুলের অখ্যাত হেডমাস্টার। প্রফুল্ল ঘোষ ধনী, রাসবিহারী দাশ নির্ধন। যেসব বিষয় প্রফুল্ল ঘোষ চর্চা করিয়াছেন সেই বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল প্রায় অপ্রমেয়, তীক্ষ্ণধী হইলেও রাসবিহারী দাশকে কেহ বড় বিদ্বান্ বলে নাই। প্রফুল্ল ঘোষ খুব মিশুকে লোক ছিলেন, লোকের সঙ্গে কথা বলিতে না পারিলে অস্বস্তি বোধ করিতেন এবং ক্লাসে অনর্গল বক্তৃতা বা পাঠন দিতে ভালবাসিতেন। একবার গরমের ছুটিতে (১৯২৮) তিনি সিমলা যাইতেছিলেন। রাত্রি বারটায় দিল্লী পৌঁছুবেন, ঘণ্টা দেড়েক পরে সিমলার গাড়ি। আমাকে লিখিলেন, ঘণ্টা দেড়েক স্টেশনে কাটাইবেন, আমি যেন স্টেশনে দেখা করি। আমি যথাসময়ে গিয়াছিলাম এবং এখনও সেই সাক্ষাৎকার সানন্দে স্মরণ করি। রাসবিহারী দাশও বাক্‌পটু ছিলেন। কিন্তু তিনি অ্যারিস্টক্র্যাট, নিঃসঙ্গ, স্বল্পভাষী। তাঁহার সঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগ আমার হয় নাই, কিন্তু যখনই দেখা হইয়াছে, যে দুই-একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা স্ফুলিঙ্গের মত নিঃসৃত হইয়াছে।

রাসবিহারী দাশ আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন—তিনি আমার জেঠামহাশয়ের সমবয়সী। ইঁহাদের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল ; আমাদের বাড়ি হইতে বিদগাঁ বাজারে যাইতে অর্ধপথে তাঁহাদের বাড়ি। বাজারে যাওয়ার পথে কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়িতে জলতৃষ্ণা মিটাইতে গিয়াছি। তখন আমি আর বানারি স্কুলে পড়ি না। তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে বিজন-বিহারী দাশগুপ্ত আমার বন্ধু এবং বানারি স্কুলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সম-সাময়িক ছিল, একটু উঁচুতে পড়িত। বিজন পরে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হইয়াছিল। বিদগাঁ বাজারের মালিকানা বহু শরিকের—অন্যতম শরিক রাসবিহারীবাবুরা। এই কারণে এবং অন্য সামান্য জমিজমা থাকায় তিনি আইনে খুব পারদর্শী ছিলেন। শুনিয়াছি Bengal Tenancy Act বা প্রজাস্বত্ব আইনে তাঁহার পরামর্শ ও মতামত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তিনি কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না এবং উপযাচক হইয়া কাহাকেও উপদেশ বা পরামর্শ দিতেন না। তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ আভিজাত্যের সংযম।

আমি যতদূর শুনিয়াছি, তিনি বি-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। তাঁহার ও তাঁহার খুড়তুত ভাই হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের যৌথ পরিবার ছিল এবং তখনকার দিনের মাপকাঠিতেও হেমবাবু জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অনুরক্তি ও আনুগত্যের জন্য প্রশংসার্হ ছিলেন। ছোটভাই উকিল হইয়া বসিলে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার মোহরার হইয়া কর্মস্থলে গেলেন, কারণ তখন দেওয়ানী আদালতে অধিকাংশ মামলাই প্রজাস্বত্ব আইনের এবং সেই আইনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে দাদা বিশেষজ্ঞ। কিছুকাল পরে হেমবাবু সরকার কর্তৃক মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রাসবিহারী—অন্ততঃ তখনকার দিনের ন্যায়ানুসারে—এক আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তিনি অগ্রণী হইয়া হেমবাবুর পরিবার হইতে নিজের পরিবারকে ভিন্ন করিয়া লইলেন। হেমবাবু ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলে তিনি বুঝাইলেন যে দুই ভাইয়ের আয়ে এমন পার্থক্য হইয়া গিয়াছে যে একান্নবর্তী থাকিলে বড়ছোট নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইবে, কিন্তু পৃথক্ হইলে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি জানি হেমবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন এই সদ্ভাব অটুট ছিল। দেশে থাকিতে হেমবাবুর বড় ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। অনেক বছর পরে উপরি-উল্লিখিত বিজনবিহারীর সঙ্গে আমার একদিন পারিবারিক বিষয়ে গল্প হইতেছিল। মনে হয় তখন আমি সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। কথা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম যে হেমবাবুর এক ছোট ছেলে—সর্বকনিষ্ঠ নাও হইতে পারে—এবং আমি কর্মসূত্রে কখনও

কখনও মিলিত হইয়াছি। আমি অনুযোগের সুরে বলিলাম, 'তুমি তো কোন দিন আমাকে ইহার কথা বল নাই।' কৃতী ব্যবহারাজীব অমনি জবাব দিল, 'ইহারা কি আমার সঙ্গেই কোন সম্পর্ক রাখে যে আমি তোমাকে ইহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব!' আবার বলি—একাল আর সেকাল!

স্কুলে যখন হামলা হয় তখন হেডমাস্টার ছিলেন ভিন্‌গাঁয়ের একজন ব্রাহ্মণ। মামলার নিষ্পত্তি হইলে পুরান স্কুলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ শিক্ষকের জায়গা হইলেও ভিন্‌গাঁয়ের ব্রাহ্মণ হেডমাস্টার—বাদিদের মতে বিশ্বাসহন্তা—অপসৃত হইলেন বা অপসারিত হইলেন। এই ভাঙাচোরা স্কুলের জন্য হেডমাস্টার পাওয়া দুরূহ এবং যাঁহারা প্রধান উদ্যোক্তা তাঁহাদের সামর্থ্যও কম। সুতরাং গ্রামের লোকে রাসবিহারীবাবুকে ধরিয়া পড়িল যে তিনি তো বাড়িতেই বসিয়া আছেন ; অল্প বেতনে তিনি স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং রাসবিহারী-বাবুও রাজি হইলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৈদ্য-ব্রাহ্মণের মধ্যে দলাদলি থাকিলেও আবার ব্যক্তিগত সম্প্রীতিরও অভাব ছিল না। আমি ইহাও বলিয়াছি ইংরেজিশিক্ষার সূর্যোদয়েই জাতিবৈরিতার কুয়াসা কাটিয়া যায়। বৈদ্য-বিদ্বেষী বলিয়া গ্রামবৃদ্ধ দীনবন্ধু চক্রবর্তী আমাদের পক্ষের লোকের কাছে অপ্রিয় ছিলেন কিন্তু তাঁহার পুত্র কুলবন্ধু চক্রবর্তী হইলেন গ্রামের ভাঙা-চোরা স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কুলবন্ধুবাবু ছিলেন ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টরের হেডক্লার্ক। তখনকার সাহেবী আমলে হেডক্লার্কদের খুব ক্ষমতা ছিল। বিশেষতঃ কুলবন্ধু-বাবু অতি সজ্জন এবং কর্মদক্ষ। অনুমোদন না থাকিলেও যে, এই স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইতে পারিত অথবা শিক্ষাসংকোচনের পক্ষপাতী ইংরেজ কর্তারা যে এই স্কুলের তেমন বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না, তাহার একটি কারণ কুলবন্ধুবাবুর সাহায্য। হয়ত বর্ষায় পানসি-নৌকাবিহারে বাহির হইয়া পল্লীশোভা দেখিবার জন্য অথবা যে-কোন কারণেই হউক, আমাদের ছোট স্কুলে ঢাকার বড় সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টর একাধিকবার আসিয়াছেন—আমার পাঠদ্দশায় এবং তাহার অব্যবহিত পরে। একজনের নাম আমার মনে আছে—J. W. Gunn। একজনের রিপোর্ট আমি পড়িয়াছি এবং অন্য দুই-একজনের মতামত পিতৃবন্ধু কুলবন্ধুবাবুর কাছে শুনিয়াছি। মোটামুটি এক কথা—এটা একেবারে পচা (rotten) স্কুল ; ইহার একমাত্র উল্লেখ্য সম্পদ্ ইহার হেডমাস্টার। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় রাসবিহারী দাশের ব্যক্তিত্বের যে চৌম্বক শক্তির কথা বলিয়াছি ইন্‌স্‌পেক্টররাও তাহার আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই।

রাসবিহারী দাশ স্কুল চালাইতেন নিজের বুদ্ধিতে এবং অন্য সকল শিক্ষককে তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন দিতেন। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন আশু মুখুজ্জের কৃপায় বি-এ, এমন কি এম-এ প্রচুর পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। সেই রকম শিক্ষক কিছু বেশি বেতন পাইতেন, কিন্তু প্রকাশ্যতঃ হেডমাস্টার নিজে সহকারী প্রধান শিক্ষক হইতে বেশ কম বেতন লইতেন। যদিও স্কুল কমিটি বলিয়া একটা সংস্থা ছিল—আমার বাবা একজন মেম্বার ছিলেন—কিন্তু তাহার সভা বড় একটা বসিত না। ইহা হইতে কানাঘুষা শুরু হইল যে, রাসবিহারীবাবু কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, কোন হিসাব দেন না ; সুতরাং হয়ত তিনি গোপনে অনেক টাকা আত্মসাৎ করিতেছেন। এমন হইতে পারিত যে রাসবিহারী দাশ ঠিকমত হিসাবপত্র রাখিতেন না, কিন্তু টাকা আত্মসাতের সম্ভাবনা একটু হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। স্বল্পসংখ্যক ছাত্র, প্রত্যেক ক্লাসেই প্রত্যেক বিষয়ের জন্য শিক্ষক দিতে হইত এবং তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তো

করিতে হইত। যাহা হউক, একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাইত এবং যিনি ঠিক নীচের স্থান অধিকার করিতেন তাঁহার হৃদয়েও উচ্চাভিলাষ স্পন্দিত হইত।

আমাদের ঘনশ্যাম সেনের বংশে কেহ কেহ উচ্চ পদ অলংকৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই বংশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান লোক গুণদাচরণ সেন—আমার বাবার কাকা এবং আমার দাদামহাশয়। দাদামহাশয় অশ্বিনী দত্তের শিষ্য ছিলেন, ভক্তিযোগের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষজীবনে উপনিষদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা এই বিষয়ে অধিকারী তাঁহারা আমার কাছে এই ব্যাখ্যার সুখ্যাতি করিয়াছেন। পেশায় তিনি ছিলেন অ্যাড্ভোকেট এবং অনেককাল হাই-কোর্টের আপীল আদালতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারাজীবদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। আমি যখন দেশে ছিলাম তখন দাদামহাশয়ের গ্রামের ভিটা জংগলাকীর্ণ ছিল। কিন্তু অনুমান করি ১৯১৭ সালে তিনি দেশে বেশ ভাল বাড়ি করেন এবং মাঝে মাঝে দেশে যাইতেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে যখন শোনা গেল যে নদীর ভাঙন থামিয়াছে, তখন তিনি গ্রামে আবার বসতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং আমার সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। সে কথা যাক্। দেশে পুনরাগমনের প্রারম্ভেই এই বিচক্ষণ লোকটি কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাসবিহারী দাশের বিরুদ্ধে যাঁহারা ষড়্যন্ত্র করিতেছিলেন দাদামহাশয় তাঁহাদের কথায় কান দিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁহারা রাসবিহারী দাশের কাছে হিসাব চাহিলেন। তন্মুহূর্তে রাসবিহারী দাশ পাকা হিসাব, তাঁহার কাছে গচ্ছিত (যৎসামান্য) টাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন। অনুরোধসত্ত্বেও তিনি যে স্কুলকে আগ্লাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সমস্ত কাহিনীটা আমি আমার সোনা জেঠামহাশয় দুর্গাশংকর সেনের কাছে শুনিয়াছি। তাঁহার কাছে নাকি দাদামহাশয় স্বীকার করিয়াছিলেন যে গ্রামে রাসবিহারী দাশের মত লোক থাকিতে পারে তাহা তিনি পূর্বে ভাবেন নাই।

যাহা হউক, রাসবিহারী দাশের অন্তর্ধান স্কুলের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর হইয়াছিল ইহা বলা যায় না। তাঁহার মত অভিজাতমনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক সরিয়া যাওয়ায় বহু লোক উৎসাহসহকারে স্কুলের পরিচালনার কাজে আসে এবং ইহাদের সমবেত চেষ্টায় স্কুলের জন্য জমি কেনা হয় এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মনে করা যাইতে পারে, যদিও ইহার পর স্কুল অমন কৃতী শিক্ষক আর পায় নাই, তবু এই তীক্ষ্ণব্যক্তিত্বশালী মানুষটি চলিয়া যাওয়ায় পরোক্ষে স্কুলের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। এইখানেই একনায়কত্ব এবং গণতন্ত্রে পার্থক্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পালং ও পালং স্কুল

১

১৯১৪ সালের শেষভাগে পূজার ছুটির পরে পালং আসিয়া ওখানকার ক্লাস সিক্স বা পঞ্চম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষা দিই এবং ১৯১৫ সাল হইতে টানা পাঁচ বছর ওখানে পড়ি। চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণী—এই তিন ক্লাসে তিন বৎসর এবং প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়ি ; ইহার কারণ ১৯১৯ সালে ১লা মার্চ আমার ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সেইজন্য বয়স বাড়াইয়া লিখা নীতিবিরুদ্ধ কাজ হইবে মনে করিয়া বাবা আমাকে এক বৎসর রাখিয়া দিলেন। পালং স্কুলে বাবা হেডমাস্টার হইয়া আসেন ১৯০৮ সালে। তিনি তৎপূর্বে বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ; ইহার আগে তিনি স্বগ্রামে বানারি স্কুলে কিছুকাল ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। আমার জেঠামহাশয়ের শ্বশুরবাড়ি পালং গ্রামে এবং স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ির পাশের বাড়িতে। আমার নিজের মামাবাড়িও পালংএর সংলগ্ন কোটাপাড়া গ্রামে। জেঠামহাশয় কোন এক উপলক্ষে পালং গিয়াছিলেন। সেখানে সেক্রেটারী বলিলেন যে তাঁহাদের ওখানে হেডমাস্টারের পদ খালি আছে এবং জেঠামহাশয় বাবার জন্য চাকুরি ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কারণ পূর্ববাংলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হইতে পশ্চিম বঙ্গের হেতমপুর বহুদূর। বাবাও তড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন, কারণ অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে হেতমপুরে পানীয় জলের অভাব এবং তজ্জনিত রোগাশঙ্কার জন্য জায়গাটা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না।

পালং স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া বাবা আবিষ্কার করিলেন যে নানা ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য এই স্কুলেরও অনুমোদন য়ুনিভার্সিটি প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে অথবা প্রত্যাহার করিবে বলিয়া নোটিস দিয়াছে। আমি অবশ্য তখনও পালং আসি নাই। বাবা কায়মনোবাক্যে স্কুলের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্কুলের চার ভিটাতে চারটি বড় ঘর উঠিল ; তাহাদের পাকা ভিত—সামনে পাকা গেট এবং দুইটি ফুলভারসমৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছ আর স্কুলের সংলগ্ন জমিতে পুষ্করিণী খনন করা হইল—যাহার জল সকলেই পানের জন্য তুলিতে পারিত, কিন্তু কেহ ওখানে স্নান করিতে পারিত না। বাবা খুব বই ভালবাসিতেন। পালং স্কুলের মত এত বই এবং এত ভাল বই খুব কম স্কুলে ছিল। ঐ স্কুলের একটা শেক্সপীয়র-সংস্করণের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল ঘোষও— The Comedy of Errors এবং The Merchant of Venice—পড়িতে আনিয়াছিলেন। ছাত্রও বহু। আমি যখন যাই তখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী ছাড়া প্রত্যেক ক্লাসেই দুইটি করিয়া সেক্‌সন। গ্রামের পোস্টাফিসে যতটা মনে আছে, ইংরেজি কাগজ কমই আসিত। স্কুলে বাবা আনিতেন Indian Daily News এবং পরে ঐ পত্রিকা উঠিয়া গেলে স্টেট্‌সম্যান বা ইংলিশম্যান। ইহা ছাড়া আসিত সাপ্তাহিক Times লন্ডন হইতে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। Times অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহে যুদ্ধের সমসাময়িক ইতিহাস বাহির হইত। কিভাবে জানি না, পালং গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ চাটার্জি নামে এক ভদ্রলোক কলিকাতায় ইহার গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং তিনি উহা স্কুলে দান করিলেন। বাবা উহা খুব পড়িতেন। পড়াশোনার এত বিপুল ও বিচিত্র উপকরণ আমার কাছে খুব বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইত।

পালং স্কুলের নিজস্ব দুইটি খেলার মাঠ ছিল। একটি ফুটবলের বড় মাঠ। দ্বিতীয়টিতে ক্রিকেট। অবশ্য ক্রিকেটের তেমন চলন ছিল না। কিন্তু ঐ অঞ্চলে খুব ফুটবল খেলা হইত এবং নানা কাপ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইত। প্রতি বৎসর স্বয়ং গোষ্ঠ পালের আবির্ভাব হইত ; তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক। আমাদের গাঁয়ের মত এখানেও পাশাপাশি অনেক স্কুল ছিল ; বরং এখানে স্কুলের সংখ্যা আরও বেশি। এইসকল স্কুলের মধ্যে পালং স্কুলের একাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ যেহেতু পালং বড় বন্দর, তাই এখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি। অন্য সব স্কুলই হয় কাহারও বদান্যতায় স্থাপিত বা পরিপুষ্ট অথবা সরকারী সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল। ইহার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই ছিল। যে স্কুলের কোন পৃষ্ঠপোষক নাই, তাহার নিজস্ব গচ্ছিত অর্থ থাকা চাই এবং বোধহয় ইহার অভাবের জন্যই স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহৃত হইয়াছিল অথবা প্রত্যাহারের ভয় দেখান হইয়াছিল। এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্কুলের অনুমোদন ফিরিয়া পাওয়া অথবা স্কুলকে ভয়মুক্ত করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বাবার পরিশ্রম ও প্রতিপত্তির জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহার জন্যই তিনি স্কুলকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য এই আস্থা ও প্রতিপত্তির একটা অপ্রীতিকর দিকও আছে। বাবা খানিকটা সমালোচনা-অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। পালং ও সন্নিহিত গ্রামগুলির আর একটা লক্ষণ ছিল সমাজব্যবস্থায় স্থিতিস্থাপকতা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এক সময়ে বঙ্গদেশের সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী জমিদার ও শাসনকর্তা ছিলেন। কীর্তিনাশার ভাঙনের ফলে রাজ-নগরের সেই সমাজই পালং গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। রাজবল্লভের বংশধরগণের আর্থিক সমৃদ্ধি তখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা অটুট আছে। তখন সেই পরিবারের প্রধান ছিলেন প্রতাপচন্দ্র সেন। ইনি রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র ইতিহাসে উল্লিখিত কৃষ্ণ-দাসের প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রের পুত্র ছিলেন। ইঁহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল এবং সেইজন্য তিনি মোটামুটিভাবে জমিদারি ঠাঁটপাট রাখিতে পারিতেন। তিনি খুব বেশি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু নিরিবিলি ইংরেজি, বাংলা পত্রিকা ও বাংলা বই পড়িয়া সময় কাটাইতেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সদালাপী এবং মিষ্টভাষীও ছিলেন। এইভাবে সাধারণ পাঁচজনের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন অথচ সকলেই তাঁহার সঙ্গে দেখাশোনা করিতে পারিত। সবাই যেন একটু দূর হইতেই তাহাদের 'বাবু' বা 'মহারাজ'কে সম্মান দেখাইয়া তৃপ্ত ছিল। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'অরূপ রতন' নাটকের মতই লোকে তাঁহাকে বড়-একটা দেখিতে না পাইলেও তিনি আছেন এই কথা মনে করিয়াই সন্তুষ্টমনে যে যাহার জায়গায় আপন মনে কাজ করিয়া যাইত। সামাজিক দলাদলি প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। আমাদের অতি ক্ষুদ্র বিরলবসতিপূর্ণ গ্রামে দলাদলি লাগিয়াই ছিল, কিন্তু পালং গ্রাম প্রায় শহরের মত জন-বহুল এবং বহুজাতির নিবাস হইলেও এখানে সামাজিক প্রশ্ন খুব বেশি উঠিত না। যদি-বা উঠিত ক্ষণিক তর্কাতর্কির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত ও সহজেই তাহার মীমাংসা হইত।

২

আমি যখন পালং গিয়াছিলাম তখন ওখানে জমজমাট অবস্থা। বাজার এত দীর্ঘ যে মনে হইত ইহার শেষ নাই এবং হাটের দিনে যে ভিড় হইত তাহা প্রায় কলিকাতার ভিড়ের মত। নদীর উপর বড় বন্দরই বাজার এবং তাহার এক প্রান্তে স্টিমার স্টেশন। ওখানে তখন দুধের জিনিসের এবং বিশেষ করিয়া কাঁসা-পিতলের বড় ব্যবসায় চালু ছিল ; স্টিমার একবার থামিলে মাল নামাইতে ও উঠাইতে বহু সময় যাইত। বিরাট সাব-পোস্টাফিসের

কাছে আমাদের গ্রামের ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস তো খেলাঘরের মত। একটু দূরে স্কুল সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আর বাজারের মাঝখানে বড় থানা। আমরা গ্রামে চৌকিদার দেখিয়াছি, থানা যে কোথায় ছিল তাহাই ঠিক বলিতে পারি না ; কখনও শুনিতাম আমরা রাজাবাড়ি থানার অধীন, আবার কখনও শুনিতাম মহকুমা মুন্সীগঞ্জ থানার। আর পালং-এ বড় দারোগা, ছোট দারোগা তো ছিলেনই ; সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টরও ওখানেই থাকিতেন। পরে জানিয়াছি মাদারিপুর মহকুমার নয়টি থানার চারটি থানাই পালং সার্কেলের মধ্যে আর পাঁচটি—তাহাদের মধ্যে একটি একেবারে ছোট—আর দুই সার্কেলে।

উপরে পুলিসী ব্যবস্থার যে বর্ণনা দিলাম তাহার অভ্যন্তরে আর একটি অফিস ছিল তাহাই স্কুলের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পালং যাইয়া এবং পরেও দেখিয়াছি ওখানে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয় এবং অন্যান্য ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানও হইত। আমাদের গ্রামে ঐরূপ কিছু দেখি নাই ; এখানেও কিছুদিন পরে আমি ইহার নিহিত তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া আর খোঁজ রাখি নাই। পালং সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিরাট কর্মকেন্দ্র এবং তাহার পরিচালক ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রধান দুই নেতা আশুতোষ কাহালী ও জীবনকুমার ঠাকুরতা। ইঁহাদের পূর্বে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সেন যিনি স্বল্প কিছুদিন আগে গত হইয়াছেন ; তাঁহার নামে স্কুলের সংলগ্ন একটি লাইব্রেরি ছিল। অল্প কিছু-কালের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উৎসব এবং লাইব্রেরি প্রভৃতি সবই মধ্যম শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর বিপ্লবীদের মিলনের উপলক্ষ এবং নূতন সৈনিক আকর্ষণের উপায়। সেই পথে বিবেকানন্দের রচনা-পাঠ দিয়া হাতে খড়ি। প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে লাইব্রেরি, ডনকুস্তির আখড়া, বিবেকানন্দের রচনা আবরণও বটে, আবার হাতিয়ারও বটে। আমাকেও দলে টানার চেষ্টা একটু-আধটু যে না হইয়াছিল তাহা নহে। আমার সমসাময়িকদের মধ্যে কেহ কেহ এই পথে অগ্রসর হইয়াছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হারাণচন্দ্র রক্ষিত ও রাধাবল্লভ গোপ। আমার সময়ে পালং স্কুলে যাঁহারা খুব মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত তাহাদের মধ্যে ইঁহারা অগ্রণী। হারাণদা কবে কোথায় থাকিতেন কেহ বলিতে পারিত না। বাবা তিরস্কার করিতেন, সি. আই. ডি. তাঁহার (অবশ্য আরও অনেকের) পিছনে লাগিয়া ছিল, কিন্তু পরীক্ষার সময় দেখা যাইত গণিতে তিনি প্রায় মোট নম্বর পাইয়াছেন এবং অন্যান্য বিষয়েও খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। তিনি ১৯১৬ সালে ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন ; তারপর বোধহয় বেশির ভাগ সময় জেলে এবং ফেরারী অবস্থায় কাটাইয়াছেন। আমার রাজশাহী থাকাকালীন (১৯৪২-৪৬) একবার বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে শুনি, তিনি মারা গিয়াছেন। রাধাবল্লভ আমার অপেক্ষা বয়সে একটু বড় হইলেও আমার সহপাঠী ; যতদূর মনে হয় আমার স্কুলে প্রবেশের পূর্বে সেই 'ফার্স্ট বয়' ছিল। তারপর কলেজে পড়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া বমাল ধরা পড়ে ; সাজার পর আন্দামান সেলুলার জেল, তারপর এখন (১৯৪২) পর্যন্ত এই অশীতিপর ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ আর. এস. পি. দলের অক্লান্ত কর্মী।

ইহাদের কথা হইতে পালং স্কুলের কথায় ফিরিয়া যাই। বাবার সঙ্গে বিপ্লবীদের খুব মজার সম্পর্ক ছিল। তখনকার দিনে হেডমাস্টারদের অবস্থা এই দিক দিয়া খুব লোভনীয় ছিল না। সি. আই. ডি. অনেক সময়ই বিপ্লবী ছাত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ করিতে আসিত এবং হেডমাস্টারদের খুব অসুবিধায় পড়িতে হইত। দুই-চারজন হেডমাস্টার হয়ত সি. আই. ডি.কে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য নিগৃহীত হইয়াছেন, এমন কি নিহত হইয়াছেন। আমি পালং যাওয়ার পূর্বে ঐ স্কুলেরই একজন শিক্ষক প্রহৃত হইয়া-

ছিলেন। এখন বুঝিতে পারি আমার বাবার পক্ষে পরিস্থিতিটা ছিল বেশ জটিল। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে এই বহুধা বিচ্ছিন্ন দেশ কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না এবং স্বাধীন হইলেও সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং বিদেশীর হাতে যখন আসিতেই হইবে, তখন দেখিতে হইবে পশ্চিমী-শক্তিদের মধ্যে কাহার শাসন সবচেয়ে কম অনিষ্টকর। এইখানেও তিনি ইতিহাসের নজির দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিতেন যে ইংরেজ-শাসন সর্বাপেক্ষা নির্দোষ। আমি যখন ওখানে গিয়াছি তখন প্রধান দুই নেতা আশু কাহালী ও জীবন ঠাকুরতা স্কুল ছাড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু অন্য অনেক বিপ্লবী যুবক স্কুলে পড়ে। বাবা ছাত্রদের কাছে এইসকল লেকচার দিতেন এবং স্কুলে গেলে প্রায়ই দেখিতাম সি. আই. ডি. ইন্‌স্‌পেক্টর—সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী—বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং তাঁহারা নিভৃতে কথা বলিতেছেন। বিপ্লবীরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। তাঁহারা অবশ্য তাঁহাদের মাস্টারমহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেক্‌চারের ফলে নিজেদের বিপদ্‌সংকুল ব্রত হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হইত না, মাথা নীচু করিয়া নম্রভাবে সব কথা শুনিয়া বিদায় লইত এবং নিজেদের পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে মাস্টারমহাশয়ের পথের ও মতের মিল না থাকিলেও মনের মিল এত বেশি ছিল যে তাহারা কখনও ভাবিতেই পারিত না যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন তথ্যের বাষ্পও কোনও ডিটেকটিভ মাস্টারমহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

বহুদিন পরে একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে যাহা শুনিয়া বাবা নিজেই একটু সহর্ষ লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের কথা বলিতেছি। রাজনৈতিক আবহাওয়া খুব উত্তপ্ত—জিন্না সুরাবর্দীর Direct Action এবং কলিকাতার ব্যাপক হত্যালীলা সবেমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি তখনও রাজশাহী কলেজেই আছি। কি কারণে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম ; আসাম মেলে ফিরিতেছি। আমাদের দীর্ঘ করিডর ট্রেনে বহু M.L.A. যাইতেছেন তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায়। ইঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ি, রাজশাহীর হিন্দু এম-এল-এ এবং অনুশীলন সমিতির প্রথম শ্রেণীর নেতা। আমি তাঁহার কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্বে বোধহয় আলাপ হয় নাই, কারণ ১৯৪৬ সালেই তিনি কারামুক্ত হইয়া বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য হয়েন। যাহা হউক, ট্রেনেই আলাপ জমিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তিনি আমার কথা অনেক শুনিয়াছেন। একেবারে অবাক না হইলেও, আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি জানাইলেন যে দীর্ঘকাল কারাবাসের সময় অনেকবার সহকর্মী আশুতোষ কাহালী ও জীবনকুমার ঠাকুরতার সঙ্গে ছিলেন। কর্মহীন দিনগুলি ইঁহারা গল্পগুজব করিয়া কাটাইতেন। এবং সেই সময় আশুবাবু প্রভৃতি বন্ধুরা তাঁহাদের মাস্টারমহাশয়ের কথা, তাঁহার ছেলের কথা, বিশেষ করিয়া মাস্টারমহাশয় কেমন করিয়া ছেলেকে পড়াইতেন যাহাতে ছেলে ইত্যাদি ইত্যাদি—এইসব বিষয়ে আলোচনা করিতেন। যাঁহারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িয়া জীবন কাটাইয়াছেন তাঁহারা জানিয়া বা না জানিয়া এত কথা আলোচনা করিতেন—ইহা শুনিয়া আমিও অভিভূত বোধ করি।

পালং স্কুলে বাবা একটানা ত্রিশ বৎসর ছিলেন। এখানকার অগণিত ছাত্রসমাজই তাঁহার প্রধান সমাজ এবং তাঁহার যৌথপরিবারের সংস্কার এখানে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তিনি এই বিরাট ছাত্রপরিবারের প্রধান এবং ইহাদের প্রত্যেকেই মনে করিত তাহারা বাবার পরিবারভুক্ত এবং পরবর্তীকালে যখন কোন উপলক্ষে ইহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাহারাও এই কথা বলিয়াই আমাকে আপ্যায়ন করিয়াছে যে তাহাদের আপনজন

ও আমার মধ্যে বাবা কোন পার্থক্য করেন নাই। বাবা শেষজীবনে যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন দেশবিভাগের পর হিন্দু ছাত্ররা অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া গিয়াছে এবং এমন দিন যাইত না যখন কেহ না কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই। যতদিন পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যাতায়াত ছিল বা সংযোগ রক্ষা করা যাইত ততদিন ওখানকার হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। বাবা গত হয়েন ১লা ডিসেম্বর ১৯৫৬। সেই সময় শবদাহ হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত এইসব ছাত্রেরা তাঁহাদের প্রয়াত শিক্ষকের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, ইহা যেন তাঁহাদেরই পিতৃবিয়োগ ও পিতৃশ্রাদ্ধ। যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে ছিলেন তাঁহারাও অনেকেই চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই মধুর দিকটা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাইয়াছিল আমার বন্ধু পবিত্রকুমার বসুর পত্রে। পবিত্র বসু পালং স্কুলের ছাত্র নহে ; সে পড়িত নিকটবর্তী চিকন্দী স্কুলে। আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই নিকটতম এবং বাবার চরিত্রের সকল দিকই সে জানিত। বাবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ক্যালেণ্ডারে অনুরক্তি দেখিয়া সে একবার বলিয়াছিল যে ডিকেন্সের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে, তিনি ডিকেন্সের কোন উপন্যাসে স্থান পাইতেন! বাবার মৃত্যুর সময় পবিত্র বসু দিল্লীতে কর্মরত ছিল। তথা হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে সে আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলাম। পবিত্র ও আমি পরস্পরকে 'ব্রাদার' বলিতাম এবং চিঠিতে 'B' বলিয়া সম্বোধন করিতাম এবং কখনও কখনও চিঠির শেষেও 'B' লিখিতাম :

New Delhi
13-12-56.

My Dear B,

I have received your letters, one after another, three in all, communicating the inevitable but the unknown. It pains me that on my last visit to Calcutta I did not make the usual pilgrimage to your house, and I shall no more see the face of one who had been, after my father's death, my greatest well-wisher in life. My loss is only next to yours.

I met your father first, not in your company, but alone. I remember the interview vividly, after the lapse of thirty-six years, and so did he. The last ten days I have been full of thoughts of him. So many incidents are emerging from apparent oblivion, so many anecdotes, advice and encouragement and so much of affection. He was a wonderful man, essentially noble, and every contact with him awakened in me the ambition to be kind, tolerant and generous. I can say that of few persons. I should also acknowledge that but for him I would not have been half so good a member of a joint family as I have been.

I stopped at this time to wipe out the drops of tears that gathered at my eyes. That is exactly what I have to offer to his memory.

Ever yours affectionately,

B

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা সব মানিয়া লইলেও আমি ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে বাবার পালং স্কুল পরিচালনায়, এমন কি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক ত্রুটি ছিল। যে কোন চাকুরিতে একাগ্র কর্তব্যনিষ্ঠা মহৎ গুণ, কিন্তু একাগ্রতা ও একাত্মতা এক বস্তু নয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, সেই সত্তা সেবকের, চালকের সত্তা হইতে স্বতন্ত্র। যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সেবা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সেই নিষ্ঠার সঙ্গে কিঞ্চিৎ নির্লিপ্ততা থাকা প্রয়োজন। নিজের সঙ্গে প্রিয় প্রতিষ্ঠানের যে পার্থক্য আছে ইহা অনুরূপ অবস্থায় আরও অনেক একনিষ্ঠ সেবকের মত বাবাও ভুলিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য স্কুল-পরিচালনার বিন্দুমাত্র সমালোচনাকে তিনি ব্যক্তিগত নিন্দা বা শত্রুতা বলিয়া মনে করিতেন। ইহার ফলে তিক্ততার সৃষ্টি হইত এবং যে অল্পসংখ্যক লোক প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিন্দুক বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাহারাই অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য লাভবান হইত। অবশ্য এই-সকল তিক্ততা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। এই অতিরিক্ত সংসক্তি যে বড়-ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান বা অনেক পরিচালক সম্পর্কেই প্রযোজ্য সেই সত্য উত্থাপন করার জন্যই এত কথা বলিলাম।

৩

পালং স্কুলে আসার আগে আমি কোন দিন পরীক্ষায় প্রথম হই নাই ; এই স্কুলেও প্রথমে আমি তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিই নাই। বানারি স্কুলের বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া পালং স্কুলে যে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়াছিলাম সেই পরীক্ষায় অংকে কোন রকমে পাস করিয়াছিলাম আর সংস্কৃতে পাস করিলেও কম নম্বর পাইয়াছিলাম। অংকে কাঁচা ছিলাম আর সংস্কৃতের মান পালং স্কুলে বেশ উঁচু ছিল। চতুর্থ শ্রেণী হইতে অনেকটা ভাল ফল করিতে লাগিলাম, কেহ কেহ তো প্রথমে বলাবলি করিল যে, হেড্‌মাস্টারের ছেলে নিশ্চয়ই আগে প্রশ্ন জানিয়াছিল! তাহা হইলেও আমি প্রথম বা দ্বিতীয় হইতে পারি নাই। তৃতীয় শ্রেণী হইতে অবশ্য ক্লাসে আমার প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত হয়। সেই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া তখনকার আমলের শিক্ষাব্যবস্থার কথা একটু আলোচনা করিতে চাই।

আমাদের আমলে ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় ১৯১০ সালে আর আমি পরীক্ষায় বসি ১৯২০ সালে। এই পরীক্ষার পাঠ্যক্রম বহুদিক্‌ হইতে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। আমাদের আমলে চারটি বিষয় আবশ্যিক ছিল—ইংরেজি (দুই পত্র), বাংলা, সংস্কৃত ও অংক। ইহাতে পাঁচশত নম্বর। ইহা ছাড়া দুইটি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল : তন্মধ্যে ছিল ইতিহাস, আর একপত্র (অতিরিক্ত) অংক, আর একপত্র (অতিরিক্ত) সংস্কৃত এবং বল-বিদ্যা, ভূগোল : ইহা ছাড়া আরও কোন বিষয় থাকিতে পারে যাহার নামই আমি শুনি নাই। ইতিহাসে বেশি নম্বর পাওয়া কঠিন আর অংক শুদ্ধ হইলেই পুরো নম্বর পাওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য সাকুল্যে বেশি নম্বর পাওয়ার আশায় অনেকেই অংকের দিকে ভিড়িতে চাহিত। ভাল ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অংকে কাঁচা সাধারণতঃ তাহারাই ইতিহাস পড়িত। শুধু ইতিহাসের দিকে ঝোঁক আছে সেইজন্য ইতিহাস লইয়াছে এরূপ ছাত্র যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ঐচ্ছিক সংস্কৃতের কোন সার্থকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। যতদূর জানি ইহার জন্য কোন স্কুলে কোন ক্লাস হইত না। ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে ইহার জন্য হয়ত উচ্চমানের কিছু সংস্কৃত সাহিত্য যোগ করা যাইত, কিন্তু তাহা হইলে পরীক্ষা কঠিন হইয়া পড়িত। সুতরাং বলা যাইতে পারে একটি সংস্কৃত-পত্র ছিল আবশ্যিক আর অতিরিক্ত সংস্কৃতপত্র অনাবশ্যক। আবশ্যিক অংক ছিল খুবই

সহজ। আমি পালং স্কুলের পনের বছরের অর্থাৎ ১৯১০ হইতে ১৯২৪ সালের রেজাল্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি শুধু অংকে ফেল করিয়া ফেল হইয়াছিল মাত্র একজন। অতিরিক্ত অংক-পত্র অবশ্য ইহা অপেক্ষা গুরুভার ছিল।

কঠিন পরীক্ষা হইত ইংরেজির, বিশেষ করিয়া প্রথম পত্রের। দুইটি বেশ বড় বড় অনুচ্ছেদের ইংরেজি তর্জমা করা হইত ; তারপর ইংরেজিতে দুইটি প্রবন্ধ লিখিতে হইত। দ্বিতীয় পত্রে ব্যাকরণটা খানিকটা সহজ ছিল আর প্রথম পত্রে চল্লিশ পাইলে দ্বিতীয় পত্রে বত্রিশ পাইলেই পাস করা যাইত। সুতরাং ইংরেজি প্রথম পত্রই একমাত্র দুরূহ বিষয় ছিল। অন্য সব কিছুই হাল্কা রকমের। যাঁহারা এই সিলেবাস রচনা করিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সুশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। বহুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করণিক আমাকে বলিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় মোটা মোটা করিয়া শীলমোহর প্রভৃতিতে লিখে 'অ্যাড্‌ভানস্‌মেন্ট অফ লার্নিঙ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার উদ্দেশ্য হইয়া গিয়াছিল অ্যাড্‌-ভানস্‌মেন্ট অফ আর্নিঙ—'এল্‌' কাটিয়া দিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে বেশি ছাত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলে বেশি টাকা পাওয়া যাইবে—এই লক্ষ্য রাখিয়াই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রম রচিত হইয়াছিল। ইহার বিশদ বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

ইংরেজি ও মাতৃভাষার যে সিলেবাস করা হইয়াছিল তাহা অন্য দিক দিয়াও সমা-লোচনাযোগ্য। সাহিত্যের আনন্দের মধ্য দিয়াই ভাষাশিক্ষা সম্ভব ; ব্যাকরণ, বাক্যগঠন-প্রণালী, শব্দের লাক্ষণিক অর্থজ্ঞানের দ্বারা নৈব নৈব চ। ইংরেজি সাহিত্য না পড়িয়া, শুধু নেসফিল্ডের ব্যাকরণ, ম্যাকমর্ডির পদবিন্যাসব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়া যে ভাষাশিক্ষা হইত তাহা কাহারও মনে দাগ কাটিত না। কতকগুলি বইয়ের নাম সুপারিশ করা হইত—as models of style, রচনাশৈলীর উদাহরণ হিসাবে। এইখানেই গোড়ায় গলদ, স্টাইলকে কখনও বস্তু বা ভাব হইতে পৃথক্ করা যায় না। বাংলায় এই ভ্রান্ত ধারণার কুফল বেশি প্রকট হইয়া দেখা দিত। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা সবচেয়ে অযোগ্য তাঁহারাই নীচের দিকে বাংলা পড়াইতেন আর উপরের দিকে যাঁহারা পড়াইতেন তাঁহারা অযোগ্য না হইলেও ঠিক কি পড়াইতে হইবে জানিতেন না। এইজন্য তাঁহারাও এই বিশেষ কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে পারিতেন না।

আমার নিজের কথা মনে আছে। বোধহয় 'অনুশীলন সমিতি'র হাওয়া আমাদের জগতেও অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমরা শুনিতাম যে নভেল পড়া যুবকদের চরিত্রগঠনে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং নভেল পড়ায় অভিভাবকরা আপত্তি করিতেন। কিন্তু কোন সংকলন বইতে, এমন কি বাংলা-ইংরেজি অনুবাদের বইতে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে উদ্ধৃতি পাইলে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া তাহা পড়িতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক শৌখিন দল কখনও কখনও মঞ্চস্থ করিলে সেই-সকল নাটকের উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা ভাল লাগিত। স্কুলে উ'চু দিকে যিনি বাংলা পড়াইতেন তিনি সেকেলে লোক, নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, স্কুলের প্রশাসনিক দায়িত্বও তাঁহার উপর খানিকটা ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে বেশ প্রাঞ্জল, সুললিত বাংলা লিখিতে পারিতেন ; তাহা হইলেও আমাদের কি পড়াইবেন তাহা যেন ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেন না। প্রধান আসামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ—যাঁহারা পাঠ্যক্রম রচনা করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে যখন বাংলায় বা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এম-এ'র পাঠ্যক্রম চালু করা হইল তখনও উপযুক্ত পাঠ্যক্রম চালু করা হইল না। এই বিভ্রাটের বিষয় পরে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

বাবা আমাকে ইংরেজি পড়াইতেন—স্কুলে এবং বাড়িতে। তিনি আজীবন বিদ্যাচর্চা করিয়াছিলেন এবং আমাকে পড়ান ছিল তাঁহার প্রধান ব্রত। কিন্তু এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাষানির্ভর সিলেবাস ইহা তাঁহার নিজের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। বাগর্থ পার্বতী-পরমেশ্বরের মত সম্পৃক্ত, কিন্তু তবু পরমেশ্বর মুখ্য, পার্বতী গৌণ। এইজন্যই তো কালি-দাসের কাব্যে পরমেশ্বরের জন্য পার্বতীর তপস্যা এত বিচিত্র, এত অপরূপ। বাবা সব সময়ই পড়াশোনা করিতেন। স্কুলের বিরাট লাইব্রেরী ছিল ; তিনি একাই তাঁহার সাধ্য-মত সদ্ব্যবহার করিতেন। কিন্তু স্টাইল যাহাকে 'শেষের কবিতা'র অমিত মুখশ্রী বলিয়াছে তাহা বাবার কাছে মুখ্য হইয়া গিয়াছিল এবং এইজন্য তাঁহার পঠন-পাঠনে ভারসাম্য ছিল না। আমি তাঁহার কাছে পড়িয়া সাহিত্যের সহিতত্ব অপেক্ষা তাহার বহিঃপ্রকাশকে প্রাধান্য দিতে শিখিয়াছিলাম।

পালং স্কুলে সংস্কৃত পড়াটা আমার খুব মনে আছে। পণ্ডিতমহাশয় শ্রীনাথ কাব্যতীর্থ ও আমরা ঐ গ্রামের এক বাড়ির দুই অংশে থাকিতাম। সকালে উঠিয়া বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া মুখ ধুইতেন এবং আমি পড়া দেখিয়া লইতাম। পণ্ডিতমহাশয় এই সময়টা তামাক খাইতেন এবং বাবার সঙ্গে গল্প করিতেন। পণ্ডিতমহাশয় সংস্কৃত যাহা পড়িয়াছিলেন প্রায় সবই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতেন। আমি প্রস্তুত ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির সুপ্রয়োগে খুব মুগ্ধ হইতাম। পূর্বে বলিয়াছি অংকে যে আমি কাঁচা তাহা ছাত্রজীবনের প্রথম পরীক্ষায় ফেল করিয়া জানিয়াছিলাম। ইহা শোধরাইয়া দিয়াছিলেন পালং স্কুলের শিক্ষকদের, বিশেষ করিয়া সেকেণ্ড মাস্টার সুরেন্দ্র ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রম। সংস্কৃতে যে আমি পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা টের পাইলাম পালং স্কুলের প্রথম পরীক্ষাতেই। আমাদের গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পাঠের তেমন সুযোগ ছিল না। শ্রীনাথ কাব্যতীর্থ শুধু সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন না ; তিনি আধুনিক মানদণ্ডেই অতিশয় 'সহৃদয়' সাহিত্য-রসিক ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অতি প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি হাস্যরসিক ছিলেন। সব কথারই তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিতেন।

আমার (জাঠতুতো) ভাই মণীন্দ্রশংকর ১৯১৭ সালে পালং স্কুলে ভর্তি হয় এবং (আমার মতই) প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়িয়া ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করে। আমরা দুই ভাই একবার ঠিক করিয়াছিলাম পণ্ডিতমহাশয়ের সরস গল্পগুলি পুস্তকাকারে সংকলিত করিব। তাহা যে পারিলাম না তাহার কারণ শুধু আমাদের অবসরের অভাব বা অক্ষমতা নয় ; সেইসব গল্পগুলি তখনকার আলোচনার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিত যে সেই-সকল ঘটনা বা অবস্থা তুলিয়া ধরিতে না পারিলে গল্পগুলির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হইবে না। অধিকাংশ সময়ে বুঝা যাইত না তিনি গল্পটি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, না, পরিস্থিতি দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করিতেছেন। আমি দুই-চারটি জবাব ও গল্প উল্লেখ করিয়া অন্য প্রসঙ্গে যাইব। স্যার আশুতোষ সংস্কৃত পঠন-পাঠন ভাল-বাসিতেন, কিন্তু বোধহয় ১৯১০ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের পরই কোন কোন মহলে আপত্তি উঠিতে থাকে যে সংস্কৃতকে এত মর্যাদা দেওয়া ঠিক হয় নাই। ইতিহাস ও ভূগোল বাদ পড়িল, বিজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিল না অথচ সংস্কৃত হইল আবশ্যিক।

আমাদের হীরালাল প্রমোশন না পাইয়া নিকটবর্তী এক স্কুলে চলিয়া গিয়াছে। সে বখাটে ধরনের ছেলে, পালং স্কুলে থাকিতে পণ্ডিতমহাশয়ের তিরস্কার ও চপেটাঘাত খাইয়াছে। ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছে ; পথিমধ্যে পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া বলিল, 'আপনার আর বিশেষ কিছু করিবার রহিল না। প্রস্তাব উঠিয়াছে, সংস্কৃত অপ্‌শন্যাল অর্থাৎ ঐচ্ছিক হইয়া যাইবে।' পণ্ডিতমহাশয় অমনি উত্তর দিলেন, 'তাতে তোর কি লাভ হইবে? সব কয়টি বিষয় অপ্‌শন্যাল না হইলে তো তোর পাসের কোন সম্ভাবনা দেখি না।' আর

একদিন—ইহার কিছু আগে—স্কুলের শেষে মাস্টারদের ঘরে কেহ কেহ গল্প করিতেছেন এবং দুই-চার জন বাহিরের বর্ষীয়ান লোকও আছেন। আলোচনার বিষয়—প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনীর অগ্রগতি। কেহ কেহ বলিতেছেন, এই অগ্রগতি প্রতিহত হইলেও জার্মেনীর জয় অনিবার্য। এক ভদ্রলোক প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া উঠিলেন, 'জার্মানরা সংস্কৃতানুরাগী ; ম্যাক্স-মুলারকে দেখুন, আমাদের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার থিব সাহেবকে দেখুন। (তারপর পণ্ডিত-মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাদের সংস্কৃতের পণ্ডিতদেরই এবার সুবিধা হইবে।' পণ্ডিতমহাশয় একটু টেরা ছিলেন ; আমার বাবার দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ওসব কথা ছাড়িয়া দিন। হেডপণ্ডিত হেডমাস্টার এবং হেডমাস্টার হেডপণ্ডিত হইলে বুঝিব একটা পরিবর্তন হইল বটে ; তার আগে কিছু মানিব না।'

আর একটি গল্প স্মরণ করিয়া অন্য প্রসঙ্গে যাইব। আমি কলিকাতায় আসার পর যখনই ছুটির পর ফিরিতাম, মা পণ্ডিতমহাশয়কে দিয়া পাঁজি দেখাইয়া যাত্রার দিন ঠিক করিতেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করি। বাবা আর পণ্ডিতমহাশয় তখন এক বাড়িতে থাকেন না। মা পণ্ডিতমহাশয়কে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। আমাদের বাসায় আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় গল্প করিতে করিতে পাঁজি আনার কথা বলিলেন। কে একজন বলিল, আজকাল পাঁজিতে ঘণ্টা মিনিট দেওয়া থাকে, দণ্ডকে আধুনিক সময়ের মাপকাঠিতে আনিতে হয় না। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, অসুবিধাও আছে, পলের মাহাত্ম্য এখন আর ধরা যায় না। অমনি প্রশ্ন উঠিল, সেটা কি রকম? তখন পণ্ডিতমহাশয় এক যাজনিক ব্রাহ্মণের উপস্থিত বুদ্ধির কথা বলিলেন। অ-ব্রাহ্মণ যজমান লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীর সেবা করেন নাই। কাজেই পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল করিয়া সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অন্য দুই-চার পূজা সারিয়া পুরোহিতের পৌঁছুছিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। পুরোহিতকে দেখিয়া গৃহস্বামী বিষণ্ণবদনে বলিলেন, তাঁহার আয়োজন সব পণ্ড হইয়াছে। প্রতিবেশীরা বলিয়াছে যে পাঁচদণ্ডের পঞ্চমী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুরোহিত অমনি হুংকার দিলেন, 'আন তো পাঁজি।' পাঁজি আনা হইলে তিনি বলিলেন, 'পাঁচদণ্ডের কথা তো বলিয়াছে। পলের কথা কিছু বলিয়াছে? পলে যে সব ঠিক করিয়া দিয়াছে। পাঁজিতে স্পষ্ট লেখা আছে পাঁচদণ্ড সাঁইত্রিশ পল। পাঁচদণ্ড তো চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পুরো সাঁইত্রিশখানা পল!' নিরক্ষর যজমান ইহা জানেন যে সাঁইত্রিশ পাঁচের বহুগুণ বেশি। সুতরাং তিনি সহর্ষে পূজার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন।

শ্রীনাথ কাব্যতীর্থ 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' ছিলেন—ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এবং 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত'। যাজনিক কার্যে, পাঁতি দিতে, কোচিং ক্লাস করিতে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। তবু তাঁহার সান্নিধ্যে থাকার ফলেই সংস্কৃতে আমি আর পিছাইয়া রহিলাম না, বরং ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা আমার পিছনে পড়িয়া গেল। ১৯১৯ সালে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইল না। প্রথম দিকটা আমার কাটিল চোখের চিকিৎসায়। কলিকাতায় আসিয়া চশমা লইলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ঝড়ে ঐ এলাকায় ভীষণ ক্ষতি হয় এবং ত্রাণসমিতির সভাপতি করা হয় বাবাকে। বাবার অফিসের কাজ আমিই বেশির ভাগ করিতাম। এমন সময় পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, আমি যেন তাঁহার টোলে পড়িয়া কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিই। সেই পরীক্ষা দিয়া পাসও করিলাম। খুব বেশি সংস্কৃত শিখি নাই, কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সেই যে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পড়িয়াছিলাম তাহার রেশ কানে ও মনে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। অন্য একটা উপলক্ষে বাবার কাছে মূল শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ অনেকখানি পড়িয়াছিলাম এবং বেশ খানিকটা মুখস্থও করিয়াছিলাম। পরে প্রায়ই মনে হইত যে যদি

বাবার কাছে আরও শেক্সপীয়র ও পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে আরও কিছু কালিদাস পড়িয়া লইতাম!

৪

পালং স্কুলে এবং পালং ও তৎসংলগ্ন গ্রামের লোকদের সংস্রবে আমার জীবনের বহু বৎসর কাটিয়াছে। আমার বাবার প্রতি অনুরক্তির জন্য এবং ওখান হইতে খুব ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করার জন্য ওখানকার ছোট-বড় সকলের ভালবাসাই আমি পাইয়াছি এবং তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি; কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান লোক ওখানে প্রায় দেখি নাই। ওখানকার যাঁহারা চালক তাঁহারা রাজদ্রোহী, বিপ্লবী; আমি রাজভক্ত পিতার ছেলে এবং নিজে স্কুলের ভাল ছাত্র। সুতরাং বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এড়াইয়া চলিয়াছি। আর যে বিরাট বণিক সম্প্রদায়ের উপর ওখানকার অর্ধ-নগরসুলভ চালচলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমি তাহার মূল্যায়ন করিতে পারিয়াছি পালং পরিত্যাগ করার পর। আমাদের সংযোগ ছিল রাজনগর সমাজের সঙ্গে যাহা তখন ক্ষয়িষ্ণু; ইহার পুরান গৌরব চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না। এই সমাজের দুইটি চরিত্র আমার চিত্তপটে গভীর-ভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ ও মনোরঞ্জন—ইহারা উভয়েই বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ, উভয়েই পদবীতে আচার্য্য এবং আমার ধারণা ইহারা রাজনগর সমাজের লোক নহে।

প্রথমে বলিব নরেন্দ্রনাথ আচার্য্যের কথা। ইনি বয়সে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। খুব মিশুকে, বেপরোয়া ধরনের লোক; সকলের সঙ্গেই হৈহৈ করিতেন এবং কাহাকেও তোয়াক্কা করিতেন না। গ্রাম্য জমিদার রায়মহাশয় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিছুকাল আগেই রায়মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র টাইফয়েডে মারা যায় এবং অনেকটা সেই শোকেই কোন চিকিৎসা গ্রহণ না করিয়া প্রথমা স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হইতেই যেন পরলোক যাত্রা করেন। নরেন্দ্রনাথের মা চিররুগ্না; জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন সে আমলের গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সমাজের মানদণ্ডে বিবাহের বয়সও হইয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে রায়মহাশয় কাহারও কাছে প্রস্তাব করিলেন যে মায়ের অসুখের কথা চিন্তা করিয়া নরেন্দ্রনাথের এখন সংসার দেখিবার জন্য বিবাহ করা উচিত। ইহা খুব সঙ্গত প্রস্তাব। কে একজন ইহা নরেন্দ্রনাথকে বলিলে তিনি প্রকাশ্যে তারস্বরে বলিয়া দিলেন, 'আমার বাবা রায়মহাশয়ের চেয়ে দুই-এক বছরের ছোট। মা মারা গেলে আমি বাবাকে বিবাহ দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিব।' বেপরোয়া এবং রোখাচোখা লোক হইলেও নরেন্দ্রনাথ আচার্য্য খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই কারণে একবার একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। বোধহয় ১৯১৬ সালের ঘটনা। ইহারা পরীক্ষার্থীরা সকালে বাবার কাছে পড়িতে আসিত। আমাদের বাড়ির লাগাই স্কুল। ইহারা জড়ো হইলে বাবাকে সংবাদ দেওয়া হইত এবং বাবা আসিয়া পড়ান আরম্ভ করিতেন। দুই-এক দিন আমিও আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতাম। হেডমাস্টারমহাশয় আসার আগে ছেলেদের হৈচৈ, হাতা-হাতি, টানাটানি সবই চলিত। সেইদিন কাহার হাত নরেন্দ্রনাথের যজ্ঞোপবীতে জড়াইয়া গিয়াছিল এবং সে নীচ জাতের! নরেন্দ্র আচার্য্য তো ক্ষেপিয়া আগুন! তাহার যজ্ঞোপবীত অপবিত্র হইয়াছে। যে এই অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে সে তো লজ্জায় বিমূঢ়। ব্রাহ্মণ যাহারা ছিল তাহারাও নরেন্দ্রনাথের বাড়াবাড়িতে অধোমুখ; তবে তাহারা বুঝিল এই উন্মাদকে না ঘাটানই ভাল। এমন সময় বাবা আসিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই একে একে লেখা লইয়া বাবার কাছে অগ্রসর হইল।

নরেন্দ্র আচার্য্য সম্পর্কে অনেক কথাই মনে আছে। আমাদের পালং-জীবনে বছরে একটা দিন ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ—প্রত্যাশায়, আশঙ্কায়, দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এই দিনটি হইল ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন। ইহা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য অসাফল্যের ব্যাপার নয়, সামাজিক প্রেস্টিজের ব্যাপার। ঐ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পাশাপাশি চার পাঁচটা স্কুল। কোন্ স্কুল কি রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিল তাহা হাটে বাজারে, চণ্ডীমণ্ডপে, খেলার মাঠে, পুকুরঘাটে আলোচ্য বিষয়। ১৯১৬ সালের ব্যাপারটা আমার খুব মনে আছে। জুন মাসে ফল বাহির হইত। তখন আবার পালং স্কুল পরিচালিত কাপ খেলা চলিতেছে। আশেপাশের ছোট ছোট গ্রামগুলিও যোগদান করিয়াছে। নরেন্দ্র আচার্য্য স্বগ্রাম বিলাসখান টিমের একজন উদ্যোক্তা। এমন সময় পরীক্ষার খবর আসিল এবং দেখা গেল পালং স্কুলের ভরাডুবি হইয়াছে। মাত্র ছয়জন পাস করিয়াছে—অবশ্য অন্যান্য স্কুলেও একই রকম পাস, কিন্তু নানা অনুরোধ উপরোধের ফলে বাবা অনেক ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই কারণে পালং স্কুলে ফেলের সংখ্যা খুব বেশি। এই ফেলের মধ্যে একজন নরেন্দ্র আচার্য্য। বাবা তো গ্লানিতে, লজ্জায় মাসখানেক বাড়ির বাহিরেই গেলেন না, তিনি London Times প্রকাশিত যুদ্ধের ইতিহাস বইখানিতে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেন। সব লোকেরই শত্রু থাকে, বাবারও ছিল। তাহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল এবং দল পাকাইতে লাগিল। ফল যেদিন প্রকাশিত হইল তাহার পরের দিনই ফুটবল কাপে নরেন্দ্র আচার্য্যের বিলাসখানের খেলা। আমি খেলা দেখিতে আসিয়া দেখি নরেন্দ্র আচার্য্য টিম্‌কে সজ্জিত করিয়া, মাঠে নামাইয়া, মাঠের পাশে দাঁড়াইয়া অক্লান্তভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার 'থ্রি চিয়ার্স ফর বিলাসখান' ধ্বনি আকাশ মন্দ্রিত করিতেছে। যখন যেখানে বল, লাইনের ওধারে নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত এবং তাঁহার সেই উদাত্ত উৎসাহ বাণী। এক ফাঁকে এক ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন্দ্র, কাল তোদের ফল বাহির হইয়াছে না?' অমনি জবাব হইল, 'তাহাতে কি হইয়াছে? বীরেশ্বর, কালীশংকর নিশ্চিত পাসের মধ্যে ছিল। আরও দুই-চারজন টেস্টে আমার অপেক্ষা বেশি নম্বর পাইয়াছিল, কিন্তু ফেল করিয়াছে। আমার এমন আক্ষেপের কি আছে? থ্রি চিয়ার্স ফর বিলাসখান !!!'

এই রকম সময়ই হইবে। তখন বি-এ পাস একটু সুলভ হইলেও পাড়াগাঁয়ে এম-এ পাস বড় একটা দেখা যাইত না। এই সময়কার সামাজিক ব্যবস্থার কথাও একটু বলিতে হইবে। ওখানে তখনও রাজনগর সমাজের রক্ষণশীলতা দূরীভূত হয় নাই ; উচ্চবর্ণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে, কৌলীন্য, ঘরজামাই রাখা, বহুবিবাহ তখনও কিছু কিছু দেখা যাইত। কিন্তু যাঁহাদের বাবা বা পিতামহ ঘরজামাই হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিয়াছে, শুধু কৌলীন্যের দোহাই দিয়া আর কত দিন চলে! এই রকম একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন বুড়ো সারদাকান্ত গাঙ্গুলী। তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে জ্ঞানদাকান্ত গাঙ্গুলী—পালং স্কুলের ছাত্র—আর পাশের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সত্যশরণ কাহালী ইংরেজিতে এম-এ পাস করিলেন। বাবার কাছে শুনিয়াছি, জ্ঞানদাকান্ত যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখন তিনি এই দরিদ্র মেধাবী ছেলের পরীক্ষার ফি দানবীর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে আবেদন করিয়া আনাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে এম-এ পাস করিয়া গ্রামীণ সমাজে বেশ একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই রকম সময়ে আমি একদিন বাহিরে বসিয়া পড়িতেছি, হঠাৎ নরেন্দ্র আচার্য্য রাস্তা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'এত পড়িস কেন? চল্ ঘুরিয়া আসি।' তাঁহার সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়া পড়িলাম। প্রধান

আকর্ষণ—ইঁনি সম্পন্ন ঘরের লোক ; সুতরাং খুব সুসজ্জিত চেম্বার, অথচ রোগীর বালাই নাই। কাজেই বসিয়া আড্ডা দেওয়ার উপযুক্ত জায়গা। ডাক্তারের নাম ধরুন—মতীন্দ্রলাল মুখুটি। ইঁহারা অপসম্বন্ধ করিতে করিতে মুখার্জি হইতে মুখুটি হইয়াছেন। এখন কন্যার কুলীন সম্বন্ধ করিয়া আবার কৌলীন্য অর্জন করিতে চাহেন। বাবা ঐ স্কুলে যোগ দেওয়ার পূর্বেই সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন না পাইয়া মতীন্দ্রলাল স্কুল ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি হয়েন এবং সেখান হইতে এম. ডি. উপাধি সংগ্রহ করিয়া, আত্মম্ভরিতা সঞ্চয় করিয়া দেশে আসিয়া ডাক্তারি করিতেছেন। কিন্তু কুটীরবাসী প্রতিবেশী জ্ঞানদাকান্ত একটা বড় পাস দিয়াছে যাহার কথা নিরক্ষর ঝি-চাকররাও জানে, ইহা ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের 'প্রিয় ছাত্র (!)'—ইঁহার নিজের কথা—ঠিক বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। গল্প যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, আমাদের ডাক্তার তখন বলিয়া বসিলেন, 'দ্যাখ্ নরেন্দ্র, English-speaking power আর বি-এ, এম-এ, পাস ঠিক এক জিনিস নয়। এই তো জ্ঞানদা ইংরেজিতে এম-এ, পাস করিয়াছে, সে কি আমার মত গড়গড় করিয়া ইংরেজি বলিতে পারিবে?' নরেন্দ্র অমনি উত্তর দিলেন, 'কখ্খনো না'। ডাক্তারের মুখ যখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন নরেন্দ্র আচার্য্য তাঁহার জবাব এইভাবে সমাপ্ত করিলেন, 'জ্ঞানদাবাবু এম-এ, পাস করিয়াছেন। তাঁহাকে ব্যাকরণ, অভিধান, ইডিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংরেজি বলিতে হইবে। আপনার কি?—নাক্সভমিকা, পালসেটিলা, রাসটক্স—যা কেন না বলেন? কিছুতেই আটকাইবে না।' ইহার পর আড্ডা আর জমিল না।

উপরের গল্পটি হইতেই বুঝা যাইবে যে নরেন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের নাটকে বেশ অধিকার ছিল। তিনি ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করিয়া, বোধহয় সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে আই-এ পাস করিয়া ১৯২১ সালে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন আসিয়া পড়িল। তিনি পড়া ছাড়িয়া ছোট-খাট ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যতদূর মনে হয় ১৯২২ সালে আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, এক রবিবার আমাদের ইডেন হিন্দু হস্টেলে আসিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন, 'চল্ আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বিকালে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিতে হইবে। তারা-সুন্দরী 'রিজিয়া' নাটকে নামিবে। ইহার পর আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।' আমি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজি হইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আস্তানায় গেলাম। তিনিই ইকমিক কুকারে রান্না করিলেন। আমি তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিয়া দূরে বসিলাম, কিন্তু এঁটো থালা ধুইতে হইল না। তিনিই বলিয়া দিলেন, আর একটু পরেই বাসনমাজার ঠিকা ঝি আসিবে। ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া আমি আমার টিকেটের দাম দিতে চাহিলে বলিলেন, 'রেখে দে! তুই যখন বড় চাকুরি করবি, তখন অনেক টাকা নিব।' বড় চাকুরি করি নাই, কাজেই তাঁহাকে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। যতদূর মনে আছে, ইহার পর তাঁহার সঙ্গেই ম্যাডান থিয়েটারে নির্মলেন্দু লাহিড়ির 'প্রতাপাদিত্য' দেখিয়াছিলাম। নির্মলেন্দু লাহিড়ির অ্যাক্টিং ভাল মনে নাই, কিন্তু পার্শ্বচরিত্র বিজয়ার ভূমিকায় কুসুমকুমারী এবং তারাসুন্দরীর রিজিয়া অবিস্মরণীয়। সীমিত পরিবেশে নরেন্দ্র আচার্য্য নিজেও বেশ অভিনয় করিতে পারিতেন। ইহার কিছুকাল পরে পালং স্কুলে একটা ছুটির মধ্যে তাঁহার চাণক্য অভিনয় ভালই লাগিয়াছিল—অবশ্য সেটা আমাদের অ-পেশাদারি আটপৌরে মানদণ্ডে।

ইহার পর আমি বি-এ, এম-এ পাস করিলাম, দিল্লীতে, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে, চট্টগ্রামে, রাজশাহীতে চাকুরি করিয়া আবার প্রেসিডেন্সীতে চাকুরিতে আসিলাম।

এই অন্তবর্তীকালে নরেন্দ্র আচার্য্য বিবাহ করিয়াছেন, তাহার দুইটি ছেলে হইয়াছে। মাঝে মাঝে পালং—বিলাসখানে এবং কলিকাতায় দেখা হইয়াছে ; সময়টা মনে নাই নরেন্দ্র আচার্য্য নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' কাগজে চাকুরি করিতেন ; প্রতিমাসে একখণ্ড আমাকে দিতেন এবং দুই-একদিন 'বঙ্গদর্শন' অফিসেও আমাকে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্বে কোন এক-দিন—ইহারও সন, তারিখ বলিতে পারিব না—বাবার কাছে শুনিয়াছিলাম, নরেন্দ্র আচার্য্যের স্ত্রী কেরোসিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং ঘটনাটা ঘটিয়াছিল কলিকাতায়ই। বাবার কাছে ইহাও শুনিলাম, নরেন্দ্রনাথ খানিকটা বিবাগী হইয়া গিয়াছেন। ছেলেদের ভার পড়িয়াছে—খুল্লতাত সুরেন ও ধীরেন এবং বিধবা পিসীমার উপর। পিসীমা মায়ের স্থান লইয়াছেন। তাঁহাকে আমি দেখি নাই ; সুরেন ও চিরকুমার ধীরেন এই কর্তব্য যেভাবে পালন করিয়াছে তাহা আমি জানি এবং যখনই এই বিষয়টি ভাবিয়াছি, মনে হইয়াছে ভরত ও লক্ষ্মণ যেন রামের ছেলে লবকুশকে প্রতিপালন করিতেছে।

১৯৪৬-৪৭ সালের কথা। দেশ-বিভাগ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ভূচিত্র হইতে উঠিয়া যাইতেছে—তাহার জায়গায় আসিতেছে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান। নামে বঙ্গ-দেশ সরকার তখনও আছে ; তবে আসল মালিক হইল ছায়া ক্যাবিনেট যাহার প্রধান ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ। কিছুদিন ইঁহারা কাজ করিতেন কতকগুলি কমিটির মারফতে ; তাহাদের নাম ছিল পার্টিশন কমিটি। শিক্ষাবিভাগের কমিটির সভ্য হইলাম আমি ও কান্তিচন্দ্র বসাক আই. সি. এস. (প্রাক্তন শিক্ষাসচিব)। আমাদের এই সময় বেশ একটা প্রেস্টিজ ছিল। আমাকে দপ্তরে যাইতে হইত বৌবাজার রাস্তা দিয়া যেখানে সেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে দুই-তিনটা ভয়ের জায়গা ছিল, সেইজন্য অস্ত্রধারী প্রহরী সমন্বিত সরকারি গাড়ি নিয়োজিত ছিল। রাইটার্স বিল্ডিংসে আমাদের বসার জায়গাও ছিল খুব সুরক্ষিত। সিম্প্সন হত্যার পর হইতেই এই প্রহরীবেষ্টিত অংশটা কুলীন, কারণ সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য। তখন সশস্ত্র পুলিস প্রহরা একটু বেশি সজাগ, কারণ কিছুদিন আগেই কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছে। একদিন অফিসে বসিয়া আছি, হঠাৎ নরেন্দ্র আচার্য্য উপস্থিত। তাঁহার খালি পা, পরণে সাদা ধুতি, গায় পাতলা সাদা চাদর—ইহা দারিদ্র্যের পরিচায়ক নয়, ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠার লক্ষণ। তিনি কেমন করিয়া আসিলেন এই প্রশ্ন করায় বলিলেন, 'আরে আমি ভবঘুরে ; আমাকে কে আটকাইবে?' আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন, 'আমি কি আসিয়াছি? সুরেন, ধীরেন আর ছোট বোন পাঠাইয়া দিল। আমার ছেলেদিগকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিতে চায়। এখন নাকি তুই শিক্ষা-বিভাগের মালিক। উহাদের ভর্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।' ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করা যে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নয় সেই কথা ইঁহাকে বলা বৃথা। সময়োচিত কিছু বলিয়া বিদায় করিলাম।

ইহার বছর-দুই পরে আমরা নিজগৃহে অধিষ্ঠিত হইলাম। বাবার কাছে শুনিলাম নরেন্দ্র আচার্য্য তিনসুকিয়ায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন। সেখানে তিনি একটি জুনিয়র বা মাইনর স্কুল খুলিয়াছেন ; সেই স্কুলে পড়ান আর যাজনিক কাজ করেন। তাঁহার দুই ছেলেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হইল। তিনি বছরে দুইখানা চিঠি লিখিতেন—নববর্ষে এবং বিজয়ায়—এবং একবার কলিকাতা আসিতেন। কিছুকাল পরে শুনিলাম দুই ছেলেই ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে প্রথম-দিকে ইঞ্জিনীয়ারদের চাকুরির প্রাচুর্য ছিল ; ইহারা উভয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। নরেন্দ্র আচার্য্য আসিলে বাবার সঙ্গেই বেশি কথা হইত, আমার সঙ্গেও হইত। তবে লক্ষ্য করিতাম তিনি পারিবারিক, সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন এবং সেই প্রসঙ্গও উঠিত না। সন

তারিখ মনে নাই, বোধহয় আমার বাবা তখন গত হইয়াছেন। সুরেন একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল এবং বলিল তাহার দাদাও বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন, যদিও সম্বন্ধাদি বিষয়ে তিনি কিছু করেন নাই। বিবাহে আমি যথাসময়ে—অর্থাৎ বৌভাতে—উপস্থিত হইলাম। বেশ ধুমধাম, অনেক লোকজন, কিন্তু আমার কাছে যিনি মুখ্য তাঁহাকেই দেখি না। সুরেন, ধীরেন প্রভৃতি বলিল, 'দাদা এই তো ছিলেন, বোধহয় ভিতরে আছেন, নাহয় ওদিকে আছেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাকে খোঁজা বৃথা, কাজের বাড়ির লোকদের বিরক্ত করা অনুচিত—এইসব সাতপাঁচ ভাবিয়া, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করিয়া, উদ্যোগ-আয়োজনের প্রশংসা করিয়া চলিয়া আসিলাম। দুই-চারদিনের মধ্যেই নরেন্দ্র আচার্য্য উপস্থিত হইলেন, তিনসুকিয়া ফেরার প্রাক্কালে। আমি অনুযোগ-অভিযোগের সুরে বলিলাম, ছেলের বিবাহে ছেলের পিতাকেই দেখিলাম না। তিনি ছিলেন কোথায়? ধীর কিন্তু একটু ধরা গলায় উত্তর করিলেন, 'আমি একটু দূরেই ছিলাম। তবে বুঝুলি, ঐ লোকজন, চোখধাঁধান আলোক-সজ্জা, ঐ সানাইয়ের বাজনা,—আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কাহার ছেলের বিবাহ কে দেয়? তাই একটু দূরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম।'

আমার সঙ্গে পূর্বের সংযোগ ও সংলাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। যখন বুঝিতে পারিলাম আচার্য্য মহাশয় জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, আমি প্রস্তাব করিলাম—তিনি তো ছেলেদের কাছে থাকিতে পারেন। উত্তরে বলিলেন, 'ছেলেরা, বৌমারা বেশ ভাল ; বিশেষতঃ তাহারা সুরেন ও ধীরেনের প্রতি খুব অনুরক্ত। বড় ছেলে নির্মল তো আমার অনেকটা কাছেই থাকে এবং দুই একবার তাহার কাছে গিয়া থাকিয়াছি। নির্মল, তাহার স্ত্রী আমার দেখাশোনা করে এবং আমার কোন কাজে বাধাও দেয় না। কিন্তু ছেলে বড় সাহেব ; আমি তাহার পিতা খালি গায়ে ও খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াই, কাজের মধ্যে পূজা, আহ্নিক ও স্তোত্রপাঠ। আমি ওখানে খানিকটা বেমানান ; সুতরাং চলিয়া আসি। তিনসুকিয়ায় আমার বন্ধনহীন মন সুবিধা বোধ করে।' ইহার কয়েক বছর পর যখন আসিলেন, দেখি নুইয়া পড়িয়াছেন। এবার একা নহেন এবং গায়ে জামা ও পায়ে জুতা আছে। বুঝিলাম এবার ভাইরা আটকাইয়াছে, নিজেরও সাহস কমিয়া গিয়াছে—বয়সও আশী অতিক্রম করিয়াছে। আর দেখা হয় নাই। আমিও অসুস্থ হইয়া পড়ায় এই অগ্রজোপম শুভানুধ্যায়ীর শ্রাদ্ধকর্মে উপস্থিত হইতে পারি নাই। ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে, এই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর জন্য বোধকরি পরলোকের ব্যবস্থা আছে এবং সেইখানে অনুতপ্ত স্বামী স্ত্রীর ক্ষমা পাইয়াছেন।

মনোরঞ্জন আচার্য্যও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বয়সে সে আমার কাছাকাছি এবং তাহার বাড়িও ছিল আমাদের আস্তানার কাছে। আমরা যে বাড়িতে থাকিতাম তাহার দক্ষিণে একখানা বাড়ি পার হইলেই মনোরঞ্জন আচার্য্যের বাড়ি। তাহার দক্ষিণে চৌধুরীদের বাড়ি ; চৌধুরীরাও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ। চৌধুরীরা সম্পন্ন গৃহস্থ ; তাহারা বোধ হয় এখনও বাংলা-দেশে টিঁকিয়া আছে : অন্ততঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ছিল। যদিও মনোরঞ্জন আমার মনে খুব রেখাপাত করিয়াছিল তবু নরেন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল মনোরঞ্জনের সঙ্গে তেমন কোন নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। আমার বাবা তো তাহাকে অপছন্দই করিতেন। কেন জানি না—হয়ত ইহা নবাবী আমলের উপাধি হইতে পারে—উহাদের বাড়িকে লোকে ফৌজদার-বাড়ি বলিত। প্রতিবেশী চৌধুরীদের মত সম্পন্ন না হইলেও সেই সময় ফৌজদারদের সংসারে অভাব-অনটন ছিল বলিয়া মনে হয় না। উহারা চার ভাই—মনোরঞ্জন কনিষ্ঠ। বাড়ির নামানুসারে উহাকে

মনাই ফৌজদার বা সংক্ষেপে মনা বলা হইত। যতদূর মনে আছে মনা আমার এক ক্লাস নীচে পড়িত। সে বোধ হয় কোন এক বছর প্রমোশন পায় নাই, কারণ আমি যখন দ্বিতীয় বার প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন সে আমার সঙ্গে পড়িত না। আমার ম্যাট্রিক পাস করার পরের বৎসরই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সব তোলপাড় হইয়া গেল। মনার আর পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৯২০ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া বসিয়া আছি। মনা বলিল সে আমার কাছে অংক শিখিবে। আমার হাতে কোন কাজ নাই ; সুতরাং এক বাক্যেই রাজি হইলাম। স্থির হইল আমি সকালে তাহাদের বাড়িতে যাইব এবং রোজ যাইতে লাগিলাম। ওখানে যাইয়া দেখিলাম—পূর্বেও যে একটু পরিচয় পাই নাই তাহা নহে—মনার মেজাজটা ফৌজী মেজাজ, কিন্তু মনটা খুব নরম। উহাদের বাড়ির রুটিনও খুব অদ্ভুত। সকলেরই ভোর হয় দেরীতে। মনা আমার সঙ্গে খানিকটা অংক কষিয়া সাড়ে দশটা নাগাদ পুকুরে ডুব দিয়া ব্রেকফাষ্ট—একডালা মুড়ি বা একবাটি চিড়া প্রধান আহার্য—সারিয়া স্কুলে যায় এবং যখন অন্য সকলের বাড়ির বাজার শেষ হইয়া গিয়াছে তখন মনার কোন এক বড় ভাই বাজারে যাইতেন এবং বাড়ির সেদিনকার রান্না প্রভৃতি আরম্ভ হইত। মনা স্কুল হইতে আসিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিত এবং তাহাদের বাড়ির ডিনার সুরু হইত রাত্রি বারটার পর। একদিন উদ্যোগ আয়োজনের একটু প্রাচুর্য ছিল বলিয়া মনার মা আমাকেও আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; সেইদিন মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত হইয়াছিল সূর্যাস্তে। সে আমলে বধূরা ছিলেন পর্দানশীন। আমি একটু দূর হইতে মনার দুই জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের এবং কনিষ্ঠ দেবরের সম্ভাষণ লক্ষ্য করিয়াছি। মনা যাহা বলিতেছে, চেঁচামেচি করিয়া বলিতেছে ; ভদ্রমহিলারা অস্ফুটস্বরে উত্তর দিতেছেন—সহজ সরল স্বাভাবিক আলাপ। একদিন কোন ব্যাপারে মনা একজন জ্যেষ্ঠাভ্রাতৃজায়াকে উঠিয়া আসিতে বলিতেছিল এবং তিনি বোধহয় দেরি করিতেছিলেন। তখন দেবর সস্নেহে তাঁহার হাতে এমন হেঁচকা টান দিল যে তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মনা অমনি তাঁহার শুশ্রূষায় মন দিল। এই সময় আমার একবার একটু জ্বর হইয়াছিল। মনা আমার কাছে এমন অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত যে আমার মা পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ফৌজদার মনার মনটা ছিল খুব কোমল।

যে ঘটনায় আমি মনার প্রতি খুব গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছিল ইহার কয়েকমাস আগে—১৯২০ সালের সরস্বতী পূজার রাত্রিতে। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের আগে। মহাত্মার রাজনৈতিক আন্দোলন দেশে যেরূপ সাড়া জাগাইয়াছিল সেই তুলনায় হরিজন আন্দোলন হিন্দু সমাজকে তেমন নাড়া দিতে পারে নাই, এই কথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি। পালং স্কুলে সরস্বতী পূজা খুব ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। ঐ জায়গাটা ভাল দুধ ও ছানার রসগোল্লা সন্দেশের জন্য বিখ্যাত। সরস্বতী পূজার দিন বহু অভ্যাগত আসিত এবং রসগোল্লা সন্দেশের ছড়াছড়ি পড়িত। তারপর ছাত্র কর্মকর্তারা স্কুলের পুষ্করিণী হইতে জাল দিয়া মাছ ধরিয়া খিচুড়ি মাছভাজা এবং প্রচুর মিষ্টি সহযোগে রাত্রির আহার করিত। তখন আমি হেডমাস্টারের ছেলে বলিয়া নয়, স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত, দুই বৎসর ফার্স্টক্লাসে পড়িয়াছি এবং দুইবার বিপুল ব্যবধানে টেষ্ট পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছি। মনে হয় অন্যান্য বার পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সমস্যা এইভাবে উঠে নাই। ব্রাহ্মণরা হয়ত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিত এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিরা আর এক পঙ্‌ক্তিতে বসিত। কিন্তু এবার গোলমাল লাগিল অপ্রত্যাশিত ভাবে। চিত্তবিনোদ স্কুলের জনৈক শিক্ষকের ভাগ্নে, সকলেরই বন্ধু ; ইহারা শিক্ষিত সভ্য পরিবার,

কিন্তু জাতিতে জলাচরণীয় নয়। আমার মনে হয় অন্যান্য বৎসর এই জাতীয় ছেলেরা সময় বুঝিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত। কিন্তু এবার চিত্ত যায় নাই, হয়ত একসঙ্গে যখন মিষ্টি পরিবেশন করিয়াছে তখন এই দিক্‌টা ভুলিয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রে কয়েকজন ছেলে আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া তাহাদের সমস্যার কথা বলিল। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ এক সঙ্গে খাইবে কি করিয়া? তখন আসন ও পাতা পাড়া হইতেছিল, ছেলেরা খাওয়ার জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেছিল, কিন্তু এমন সব জাতির ছেলেও থাকিতে পারে যাহাদের সঙ্গে একঘরে বসিয়া খাওয়াই যায় না। মনা নিকটেই ঘোরাফেরা করিতেছিল ; মুহূর্তের মধ্যেই সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল এবং ইহাদের আসল লক্ষ্য যে চিত্ত, তাহা সে—নিজে ব্রাহ্মণ —আঁচ করিয়া ফেলিল। কথায় কথায় চিত্তকে প্রথম আসন ও পাতার দিকে লইয়া গেল, তারপর নিজে কিছু খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া বসিয়া পড়িল ; নিজে যেন খেলায় খেলায় একটা মাছভাজা মুখে দিল আর একটা মাছভাজা চিত্তবিনোদের মুখে দিল এবং একটা আসন টানিয়া এক পাতায়ই দুইজনে খাইতে আরম্ভ করিল। আমার পাশে যে প্রভাত প্রভৃতি দুই-চারজন ব্রাহ্মণ বিতর্কে লিপ্ত ছিল তাহারা ছাড়া অন্য সবাই ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝিতে পারিল না ; আশেপাশে অনেকেই খাইতে বসিয়া গেল ; এক প্রভাত কয়েক-মিনিট অস্ফুটস্বরে বক্‌বক্‌ করিল। তারপর আর কোন কথাই উঠিল না। আমি তখনও শ্রীকান্ত পড়ি নাই, কিন্তু পরে বহুবার পড়িয়াছি। প্রত্যেকবারই মনে হইয়াছে, মনার জাতিভেদ সমস্যার সমাধান ইন্দ্রনাথের সমাধান অপেক্ষাও জীবন্ত!

ইহার পর আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কিছু দিনের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল, ছাত্রেরা স্কুল ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল, হেডমাস্টারের জীবনে নানা সমস্যা দেখা দিল—স্কুলরক্ষা, আয় যেখানে কমিয়া গিয়াছে সেখানে স্কুলের ব্যয়-সংকুলান, নিজের সংসারযাত্রা নির্বাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে বৎসর পড়া শেষ করি, মনে হয় সেই বৎসরই আমাদের স্কুলে একজন ছাত্র ভর্তি হইল যাহার নাম অমলবরণ মজুমদার। সে মনাদের পাশের বাড়ির চৌধুরীদের মেয়ে বিবাহ করিয়া ঐ বাড়িতে থাকিয়াই পালং স্কুলে পড়িতে লাগিল। ঠিক আমাদের ক্লাসেই ভর্তি হইয়াছিল কিনা মনে করিতে পারিতেছি না। সেই আমলে বাল্যবিবাহ কমিয়া আসিলেও উঠিয়া যায় নাই এবং প্রথম তিন ক্লাসের প্রত্যেক ক্লাসেই দুই-চারজন বিবাহিত ছিল। অমলবরণের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় ছিল ; মনে হইত সে আমার চেয়ে দুই-এক বছরের বড়ই হইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইবার বছর খানেকের মধ্যেই শুনিলাম অমলবরণ কলেরায় মারা গিয়াছে। যে বালিকাকে কখনও দেখি নাই তাহার অকাল বৈধব্যে একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম এই পর্যন্ত।

কিছুকাল পরে বাবা তাঁহার বাসস্থান পরিবর্তন করিলেন অর্থাৎ মনাদের পাড়া পরিত্যাগ করিলেন। আমার পালং যাওয়া-আসা তো দুই বড় ছুটি—গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশ। একবার কাণাঘুষা শুনিলাম, মনার সঙ্গে অমলবরণের বিধবা পত্নীর প্রণয়-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। পরে ইহা প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্পর্কে আমরা বইতে যতই পড়ি বা যতই রচনা লিখি না কেন, বিধবা-বিবাহ আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গ্রামীণ-সমাজে, বিশেষ করিয়া রাজবল্লভের আমল হইতে নির্ধারিত সমাজব্যবস্থায় একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল। একবার যাইয়া শুনিলাম মনা নাকি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছে সে এই বিধবাকে বিবাহ করিবেই এবং মনাই ফৌজদার যে তাহার কথা রাখিবে তাহাও সকলেই জানিত। আর একবার যাইয়া শুনি বেপরোয়া মনা রাত্রিতে বাড়ি ফিরিতেছিল এমন সময় পথে কয়েকজন আততায়ী তাহাকে আক্রমণ করে

এবং কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করে যে সে একটু খোঁড়া হইয়া যায়। আমি ইহার পরে মনাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি ; তখন মনে হইয়াছিল সেই আঘাতটা একেবারে সারে নাই ; যদিও মনার চলাফেরায় কোন অসুবিধা হইত না। কেহ কেহ বলে আততায়ীরা বিধবার ভাই, কারণ অন্য উপায়ে তাহারা ভগিনীর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। আবার কেহ কেহ বলে সমাজের নীতিবাগীশেরাই এই পুণ্যকর্মে ভলান্টিয়ার লাগাইয়াছিলেন। যাহা হউক মনা তাহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু বিবাহের পর তাহাকে স্ত্রীসমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া জীবিকা অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। আমি তখন চাটগাঁ বদলি হইয়া যাই। যতদূর মনে করিতে পারি, ১৯৩৫ সালে চাটগাঁ হইতে আসার পর মনা একদিন কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে বোধহয় পত্রিকার হকার হইয়া নিজের ও স্ত্রীর ভরণপোষণের চেষ্টা করিতেছিল। শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অপটুতা ও ঔদাসীন্যের জন্য আমার বেতন ছয় মাস আটকা ছিল এবং ইহা ছাড়া আরও নানা ঝঞ্ঝাটে আটকাইয়া পড়ায় অনেক দিন মনার সম্পর্কে খোঁজখবর করিতে পারি নাই। ইহার কিছুদিন পরে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাহার ফলে আমাদিগকে পালং গ্রাম হইতে পাকাপাকিভাবে চলিয়া আসিতে হয়। পরে শুনিলাম মনার মৃত্যু হইয়াছে। মনে হয়, যে সমাজব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে, আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, সে দারিদ্র্যের কাছে হটিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্দুল গফুর—সমরেজ স্মিথ

১

যে ঘটনায় পালং হইতে আমাদের পাততাড়ি গুটাইতে হয় তাহার কথা পৃথকভাবে বলিতে হইবে। ঘটনাটি ১৯৩৬—৩৭ সালে ঘটে। তখনও দেশবিভাগ হয় নাই, পালং এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং এই ঘটনাকে বড় করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীমান রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে আমি একখানা বই পড়িয়াছি এবং এই ছোট্ট ঘটনার বৃহত্তর, গভীরতর ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছি। পালং মাদারিপুর মহকুমার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সার্কেল, ইহা পূর্বেই বলিয়া থাকিব। সেই সময়ে ওখানকার মহকুমা হাকিম ছিলেন W. H. Saumarez Smith। ইনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া এই প্রথম মহকুমার ভার পান এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পিতামাতাকে চিঠি লিখিতেন। পুত্রের এই চিঠিগুলি পিতামাতা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর ১৯৪২ সালে স্মিথ সাহেব এই চিঠিগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়াছেন।* এই চিঠির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে ঘটনাটার বিবরণ দেওয়া দরকার।

আমি যখন পালং স্কুলে পড়ি তখন আব্দুল গফুর কোতোয়াল নামে আমার এক সহাধ্যায়ী ছিল ; বোধহয় সে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিল। পালং একটা বড় বন্দব। কোতোয়ালরা আগে থাকিত নদীর ওপারে—চরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য পদ্মানদীর চরের জীবনযাত্রার খুব সহানুভূতিপূর্ণ, এমনকি একটু রোমান্টিক ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে চরের বাসিন্দাদিগকে একটু ভীতির চক্ষে দেখা হইত—ইহারা দুর্দান্ত, যাযাবর ; অতএব অবিশ্বাস্য। আমাদের স্কুলের মৌলবীসাহেবও ইহাদের সম্পর্কে ভাল মত পোষণ করিতেন না। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখনই কোতোয়ালরা জুতার দোকান এবং ধানের কারবার করিয়া বেশ সচ্ছল হইয়াছিল। আমার স্কুল ছাড়ার পর ইহারা চর ছাড়িয়া ভদ্র, হিন্দুপ্রধান পল্লীতে বাড়ি করে। তখনই কেহ কেহ কোতোয়ালদের অভ্যাগমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছিল। আমি আব্দুল গফুরের পিতা ও পিতৃব্যকে দেখিয়াছি ; তাঁহারা সৌম্যদর্শন এবং ব্যবহারে খুব মার্জিত ছিলেন।

যে সময়টার কথা বলিতেছি সেই সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমানদের খুব প্রাধান্য দেখা যাইতেছিল। শুধু চাকুরিতে বা মন্ত্রিত্বে বা আইন সভায় নয়, স্যার জন এন্ডারসনের কৃপায় মুসলমান গুন্ডারাও বেশ সুবিধা পাইয়াছিল ; এবং তাহাদের সমগোত্রীয় হিন্দুরাও কিছু মজা লুটিতেছিল। স্যার জন এন্ডারসন গ্রাম্য রক্ষিবাহিনী সংগঠন করিলেন। ইহাদের কাজ হইল সন্ত্রাসবাদীদের ধরা, কিন্তু ইহারাই সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। ফরিদপুর জেলার পুলিসের বড় সাহেব ছিলেন দোহা যিনি আগে ও পরে অনেক কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসন অনেকখানি নির্ভর করিত পুলিসের উপর এবং আমার ধারণা এই 'টেররিষ্ট' জেলায় দোহার রাজত্ব কায়েম করার জন্যই পূর্বতন

——

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করুণাকুমার হাজরাকে বদলি করিয়া সেই জায়গায় হিল সাহেবকে পাঠান হয়। ইহার কিছুদিন পরে প্রশাসনিক প্রধান স্যার রবার্ট রীড—ইনি আসামের গভর্ণর হইয়াছিলেন—করুণা হাজরাকে যে তিরস্কার উপহার দিয়াছিলেন (মৎপ্রণীত Portraits and Memories দ্রষ্টব্য) তাহা হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। মহকুমায় পুলিস সাহেব ছিলেন হাফিজুদ্দীন যাঁহাকে স্মিথ সাহেব তাঁহার গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন আর সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন বদরুদ্দিন যিনি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কট্টর সমর্থক বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে খানিকটা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন।

এই সকল পৃষ্ঠপোষকদের ছত্রচ্ছায়ায় বর্ধিত হইল আব্দুল গফুর কোতোয়াল। আব্দুল গফুরকে আমি খুব জানিতাম। তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা বা বিদ্বেষ কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসায়ে তাহার কিছু পয়সা হইয়াছে, সেই কারণে প্রভাব প্রতিপত্তিও হইয়াছে। যে সমাজে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর সেখানে সে পাস না করিলেও ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে এবং সে ব্যবহারে অমায়িক এবং খানিকটা নিরীহ প্রকৃতিরও। কাজেই সে য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমাদের স্কুল কমিটির যাঁহারা কর্ণধার হইতেন তাঁহারা আব্দুল গফুর হইতে যোগ্যতর নহেন।

আব্দুল গফুরের প্রধান দোষ প্রথম রিপুর প্রাবল্য। যতদূর মনে করিতে পারি আমার সহাধ্যায়ী হইলেও আমার একবার এবং একমাত্র বিবাহের পূর্বেই সে তিনটি বিবাহ করিয়াছিল এবং বোধহয় চল্লিশ পার হইতে না হইতেই সে দুরারোগ্য যৌনব্যাধিসম্ভূত ক্যানসারে খুব কষ্ট পাইয়া মারা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে বারবিলাসিনীদের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক ছিল। ইহার বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিম স্মিথ সাহেবের কোর্টে নালিশ করিল বীণাপাণি দেবী ; সে একেবারে ভিন্ন কোটির লোক। আব্দুল গফুর বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী এবং ক্ষমতায় আসীন, আর বীণাপাণি ক্ষয়িষ্ণু কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের উপায়-হীনা অবলা। ইহাদের সংঘর্ষে কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নাই, এমন কি ইহার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল, তাহাও আকস্মিক। অথচ আমাদের মহকুমা হাকিম স্মিথ সাহেব ইহার মধ্যে গভর্ণমেন্ট পার্টি ও কংগ্রেস পার্টির সংঘর্ষ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাতফ্রেম যে কত ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছিল—এই আবিষ্কার তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

২

বীণাপাণির স্বামী মনোরঞ্জনও আমার সঙ্গে পড়িত। যতদূর মনে হয় সে ক্লাস সেভেন বা চতুর্থশ্রেণীর বেশি অগ্রসর হয় নাই। বীণাপাণির বাড়ি অর্থাৎ মামাবাড়ি পালংগ্রামের সংলগ্ন পাড়াগাঁয়ে। কবে এই মনার বিবাহ হইয়াছিল জানি না, কিন্তু ইহা শুনিয়াছি একটি কন্যার জন্মদান করিয়া সে জীবিকান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সেই অ্যাডভেঞ্চারে সে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই ; তাই কন্যাসহ বীণাপাণি অপরের অসচ্ছল সংসারে গলগ্রহ হইয়া রহিল। তখন ভদ্রঘরের এই জাতীয় মেয়েদের মধ্যে অর্থোপার্জনের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। যাঁহারা লেখাপড়া শেখে নাই তাহারা চরকা কাটিয়া, তাঁত চালাইয়া, দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করিয়া রোজগার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর আব্দুল গফুর ধনী লোক, পদস্থ ব্যক্তি, সে সরকারি সংস্থার প্রেসিডেন্ট—কিসের প্রেসিডেন্ট গ্রাম্য লোকেরা বুঝে না ; কিন্তু পুলিস সুপার দোহা হইতে ইন্‌স্‌পেক্টর বদরুদ্দিন পর্যন্ত রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি তাহার

একমাত্র দুর্বলতা মদনপীড়া যাহার প্রকোপে স্বয়ং মহাদেব কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্য হইয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি গফুরের তৃতীয়া স্ত্রীও খুব প্রচলিত পথে তাহার গৃহে আসে নাই। কামলালসার ধর্মই এই যে সে নিত্য নূতন আহার খোঁজে। সেই আহার সংগ্রহ করিবার লোকেরও অভাব হওয়ার কথা নয়। এবার যাহারা জুটিল তাহাদের একটু পরিচয় দিই—মতিলাল মুখুটি ও দেবেন্দ্রমোহন দে। মতিলালের দাদা চুণী এবং দেবেন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভাই যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিল। চুণী আমার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া ছোটভাইয়ের পাপের জন্য লজ্জা ও অনুশোচনা করিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে আমার এক-সময় খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সেই সময়ে বিপ্লবী ছিল এবং আমাকেও সেই দলে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পরে আমাদের আর একজন সহাধ্যায়ী—বর্তমানে আর. এস. পি.'র অন্যতম নেতা রাধাবল্লভ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধরা পড়ে এবং আন্দামানে প্রেরিত হয়। কে রাধাবল্লভের বিরুদ্ধে পুলিসকে গোপন সংবাদ দেয়? ইহা লইয়া শুধু একটা গুজবই প্রচলিত ছিল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে-ঘটনার কথা লিখিতেছি তাহার পর বাবা কুড়ি বছর বাঁচিয়া ছিলেন, আমাদের সঙ্গে যোগেন্দ্রমোহনের আর দেখা হয় নাই, এমন কি পালং সমিতির বার্ষিক বিজয়া সম্মিলনীতে সে কোন দিন আসে নাই। শুনিয়াছি সে ব্যবসা করিয়া অর্থবান্ হইয়াছিল। এখন বোধহয় বাঁচিয়া নাই। তাহার কিসের ব্যবসা তাহাও জানি না। সে যেন কলিকাতাস্থ পালংসমাজ হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

১৯৩৬ সালে দেবেন্দ্রমোহন দে ও মতিলাল মুখুটি উভয়েই বেকার। তাহারা প্রতি-বেশিনী বীণাপাণিকে বলিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আসিয়াছেন; তিনি ভদ্রঘরের মেয়েদের নার্সিং শেখার জন্য বৃত্তি দিবেন এবং নার্সিং শিখিলেই ভাল চাকুরি মিলিবে। বীণাপাণির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। ডাকবাংলোতে ইন্টারভিউ হইবে। বীণা উৎসাহিত হইল এবং বীণার অভিভাবকরাও কোন আপত্তি করিল না। হিন্দু মেয়েদের পর্দা তখন অনেকটা আলগা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং দরিদ্র, উপার্জনে অক্ষম স্বামীর স্ত্রী বীণা ডাক-বাংলোতে প্রেসিডেন্টের কাছে তাহার আর্জি পেশ করিতে গেল; তাহাকে ভরসা দেওয়া হইয়াছে ইন্টারভিউর সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্তি মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা। তাহার রক্ষক হিসাবে সঙ্গে গেল প্রতিবেশী মতি ও দেবেন্দ্র।

ডাকবাংলো নদীর পারে। সেখানে আসিয়া বীণাপাণি শুনিল ডাকবাংলোর ঘাটেই বড় পানসি নৌকায় প্রেসিডেন্ট সাহেব কাজ করিতেছেন। সেখানে যাইতে হইবে। বীণাপাণি নৌকায় যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু দারিদ্র্য হইতে মুক্তির প্রলোভন আর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী মতিলাল ও দেবেন্দ্রমোহনের সান্নিধ্য তাহাকে সাহস দিল। এই প্রতিবেশীরা তাহার সঙ্গেই নৌকায় উঠিল এবং নৌকার ভিতরে আসীন প্রেসিডেন্টকে দেখাইয়া দিল। বীণা ভিতরে প্রবেশ করিতেই খোলা প্রবেশদ্বারের উপর ঝাঁপ পড়িয়া গেল, নৌকা ছাড়িয়া দিল আর মতিলাল ও দেবেন ছাউনি বা ছইয়ের উপরে লাফ দিয়া উঠিয়া বসিল। মাঝ-নদীতে প্রেসিডেন্ট আব্দুল গফুর তাহার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল এবং ছাদের উপর হইতে অভিভাবকরা রোরুদ্যমানা বীণাপাণিকে চুপ করিতে বলিতেছিল। দুপুর বেলা হইলেও নদীর মাঝখানে এই ধর্ষণের কোন সাক্ষী থাকার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে চক্রধরবাবু নামে সিঙ্গার কোম্পানির এক সেলস্‌ম্যান ছোট নৌকা করিয়া ঐ সময় ঐ পথে যাইতেছিলেন। ইনি স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ শুনিয়াছেন এবং যেহেতু আবরণহীন আলোতে ছইয়ের উপর বসিয়া দুই ব্যক্তি হাত নাড়িয়া কি বলিতেছিল সেইজন্য তাঁহার পক্ষে মতি ও দেবেনকে সনাক্ত করায় কোন অসুবিধা হয় নাই।

দিনে দুপুরে এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটায় জনবহুল পালং সমাজে খুব একটা আলোড়ন ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গ্রামে অবৈধ প্রণয় অথবা পরাক্রমশালী লম্পটের কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যাইত এবং কখনও কখনও তাহার সাজাও দেওয়া হইত। পালং গ্রামেই আমি দুইটি এই জাতীয় অবৈধ আচরণ ও তাহার সাজার কথা জানি। মনাই ফৌজদারের চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে আমি রক্ষণশীল প্রভাতের কথা বলিয়াছি। প্রভাতের পিতামহ ছিলেন সম্পন্ন পরাক্রমশালী লোক এবং তাঁহার সংসারও ছিল জনবহুল। এই প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক বিধবার অবৈধ সংসর্গ ছিল। রাজবল্লভের বংশধরের বধূ বলিয়া এই বিধবাকে রানী বলা হইত। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বলিয়া তেমন কেহ ছিল না। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি ; তাঁহার বাড়িতে অন্য এক শরিক থাকিলেও উহা খুব নিস্তব্ধ বলিয়া মনে হইত। পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ নৈশবিহার সমাপ্ত করিয়া অনতিদূরে নিজগৃহে যাইতেছেন এমন সময় স্বদেশী ভলানটিয়ারবাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া রামদাও দিয়া শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার ধড় ও মুণ্ড নিজের গৃহের সামনে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কেমন করিয়া জানি না দলের প্রধানের নাম ব্রাহ্মণগৃহিণী ঠিকই বলিয়া ছিলেন, কিন্তু মৃত স্বামীর চারিত্রিক কলঙ্ক গোপন করার জন্য তিনি বলিলেন যে তাহার স্বামী গভীর রাত্রিতে প্রস্রাব করিতে উঠিয়াছিলেন এমন সময় অমুক লোক তাঁহাকে কাটিয়া ফেলে। এই গল্পটা অবিশ্বাস্য ; সুতরাং সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুলিস তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরে আর একটা ঘটনা ঘটে পালংগ্রামের একটু দূরে—যতদূর মনে হয়—স্বর্ণঘোষ গ্রামে। এক শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্রাহ্মণ এক প্রতিবেশিনীর কাছে কুপ্রস্তাব করেন এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। একদিন দেখা গেল তাহার মুণ্ডহীন মৃতদেহ নদীতে ভাসিতেছে। মাথা না থাকিলেও তাঁহাকে সনাক্ত করিতে অসুবিধা হইল না। শোনা যায় সেই মহিলা কলিকাতায় তাঁহার স্বামীকে সংবাদ দেন এবং তিনি কলিকাতা হইতে দুই অতিকায় আদমীকে আনিয়া লুকাইয়া রাখেন এবং অপরাধীকে তাহার কোন বন্ধুর সাহায্যে রাত্রিতে বাহিরে ডাকিয়া আনেন। অতর্কিত আক্রমণে এই মল্লবীরকে ধরাশায়ী করা হয় এবং পরে পিছমোড়া বাঁধ দিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এই খুনের কোন কিনারাই হয় নাই, কাহাকেও গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয় নাই।

কিন্তু আব্দুল গফুরের ব্যাপারটা অন্য রকমের। কিছুদিন আগেই র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাহির হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুরা শঙ্কিত আর ফরিদপুর জেলায় বিশেষ করিয়া বিপ্লবী-অধ্যুষিত পালং সার্কেলে দোহা-বদরুদ্দিনের পরাক্রমে খানিকটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এন্ডারসনী দাপটে বিপ্লবীরাও একটু গা ঢাকা দিয়াছেন। পালং এলাকায় আমি কোন কংগ্রেস সংগঠন দেখি নাই। কাজেই এবার জন-সেবার দায়িত্ব পড়িল নিরীহ রাজভক্ত হিন্দুদের উপর যাঁহাদের কোন সংগঠন নাই, জাগ্রত বিবেকই যাঁহাদের একমাত্র ভরসা। ইঁহারা বাবাকে ধরিয়া পড়িলেন এবং বাবা এই সৎকাজে অগ্রসর হইলেন। বাবার ইংরেজ রাজার প্রতি ভক্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি এবং তিনি ব্রিটিশ জাস্টিসে খুব আস্থাবান ছিলেন। রাজদ্রোহী বাল গঙ্গাধর তিলকও যে ব্রিটিশের ন্যায়পরতায় বিশ্বাস করিয়াই ভ্যালেন্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে মামলা করিতে বিলাত গিয়া-ছিলেন, এই কথা ছোটকালে বাবার কাছে শুনিয়াছি। সুতরাং বাবা অগ্রণী হইয়া বীণাপাণিকে দিয়া মাদারিপুর মহকুমা হাকিম **Saumarez Smith** সাহেবের কোর্টে মামলা রুজু করিয়া দিলেন এবং সর্বশক্তি লইয়া—তাহার চেয়েও বেশি ঝুঁকি লইয়া—রণাঙ্গণে নামিয়া পড়িলেন।

৩

এই সময় আমি একবার পালং গিয়াছিলাম। বাবার আস্তানা ছিল একটা নিরালা জায়গায়। একটি বড় দোতলা টিনের ঘর ; সামনের দিকটা একটু বাড়ান এবং তাহাই দিনে ড্রইং রুম এবং রাত্রিতে আমার খুড়তুতো ভাই বেণুর শোয়ার ঘর। সেইখানে একদিন সকালবেলা বসিয়া আছি ; হঠাৎ আব্দুল গফুর আসিয়া উপস্থিত। পুরাতন সহাধ্যায়ী হিসাবে আমার সঙ্গে একটু প্রাথমিক কথাবার্তা বলিতে বলিতেই বাবা আসিয়া হাজির হইলেন। আব্দুল গফুর হিন্দুপ্রথায় বাবার পদধূলি লইয়া বলিল, 'স্যার, আমি ছোটকালে motherless ; আমি যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি আপনি ক্ষমা করুন ; না হয় আপনি যাহা হয় সাজা দিন।' বাবা ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন, 'তুমি যদি নির্দোষ হও তাহা হইলে ভগবান তোমাকে রক্ষা করিবেন।' একটু 'যদি' থাকিলেও আমার তো মনে হইল আব্দুল গফুর পাপ কবুল করিয়া বাবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বাবা সেই ভিক্ষা দিলেন না। ইহা আমার সাক্ষাতে ঘটিল। আমার ভাগ্নে বলিতেছে যে পরে জেলের ফেরৎ আব্দুল গফুর আমার রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে বাবাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া গিয়াছিল। অবশ্য আমি তাহা দেখি নাই। তবে পালং ফিরিয়া গিয়া সে বাবাকে দুই-একখানা চিঠি লিখিয়াছে তাহা দেখিয়াছি। যাহা হউক মামলায় কংগ্রেস কোথাও ছিল না, প্রকৃতপক্ষে পালং খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা হইলেও ওখানে কোন কংগ্রেস অফিসই আমি দেখি নাই।* সেই কথায় পরে আসিব। মহকুমা হাকিম স্মিথ সাহেব ১৯৩৬ সালে ২৯শে জুন মাদারিপুর পৌঁছান। ৪ঠা জুলাই তিনি এই মামলার কথা উল্লেখ করেন। ২রা আগষ্ট তিনি লিখেন যে এই মামলায় প্রতি পদে দুই পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তি হইতেছে, আসামীপক্ষ একচুলও ছাড়িতেছে না। আসামীপক্ষ বলিতেছে যে অপর পক্ষের সব সাক্ষীই কংগ্রেসের লোক। আব্দুল গফুর সরকারি পক্ষের প্রধান বলিয়া কংগ্রেস আব্দুল গফুরকে নিঃশেষ করিতে চায়। স্মিথ সাহেব এখানকার হাকিম ; যদিও তিনি মাত্র মাসখানেক আছেন--তবু দাবি করিতেছেন পালঙের দলাদলি সব তিনি জানেন এবং এই মামলাটা প্রকৃতপক্ষে বীণাপাণি বনাম আব্দুল গফুর নয় ; কংগ্রেস বনাম ইংরেজ সরকার। তিনি লিখিতেছেন যে তিনি নিরপেক্ষ (অর্থাৎ সরকারি পক্ষে) রায় দিবেন। প্রকৃতপক্ষে দায়রায় সোপর্দ হইলে তো সরকারই বাদীপক্ষ হইয়া যায় এবং আসামীই হইবে তখন বিবাদী অথবা সরকার-বিরোধী। প্রতি পদে এই ম্যাজিস্ট্রেট-বিচারকের বিচারবুদ্ধির বিকৃতি প্রমাণিত হয়। ইনি বলিয়াছেন যে ইহা কংগ্রেস বনাম সরকার মামলা এবং ওখানকার ইলেকসনে একজন হিন্দুপ্রার্থী ৫০০ টাকা বাদীপক্ষকে দান করিয়াছেন। হাকিম সাহেব মনে হয় জানিয়া শুনিয়াই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। যে প্রার্থী অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন তিনি রাজভক্ত জমিদার · ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের কর্ণধার রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র কুমার পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন কংগ্রেসপ্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমার বাবা ব্রিটিশের প্রতি অনুকূল ছিলেন। তিনি ঐ এলাকায় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী

* অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে ইহার কিছু পরে (১৯৩৮/৩৯ সালে) 'অনুশীলন সমিতি'র বিপ্লবীরা কংগ্রেস অধিকার করিবার জন্য নানাস্থানে কংগ্রেস অফিস স্থাপন করেন। একটি অফিস স্থাপিত হয় পালং বাজারে। কিন্তু বীণাপাণি মামলার সঙ্গে কংগ্রেসপন্থী কাহারও কোন সংযোগ ছিল না। অবশ্য তাঁহারা যে গফুরের সঙ্গেও ছিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুরের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতে আপ্রাণ তদ্বির করিয়া অর্থসাহায্যের ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্মিথ সাহেব মনে করিতেন যে এই মামলাটা গভর্ণমেণ্ট বনাম কংগ্রেস ; তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রধান প্রশাসনিক অফিসার ; আবার তিনিই বলিয়াছেন যে তাঁহাকে নিরপেক্ষ বিচার করিতে হইবে। সরকারকে বিবাদী আসামীর সঙ্গে জড়াইয়া নিরপেক্ষতার দাবি করা যেন সোনার পাথরবাটি উপহার দেওয়া। তাঁহার নিরপেক্ষতার আরও বহু প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার রায় দায়রা আদালতে টিঁকিবে না ; ইহার একটি কারণ জজ হিন্দু এবং শ্যেনদৃষ্টিতে তিনি ইহাও দেখিয়াছেন যে জুরীদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি। সুতরাং বেচারা গফুরের নিস্তার নাই। তাঁহার মতে হিন্দু জজের উচিত ছিল মামলাটা অ্যাডিশনাল জজ ডাচের কোর্টে হস্তান্তরিত করা —যেহেতু ডাচ সাহেব ইংরেজ অতএব তিনি নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করিতে পারিতেন, যেমন নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তিনি নিজে। অবশ্য যতদূর জানি ডাচ সাহেবের আর একটা সার্টিফিকেট ছিল। তিনি পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হইয়া বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় প্রতিবাদী হইয়া সেই পরস্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী হইয়াছিলেন। স্মিথ সাহেব অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহা প্রায় সবটাই মিথ্যা এবং আবার অনেক কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন দরিদ্র গফুর তাঁহার কোর্টে মামলা করিতেই ফতুর হইয়া গিয়াছিল, কারণ সেখানে সে ফজলুল হকের মত নামী ও দামী উকিলকে নিযুক্ত করিয়াছিল। পরে অর্থাভাবে সে আর আত্মপক্ষসমর্থনের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। আমি ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না ; তবে মনে হয় দায়রা আদালতেও ফজলুল হকই তাহার অ্যাডভোকেট ছিলেন। যাহা হউক সেখানে যে তাহার অর্থের অপ্রাচুর্য হয় নাই, ইহা পরের অর্থাৎ শেষ অধ্যায় হইতে বোঝা যায়। হাইকোর্টে যখন গফুর আপীল করে তখন ফজলুল হক সাহেব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী। হক সাহেবের জায়গায় গফুর নিযুক্ত করে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব—ইংরেজ ব্যারিস্টার কার্ডেন নোড যাঁহার পারিশ্রমিক উকিল ফজলুল হকের পারিশ্রমিকের অন্ততঃ তিনগুণ। রায় দেন ইংরেজ জজ লেথব্রিজ সাহেব। খুব সংযত রায় ; তিনি দণ্ড বহাল রাখেন, শুধু কারাবাসের মেয়াদ কমাইয়া দেন।

স্মিথ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি যে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার এক্তিয়ারের বাহিরে ছিল, কিন্তু তবু তিনি এই বিশ্বাসে অটল যে আব্দুল গফুর নির্দোষ! এই বিশ্বাসটা কি যুক্তিনিষ্ঠ, না তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ বা রাজদ্রোহী কংগ্রেস বিরোধিতার ফলশ্রুতি? আব্দুল গফুরকে খালাস দিয়া তিনি যে রায় দিয়াছিলেন তাহা আমি পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দেখা যায় যে তিনি উপস্থাপিত সাক্ষ্য খুব বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন যাহা উচ্চতর আদালতের কর্তব্য। আমাকে একজন ঝানু মহকুমা হাকিম বলিয়াছেন যে ইহা বাস্তবিকপক্ষে স্ববিরোধী, কারণ সাক্ষীরা যাহা বলিতেছে তাহার যদি বিস্তারিত জেরার প্রয়োজন হয় এবং যদি তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসাপেক্ষ হয় তাহা হইলে আসামীপক্ষ এবং নিম্ন আদালত মানিয়াই লইল যে বাদীর পক্ষে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং মামলা উচ্চতর আদালতে যাওয়ার যোগ্য!

মহকুমা হাকিম নিজেই বলিতেছেন তিনি পালং থানার নানা দলের সংবাদ রাখিতেন, কারণ তিনি হাকিম। আমি কস্মিনকালেও হাকিম ছিলাম না, তবে তাঁহার অভ্যাগমের কুড়ি বছরেরও অধিককাল আগে ওখানে শিকড় গাড়িয়াছিলাম। তিনি যে দলাদলির কথা লিখিয়াছেন এবং আব্দুল গফুর যে সরকারি দলের নেতা ইহা আমি ১৯৮০ সালে তাঁহার বই পড়িয়াই প্রথম জানিলাম। এইসব কথা তিনি দোহা, বদরুদ্দিন এবং হয়ত মহকুমা

পুলিস সাহেব হাফিজুদ্দিনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন। ই'হারা পাকা লোক ; ই'হারা বুঝিয়া থাকিবেন যে সাহেব বয়সে নবীন হইলেও ভারতশাসনের মূলমন্ত্র শিখিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কাছে যদি বীণাপাণির দরখাস্ত খারিজ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা সহজ হইবে না। সেইজন্যই এত উদ্যোগ-আয়োজন এবং বড় উকিলের ব্যবস্থা। স্মিথ সাহেব তাঁহার কাজ সোৎসাহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং মামলা নিষ্পত্তির পূর্বেই তিনি যে স্বীয় মত স্থির করিয়া রাখিয়া-ছিলেন তাহা অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এই চক্রীরা আমার বাবার অবিচলিত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দায়রা আদালতের রায় পড়িয়া সাহেব হুংকার দিয়া উঠিয়াছেন—Talk about British Justice! তাঁহার রায় ও বই পড়িয়া আমি বলিব Amen!

৪

আমাদের পালং গ্রামের আস্তানা ছিল খুব নিরালা জায়গায়। বাবা তো মামলার তদ্বিরে ও অর্থসংগ্রহের জন্য নানা জায়গায় যাইতেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিলেও পরিবারস্থ অন্যান্য লোকদের কথা ভাবিতে হইল—আমার মা, পরলোকগতা দিদির দুই মেয়ে ও দুই ছেলে এবং আমার ছোট বোন। ইহাদের মধ্যে আমার এক ভাগ্নী ও ছোট বোন তখন বিবাহযোগ্যা। কিছু দিন জবর আলী নামে একজন বিশ্বাসী পাহারাদার ছিল। জবর আলী বিশ্বস্ত হইলেও একা কি করিবে? বিশেষতঃ স্মিথ সাহেবের সরকারি নীতির ব্যাখ্যা পড়িয়া এবং দোহার কার্যকলাপ দেখিয়া সবাই একটু ভীত হইয়া পড়িল। সেইজন্য ঐ সংসার গোটান হইল, মা আমার ছোট বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের লইয়া কলিকাতায় আমার কাছে চলিয়া আসিলেন, বাবা স্কুলে থাকিতেন এবং সেক্রেটারির বাড়ি আহারাদি করিতেন। এই ব্যবস্থা অল্পদিনের জন্যই সম্ভব। মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হইলে বাবাকেও কলিকাতায় আসিতে হইল এবং প্রায় দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়া হাইকোর্টের মামলার খবচ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তৎসঙ্গে বীণাপাণিকেও হাঁসপাতালে নার্সের কাজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। বাবা আর পালং ফিরিয়া যান নাই। স্মিথ সাহেব হাইকোর্টের ন্যায়বিচারে আস্থা পোষণ করিতেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে হাই-কোর্ট হিন্দু জুরী ও হিন্দু জজের রায় নাকচ করিয়া দিবেন। চল্লিশ বৎসর পর তিনি গ্রন্থের যে টিপ্পনী সংযোজন করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু হাইকোর্টের ইংরেজ জজ লেথব্রিজ সাহেবের রায়ের উল্লেখ করেন নাই।

১৯২০ সালে আমি যখন কলিকাতায় আসি তখন বাবার ইংরেজ রাজভক্তি লইয়াই আসিয়াছিলাম এবং অসহযোগ আন্দোলনে যে যোগ দেই নাই তাহা অসহযোগে বিশ্বাসের অভাবের জন্যই। কিন্তু ক্রমশঃ আমার সেই রাজভক্তি উবিয়া যায়। ১৯৩০ সালে বিপ্লবে যোগ না দিলেও বিপ্লবীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সম্প্রতি আমি সাধ্যমত পড়াশোনা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে এক গ্রন্থও লিখিয়াছি। এখন সেই আমলের গোপন দলিলও সব প্রকাশিত হইতেছে এবং ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে স্মিথ সাহেব মাদারিপুরে মহকুমা হাকিম হয়েন এবং বীণাপাণি দেবীর মামলা করেন। তখন ই'হার বয়স ২৫ বছর : সেই বয়সে মানুষের আদর্শে বিশ্বাস এবং নিরপেক্ষতা অটুট থাকে বলিয়াই বিশ্বাস। এই সময়েই লিনলিথগো বড়লাট হইয়া আসেন এবং ইংরেজের মুসলমান তোষণনীতিকে পরিপূর্ণ রূপ দেন। এই নীতির সূত্রপাত হয়

লর্ড মিন্টোর সময়ে, কিন্তু ইহা স্বস্বরূপে দীপ্যমান হয় লিনলিথগোর আমলে। এই যুবক ছোটসাহেব আর ঐ সকল পরিপক্ক প্রবীণ বড়সাহেব—ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এবং শঠতা ও কপটতার ঐক্য দেখিয়া অবাক হই। স্মিথ সাহেবের সেই আমলের লেখা ও এই আমলের টিপ্পনীর মধ্যেও আশ্চর্য মিল আছে। ইংরেজের অধীনতা যে কতবড় অভিশাপ স্বাধীনতার সহস্র অভাব-অভিযোগের মধ্যেও এই বই পড়িয়া সেই কথাটাই বেশি করিয়া উপলব্ধি করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেন্সী কলেজ—১

ইডেন হিন্দু হস্টেল

১

১৯২০ সালের জুলাই মাসের প্রথম ভাগে—বোধহয় ১লা জুলাই—ইডেন হিন্দু হস্টেলে প্রবেশ করিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে আগেই ভর্তি হইয়াছিলাম। এক সময়ে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস লিখিয়াছি। তখন যেন সরকারি কাগজপত্রে দেখিয়াছিলাম যে এই হস্টেলে প্রথম দিকে অন্যান্য কোন কোন কলেজের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এখন সেই ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের কালে অর্থাৎ আমার ভর্তি হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে হইতে এবং আমার কলেজ ছাড়ার অনেক দিন পরেও, এখানে শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরাই থাকিতে পারিত। আমি যে বৎসর ভর্তি হই তখন আবাসিক সংখ্যা ছিল ২৬০ ; দুই-এক বৎসরের মধ্যেই অফিস বা অফিসারদের প্রয়োজনে জায়গার দরকার হওয়ায় ছাত্রসংখ্যা কমাইয়া ২৫০ করা হয়।

আমি যখন ভর্তি হই তখন ইহাকে নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত পক্ষিকুলের কলরবে মুখর বিশাল বটবৃক্ষের মত মনে হইত। লেখাপড়ার উদ্যোগ-আয়োজনে বা অন্যান্য বন্দোবস্তে কোন অপ্রাচুর্য বা অসুবিধা ছিল না। সকালে প্রিফেক্ট নাম ডাকিতেন এবং রাত্রি ন'টার মধ্যে ফিরিতে হইত। খাওয়া-দাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা আমাদের মত সাধারণ ঘরের ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। জলখাবারের জন্য বনমালী হালুইকরের প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল ; তাহার কর্মীরা সকালে বিকালে খাবার লইয়া ঘুরিয়া যাইত। একটু অসুবিধা ছিল টেবিলের এবং অভাব ছিল চেয়ারের। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই Bursar ষ্টার্লিং সাহেব প্রত্যেকের জন্য পৃথক চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সাহেব পঠন-পাঠনের জন্য তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই, কিন্তু কলেজকে খুব ভালবাসিতেন। তিনিই যে এই সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা মনে রাখিয়াছিলেন। আমার নিজের এম-এ পাস করার পরে এবং তাঁহার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে আমি ষ্টার্লিং সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তখনও তিনি এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁহার ছাত্রদরদের অনেক বেশি স্মরণীয় প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি পাড়াগাঁয়ের স্কুল হইতে আসিয়াছি। সেখানে সেকেণ্ড ডিভিশনে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাসকেই অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব বলিয়া গণ্য করা হইত। এইখানে হিন্দু হস্টেলে সব ওয়ার্ডেই এমন কি প্রত্যেক ঘরে এমন ছাত্র থাকিত যে বা যাহারা হয় বৃত্তি পাইয়াছে অথবা কাছাকাছি গিয়াছে। এই দিক দিয়া হিন্দু হস্টেলের কৌলীন্য ছিল। আমাদের আমলে কলেজে ভর্তির বেলায় কিছু কিছু সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যে-সব হিন্দু ছাত্র এই সংরক্ষণের সুবিধা পাইত তাহারা প্রায়শঃই কলিকাতার অভিজাত বংশের ছেলে এবং কলিকাতার ছেলে। তাহারা বড় একটা হস্টেলে আসিত না। এই কারণে হস্টেলের ছাত্রদের কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায়, তর্কবিতর্কে বেশ একটা উঁচুমান বজায় থাকিত। অবশ্য 'ভাল ছেলে' বলিতে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব ছাত্রকেই বুঝাইত যাহারা পরীক্ষায় ভাল ফল করিয়াছে। পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিতে হইলে তিনটি

জিনিস চাই—বরাত, অধ্যবসায় ও বুদ্ধি। প্রথম দুইটির তুলনায় তৃতীয়টি গৌণ। কিন্তু অধ্যবসায়ের ঘষামাজার চোটে বুদ্ধিও খানিকটা তীক্ষ্ণতা লাভ করে আর বরাতগুণে সাফল্য আসিলে মানুষ মোহাচ্ছন্ন ও মদমত্ত হয় বটে, কিন্তু অনেক সময় বরাতের জোরে সুপ্ত বুদ্ধিও খুলিয়া যায়। যাহা হউক, যে উপলব্ধি আমার একষট্টি বছর আগে হইয়াছিল তাহার স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজের কমনরুমে সেইসব ছেলেরাই আড্ডা দিত, যাহারা ধনী, অভিজাত পরিবারের সন্তান অথবা তাহাদের অনুচর। কিন্তু হিন্দু হস্টেলের লাইব্রেরিতে, কমনরুমে, বারান্দায়, তাসের আড্ডায় যে সরস, সজীব, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা যেসকল বিতর্কে যোগ দিয়াছি তাহা স্মরণীয়। ঐ সময় হস্টেলে পাঁচটা অংশ ছিল—ইহাদিগকে ওয়ার্ড বলা হইত। প্রত্যেক ওয়ার্ডের একটা হাতেলেখা ম্যাগাজিন ছিল। ভাল কাগজে আবাসিকরা প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লিখিত, ছবি প্রধানতঃ কার্টুন, আঁকা হইত। তারপর খুব ভাল করিয়া বাঁধাইয়া ওয়ার্ডের কোন এক জায়গায় রাখা হইত। আমি গ্রামের নগণ্য স্কুল হইতে দেশের সব চেয়ে নামজাদা কলেজে আসিয়াছি, আমার অদম্য কৌতূহল। আমি সব ওয়ার্ডের পুরানো, নূতন ম্যাগাজিন হাতড়াইয়াছি। ইহাদের মান খুব উঁচু বলিয়া আমার মনে হইত। এখনও যা অল্পস্বল্প মনে আছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। একটি প্রবন্ধের কথা এখন বেশি করিয়া মনে হইতেছে—'Where is Mill?' জন ষ্টুয়ার্ট মিল বহুশ্রুত ব্যক্তি, তাঁহার মনীষা নানা বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছে—কোন কোন বিষয়ে যেমন অর্থনীতিতে তিনি পথিকৃৎ, আবার কোন কোন বিষয়ে যেমন তর্কশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া আরোহ-খণ্ডে—Inductive Logic-এ তিনিই যেন শেষ কথা বলিয়া দিয়াছেন ; ইহা ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতিতেও তাঁহার রচনা প্রামাণিক বলিয়া মনে করা হইত। এই লেখক—এখন তাহার নাম মনে নাই—অতি সুন্দর, সুললিত যুক্তি দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে কোন বিষয়েই মিলের মৌলিকতা নাই, কোন শাস্ত্রেই তাঁহাকে পুরোধা বলিয়া মান্য করা যায় না। একজন কলেজের ছাত্রের রচনায় এইরূপ বৈদগ্ধ্য বা মুন্সিয়ানা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

আমরা যখন পড়িতে আসি, তখন শিক্ষিত বেকারের সমস্যা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। হস্টেলের লেখাপড়া, আলাপ-আলোচনা, উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেও ইহার কালোছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা বেশ অনুভব করিতাম। যাহারা বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িত, তাহাদের কথাবার্তায় পরিপক্কতার সুর যেমন স্পষ্ট ছিল আবার আসন্ন কর্মহীনতার আশংকাও অনুভব করা যাইত। এখন এই সমস্যার বিপুলতা লইয়া খুব আন্দোলন করা হয়। কিন্তু তখন সেই জাতীয় আন্দোলন সম্ভব ছিল না, অন্ততঃ ইডেন হিন্দু হস্টেলে তাহা অনুভব করা যাইত না। যাহারা সেই বৃহত্তর সমস্যা উপলব্ধি করিত তাহারা বিপ্লবী দলে যোগ দিত এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে আন্দোলিত হইত। অনুভব করিতাম এইসব ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত ছিল যুবক সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন অনেককে বিচলিত করিল এবং হিন্দু হস্টেলের কিছু ছাত্রকে পাকাপাকিভাবে টানিয়া নিল—যেমন অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন। ইঁহাদের নাম শুনিয়াছি, পরে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু তখন চিনিতাম না। একটি ছাত্রের কথা আমার খুব মনে আছে। আমি থাকিতাম ছ' নম্বর ঘরে আর ইহার আস্তানা হইল পাঁচ নম্বর ঘরে। এই দুইটি ঘর প্রায় এক ঘরের মত—মাঝখানে একটা কাঠের পার্টিসন ; তাহাও সম্পূর্ণ নয়। আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ; যতদূর মনে আছে এই ছাত্রটি বি. এস্-সি- পরীক্ষার্থী। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ দেখিয়াই

ইহার মন বিচলিত হইত, মুখ আরক্তিম হইত, যেন কিছুতেই পাঠ্য বইয়ে মন বসিতেছে না। উ'চু ক্লাসের ছাত্র বলিয়া আমি কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিলাম ইহার কলেজে পড়া এখানেই সাঙ্গ হইল। ইহার নাম ছিল অজয় মুখোপাধ্যায়। ইহার পরবর্তী ইতিহাস বলিতে হইবে না।

অসহযোগ আন্দোলনে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সাড়া দিলেও, মোটামুটিভাবে বলা যায় ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের ও হিন্দু হস্টেলের জীবনে খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। পরাধীন দেশে শিল্পবাণিজ্য সাহেবদের হাতে—বাঙ্গালীরা সওদাগরি অফিসে কেরানী হইতে পারে, এই পর্যন্ত। সেই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া কেহ প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসে না। বাকী রহিল সরকারি চাকুরি। ১৯২২ সাল হইতে এই দেশে আই. সি. এস্. পরীক্ষা লওয়া শুরু হইল। ইহা একটা বড় লক্ষ্য হইল বটে, কিন্তু তাহা দুই-চার জনের ভাগ্যে জুটিত। তবে অনেকেই চেষ্টা করিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বি সি. এস্. পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সেখানে অবশ্য চাকুরি বেশি এবং প্রার্থী সবাই বাঙ্গালী। তবু পরীক্ষাটা বরাতের ব্যাপার, যদি আই. সি. এস্. জুটিয়া যায় এই প্রলোভনেই অধিকাংশ ছাত্র উৎসাহিত হইত। আবার অডিট সার্ভিস পরীক্ষাও একটা আকর্ষণ হইল ; তাহা সর্বভারতীয় চাকুরি হইলেও আই. সি. এস্.-এর জৌলুষ অনেক বেশি। যাহাই হউক এইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আর কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! আমি যে-সময় হিন্দু হস্টেলে ছিলাম সেই সময় আমার আগে পরে যত ছেলে ছিল, সবচেয়ে দীপ্তিমান ছাত্র ছিলেন পিনাকিরঞ্জন সিংহ। তিনি পড়িতেন খুব কম, কিন্তু পরীক্ষায় যেন অনায়াসে উপরে আসিয়া যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া মনে হইত এইরূপ চটপটে বুদ্ধির লোক বড়-একটা দেখি নাই, কিন্তু ইংরেজির ছাত্র হইলেও কখনও বইয়ের কথা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সব পরীক্ষায় ভাল করিয়া তিনি আই. সি. এস্. পরীক্ষায় পিছলাইয়া গেলেন। ইহার পর অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অমুকে পাস করিল আর পিনাকী পাস করিতে পারিল না। এই পরীক্ষার দাম কি?' ব্যক্তিগত সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম। একবার আই. সি. এস্. সূর্য ছাত্রজীবনের আকাশে উদিত হইলে বি. সি. এস্. খুবই নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আবার সেখানে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার জন্য ডেপুটির সংখ্যা কমিয়া গেল। সব-ডেপুটিগিরি অবশ্য বেশ কিছু ছাত্র পাইত। কিন্তু উচ্চ আশা লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া সব-ডেপুটির চাকুরি লইয়া বাহির হওয়া উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে অনেকটা আকাশে তীর ছুড়িয়া কলাগাছ বিদ্ধ করার মত। তাহাই বা কয়জনের ভাগ্যে জোটে।

আমি বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু ইডেন হস্টেল নিবাসী উচ্চাভিলাষী, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বৃত্তিধারী ছাত্রদের মধ্যে চাকুরিব বিড়ম্বনার কথা বলিতেছি। ইহার বাহিরে অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত বৃহত্তর সমাজের ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল না তাহা নহে। আমি যখন গ্রামের স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করি (১৯১২—১৯১৫) তখন একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষকের বেতন ছিল ৬০ টাকা। কিন্তু ইহার বার-তের বছর পরে যখন চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে বাবার কাছে পালং যাইতাম, তখন গ্রাজুয়েটেরা বাবার কাছে চাকুরির জন্য উমেদারি করিত এবং পঁচিশ টাকা মাহিনা পাইলেই খুশি থাকিবে এই কথা বলিত। খানিকটা কারণ আশু মুখুজ্জের কৃপায় পরীক্ষা হু-হু করিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আগে যাঁহারা এনট্রান্স পাস করিত বা করিত না, পনের বছর পরে তাহারা বি-এ পাস করিত। ইহা অপেক্ষাও বড় কারণ—যে দেশে কুটীরশিল্প মুমূর্ষু, ভারি শিল্পের সংখ্যা নগণ্য এবং তাহাও বিদেশীর করতলগত, সেনাবাহিনীতে প্রবেশ প্রায়

বন্ধ এবং জনসংখ্যা প্রবল বেগে বর্ধমান, সেখানে প্রতিদিন শিক্ষিতের নিয়োগের সম্ভাবনা সংকুচিত হইতে বাধ্য। এই শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জগতের বাহিরে অনশন ও অর্ধাশনের যে বিপুল সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহারও আভাস যে পাই নাই তাহা নহে।

যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতদের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা করিতেন তাঁহারা আমাদের দুর্দশার কথা যে না বুঝিতেন তাহা নহে। তখনকার একজন খুব জাঁদরেল সাহেব ছিলেন উইলিয়াম প্রেনটিস। তিনি বেশ কিছুকাল মাত্র ৩৭৫০ টাকা বেতনে চীফ সেক্রেটারি ছিলেন এবং পরে ৫৩৩৩ টাকা বেতনে মেম্বর হইয়াছিলেন। কলিকাতায় যে বড় সাহেবকুল থাকিতেন তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি বা বিশেষ ভাতার নানা ব্যবস্থা থাকিত, ডেপুটিদের জন্যও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সব-ডেপুটিদের জন্য সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। ছোট কোন-একটা বিশেষ পদের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ সব-ডেপুটির যৎসামান্য ভাতার প্রস্তাব করা হয় এবং এই প্রস্তাব চীফ সেক্রেটারি প্রেনটিস পর্যন্ত পঁহুছায়। তিনি মন্তব্য করেন যে, ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য এইসকল অফিসাররা কলিকাতায় আসিতে ব্যগ্র। বেতন কিছু কমাইয়া দিলেও ইহারা কলিকাতায় আসিবে। সুতরাং ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব অযৌক্তিক। সাহেব শুধু যুক্তিবাদী ছিলেন না, সুরসিকও বটে।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই ১৯২০ সালে। তখনও প্রতিযোগিতামূলক আই. সি. এস্., বি. সি. এস্. পরীক্ষা আরম্ভ হয় নাই। বিরাট ব্যবসার ক্ষেত্র ইউরোপীয় বা মারোয়াড়ী বণিক-সম্প্রদায়ের হাতে ; কোন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার গুণে প্রবেশ করিতে পারিবে ইহা ভাবাই যাইত না। যাহারা খুব ভাল পাস করিত, তাহাদের লক্ষ্য ছিল সরকারি কলেজে চাকুরি—প্রভিন্সিয়েল গ্রেডে, অনেকটা ডেপুটির মত। তখনকার ইংরেজির খুব নামজাদা ছাত্র ছিলেন বীরেন্দ্র-বিনোদ রায় ও ফিরোজ দস্তুর। ইঁহাদের কথা পরে সবিস্তারে বলিতে হইবে। চাকুরির তদ্বিরে বীরেন্দ্রবিনোদ ডি. পি. আই. সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব নিজে সদ্য পাস করিয়া প্রভিন্সিয়াল সার্বিসের তিনগুণ বেতনে এই দেশে আসিয়াছিলেন এবং একাধিক বিষয় পড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সদ্য পাস করা গ্রাজুয়েটরা বড় জোর নিম্নতম অর্থাৎ লেকচারার হইয়া ঢুকিতে পার। তুমি অথবা দস্তুর কেহ প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে চাকুরি পাইবে না।' কালক্রমে লেকচারারের চাকুরিও দুর্ঘট হইল। আমার মনে আছে ১৯২৫/২৬ সালে কেমিস্ট্রির লেকচারার পদে বি এস্-সি., এম. এস্-সি.-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট প্রার্থী কাজ পাইলেন না এবং আত্মহত্যা করিলেন। তিনি নাকি লিখিয়া গিয়াছিলেন, চাকুরি না পাওয়া তাঁহার আত্মহত্যার কারণ নয়। অবশ্য ইহা কেহ বিশ্বাস করে নাই ; ইহা মৃত্যুপথযাত্রীর আত্মসম্মান রক্ষার শেষ চেষ্টা মাত্র। আমাদের পরের বছরের ছাত্র অশোক শাস্ত্রী—ঈশান বৃত্তিধারী, পি. আর. এস্. —অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া কোনক্রমে লেকচারার হইয়াছিলেন। তারকনাথ সেন লেকচারার হইয়াও পদচ্যুত হইয়াছিলেন এবং অনেক তদ্বির-তদারকির পরে পুনর্নিযুক্ত হয়েন।

চাকুরির বাজার যতই মন্দা হউক, ইডেন হিন্দু হস্টেলে লেখাপড়ার আবহাওয়া খুব সরগরম ছিল ; লেখাপড়ার আলোচনাই বেশি হইত এবং সেই আলোচনায় বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রতিফলিত হইত। কেহ কেহ যে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়া কালক্ষেপ করিত না এমন নয়। দুই-চারজন ছাত্র গর্হিত অপরাধও করিত। একবার একটা উৎসবে কয়েকজন উচ্ছৃংখল ছেলে হৈহল্লা করিয়াছিল বলিয়া হস্টেল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম ইহারা কেহ কেহ পানোন্মত্ত হইয়া একটু বেসামাল হইয়াছিল। হয়ত অপবাদটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ইহাদের মধ্যে আমাদের সহপাঠী একজন ছিল—আই. এস্-সি. ক্লাসের

ছাত্র। কয়েক বছর পর আমরা কয়েকজন চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে একটা মেসে ছিলাম। উহা মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন ; কাজেই ডাক্তার ও হবু ডাক্তারই বাসিন্দাদের মধ্যে সংখ্যায় অধিক। আমাদের পাশের ঘরে সেই বিতাড়িত সহাধ্যায়ীকে দেখি ; সে তখন ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষায় ফেল করিতে শুরু করিয়াছে। ঐ ঘরে আর দুইজন আবাসিক ছিলেন ; বয়সে প্রবীণ সিন্ধি ডাক্তার ; কলিকাতায় আসিয়াছেন. D. T. M. পড়িতে। একদিন সকালে দেখি পাশের ঘরে পুলিশের অভ্যাগম ; কারণ—সিন্ধি ডাক্তারদের দামী ডাক্তারি যন্ত্র চুরি হইয়াছে। পুলিশ দেখিয়া শুনিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আমাদের সেই হবু ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। পরে মেসের ম্যানেজারের কাছে শুনিয়াছিলাম সেই যন্ত্রের অনুসন্ধানে পুলিশ অদূরে হাড়কাটা গলি পর্যন্ত গিয়াছিল। এই জাতীয় হামলাবাজ বা কলঙ্কী ছাত্র ইডেন হিন্দু হস্টেলে কমই ছিল। সাধারণতঃ যাহারা হৈচৈ করিত তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ছিল নিরামিষ ধরনের। যেমন রাত্রি ১১টায় পাঁড়ে আলো নিবাইয়া দিত ; একদিন অন্ধকারে হৈহল্লা শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখি নলিনাক্ষ সান্যালকে পুরোধা করিয়া একদল ছাত্র ফুটবল খেলিতে নামিয়াছে। সান্যাল মহাশয়কে নেতৃত্ব দেওয়া বাস্তবিকই ছাত্রদের রসবোধের পরিচয় দেয়, কারণ অমাবস্যা রাত্রিতে নলিনাক্ষ সান্যালকে ঠাহর করা খুব সহজ কাজ নয়!

২

লেখাপড়ার ক্ষেত্রে শুধু যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে, বৈচিত্র্যও ছিল। আমি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দুইটি লোকের কথা বলিব যদিও ইঁহারা কেহই খ্যাতি লাভ করেন নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি ; তখন আমরা চারজন তের নম্বর ঘরে থাকিতাম—আমি কনিষ্ঠ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ইকনমিক্স অনার্স লইয়া পড়িতেন (উৎকলবাসী) জগন্নাথ মিশ্র, শৈবালকুমার গুপ্ত আর ছিলেন আমাদের প্রিফেক্ট ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জগন্নাথবাবু সরল, সোজা প্রকৃতির লোক, কোন-ভাবেই নিজেকে জাহির করিতে চাহিতেন না। আকস্মিকভাবে একদিন শুনিয়াছিলাম তিনি উৎকলপ্রদেশের খুব এক ধনী পরিবারের লোক। কিন্তু তিনি নিজে ধরা দিতে চাহিলেন না। পরস্পর শুনিয়াছিলাম ১৯৩৫ সালের নূতন বিধান অনুসারে যে-সকল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তখন উৎকলপ্রদেশের মন্ত্রিসভার তিনি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি বা সংসদসচিব নিযুক্ত হয়েন। তারপর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। শৈবালবাবু খুব নামজাদা ছাত্র ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তারপর আই. সি এস্. পরীক্ষায় খুব উঁচু স্থান অধিকার করিয়া ছাত্রহিসাবে নিজের প্রাধান্যের স্বাক্ষর রাখিলেন। কর্মজীবনে যা-কিছু সময় পাইতেন লেখাপড়া করিতেন। এখন আশি বৎসর বয়সেও প্রধান কাজ বিদ্যাচর্চা। কিন্তু আমি এখানে বলিতে চাই চতুর্থ ব্যক্তির অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। সুরেনবাবু আমার চেয়ে চার ক্লাস উপরে পড়িতেন এবং আইনও পড়িতেন কারণ প্রথম হইতেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল আইন ব্যবসায়। তর্কপ্রিয় লোক না হইলেও সুরেনবাবু তর্কপটু লোক ছিলেন। আইন ব্যবসায়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে। শৈবালবাবুর বাবা ও মামা ছিলেন ভোলার উকিল আর সুরেনবাবু তো খাস বরিশালের লোক। ইহাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং অনেক সময় ইঁহারা তর্কে অবতীর্ণ হইতেন। সুরেনবাবু বয়সে বড় বলিয়া শৈবালবাবু তাঁহাকে বেশ সমীহ করিতেন এবং ইঁহাদের তর্ক বা আলোচনায় কখনও

তিক্ততার আভাসও থাকিত না। যে যাহার পড়াশোনা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন, খুব বেশি যে তর্ক উঠিত তাহাও নয়। কিন্তু যখন অলোচনা হইত অনেক সময় অর্থনীতি বিষয়ক কোন প্রশ্ন উঠিয়া পড়িত। আমি নিজে অর্থনীতিতে একেবারে অজ্ঞ, কিন্তু লক্ষ্য করিতাম যুক্তিবাণ নিক্ষেপে সুরেনবাবু সমধিক কুশলী। অবশ্য এই কারণে আমি সুরেনবাবুর কথা লিখিতেছি না। সুরেনবাবু গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছিলেন, তাঁহার লক্ষ্য ছিল উকিল হওয়া, কিন্তু তিনি এম-এ পড়িলেন ইকনমিক্সে এবং এই বিষয়েও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। বুদ্ধিবৃত্তির এই দুঃসাহসিক অভিযান আমাকে খুব চমৎকৃত করিয়াছিল। শুনিয়াছি আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পথিকৃৎ অ্যালফ্রেড মার্শাল ডিগ্রি লইয়াছিলেন গণিতে ; এই জগতের দিক্‌পাল জন মেনার্ড কীন্‌স তো গণিতে র‍্যাংলার। আধুনিক কালে ওদেশে এবং সেইজনাই এদেশেও গণিতের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছিলাম তখন আমাদের দেশে ইকনমিক্সের সঙ্গে গণিতের কোন সম্পর্ক ছিল না। পূর্বে তো ইকনমিক্স ইতিহাসের অঙ্গ ছিল। আমাদের আমলে mathematical economics অনেক ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয় ছিল মাত্র, কিন্তু কেহ বড় ইহার প্রতি নজর দিত না। যিনি এই বিষয়ে পড়াইতেন শুনিয়াছি তিনি নিজে বি. এ.-তে ইকনমিক্সে অনার্সই পান নাই। যদি সুরেনবাবু গণিত ও অর্থনীতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে জানিয়াই গণিতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাইয়া অর্থনীতি পড়িতে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার দূরদৃষ্টিকে অভিবাদন জানাইতে হইবে।

আর যাঁহার কথা বলিব তিনি আরও মজার লোক। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ ভাষার অবসরপ্রাপ্ত লেকচারার—শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সুরেশবাবু হিন্দু হস্টেলে থাকিতেন : আমার চেয়ে বছর-দুই নীচুতে পড়িতেন—বিজ্ঞানের ছাত্র, বোধহয় কেমিস্ট্রির। আমার সঙ্গে সংস্রবের বিশেষ কোন যোগসূত্র ছিল না। তবু আমি তাঁহাকে বেশ চিনিতাম। মনে হইত ইনি ঠিক অন্য পাঁচজনের মত লোক নহেন ; জ্ঞানের জগতের নানা অলিগলিতে ইনি সঞ্চরণ করিয়া বেড়ান। আমি ইঁহার বছর-দুই আগে কলেজ ছাড়িয়া এম-এ পাস করিয়া দিল্লী চলিয়া গিয়াছিলাম। তাহারও বছর-দেড়েক পরে কলিকাতায় ফিরি। সুরেশবাবুর আর তখন কলেজে থাকার কথা নয়। মহাত্মা গান্ধীর উৎসাহে তখন হিন্দী আসর জমাইতে শুরু করিয়াছে। বোধ হয় সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতেই শুনিয়াছিলাম যে তিনি ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দের তালিকা প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত আছেন। এই কাজের অঙ্গ হিসাবে রুশ ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন ও রুশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িতে শিখেন। তাঁহার এই বিষয়ে কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নাই। তাঁহার মনটা ভবঘুরে ; এদেশে আবদ্ধ থাকিলেও হিমালয়ে বসবাসকারী রুশভাষাভাষী রোয়েরিখ (Roerich) পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কালিদাসের কথা একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে সাধু হইল প্রয়োগবিজ্ঞানম্। কে কোন্ ভাষা জানে তাহার প্রধান সাক্ষ্য অনুবাদ করার সামর্থ্য। এই সাক্ষ্যকে এড়াইতে চাহেন বলিয়াই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে একদল পরীক্ষা হইতে অনুবাদ তুলিয়া দিতে চাহেন। যাহা হউক, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক সংস্থা—যেখানে রুশ ভাষা হইতে অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিত সুরেশবাবুর ডাক পড়িত, এবং এইভাবে রুশ ভাষায় তাঁহার অধিকার নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ ভাষার ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমের লেকচারার নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল—খানিকটা এখনও আছে—রুশ ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া

দেওয়া। তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে এই সূত্রে তিনি স্লাভনিক অনেক ভাষার সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছেন।

আর একটা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইতেও তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই। আমি কমিউনিজম বিষয়ে কিছু কিছু পড়াশোনা করিয়াছি। রুশ প্রধানদের মধ্যে ট্রট্স্কির সাহিত্যিক মনীষার উপর আমার খুব শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু লেনিন বা ষ্টালিনের প্রতি আমি কখনও আকৃষ্ট হই নাই, যদিও ইঁহাদের বিশেষতঃ লেনিনের রচনা আমি কিছু কিছু পড়িয়াছি। সুরেশবাবু এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসেন এবং এখানে আসিলেই আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন। ষ্টালিন মারা যান ১৯৫৩ সালে এবং ১৯৫৬ সালে পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ ষ্টালিনবিরোধী বক্তৃতা দেন। হলফ করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু যতদূর স্মরণ করিতে পারি ষ্টালিনের মৃত্যুর পর কোন-একটা প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থের নূতন সংস্করণে সুরেশবাবু দেখিতে পান যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষ্টালিনের ভূমিকাকে ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে ; ঐ কোষগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ষ্টালিনকে ঐ যুদ্ধের মহানায়ক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং এইভাবে তিনিই আমাকে de-Stalinization-এর প্রথম আভাস দেন।

সুরেশবাবুর কৌতূহল নানা বিষয়ে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। তাঁহার পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমার বড় মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভদ্রলোকের বোধহয় যোটক বিচারের দিকে ঝোঁক ছিল। আমার সেই দিকে কোন উৎসাহ ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে মেয়ের জন্মের সন তারিখ সময় জানাইয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই ; কিন্তু তাঁহার নিকট লগ্ন প্রভৃতি পাইয়া সুরেশবাবু আমার মেয়ের কোষ্ঠী রচনা করেন এবং কোন্ বৎসরে কিরূপ ফলাফল হইতে পারে তাহার বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত এক এক্সারসাইজ বুক আমাকে দেন।

একটা ব্যাপারে সুরেশবাবুর বিচার সমধিক যাথার্থ্যের আভাস দেয়। আমাদের দেশে যাঁহারা ভাষার অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সবাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়া থাকিতেন। সুরেশবাবুর সঙ্গে তো বেশ নৈকট্য ছিল। জীবনের শেষ বছর-দুয়েক সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আমি তখন রুগ্ন, গৃহ-বন্দী ; তিনি মাঝে মাঝে আমাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন বলিলেন, তিনি শীঘ্র ফ্রান্সে যাইবেন এবং আগামী বৎসর জার্মেনী যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পর সুরেশবাবু আসিলে আমি সুনীতিকুমারের বিস্ময়কর সংকল্পের কথা বলি। তিনি আমাদের অপেক্ষা ১৩।১৪ বৎসরের বড় এবং তখন পঁচাশি অতিক্রম করিয়াছেন, তবু বিদেশে পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহসিক সংকল্প করিয়াছেন। সুরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'নাঃ! নাঃ! আমি নিষেধ করিয়া দিয়াছি। জুলাই মাস পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকিতে হইবে এবং কোথাও পা না বাড়াইতে বলিয়াছি।' জুন মাসে সুনীতি-কুমারের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে সুরেশবাবু বলিলেন, 'আমার কথা শুনিলেন না। তেল ফুরায় নাই, বাহিরের দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিভিয়া গেল।' আমি হেঁয়ালি ভেদ করিতে না পারায় সবিস্তারে বুঝাইয়া বলিলেন, সুনীতিকুমারের জুলাই মাস পর্যন্ত ফাঁড়া ছিল। কিন্তু মৃত্যুযোগ ছিল না। সুতরাং সাবধানে থাকিয়া জুলাই মাস উত্তীর্ণ করিলে ফাঁড়া কাটাইযা দিতে পারিতেন। কিন্তু ফ্রান্স যাওয়ার ব্যস্ততায় চোখের অপারেশন করিতে গেলেন, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ব্যাহত হইল, শরীরের উপর ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল, জ্বর ও পরে নিউমোনিয়া আসিয়া পড়িল। সেই দমকা হাওয়ায় জীবনশিখা নিবিয়া গেল!

কিছু পূর্বে ফিরোজ দস্তুরের কথা বলিয়াছি। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র

ছিলেন কিন্তু হিন্দু হস্টেলে ছিলেন না। তিনি সুরেশ সেনগুপ্তকে এলাহাবাদে বেশ জানিতেন। স্মৃতিচারণ করিতে করিতে তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'দেখ, আমি জন্মিয়াছিলাম পশ্চিমভারতে (বোম্বাইয়ে), শিক্ষালাভ করিয়াছি পূর্বভারতে (কলিকাতায়) চাকুরি করিয়াছি উত্তরভারতে (এলাহাবাদ ও দিল্লীতে), অবসর জীবন যাপন করিতেছি দক্ষিণভারতে (কোদাইকানালে)। প্রকৃত জিজ্ঞাসা—intellectual curiosity—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেই দেখিয়াছি। তুমি কি অন্য কোথাও সুরেশ সেনগুপ্তের মত কোন লোককে দেখিয়াছ?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেন্সী কলেজ—২

সতীর্থবৃন্দ

১

পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি ; প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকিলাম ভয়, বিস্ময়, গর্ব—নানাবিধ ভাব ও ভাবনা লইয়া। প্রথম দিন তো কলেজের এক নম্বর ঘর চিনিতেই দেরি হওয়ায় ঢুকিয়া দেখি প্রফেসর (সতীশচন্দ্র দে) নাম ডাকা শুরু করিয়া দিয়াছেন। আমরা যে দশজন সেবার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন মহিলা—অধ্যাপক সুকুমার দত্তের স্ত্রী। ন' জন ছেলে সবাই প্রেসিডেন্সীতে আসিয়াছি—দুই জন বিজ্ঞানে আর সাত জন কলা বিভাগে। আর্টসের বাকী ছ' জনই আমার মনোযোগ প্রথম আকর্ষণ করিল। দেখিলাম, ইহারা সবাই আমা অপেক্ষা পরিপক্ক এবং আমার চেয়ে বেশি জানে। মনে হয় লেটার অর্থাৎ শতকবা আশির উপরে পাইলেও বাংলায়ই আমি সব চেয়ে পিছাইয়া আছি। পালং স্কুলে কেহ বাংলা লইয়া মাথা ঘামাইত না। বাবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন ও প্রশংসা করিতেন, শরৎচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন নাই। আমাকে ইঁহাদের কাহারও রচনা পড়িতে উৎসাহ দিতেন না। সেই আমলে কোন পাঠ্যপুস্তক বা প্রবন্ধসংকলনে শরৎচন্দ্রের লেখা বাহির হয় নাই। সংকলন গ্রন্থেই আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অংশাবিশেষ পড়িয়াছিলাম এবং এইসব সাহিত্যকণায় আমার রসবোধ সঞ্জীবিত হইয়াছিল। স্কুলের লাইব্রেরিতে ইংরেজি গীতাঞ্জলি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু হিন্দু হস্টেলে আসার মাসখানেকেব মধ্যেই পবিত্র বসু ইহার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল আর আমার সামান্য সম্বল হইতে একটাকা দিয়া আমি তখনই ইহার ভারতীয় সংস্করণ একখণ্ড কিনিয়া ফেলিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজেও প্রথমে বাংলা পড়ার তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। ইহার প্রধান দায়িত্ব অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাহা হউক, পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য যখন বাংলা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন কলেজের বাংলা পঠন-পাঠন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। আমি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইলাম ইডেন হিন্দু হস্টেলে বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে, হস্টেল লাইব্রেরির সাহায্যে। বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করি অধুনা প্রয়াত চারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে, যে উত্তরকালে 'জরাসন্ধ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আমাদের সেই প্রথম দশজনের মধ্যে চারুও ছিল একজন এবং যতদূর মনে করিতে পারি চারু বাংলায় নব্বুইর উপর নম্বর পাইয়াছিল, যদিও সে কোন পরীক্ষাই—অর্থাৎ ম্যাট্রিক হইতে বি-এ পর্যন্ত—বাংলায় ফার্স্ট হয় নাই। পরীক্ষা একটা ভোজবাজি। আই-এ পরীক্ষায় আমরা অনেকেই বাংলায় লেটার পাইয়াছিলাম, চারু পায় নাই। আর ঐ আই-এ পরীক্ষায় আমার নম্বর—যতদূর মনে হয় ৮৩ হইতে এক নম্বর বেশি পাইয়া প্রথম হইয়াছিল বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী। বীরেন্দ্রকিশোরের নানা দেশের নানা সাহিত্যে কৌতূহল ছিল, তাহার সঙ্গীত-শাস্ত্রে নাকি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, সুরশৃঙ্গার বাজাইয়া সে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু সুদীর্ঘকালের পরিচয়েও তাহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বা বাংলা-

ভাষার উপর অধিকারের চিহ্ন দেখি নাই। আর হাঁস যেমন অবলীলাক্রমে জলের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায় চারুর মন ও কল্পনা তেমনি অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। পবিত্র বসু তো ছিলই ; তারপর চারুও কিছুদিনের মধ্যে হস্টেলে চলিয়া আসিল। চারু শুধু যে ভাল বাংলা লিখিত তাই নয়, সে খুব ভাল পড়িতে পারিত। আমার বেশ মনে আছে প্রতি রবিবার সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িত আর আমি শুনিতাম। এমনি করিয়া এই দুই বন্ধুর উৎসাহে ও সাহচর্যে আমার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি বাংলা কিছু কিছু পড়িয়াছি ; সেই তুলনায় লিখিয়াছি বেশি। আমি মনে করি যে বাংলা সাহিত্যে যাহা পড়িয়াছি তাহা খানিকটা খাপছাড়া এবং তাহার মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব আছে। কখনও কখনও মনে হয় হঠাৎ কে যেন গাছের শীর্ষে তুলিয়া দিয়াছে ; তারপর আমি শাখাপ্রশাখায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি ; কেমন করিয়া গোড়া হইতে আগায় উঠিতে হয় তাহা আর জানিলাম না।

চারু যেমন বাংলায় পারদর্শী ছিল তেমনি গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানা ছিল সংস্কৃতে। সে সংস্কৃতে প্রথম হইয়াছিল, সর্বসাকুল্যে চারুর ঠিক উপরে ছিল। সংস্কৃত তো মাতৃভাষা নয় ; চারুর বাংলায় দখল যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল গৌরের সংস্কৃতে বুৎপত্তি সেইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। মনে হয় খানিকটা সহজাত মেধা এবং খানিকটা অনুশীলনের জোরে সে এইরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছিল। আমাদের সপ্তাহে একদিন করিয়া ব্যাকরণ ও অনুবাদের ক্লাস হইত। গৌর আর আমি পাশাপাশি বসিয়া একই প্রশ্নের উত্তর করিতাম। মিলাইয়া দেখিয়াছি গৌর যাহা লিখিত তাহা সংস্কৃত সাহিত্য আর আমার রচনা ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রের বিশুদ্ধ উদাহরণ। চারু আর গৌর উভয়েই অঙ্কে অনগ্রসর ছিল। অঙ্কে আমার দুর্বলতার কথা আগেই বলিয়াছি, কিন্তু উহারা আমার চেয়ে অনেক বেশি কাঁচা ছিল। উপরিতলার ছেলেদের মধ্যে শুধু সুশীল চট্টোপাধ্যায় অঙ্ক না লইয়া ইতিহাস লইয়াছিল। তাহা হইলেও অঙ্কের ক্লাসে ছেলে কম ছিল ; অধ্যাপকরা স্কুলের মতই ক্লাসে অঙ্ক কষিতে দিতেন, আমরা বেশ চটপট কষিয়া দিতাম—আমাদের পিছনে পড়িয়া থাকিত চারু এবং আরও পিছনে গৌর। অঙ্কের ক্লাসে আমার দুইজন ভাল ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়—জিতেন্দ্রভূষণ রায় ও প্রণবেন্দুপ্রসাদ পাল। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর বা divisional বৃত্তি পাইয়াছিল। জিতেন খুব বড় ঘরের ছেলে ; তাহার অঙ্কের মাথা ছিল খুব পরিষ্কার। কিন্তু মনে হয় বাড়ির পরিবেশ লেখাপড়ার অনুকূল ছিল না। সেইখানে প্রধান চর্চার বিষয় ছিল মোহনবাগান ক্লাব ; কাজেই ম্যাথামেটিক্স বা অন্য কিছু প্রবেশ করিতে পারিত না। জিতেন নিজে ক্রিকেট খেলিত। কর্মজীবনের প্রারম্ভে আমি ভাল খেলা থাকিলে ইডেন গার্ডেনে গিয়াছি। আমি ক্রিকেট খেলা দেখিতে ভালবাসিতাম ; সেই আমলে তেমন ভিড় হইত না। জিতেনের সঙ্গে দেখা হইত। কিন্তু আমাদের সেই আগেকার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে বোধহয় কোনরকমে বি. এ. পাস করিয়াছিল ; কি করিত তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। এক সময় তাহাদের ধনসম্পদ ছিল, আর আমি কখনও ঋদ্ধি লাভ করি নাই। তবু তাহার কৈশোরের মেধাদীপ্ত মুখ আমার মনে জাগরূক আছে। প্রণবেন্দুর কাহিনী আর একটু বৈচিত্র্যময়, আরও একটু রোমাঞ্চকর। সে পরীক্ষায় মোটা-মুটি ভাল পাস করিয়াছিল, মোটামুটি ভাল চাকুরি করিত, ডেপুটিগিরি সমাপ্ত করিয়া পেন্সন লইয়া আমার সাহায্যে কলেজের প্রফেসারিতে প্রবেশ করিল এবং তাহাও শেষ করিয়া নূতন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইল—এ যেন গীতার 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' নূতন বাস পরিগ্রহ করা। গীতা সম্পর্কে অজ্ঞ হইলেও ইচ্ছা করিয়াই গীতার উল্লেখ করিলাম, কারণ প্রণবেন্দুর বর্তমান গবেষণার বিষয় জন্মান্তর-বিশ্লেষণ—'বহূনি মে জন্মানি তব

চার্জ্জুন'। শাস্ত্রকারেরা যাহাই বলুন না কেন, মৃত্যুর ওপার হইতে কোন যাত্রীই ফিরিয়া আসিয়া ওখানকার কথা বলে নাই। সুতরাং যুক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মানিতেই হইবে যে বস্তুবাদের পাল্লাই ভারী ; অর্থাৎ মরণের পর আর কিছু নাই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ওখানে থামে নাই। সাধারণতঃ, যাহারা মাঝে মাঝে তাহাদের জন্মান্তরের কাহিনী বলে তাহাদের সংলাপকে আমরা প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু নব্য বিজ্ঞান এই আজগুবি কাহিনীকে প্রলাপ মনে করিয়া উড়াইয়া না দিয়া নানা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সে এই-সকল অসংলগ্ন, অবিশ্বাস্য কাহিনী হইতে একটা সম্ভাব্য ইতিহাস রচনা করিতে চেষ্টা করে। ইহার নাম para-psychology। এই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রণবেন্দু একখানা সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছে—ইহার নাম 'জাতিস্মর ও মৃতের আবির্ভাব'। সাহিত্যজগতে চারুর নাম 'জরাসন্ধ' আর প্রণবেন্দুর নাম 'নচিকেতা'।

আমাদের এই সময়কার সহপাঠীদের মধ্যে আর দুই জনের নাম এখানে বলিতে চাই। ইহাদের একজন ভগবতীপ্রসাদ খৈতান। যে-সকল অ-বাঙ্গালী বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন খৈতানরা তাঁহাদের অন্যতম। এই পরিবারের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—যেমন দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, কালীপ্রসাদ খৈতান, চন্ডী-প্রসাদ খৈতান ইত্যাদি। ভগবতীপ্রসাদ সেরকম কিছু করে নাই, তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড মাধ্যমিক। সে ছিল আদর্শবাদী এবং সে আদর্শবাদ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করার সৎ-সাহসও তাহার ছিল। আমাদের একজন গোবেচারা শিক্ষক ছিলেন ; তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু বলা উচিত হইবে না। সব শিক্ষকেই যে খুব পণ্ডিত হইবেন এমন কেহ প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু এই ভদ্রলোকের জাগতিক কাণ্ডজ্ঞানের খুব অভাব ছিল। তিনি ক্লাসে ঢোকামাত্রই তুমুল হট্টগোল আরম্ভ হইত এবং তাহা কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানেও অনুরণিত হইত। আমরা যাহারা হৈ-হল্লা করিতাম না তাহারাও গল্পগুজব করিতাম ; অধ্যাপক যাহা বলিতেন তাহা শোনাও যাইত না, সেই চেষ্টাও করিতাম না। তবে আমাদের মৃদুস্বরে গল্পগুজবের সম্মিলিত শক্তি তাণ্ডবের নেতাদের গর্জনকে প্রবলতর করিত। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত আমাদের ফার্স্ট বয় হেমেন এবং সে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতেও চেষ্টা করিত, কিন্তু অন্য কাহাকেও থামিতে বলিত না। সেই সাহস ছিল ভগবতীপ্রসাদের। সে একদিন প্ল্যাটফর্মের উপরে উঠিয়া অশিষ্ট সহাধ্যায়ীদের লক্ষ্য করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল। আমার এখনও মনে আছে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য, ভারতবর্ষের গুরুভক্তির আদর্শ, সতীর্থদের আচরণের জঘন্যতা—এইসব কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গেল। অবশ্য ইহার ফল হইল বিপরীত। গুরুমহাশয় ভগবতীপ্রসাদের বক্তৃতা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেব যখন **'ring leader'** বা পালের গোদা পাঁচজন ছাত্রের নাম চাহিলেন, তিনি অন্য চারজনের সঙ্গে ভগবতীপ্রসাদের নামও জুড়িয়া দিলেন। সেই আমলে এই জাতীয় অপরাধে তৎক্ষণাৎ কলেজ হইতে বহিষ্কার ছিল অবধারিত শাস্তি। মনে হয় অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় এই তালিকার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েন। যাহাই হউক, তালিকা বাতিল হইয়া গেল। অন্য চারজনের—ইহার মধ্যে আর একজন নিরীহ ছেলেও ছিল—সঙ্গে ভগবতী-প্রসাদও নিস্তার পাইয়া গেল। আমাদের ক্লাসের প্রত্যেককে চার টাকা করিয়া জরিমানা করা হইল। তখনকার দিনে চার টাকা খুব একটা কম টাকা নয়। সেইজন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। ভগবতীপ্রসাদ এখন প্রখ্যাত সলিসিটর খৈতান কোম্পানীর প্রধান : ছোট-বড় কৌঁসুলী তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে, সুপ্রীম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় হাইকোর্টকে কব্জা করা তাহার কাজ। আইন-আদালতের সঙ্গে সম্মুক্ত অভিজ্ঞ

ব্যক্তিরা বলে, সেই নাকি সবচেয়ে সমৃদ্ধিমান্ ব্যবহারাজীব। আমি অনেক সময় ভাবি এই কালোটাকা-পুষ্ট মামলা-তন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারাজীব তাহার যৌবনের আদর্শবাদ কতটুকু স্মরণে রাখিয়াছে?

হিমাংশু বসুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল আরও ঘনিষ্ঠ। সেও হাইকোর্টের লোক। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্রমিক রোলনম্বর হিসাবে বসিতে হইত; ইংরেজি ক্লাসে সেই নিয়ম মানা হইত। তাহার রোল নম্বর ছিল ১৮, আমার ১৯। ইহা হইতে আমরা অন্যান্য অনেক ক্লাসেও পাশাপাশি বসিতাম, বিশেষ করিয়া পরবর্তী কালে এম-এ ক্লাসে, যেখানে আমরা সংখ্যায় ছিলাম মুষ্টিমেয়। কর্মজীবনে সে হইল ব্যারিস্টার, পরে জজ এবং শেষে প্রধান বিচারপতি। আমার অধ্যাপক জীবনের প্রারম্ভে হিমাংশুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িত আর শেষের দিকে পড়িত তাহার একমাত্র সন্তান অর্চ্চনা। কাজেই তাহার সঙ্গে আমার মোটামুটি যোগাযোগ ছিল। করুণা হাজরা ছিল লিগেল রিমেমব্রানসার; তাহার কাছে শুনিয়াছি, বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি হিসাবে হিমাংশু খুব মর্যাদার সহিত (with dignity) কাজ করিয়াছে। ছাত্র অবস্থায় সবাই তাহাকে জানিত বড়লোকের ছেলে বলিয়া; বাবা বড় অ্যাডভোকেট এবং পরে শ্বশুর হইলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। কিন্তু হিমাংশু খুব অমায়িক, একটু লাজুক ধরনের ছেলে ছিল; প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা অর্থাৎ বৃত্তিধারী ছেলেদের সঙ্গে তেমন মিশিতে চাহিত না। পাশে বসিতাম বলিয়াই বোধ হয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ১৯৪২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় All Indian English Teachers' Conference-এর অধিবেশন আমন্ত্রণ করিল। যদিও আমার সঙ্গে এইসকল সম্মেলন বা সমিতির কোন সম্পর্ক নাই, তবু আমি ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক: সুতরাং অন্যতম কর্মকর্তা। কথা ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদ্মজা নাইডু এই সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন এবং তিনি রাজিও হইয়াছিলেন। কিন্তু কনফারেন্সের দুই দিন আগে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে আর্থ-রাইটিসের ব্যথার জন্য তিনি উপস্থিত হইতে পারিবেন না। রেজিস্ট্রার প্রবীর বসুমল্লিক আমার ছাত্র এবং ইহারা উভয়েই কলিকাতার কায়েত, জানাশোনা থাকা সম্ভব। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, পদমর্যাদায় চীফ জাস্টিস গভর্ণরের ঠিক পরে, আর হিমাংশু নিজেও ইংরেজির ছাত্র। সে বেশ ভাল উদ্বোধক হইবে, প্রবীর তাহার সঙ্গে যোগাযোগ করুক, আমার অনুরোধও যেন যোগ করিয়া দেয়। প্রবীর প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। যোগাযোগ করিয়া বলিল, জজসাহেব তো শুনিয়া খুব অপ্রস্তুত হইলেন; বলিলেন আমার এইরূপ অনুরোধ করা ঠিক হয় নাই। তিনি সাধারণ ছাত্র ছিলেন, সাধারণভাবে এম.-এ. পাস করিয়াছিলেন অনেককাল আগে। এই বিবুধজনের সভার উদ্বোধন? ইহা কখনো তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। আশা করি কোর্টের অবমাননা হইবে না। জজসাহেবরা, বিশেষতঃ আজকালকার জজসাহেবরা একটু বক্তৃতাপ্রবণ। এই তো সেই দিন—একজন প্রধান বিচারপতি সাড়ম্বরে জানাইয়া দিলেন: Don Quixote গ্রন্থের রচয়িতা De Quincey। এই সকল পণ্ডিতম্মন্য জজসাহেবদের মুখরতার পাশে অমায়িক হিমাংশুর সঙ্কোচ স্মরণীয়।

২

লেখাপড়ায় আমার ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বরণীয় তিনজন—হেমেন, গোপীনাথ ও প্রবোধ। হেমেন রায়চৌধুরী ময়মনসিংহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূস্বামী বা জমিদার। সে

নিজে পোষ্যপুত্র ; আগের দুই পুরুষে বিধবা রানীরা জমিদারি চালাইয়াছেন। জমিদারির আয় ছাড়া তাঁহারা প্রচুর টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। হেমেন পরীক্ষায় খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ম্যাট্রিকে পঞ্চম হইয়াছিল, কিন্তু মাধ্যমিক—এখনকার উচ্চ মাধ্যমিক--পরীক্ষায় সকলকে টপকাইয়া প্রথম হইয়াছিল। আমি দ্বিতীয় হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তাহার বেশ ব্যবধান ছিল, আর আই. এস্‌-সি.র ছেলেরা সবাই ছিল আমাদের নীচে—এটা সচরাচর হইত না। হেমেন অংকে অনেকখানি অগ্রসর ছিল। অনুমান করি সে যখন আমাদের সঙ্গে আই-এ পড়িত তখন বাড়িতে সে আরও উঁচু ক্লাসের অংক কষিত। একটা মজা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতাম। প্রতিদিন আমাদের শিক্ষকরা অংক কষিতে দিতেন এবং আমরা খাতা-পেন্সিল লইয়া কষিতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষকের কাছে ধরিতাম। হেমেন ওসব কিছুই করিত না : একটু পরেই খাতায় একটু লিখিত। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই যে সে মনে মনে আঁক কষিয়া ফলটা লিখিয়া রাখিল। তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডও তাঁহার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পাইয়াছিলেন চন্ডীপ্রসাদ খৈতান শতকরা ৯৫। তারপরেই হেমেন ৯১%, দেবপ্রসাদ ঘোষ হেমেনের অপেক্ষা সর্বসাকুল্যে এক নম্বর কম। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বি. এস্‌-সি.তে কত পাইয়াছিলেন শুনি নাই। কিন্তু এম্‌. এস্‌-সি.তে তাঁহার সর্বকালীন রেকর্ড ৯২% অর্থাৎ ৭৩৪। ইহার পর মনোরঞ্জন গোস্বামী ও হেমেন ৮৯%। হেমেন, গোস্বামীর অপেক্ষা সামান্য কম। অংক বাদ দিলেও হেমেন অন্যান্য বিষয়েও কৃতী ছিল--বিশেষ করিয়া ইংরেজি ও সংস্কৃতে। তবে একটা কথা বলিব। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহার ভাল ভাল গৃহশিক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন--ক্ষুরধার বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যাপক প্রস্তুতিই তাহাকে বিরাট সাফল্য আনিয়া দিয়াছে।

হেমেনের সম্পর্কে যাহা সবচেয়ে বেশি মনে আছে—মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে সে চলিয়া গিয়াছে—তাহা তাহার বিদ্যাবত্তা নহে, চরিত্রমাধুর্য্য। তাহার বিদ্যাবত্তাকে আমি ছোট করিতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে আমার মতে, আমার পরীক্ষার্থীজীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা একটি নগণ্য মাসিক পরীক্ষা। পরীক্ষক শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—আমি পঁচিশের মধ্যে চব্বিশ আর হেমেনের সতের' একটা অংক সে একেবারেই পারে নাই আর আমি নির্ভুল-ভাবে করিয়াছিলাম। হেমেন নিজেই তাহার মনস্তাপের কথা বলিয়াছে কেমন করিয়া সে এই আঁকটাকে ধরিতেই পারিল না। আমার আত্মশ্লাঘা কিন্তু আজও অম্লান রহিয়াছে : আমার সচেতন বুদ্ধি অংকে কাঁচা কিন্তু তাহার অন্তরালে নিশ্চয়ই অবচেতন প্রতিভা ছিল : কারণ আমি এমন একটা আঁক কষিয়াছিলাম যাহা হেমেনও ধরিতে পারে নাই! হেমেনকে যে আমরা ভাল লাগিত এবং যেজন্য এখনও তাহাকে স্মরণ করি তাহা তাহার সমতাবোধ। তাহার বাড়িতে যাহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইত তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু স্কুলের সতীর্থ এবং তাহারা লেখাপড়ায় অতি সাধারণ ; এক সুরেশচন্দ্র সেন ছাড়া বোধহয় কেহ প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার মতও নয়। তাহাদের সঙ্গে সে প্রতিদিন বিকালে তাহার বাড়ির ছাদে ফুটবল (ন্যাকড়ার তৈরি) খেলিত ; হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আমিও দুই-একদিন খেলিয়াছি। তারপর খাওয়া দাওয়া—সে খুব সাধারণ ব্যাপার, তাহার বাড়ির মত নয়। আমরা পাঁচ জন যেমন খাই সেইরূপ খাবার সবাই মিলিয়া খাইতাম। আলাপে আলোচনায়, খেলায়, আহারে—কোথাও কেহ তাহার সঙ্গে অপরের সামাজিক, আর্থিক অথবা বিদ্যাবুদ্ধির পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারিত না। কলিকাতায় ফুটবল খেলা দেখার নেশা তখনও যুবকদের মধ্যে প্রবল ছিল। স্বয়ং গোষ্ঠ পাল পালং এলাকার লোক এবং হারাণ সাহা প্রভৃতি অনেক বড় খেলোয়াড় ঐ দিক হইতে আমদানী হইয়াছিল। তখন

অবশ্য লাইন দেওয়ার প্রথা আরম্ভ হয় নাই। চার আনা ও আট আনার টিকেট; ধাক্কাধাক্কি করিয়া ঢুকিতে হইত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সালেও দেখিয়াছি যে আট আনার টিকেটে যে ভিড় হয় তাহা দুর্ভেদ্য নয়; তাহার সাত আট বৎসর আগে ঐ শ্রেণীতে প্রবেশ আরও সুগম ছিল। আর হেমেনের মত প্রথম সারির ভূম্যধিকারীর পক্ষে পশ্চিমের সাদা গ্যালারিও অনধিগম্য হইত না; যদিও তখন সেখানে সাদা মুখেরই ভিড় হইত। হেমেন আমাদের সঙ্গে চার আনার টিকেট কাটিয়া ঢুকিত। ইহার মধ্যেও তাহার বেশ একটা সংযমবোধ ছিল। আমি আর সে যতবার একসঙ্গে ঢুকিয়াছি, সে কখনও আমার টিকেট কাটে নাই। বুঝিতে পারিতাম সে কাহারও আত্মসম্মানবোধকে ক্ষুণ্ণ করিতে চায় না। ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুই-চারবার খেলা দেখিতে গিয়াছি। কিন্তু খেলার মাঠে তাহার সঙ্গে যাওয়া অনেক দিন আগেই ঘুচিয়া গিয়াছে। তবে হেমেনের ঈস্ট বেঙ্গল প্রীতি এবং মোহনবাগান বিদ্বেষ ঈস্ট বেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সোচ্চার হইয়াছিল। ১৯২৪ সালের পূর্বেই একবার শীল্ডে ঢাকা হইতে খুব ভাল এক টীম আসিয়াছিল—ঢাকা উয়ারী ক্লাব—প্রথম রাউণ্ডে মোহবাগানের বিরুদ্ধে তাহাদের খেলা ছিল। হেমেন আর আমি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া খেলা দেখিয়াছিলাম। আমি সানন্দে ভাল খেলা দেখিলাম আর হেমেন সোৎসাহে উয়ারীর পক্ষে হাততালি দিল এবং অল্পবিস্তর চেঁচামেচি করিয়া তাহার বাঙ্গাল-প্রীতি প্রমাণিত করিল।

হেমেন ১৯২৬ সালে এম-এ পাস করে এবং ১৯৩৫ সালে স্বল্পকালস্থায়ী দুরন্ত টাইফয়েড রোগে তাহার মৃত্যু হয়। এই আট-ন' বছর নানা জায়গায় জীবিকাসংস্থানের কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে দেখা হইত। সে এই কয় বছর বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দেখার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সে যে এই বিষয়ে কতটা তৎপর ছিল এবং কতটা সাফল্য অর্জন করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাইলাম তাহার মৃত্যুর পরে এবং—দীর্ঘকাল পরে। তাহার মৃত্যুর পরই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটুটে বেশ এক বড় শোকসভা হয়। রাজা মন্মথ সভাপতি ছিলেন এবং প্রথম বক্তা ছিলেন তদগ্রজ প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী; ইঁহারা সন্তোষের জমিদারিতে হেমেনের শরিক। সভায় ময়মনসিংহের লোকদেরই ভিড়; তাঁহাদের উদ্যোগে সভা এবং তাঁহারাই বক্তা—সরল, আন্তরিক ছোটখাটো অনেক ঘটনার বিবরণসম্বলিত স্মৃতিচারণা করিলেন ওখানকার লোকেরা। আমার মনও স্মৃতি-বিজড়িত, কিন্তু সে অন্য রকমের স্মৃতি। সেই দিন বুঝিলাম এই প্রবাসী জমিদার (অ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ডলর্ড) গ্রামের জনসাধারণের কাছে নিজেকে কত আপনার করিয়া লইয়াছিল। ইহার বহু পরের কাহিনীটি বাস্তবিকই চমকপ্রদ। হেমেন মারা গিয়াছে ১৯৩৫ সালে; তাহার বার বৎসর পর দেশবিভাগ হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্তানে রূপান্তরিত হইয়াছে। সন্তোষের নেতা হইয়াছেন কোন হিন্দু ভূস্বামী নহেন, কট্টর কম্যুনিস্ট মৌলানা ভাসানী। চব্বিশ বছর পর ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হইয়াছে। ততদিনে পূর্ববঙ্গের রাজা-জমিদাররা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। হেমেনের বড় ছেলে অনিলের খেয়াল হইল পূর্বপুরুষের আবাস সন্তোষ দেখিয়া আসিবে এবং আরও কিছুকাল পর সেখানে যাইয়া হাজির হইল। সে পূর্বের রাজগী দেখে নাই এবং সম্পদশালী হইলেও পশ্চিমবঙ্গে সে একজন গৃহস্থ মাত্র। সন্তোষে পঁহুছিয়া পিতৃপরিচয় দিলে সকল শ্রেণীর 'প্রজারা' আসিয়া ভিড় করিলেন এবং যে নজরানা দিতে লাগিলেন তাহা কুনকি দিয়া পরিমাপ করার মত। অনিল সেই অর্থ সাধারণের জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিলে তাহাকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য এক সভা আহূত হয়। সেই বিরাট জনসভায় মৌলানা ভাসানী দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, 'আজ আমি সামন্ততন্ত্রের

প্রতিভূর কাছে হার স্বীকার করিলাম।' এই কাহিনীটি আমি শুনিয়াছি অনিলের মা উমাদেবীর কাছে।

হেমেনের ছাত্রজীবন শেষ হয় ১৯২৬ সালে এবং সে ইহলীলা সংবরণ করে নয় বছরের মধ্যে। তাহার ছাত্রজীবনে যে বিরাট সম্ভাব্যতা ছিল তাহাকে পূর্ণরূপ দিতে কোন চেষ্টা করে নাই। সে ছিল রানীর দত্তকপুত্র ; দুই মেয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি হেমেনকে পোষ্য লইয়াছিলেন যাহাতে জমিদারি অটুট থাকে ; বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। হেমেনের মৃত্যুর পর তাহার বড় ভাগ্নে অশ্বিনী বসুর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দিদিমা যখন দত্তক গ্রহণ করেন তখন আমরা দৌহিত্রেরা খুব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। পরে বুঝিয়াছি, দিদিমা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ইহা করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তি পাইলে আমরা ভ্রাতারা ও মাসতুত ভ্রাতারা নানা পথে যাইতাম ; এই সম্পত্তির আয় উকিল, ব্যারিস্টার, পানীয় ব্যবসায়ী এবং অন্য পাঁচজনে লুটিয়া খাইত। মামার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, রাশভারি ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে সৎপথে রাখিয়াছে ; আমাদের মধ্যে কেহ ব্যবসায়ী হইয়াছে, কেহ আই. সি. এস্. হইয়াছে ; সবাই সৎপথে স্বাবলম্বী হইয়াছে এবং মামার বাৎসল্যে আমরা সকলেই সচ্ছল অবস্থায় আছি।' তবু প্রচুর অবকাশ ও প্রচুর অর্থসামর্থ্য সত্ত্বেও সে যে বিদ্যাচর্চা ছাড়িয়া দিল ইহাতে নিকট-বন্ধুদের মধ্যে আমি ও প্রবোধ ব্যথিত বোধ করিয়াছিলাম।

হেমেনের পর যে সহাধ্যায়ীর কথা বলিব অনেকাংশে তাহাদের মধ্যে বিরাট বৈষম্য। ছাত্র হিসাবে হেমেনের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরীক্ষায় ভাল ফল করা। আমাদের সময়কার দর্শনের ভাল ছাত্র গোপীনাথের প্রধান লক্ষণ ছিল পরীক্ষা সম্পর্কে ঔদাসীন্য। তাঁহার পিতৃদেব কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরীক্ষার রেকর্ড খুব উঁচু রকমের। সে মনে করিয়া থাকিবে উহাই দুই পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু গোপীনাথ আজীবন বিদ্যাচর্চা করিয়া যাইতেছে। ষাট বৎসরের অধিককাল পূর্বে ইডেন হিন্দু হস্টেলে তাহাকে যেমন নিবিষ্টচিত্তে পঠনরত দেখিয়াছি এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে যে প্রথম দিকে আমাদের মত ভাল ফল করে নাই তাহা আমাদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না ; পরীক্ষা ব্যবস্থা যে কত হাল্‌কা তাহাই জানাইয়া দেয়। আমি সাহিত্যের যে শাখার চর্চা করি তাহা দর্শনঘেঁষা—সাহিত্যতত্ত্ব। সেই কারণে দর্শনে খানিকটা পল্লবগ্রাহিতা করি এবং সেই ব্যাপারে সহাধ্যাযী গোপীনাথের শরণাপন্ন হই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে গোপীনাথের অধিকার এত ব্যাপক, দৃষ্টি এত গভীর এবং তাহার ব্যাখ্যা এত প্রাঞ্জল, যে আমাদের কাছে মনে হয় এই দুরূহ বিষয়ের কোন সমস্যাই তাহার কাছে সমস্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় না। অন্যত্র আমি বিনা দ্বিধায় এই মত প্রকাশ করিয়াছি যে বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছেন গোপীনাথ তাঁহাদের পুরোধা। আমি যতটুকু বুঝি পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দর্শনে এবং প্রায় সমস্ত বিভাগে তাহার সমান অধিকার। তবে লজিক বা তর্কশাস্ত্রে তাহার ব্যুৎপত্তি একটু বেশি। ইহা এম-এ-তে তাহার নির্বাচিত বিশেষ বিষয়ও ছিল। কিন্তু আই-এ পরীক্ষায় আমরা অনেকেই—হেমেন, আমি, বিনয়, করুণা—লজিকে লেটার অর্থাৎ ৮০% পাইয়াছিলাম—বিনয় প্রথম হইয়াছিল —কিন্তু গোপীনাথ লেটার পায় নাই।

গোপীনাথ বি-এ ও এম-এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিল। তারপর কি কারণে জানি না, সে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য থীসিস দিয়া কৃতকার্য হইয়াছিল। একসময়ে প্রেমচাঁদ বৃত্তির খুব মর্যাদা ছিল : প্রধানতঃ আশুতোষের ভুল ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেমচাঁদ বৃত্তির মর্যাদা কমিয়া যায় এবং এই বৃত্তি অনেকটা তম্বিরভোগ্যা হইয়া উঠে। আমি নিজেও

এই বৃত্তি পাইয়াছিলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের আখ্যা দিয়াছিলেন সাড়ে বারো টাকার পি. আর. এস.। ইহা লইয়া এত কাড়াকাড়ি-ভাগাভাগি হইত যে জনপ্রতি মাসিক সাড়ে বারো টাকা জুটিত। গোপীনাথ কিন্তু আমাদের মত সাড়ে বারো টাকার পি. আর. এস. নয়। তাহার বেলায় সে একাই ইহা পাইয়াছিল ; শুনিয়াছি যে, যে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন সর্ব পল্লীতে বিচরণ করিয়াছেন, তিনিই ঐ বৎসর এই বৃত্তির বখরা হইতে দেন নাই। কিন্তু গোপীনাথ উহা ছাপে নাই, ঐ বিষয়ে কখনও কোন কথা আমি জিজ্ঞাসাও করিতে ভরসা পাই নাই। সে খুব ধর্মবিশ্বাসী ; শুধু সদাচারী নহে, পূজার্চনাদিতে—মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে থাকে বলিয়া আমি বলি নমাজ পড়িতে—অনেক সময় কাটায়। তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি ; সে বলে, ইহা বিশ্বাসের ব্যাপার, আলোচনার প্রবেশ নিষেধ। আমরা সহাধ্যায়ী হইলেও, আমি চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম (দ্বিতীয় শ্রেণীর) প্রফেসর হিসাবে আর সে প্রবেশ করিয়াছিল অধস্তন লেকচারার হিসাবে। আমি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাজশাহী কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল—সে বলে, 'ছোট সাহেব'—নিযুক্ত হই। আমার বদলির মাস-কয়েক পূর্বে সে ওখানে যায় দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে—এবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রফেসর হিসাবে। বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর স্নেহময় দত্তকে তাহার স্থায়ী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে হয়। এই ব্যাপারে একটা ছক-কাটা ফর্ম আছে ; তাহার মধ্যে কর্মচারীর ব্যক্তিগত ইতিবৃত্ত নিজেকেই পূরণ করিতে হয় ; তারপর উপরিওয়ালা তাঁহার মন্তব্য লিখেন। গোপীনাথ চাকুরির ইতিবৃত্ত দিয়া প্রথম শ্রেণীতে বি-এ ও এম-এ পাস করিয়াছে—ইহা লিখিয়া অধ্যক্ষকে কাগজটা ফেরৎ দিল। পি. আর. এস -এর কথা লিখিতে রাজি হইল না। অধ্যক্ষ সুপারিশের জন্য আরও কিছু মালমসলা চাহিলে সে উত্তর করিল, সে প্রমোশন প্রার্থনা করে নাই। অধ্যক্ষ যদি সুপারিশ করার মত মালমসলা না পাইয়া থাকেন, তাহাকে পুনর্মূষিক করিয়া বদলি করিয়া দিতে পারেন। আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া অধ্যক্ষ লিখিয়া দিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সমান ব্যুৎপন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সরকার সুপারিশ গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর আমরা সবাই প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিলাম। কয়েক দিন পর স্বাধীন ভারতে, বিধান রায়ের আমলে, প্রধান অধ্যাপকের পদ খালি হইল। গোপীনাথেরই সেই পদ পাওয়ার কথা। তখন আবার পাব্লিক সারভিস কমিশনে ইনটারভিউ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। 'ইনটারভিউ' শব্দটি এমন প্রচলিত হইয়াছে, যে ইহার উপযুক্ত প্রতি-শব্দ আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যাহাকে চাকুরি দেওয়া হইবে অথবা যে বা যাহারা প্রার্থী হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে কমিশন এবং কমিশনের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের মোলাকাৎ ; এই মোলাকাৎ মৌখিক পরীক্ষাও হইতে পারে আবার কুশল প্রশ্নও হইতে পারে। যাঁহারা চাকুরি করিতেছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রমোশন দেওয়ার সময় 'ইনটারভিউ' অনিবার্য নয় ; ইনটারভিউ ছাড়া প্রমোশন পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে, এখনও দেওয়া হইতেছে। কিন্তু গোপীনাথের বেলায় বলা হইল, ইনটারভিউ ছাড়া প্রমোশন হইতে পারে না ; আবার গোপীনাথেরও এক কথা—ইনটারভিউ নৈব নৈব চ। কমিশন ও সরকার-বাহাদুর দেনেওয়ালা ; তাহাদের জেদই বজায় রহিল। গোপীনাথ প্রধান অধ্যাপকের পদ পাইল না।

৩

আমার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ছাত্রজীবনে হেমেন সব চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল এবং গোপীনাথ সব চেয়ে বেশি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অধিক মেধাসম্পন্ন ছিল প্রবোধরঞ্জন সেন। সৃজনীপ্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিই ; তাহা চারুর কিছু ছিল, আর ছিল অচিন্ত্য সেনগুপ্তের—যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল এম-এ ক্লাসে। আমি বলিতেছি ধীশক্তির কথা। ইহার চুলচেরা বিভাগ করা সম্ভব নয় ; তবু আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতে পারি, এই ধীশক্তির তিনটি রকমফের দেখা যায় : কাহারও কাহারও অংকের দিকে খুব মাথা পরিষ্কার, কিন্তু অংকের বাহিরে ততটা খোলে না ; কেহ কেহ আবার নৈয়ায়িক বিচার বা দার্শনিক মননশীলতায় খুব ওস্তাদ, কিন্তু তাহার বাহিরে ততটা পটু নহে এবং আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে আলংকারিকদের ভাষায় সহৃদয় বা রসবেত্তা বলা হয় ; ইহারা রসসৃষ্টি করিতে না পারিলেও রসোপলব্ধিতে পারদর্শী। হেমেনের গাণিতিক বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল ; পরীক্ষায় কৃতিত্ব সত্ত্বেও বলিব তাহার রসোপলব্ধির ক্ষমতা ততটা পরিণত ছিল না, আর তাহার দার্শনিক মননশীলতার কোন পরিচয় আমি পাই নাই। আজকাল mathematical logic বা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের মারফতে এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি গণিতজ্ঞ দার্শনিকদের অভ্যাগমে খাঁটি দর্শন খানিকটা বিপর্যস্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিবেন যে, যিনি গণিত অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি দার্শনিক নহেন। কিন্তু গোপীনাথের সঙ্গে mathematical logic সহ অন্য যে-কোন দার্শনিক বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করিলেই তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। গাণিতিক বুদ্ধি যে দার্শনিক প্রজ্ঞাকে কতটা আচ্ছন্ন করিতে পারে রাসেলের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গোপীনাথের রসোপলব্ধি মাধ্যমিক ; কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য রসশাস্ত্রের যেমন সরস ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা গোপীনাথের সাধ্যাতীত। অনেকের রসোপলব্ধির ক্ষমতা পরমাশ্চর্য, কিন্তু সেই পরিমাণে দার্শনিক গভীরতা বা গাণিতিক তীক্ষ্ণতা বা স্পষ্টতা নাই। যাঁহারা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারকনাথ সেনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা এই ন্যূনতার পরিচয় পাইয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্শনিক প্রবণতা ছিল, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চাহিতেন না। এখন স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বোধহয় এইচ. জি. ওয়েলশ বার্ণার্ড শ'য়ের একটা দোষের কথা বলিয়াছেন : indolence about fundamentals, মৌলিক তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে অনীহা। এই দুর্বলতা ইঁহাদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সেই আমলের শিক্ষকদের মধ্যে এক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ইহার ব্যতিক্রম বলিয়া আমার মনে হইত। কিন্তু তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। আশুতোষ পার্টটাইম লেক্‌চারার নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু আমাদের আমলে রবি ঘোষ য়ুনিভার্সিটিতে পড়াইতেন না। আশুতোষের মেধা চিনিবার ক্ষমতার নিদর্শন!

যাক, আমাদের সহাধ্যায়ীদের কথায় আবার ফিরিয়া আসি। আমার সব সময়েই মনে হইত 'প্রবোধে সন্তি ত্রযোগুণাঃ'। প্রবোধের নাম বিস্মৃতির অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি, চরিত্র এবং জীবনকাহিনী আমার মনে এত গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে যে তাহা একটু বিস্তৃতভাবে না বলিলে এই গ্রন্থের অঙ্গহানি হইবে। আমি পালং স্কুল ও তাহার বড় খেলার মাঠের কথা বলিয়াছি, যে মাঠে গোষ্ঠ পাল প্রভৃতি নামজাদা খেলোয়াড়রা খেলিযাছেন। ইহারই দক্ষিণ দিকে একটা খুব প্রশস্ত পরিত্যক্ত বাড়ি ছিল ; ইহাকে ছাড়া-বাড়ি বা ডাক্তারের বাড়ি বলিত। এই ডাক্তারের নাম জানকী ডাক্তার

এবং তাঁহারই দৌহিত্র প্রবোধ। ডাক্তারের কোন ছেলে ছিল না! তিনি মুর্শিদাবাদে ডাক্তারি করিয়া বেশ সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনি নসীপুরে বাড়ি করিয়া পাকাপাকিভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন ; দেশে আর কোন দিন ফেরেন নাই। মেয়ে যোগমায়াকে বিবাহ দিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে এবং তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযোজিত করেন। প্রবোধ জানকী ডাক্তারকে কোন দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না এবং মাতা যোগমায়াকে প্রবোধের ভাল মনে ছিল না। পাঁচ ছেলে ও এক মেয়েকে রাখিয়া যোগমায়ার মৃত্যু হইলে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া যায়। জানকীনাথের বিধবা পত্নী নাতি-নাতনীদের ভার লইয়া জানকীনাথের বাড়িতেই রহিলেন আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ অন্যত্র সংসার পাতিলেন। উভয় পরিবারই এক নসীপুরে বাস করিলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন যোগসূত্র ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের সমর্থকরা কেহ কেহ বলিয়াছেন যে দেবেন্দ্রনাথ আগের পক্ষের সন্তানদেরও প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ইহা সত্য নহে। অনুমান করি দেবেন্দ্রনাথের সেই আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। জানকীনাথ বেশ কিছু ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন ; প্রধানতঃ তাহা বিক্রয় করিয়াই বিধবা পরলোকগতা মেয়ের সন্তানসন্ততিদের প্রতিপালন করিতেন। প্রবোধ মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর ইন্সিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়।

আমি যতদূর জানি প্রবোধের সঙ্গে পিতার বিশেষ সংস্রব ছিল না ; পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সে তৃতীয়। বড় দুই জনের প্রতি তাহার বিশেষ টান ছিল বলিয়া মনে হইত না। বৌদির প্রতি কিছু সহানুভূতি ছিল, তাহার কারণ অন্য। বৌদি বড় ঘরের মেয়ে, কিন্তু মাতৃহীনা। প্রবোধ মনে করিত, প্রথম পক্ষের মেয়ে বলিয়াই পিতা প্রবোধের দাদার মত সম্বলহীন পাত্রের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; স্ত্রী জীবিত থাকিলে পারিতেন না। নিজের মাতামহী যিনি ইহাদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিও বিশেষ প্রীতি বা শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হইত না। তাহার ধারণা ইহা অন্ধসংস্কার ; এক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আর এক সম্পত্তি রক্ষা করা এবং অনেকটা মেয়ের সতীনের প্রতি বিদ্বেষ এই মমতাকে সঞ্জীবিত করিত। ইহা আমার জল্পনা ; সে নিজে এইসব কথা কখনও চিন্তা করিয়াছিল এমন বলিতে পারি না। পরিবারবর্গের প্রতি আমার গভীর প্রীতিকে সে অপরিণত বুদ্ধির নিদর্শন বলিয়া মনে করিত। মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর স্কুলে তাহার মত আর কোন ছাত্র পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সে কোন দিন কোন শিক্ষকের নাম পর্যন্ত করে নাই। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলাম, তখন কলেজের শিক্ষকদের প্রতিও প্রবোধের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভয়ের ভাব দেখি নাই। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া একটা কবিতা পড়াইলেন। আমরা অনেকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিলাম ; প্রবোধও এই লেকচারের প্রশংসা করিল, কিন্তু অন্যভাবে। সে আমাকে বলিল, 'আজ ১২ টাকা মাহিয়ানা দেওয়া সার্থক হইল।' ইহার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট : শ্রীকুমারবাবুর লেকচার তাহার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু অন্য সকলের পড়ান নগণ্য। বি-এ ক্লাসে যখন পড়ি তখন হোম সাহেব যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইতেন তাহাতে সে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; এমন কি সাহেব যে চসার পড়াইয়াছিলেন তাহার দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সে আধুনিককালের ট্যাবার্ড (Tabard) সরাইখানায় কিরূপ গল্প বলা হইতে পারে, তাহার নমুনা লিখিয়া সাহেবকে দেখায় এবং সাহেব খুশি হইয়া তাহা ম্যাগাজিনে ছাপিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের শিক্ষকরা এই স্বাতন্ত্র্য যে লক্ষ্য না করিতেন তাহা নহে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের প্রথম পাঠ ছিল সুইফ্‌টের আইন ও আইনজীবীবিষয়ক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনা। পাঠনান্তে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে ঐ প্রবন্ধ বিষয়ে আমাদিগকে প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমাদের খাতাগুলি ফেরৎ দেওয়ার সময় আমাদের সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু প্রবোধকে তাহার খাতাটা ফেরৎ দেওয়ার সময় বলিলেন, 'তোমার বক্তব্যের সঙ্গে আমি এক মত নই ; তবে তোমার মৌলিকতা আমি অস্বীকার করিতে পারি না।' ঠিক এইরকম মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হোম সাহেব এই তরুণ আন্ডারগ্রাজুয়েটের রচনা ছাপিয়াছিলেন। বি-এ পড়ার সময় লেকচার ক্লাসে ও টিউটোরিয়েল ক্লাসে আমাদের সঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং আমরা তাঁহার সাহিত্য-ব্যাখ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিতাম ; প্রবোধ এই বিষয়ে আমাদের অগ্রণী ছিল, কিন্তু তবু শ্রীকুমারবাবু এই খাপছাড়া ছাত্রকে আপনার করিতে পারেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অধ্যাপনায় কে না অভিভূত হইয়াছে ? একে তো তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ; তার পর প্রতিদিন ক্লাস নেওয়ার আগে তিনি সুচিরপরিচিত বিষয়ে আর একবার প্রস্তুত হইয়া আসিতেন। আমাদের কাজ ছিল তন্ময়, তদ্গতচিত্তে শোনা ও তাঁহার ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা। কিন্তু প্রবোধের বুদ্ধি কখনও স্বকীয়তা হারাইত না। ওথেলোর তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের চারঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার মাঝখানে তিনি বলিলেন, শেক্সপীয়রের যুগে jealousy শব্দ সব সময় আধুনিক কালের মত স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস বুঝাইত না ; অনেক সময় ইহা সাধারণ সন্দেহ বুঝাইতেও প্রযুক্ত হইত। অমনি প্রবোধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই নাটকে ওথেলোর মনোভাব কখন কোন্ জায়গায় এলিজাবেথীয় নিরামিষ সন্দেহ হইতে আধুনিক বিষাক্ত সন্দেহবাতিকে পরিণত হইল ? স্যার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঞ্চিত বিদ্যা ও প্রস্তুতি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তিনি ক্লাস সেই দিন সেইখানেই বন্ধ করিয়া দিলেন এবং এই বিষয়ে আরও চিন্তা করিবার জন্য সময় লইলেন। নানা কারণে আমি এম-এ ক্লাসে অনেক দিন যাইতে পারি নাই। কিন্তু সাধারণতঃ কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব ক্লাস বাদ দিতাম না। ওখানে হৈ-হট্টগোল হইত, কিরণচন্দ্র কম কথা বলিতেন কিন্তু যাহা বলিতেন তাহা জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিত ; আর প্রবোধ প্রায়ই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। এই তর্কযুদ্ধে প্রবোধই সর্বাধিক নৈপুণ্য দেখাইত। ওখানে যে প্রশ্নগুলি উঠিত তাহা সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন। কলেজ ছাড়ার পরে বহু বৎসর ধরিয়া আমি প্রবোধের সঙ্গে এইসকল প্রশ্ন লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছি এবং আমি সেই আলাপ-আলোচনা হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি কিন্তু আমার বক্তব্য তাহার মনে কোন রেখাপাত করিয়াছে এমন মনে হয় নাই। সে যেন আমার যুক্তিকে খণ্ডিত করিয়াই খুশি।

যাহারা স্বকীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহাদের বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণই হউক, তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান অপরিণত থাকিয়া যায়। সে দেখিয়াছিল অন্যে যে যত চেষ্টা করুক, শুধু বুদ্ধির বলেই সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ভাল ফল করিয়াছে। আর ইহাও দেখিয়াছে—ইহা সে আমাকে অনেক বার বলিত—মুর্শিদাবাদের রাজামহারাজারা, ধনী ব্যবসায়ীরা সবাই প্রবীণ উকিল বুদ্ধিজীবী বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরামর্শভিক্ষু। তাহার উপরেও রহিয়াছেন রাসবিহারী ঘোষ, যিনি হাইকোর্টের প্রধান ব্যবহারাজীব। ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে সেও বুদ্ধির জোরেই বাজিমাত করিবে। এইসকল যুক্তি খুবই ছেলেমানুষী : কিন্তু যে শুধু আপন বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে, যে সব বিষয়েই নাস্তিক, ঈশ্বর মানে না, পারিবারিক বন্ধন মানে না, সামাজিক সৌজন্য, রীতিনীতিকে পরিহাস

করে, সে বন্ধির কারাগারে বসিয়া এইরূপভাবে ঊর্ণনাভের জাল বুনিতে থাকে এবং ক্রমে কঠিন বাস্তবের আঘাতে সেই জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। প্রবোধ প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ হইয়াছিল এবং তাহার উপরে ছিল দুঃখহরণ চক্রবর্তী ; করুণা হাজরা ও আমি এবং ঠিক নীচে হইয়াছিল হেমেন রায়চৌধুরী। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হেমেন প্রথম হয়, আমি দ্বিতীয় এবং প্রবোধ তৃতীয়। এই পরীক্ষার পর সে আমাকে বলিল যে আমি যে-বিষয়ে বি-এ পড়িব, সেও সেই বিষয়ে পড়িবে। ইহার কারণ যাহা বলিল তাহা খুব চমৎকার। দুঃখহরণ, করুণা ও হেমেনকে সে একবার হারাইয়াছে, কিন্তু আমি দুইবারই তাহাকে পরাস্ত করিয়াছি। বার বার তিনবার ; তৃতীয় দফায় সে আমাকে পরাজিত করিবেই। তাহার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম।

নিয়তি তাহার উপর সদয় ছিল না। বি-এ পরীক্ষায় সে ও আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাই। আমি প্রথম, সে তৃতীয় ; কাজেই যে পরীক্ষায় আমাকে পরাজিত করিয়া সে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল সেই পরীক্ষায় তাহার ও আমার মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়া গেল। ইহার পর এম-এ পরীক্ষার জন্য সে একেবারেই কেয়ার করিত না। সে তো চাকুরি করিবে না ; ওকালতি করিবে। সুতরাং এম-এ'র জন্য সে যথাযোগ্যভাবে প্রস্তুত হইল না। ১৯২৬ সালে আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল ; নানা কারণে আমি স্থির করিলাম সেইবার পরীক্ষা দিব না। সে কতকগুলি বই—যেমন জেন অস্টেনের উপন্যাস—আমাকে পড়িয়া তাহাকে সারাংশ বলিতে বলিল। কিন্তু তাহার আত্মবিশ্বাস এত বেশি ছিল যে সে কখনও মনে করে নাই সে প্রথম শ্রেণীতে পাস করিবে না। ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিন জন প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে ; সে—বোধহয় ৭ নম্বরের জন্য—দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছে। ইহার কয়েক মাস পরেই আমি এম-এ পাস করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে চাকুরি পাইয়া চলিয়া গেলাম। ১৯২৮ সালে তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে ; সে একটা মেসে থাকে এবং আলিপুরে ওকালতি করে। ঐ সালেই ৩১শে ডিসেম্বর আমি প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য থীসিস দিই, কিন্তু তাহাকে বা অন্য কাহাকেও কিছু বলি নাই। ঈস্টারের পক্ষকাল ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়াছি (১৯২৯) ; তাহার কাছেই প্রথম শুনিলাম যে কয়েক দিন পূর্বে পরীক্ষক বোর্ডের মিটিং হইয়া গিয়াছে এবং আমি সফল প্রার্থীদের অন্যতম। তাহার জীবনেও একটা পরিবর্তন আসিতেছিল ; আমি তাহা তখন আঁচ করিতে পারি নাই।

সেই আমলে দিল্লীতে সব চেয়ে বড় অবকাশ ছিল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত—পুরো তিন মাস। জুলাই মাসে (১৯২৯) কলিকাতায় আসিয়া শুনি আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকুরি হইয়াছে ; সুতরাং দিল্লীর পাট এখান হইতেই গুটাইলাম। যতদূর মনে হয় প্রবোধ তখন কলিকাতায় ছিল না। অধ্যাপক প্রফুল্ল-চন্দ্র ঘোষের সুপারিশক্রমে সে রাজদরবারে শিক্ষকের চাকুরি লইয়া নেপাল চলিয়া গিয়াছে। এতকাল সে বুদ্ধির বলে বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও রাসবিহারী ঘোষ হইবার সংকল্প করিয়াছিল ; তাহার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

এই পরিবর্তন বা ওলট-পালটের মধ্য দিয়া মনুষ্যজীবন ও চরিত্রের রহস্য ধরা পড়ে। হয়ত অনেকের জীবনেই এই মোহভঙ্গ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রবোধ তো অনেকের মধ্যে একজন নয়! তাহার মত ধীশক্তিসম্পন্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠ লোক আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। সেই জন্যই তাহার জীবনের অনুচ্চারিত ট্র্যাজেডি আমার মনকে এত নাড়া দিয়াছে এবং সেই জন্যই ইহা সবিস্তারে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া সে

দেখিতে পাইল পরিবারের দায়িত্ব অনেক কিন্তু আয়ের অঙ্ক শূন্য এবং সবাই তাহার মুখাপেক্ষী। মাতামহীর জমি একখানা একখানা করিয়া সব বিক্রি হইয়া গিয়াছে। দাদা বেকার, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান : ছোট দুই ভাই পাঠরত ; একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। সে বড় উকিল দেখিয়াছে ; তাহাদিগকেও যে অনেকদিন প্রতীক্ষা করিতে হয় তাহা ভাবিয়া দেখে নাই এবং অপর কেহ বলিলেও সেই কথায় কান দেয় নাই। পারিবারিক সামাজিক সম্বন্ধের দৃঢ় অলক্ষ্য শিকড় নিহিত আছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। বুদ্ধি তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু হৃদয় তাহাকে শিরোধার্য করিয়া রাখিয়াছে। প্রবোধ দাদার অক্ষমতা লইয়া আমার কাছে কৌতুক করিয়াছে এবং দাদার জমিদার শ্বশুর যে কন্যার মাতৃহীনতার সুযোগ লইয়াই এইরূপ পাত্র নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে শুনাইয়া দিয়াছিল ; কিন্তু এই অসহায় ভ্রাতৃজায়া ও তাঁহার অপোগণ্ড শিশুদের দায়িত্ব যে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। বাস্তবের সংঘাতে যেদিন তাহার অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিল সেইদিন তাহার বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় পরাজয় স্বীকার করিয়া কোথায় পলায়ন করিল এবং সে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, নিজের উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নেপালের রাজদরবারে আশ্রয় লইল। সেই আমলে অর্থাৎ রাণাশাহীতে ইচ্ছা করিলে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিত। কিন্তু তাহার নীতিবোধই তাহাকে অধিক অর্থোপার্জনের পথ হইতে নিবৃত্ত করিত এবং একাধিক সূত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি, তাহার নির্লোভ ঋজু চরিত্রের জন্য রাজারানীদের কাছে সে বিশেষ মর্যাদা পাইত। তাহা হইলেও চারটি স্কুলের ছাত্রের পড়া দেখিয়া সামন্ত ব্যবস্থার বিরাট শোষণযন্ত্রের সাক্ষী হইয়া সে জীবন কাটাইবে কেমন করিয়া?

নেপালে যাইয়া পারিবারিক সমস্যার সমাধান হইল এবং পার্বত্য প্রকৃতির শোভা তাহাকে মুগ্ধ করিল। তাহার চরিত্রের মধ্যে যে বেপরোয়া উন্মার্গগামিতা ছিল তাহাও পর্বতারোহণে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইল, কিন্তু এই পরিবেশে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দম আটকাইয়া আসিল। এই কারণে তাহার মনের ভিতরে একটা প্রবল আলোড়ন-আন্দোলন হইয়া থাকিবে যাহা তাহার সচেতন বুদ্ধি ধরিতেই পারে নাই। যাহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে পারে তাহারা গ্রন্থপঞ্জী রচনা করে না। তাহারা বাস্তবিকই কিছু নূতন তথ্য, নূতন ভাবনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা আজকালকার সস্তা পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জীতে সমৃদ্ধ রিসার্চ হইতে ভিন্ন। আমাদের দেশে যে রিসার্চ আজকাল খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ইউরোপে সেই জাতীয় রিসার্চের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এ. সি ব্র্যাডলি খেদ ও বিদ্রূপের সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন : Research, though toilsome, is easy ; imaginative vision, though delightful, is difficult'। কথাটা প্রণিধানযোগ্য : আমি শুধু ইহাকে স্পষ্টতর ও প্রশস্ততর করিবার জন্য একটি কথা—intellectual quest—যোগ করিয়া বলিতে চাই 'পরিশ্রমসাপেক্ষ হইলেও রিসার্চ সহজসাধ্য : সৃজনাত্মক দৃষ্টি ও বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা আনন্দদায়ক হইলেও দুরধিগম্য।'

নেপালের নির্জনতায় প্রচুর অবকাশে প্রবোধ প্রেমচাঁদবৃত্তির জন্য একটি নিবন্ধ রচনা করে ; দার্শনিক মননশীলতায় ও সাহিত্যিক সৌন্দর্যে ইহার তুলনা বিরল। ইহার বিষয় ছিল 'ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা'। লিখিবার সময় আমি ইহা দেখি নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করার পর আমি ও বন্ধুবর তারাপদ মুখার্জি ইহা পড়িয়া চমৎকৃত হই ; ইহা এ. সি. ব্র্যাডলি বা তদগ্রজ এফ. এচ. ব্র্যাডলির রচনার সমগোত্রীয়। বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন নির্মলকুমার সিদ্ধান্তকে। তখন এবং পরবর্তীকালেও পঠন-পাঠন জগতে ইঁহার নাম-ডাক খুব বেশি। আমাদের কালের কথা যখন বলিতেছি, তখন ইঁহার কথাও বলিতে

হয়। সিদ্ধান্ত মহাশয় ১৯১৩ সালে বি-এ অনার্স এবং ১৯১৫ সালে এম-এ পরীক্ষায় উভয়ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেন এবং কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করেন। তখন তাঁহার তেমন কোন নিজস্ব পরিচয় ছিল না। পিকউইক পেপার্সের মিঃ লিও হান্টারের মত স্ত্রীর নামেই তাঁহাকে আমরা জানিতাম : তিনি সুগায়িকা চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের স্বামী। ইহার পর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যান এবং সেইখানে দুই পরীক্ষায়ই অর্থাৎ ট্রাইপোসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ফার্স্ট ক্লাস পান। দেশে ফিরিয়াই তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরেজির পণ্ডিত-সার্বভৌম বনিয়া গেলেন! দক্ষিণ ভারতেও হইতেন কিন্তু সেখানে আবার অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস আয়াপান পিল্লাই ছিলেন। ইহা ঔপনিবেশিকতার প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়'-গ্রন্থের উপজীব্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের একটা অনুসিদ্ধান্ত আছে। সাম্রাজ্যবাদ প্রজাবর্গের বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিদেশী ডিগ্রিধারীর মূল্যনির্ধারণ করার ক্ষমতা দেশী লোকেরাও হারাইয়া ফেলে। ইংরেজির যেখানে যে পরীক্ষা হউক, যেখানে যে বড় চাকুরি হউক সিদ্ধান্তমহাশয়ের সিদ্ধান্ত বেদবাক্য। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে যে যৎসামান্য লিখিয়াছেন তাহা অতি তুচ্ছ ; একখানা বই লিখিয়াছিলেন মহাকাব্যের কাহিনী সম্পর্কে এবং তাহা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষার অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত হইয়াছিল। ইংরেজি সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে সেই রচনার কোন সম্পর্ক নাই। যাহা হউক, এই ব্যক্তিই প্রবোধের থীসিসের পরীক্ষক হইলেন এবং কিছুই না বুঝিয়া তিনি ইহা খারিজ করিয়া দিলেন। এই সারবান রচনাটি প্রবোধ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকিবে। তাহা না হইলে আমি ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতাম। এই প্রত্যাখ্যানের সংবাদ প্রবোধ নেপালে বসিয়া শুনিল ১৯৩৭ সালে।

আমি ঠিক সময়টা বলিতে পারিব না, তবে এই রকম সময়ই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সে পিতৃশ্রাদ্ধ করিল না। নেপাল এখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' (secular) রাষ্ট্র হইয়াছে কিনা জানি না। কিন্তু তখন ইহা ছিল পুরোপুরি 'হিন্দু রাজ্য'—প্রতি পদে আচার, সংস্কার, পাল-পার্বণ, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ। কেহ কেহ অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধ না করার জন্য প্রবোধকে অনুযোগ করিলে সে জবাব দিল, পিতার প্রতি তাহার কিছু শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই পিতাকে এই প্রহসন সে নিবেদন করিবে না। আমার মনে হয় সংসারের দায়—যাহা সে এতকাল অস্বীকার করিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার মধ্যে যে পরাজয় নিহিত ছিল তাহাও তাহাকে পীড়িত করিয়া থাকিবে। তাহার বিমাতার এক ছেলে ছিল ; সে বিবাহও করিয়াছিল। সেই বৈমাত্রেয় ভাই কিছুদিন পর মারা যায় এবং বিধবা শাশুড়ী-বৌয়ের দায়িত্বও অনেকটা প্রবোধের উপরে বর্তায়। এইসব দায়িত্ব যে সে গ্রহণ করিল ইহা যতটা পীড়াদায়ক ততোধিক পীড়াদায়ক হইল এই যুক্তিহীন পরার্থপরতার জন্য নিজের সুচিরপোষিত অভীষ্টকে জলাঞ্জলি দেওয়া। এইসকল যুক্তি-বিপরীত কর্ম এই নাস্তিকের গহনতম প্রদেশে ঝড় তুলিয়া থাকিবে যাহার সন্ধান সচেতনবুদ্ধি রাখিত না। আমি ঈস্থেটিক আলোচনা ভাল-বাসিতাম আর এই ক্ষেত্রে তাহার জুড়ি আমি আজও দেখি নাই। আমার সঙ্গে যখন দেখা হইত তখন content ও form, আর্টের সংজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হইত এবং বাহিরের কোন বাধা না আসা পর্যন্ত তাহার নিবৃত্তি হইত না। এই পরিস্থিতিতে একটা ঘটনা ঘটিল যাহার ধাক্কা প্রবোধের অন্তরাত্মা সামলাইতে পারিল না। তাহার হেফাজতে চারটি 'রাজকুমার' ছিল। জ্যেষ্ঠের বয়স যখন সতের তখন তাহার বিবাহ হয় এবং বোধহয় বছর-খানেক পরে অল্পদিনের অসুখে তাহার মৃত্যু হয়। এবং যে বালিকাবধূ রাজৈশ্বর্যের স্পর্শ-মাত্র পাইয়াছিল তাহার ভাগ্যে রহিল সনাতন হিন্দুধর্মের অমোঘ নিয়মানুসারে আজীবন

ব্রহ্মচর্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ। প্রবোধের মনে সবচেয়ে আঘাত দিল রোগীর প্রতি অবহেলা। রাজপরিবারের প্রয়োজনে নেপালে কিছু কিছু পাস করা বাঙ্গালী ডাক্তার থাকিতেন ; তন্মধ্যে আমার শ্বশুরমহাশয় অন্যতম। আমি দেখিয়াছি, অবকাশ পাইলেই তদানীন্তন মহারাজের অনুমতি লইয়া রাজার আত্মীয়েরা কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিতেন। এই ক্ষেত্রে অবশ্য দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করিয়া কলিকাতা আসা সহজ হইত না, হয়ত সম্ভবও হইত না। কিন্তু প্রবোধ দেখিল যে অসুখ যেমন বাড়িতে লাগিল, ততই চিকিৎসার পরিবর্তে পূজার্চনার দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হইল এবং ডাক্তার-কবিরাজের স্থান গ্রহণ করিলেন দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত। ইহা 'বুদ্ধিজীবী' শিক্ষকের বুদ্ধিকে আঘাত করিল এবং হৃদয়কে মথিত করিল। সে কয়েকদিন এই ট্র্যাজেডির কথা ভাবিল। ওখানকার রাজপুরুষেরা তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত ব্যবহার করিতেন। সে ছেলের বাবাকে গিয়া বলিল, 'আপনি তো ছেলেকে হত্যা করিলেন।' সেই শোকবিহ্বল পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'আমার এই দুঃসময়ে আপনি আমাকে পুত্রহন্তা বলিয়া গালি দিতেছেন! আমি যদি পুত্রহন্তা হই, তবে তো আপনিও হত্যার অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন।'

ইহার পর সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল এবং সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিল। ঐ রাণাপরিবার তাহার প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা প্রবোধের ওখানকার—এবং আমার আগেকার বন্ধু নৃপেনবাবুকে সঙ্গে দিয়া যথেষ্ট অর্থসহ তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আমিই তাহার ভার লইলাম। নৃপেনবাবুর সঙ্গে ও প্রবোধের সঙ্গে কথা বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই রকম। ঐ রাজপুরুষের সঙ্গে কথা বলিয়া বাড়ি আসিয়া সে আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিতে লাগিল এবং নানা অলীক ছায়াছবি তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। সে পিতৃশ্রাদ্ধ করে নাই ; সমসেরজঙ্গ বাহাদুর রাণা বলিয়াছেন সেও murder করিয়া থাকিতে পারে। তবে সে কি পিতৃহন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তাহার আর কিছু মনে নাই। সে যখন কলিকাতা আসিয়াছিল, তখন তাহার শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল ; নৃপেনবাবু অন্তরালে আমাকে বলিলেন যে ইহা আত্মহত্যার চেষ্টার ফল। যাহা হউক, এখানে খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর একদিন আমার সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে পুনরায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু একরাত্রির বেশি তাহা থাকে নাই। ধীরে ধীরে সে পুনরায় সুস্থ হয় এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সুপারিশে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাকে আশুতোষ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেন। এখানে বহুদিন কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করে এবং পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

শেষ পর্যন্ত চাকুরি ঠিক মত করিলেও তাহার এই নবজীবনে আগের মানুষটিকে আর ফিরিয়া পাই নাই। সেই উগ্র আত্মবিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; কেবলই অনুনয় করিয়া বলিত, সে যাহা বলিল তাহার মধ্যে কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে আমি যেন কিছু মনে না করি। বুদ্ধির সেই তীক্ষ্ণতা চলিয়া গিয়াছিল—ইহা আমি এবং তর্কযুদ্ধে তাহার অন্যতর প্রতিপক্ষ গোপীনাথ সব সময় লক্ষ্য করিতাম ; সেই সাহিত্যবিশ্লেষণশক্তি, সেই রসোপলব্ধি তাহাও কমিয়া গিয়াছিল। যে ছিল ঘোর নাস্তিক, সে এখন হইল শাস্ত্রবিশ্বাসী এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাতা। এই পরিবর্তন সে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারিয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি আর তাহাকে ঘাঁটাই নাই। গীতা তাহার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল ; আমাকে বলিত, অন্য কিছু করিবার না থাকিলে, নির্জনে গীতা আবৃত্তি করিয়া সময় কাটায়। যেসব তুচ্ছ সমস্যা লইয়া সে আমার কাছে আসিত তাহা সবই ভাইপো-ভাইঝিদের, কিন্তু তাহাদের জন্য সমস্ত উৎসর্গ করিলেও তাহাদিগকেও সে একান্ত অন্তরঙ্গ করিতে পারে নাই। একটা নিত্যকর্ম ছিল : অপরাহ্ণ চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে

গোলদীঘিতে একটা বিশেষ জায়গায় কয়েকটি লোকের কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা ; আমাকে বলিয়াছে যে এই ব্যাখ্যা যাহারা শুনিত তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। এই কথা যখন বলিত, তখন যেন মনে হইত একটা চাপা হাসি খেলিয়া যাইতেছে ; তবে কি তাহার গীতা-আবৃত্তি, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মব্যাখ্যার মধ্য দিয়া যৌবনের নাস্তিকতা উঁকিঝুঁকি দিত? তাহার মত ধীমান্ লোক আমি আর দেখি নাই। কিন্তু তাহার পরিণতি হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে বুদ্ধি মানুষের প্রধান অস্ত্র হইলেও শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নাই। বার্ণার্ড শ' যেন কোথায় বলিয়াছেন, 'The man who listens to reason is lost'.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেন্সী কলেজ—৩

অধ্যাপকমণ্ডলী

১

প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য শিক্ষকদেব সঙ্গে পরিচয়—শুধু মুখের পরিচয় নয়, মনের সম্মিলন। তখন স্যার আশুতোষ ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিযাছেন অর্থাৎ ১৯১৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ক্লাস তুলিয়া লইয়াছেন আর আমি ভর্তি হইয়াছি ১৯২০ সালে। তবে কলেজের মর্যাদাহানি হইলেও তখনও লেখাপড়ার মানের অবনতি আরম্ভ হয নাই। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্তিত শাসন-সংস্কারের ফলে নূতন সাহেব-প্রফেসর আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাহেবী ঢঙ আর সাহেবী ডিসিপ্লিন দুই-ই ছিল। কোন অধ্যাপক ধুতি পরিতেন না ; প্রফেসরদের ঘরের সামনে তিনজন বেয়ারা বসিয়া থাকিত এবং শুধু তাহাদের হাত দিয়া কাগজের স্লিপ পাঠাইলে অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলা যাইত ; প্রফেসর বাহিরে আসিয়া দেখা করিতেন, ছাত্রদের ঘরে ঢোকার রেওয়াজ ছিল না। একটা প্রবাদ ছিল যে এই তিনজনের যে প্রধান—তাহার নাম যদু—সে প্রফেসরদের উপরেও তদারকি করিত, তাঁহারা ৭ মিনিটের দ্বিতীয় বেল পড়ামাত্র ক্লাসে যান কিনা ইহার প্রতি নজর রাখিত। প্রিন্সিপ্যালের বেয়ারা গুরুপ্রত্রীর বেশ একটা মানানসই গাম্ভীর্য ছিল। আর খুব দাপট ছিল বড়বাবু (হেড অ্যাসিষ্টান্ট) আর বার্সারের বড়বাবু অর্থাৎ অ্যাকাউন্টেন্ট অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। ইঁহাদের ডিঙ্গাইয়া তবে তো প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ও বার্সার সাহেবের সঙ্গে কথা বলা যাইত। প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো তবু সব দিকে নজর রাখিতেন, কিন্তু বার্সার ষ্টার্লিং সাহেব খুব সদাশয় হইলেও কোন কিছুতেই মাথা ঘামাইতেন না। তিনি অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষকে বলিয়াছিলেন, 'You see Atulbabu prepares papers in a day which I take three days to sign!' ৯ বছর পর ১৯২৯ সালে যখন অধ্যাপক হইয়া প্রবেশ করি, তখন সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত বড়-বাবুর সঙ্গে একদিন প্রফেসরদের ঘরে দেখা হয়। তিনি হাসিমুখে বলিলেন, 'এখন প্রফেসরকে আর "তুমি" বলা যায়?' দেখিলাম পূর্বের বড়বাবুর অন্য রূপ ; কালো একটু বড় পাড়ের ধুতি, কলপ দেওয়া কালো চুল, বাঁধান দন্তরুচি। শুনিলাম তিনি অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি সৌভাগ্যেব অধিকারী হইয়াছেন—'রায়সাহেব' উপাধি আর দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যা।

আমাদের আমলে সাড়ে-চারজন খাঁটি সাহেব ছিলেন। অর্থাৎ জিওলজিক্যাল সার্ভে হইতে ধার দেওয়া একজন সাহেব সপ্তাহে কয়েকটি বক্তৃতা দিতেন, সেইজন্য তাঁহাকে আধজন বলিলাম। আর ছিলেন ফিজিক্সের প্রধান ডক্টর হ্যারিসন। ইনি আগে বছর-সাতেক অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর ১৯২০ সালে পুনরাগমন করিয়া ১৯২২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের আমলে তাঁহার তেমন নামডাক ছিল না ; ছাত্রেরা ঈষৎ বিদ্রূপের সহিত বলিত যে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের (জুরিখ) হইতে ডক্টরেট পাইয়াছিলেন যে-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম ডক্টর—অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। আর রহিলেন অধ্যক্ষ ব্যারো, অধ্যাপক ষ্টার্লিং ও হোম। ইঁহারা তিনজনই ইংরেজির অধ্যাপক। ব্যারো অধ্যক্ষ হিসাবে খুব নীতি-

নিষ্ঠ এবং সহৃদয় হইলেও বাহিরে বেশ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। ইনি পূর্বে ঢাকা কলেজে অধ্যাপক ও চাটগাঁ কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ঢাকা বিভাগের স্কুল পরিদর্শকও ছিলেন। আমি যখন পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হইয়া আসি, তখন আবার তিনিই অধ্যক্ষ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি ছাত্র ছিলাম এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আমি অধ্যাপনা আরম্ভ করি। উভয় আন্দোলনের সময়ই তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় স্থিরচরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠতা সকলের মনের উপর রেখাপাত করে। তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয় সেখানে একটা মানপত্র দিয়াছিল সেইসব ছাত্রেরা যাহাদিগকে তিনি নানা সময়ে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ('expelled students)। আমি যখন চাকুরিতে প্রবেশ করি তিনি আমার নিয়োগের বিরোধিতা করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে কয় দিন তাঁহার সঙ্গে কাজ করিয়াছি তিনি আমার প্রতি আনুকূল্য করিয়াছিলেন এবং অস্থায়ী কর্মচারীর চাকুরিতে যাহাতে ছেদ না পড়ে সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। সেই আমলে প্রিন্সিপ্যালের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল ; ব্যারো সাহেবের এই দাক্ষিণ্য আমি আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়াছি।

ব্যারো ছিলেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক আর ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক ষ্টার্লিং ছিলেন অন্য ধাঁচের মানুষ। ইনি ছিলেন অবিবাহিত ; ভাল পোশাক পরিতেন ; অনেক সময় কোটের বোতামের ফাঁকে ফুল গুঁজিয়া আসিতেন। খুব হাসিখুশি লোক ; মনে হয় জীবনটাকে শিস্ দিয়াই কাটাইয়া দিবেন। ইনি, হোমসাহেব ও অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ সমবয়সী এবং ইঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। অধ্যাপক ঘোষ নাকি একদিন হোমসাহেবকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের উভয়ের চুল সাদা হইয়া আসিল, কিন্তু তাঁহাদের সমবয়সী ষ্টার্লিং-এর চুল একেবারে কাঁচা। হোম উত্তর করিলেন, 'That's because Sterling never thinks !' কিন্তু এই আপাত-তরল লোকটি প্রেসিডেন্সী কলেজকে যতটা ভালবাসিতেন খুব কম লোকই ইহাকে তেমন ভালবাসিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকদের একটা ছোটখাট ছাত্রভাণ্ডার ছিল ; অধ্যাপকরা সাধারণতঃ মাসিক একটাকা চাঁদা দিতেন · দুই একজন দুই টাকা করিয়া দিতেন। অধ্যাপক হিসাবে কলেজে ঢুকিয়া দেখি তিনি বেশ একটা মোটা টাকা বৎসরান্তে এই ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিতেন। এই হাল্‌কা মানুষটির দরদী মনের পরিচয় পাইয়া সকলের মনেই বিস্ময় হইত। যে-সব ছাত্রেরা বিলাত যাইত, তাহারা অনেকেই ষ্টার্লিং সাহেবের সঙ্গে দেখা করিত, কারণ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের স্মৃতিচারণা করিতে ভালবাসিতেন। একটা ছোট ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চাশের দশকে, আমার চেয়ে বছর-দুয়েকের জুনিয়র ইতিহাসের ছাত্র সুকুমার ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সী কলেজের রেজিস্টার একখণ্ড হাতে করিয়া আমার কলেজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। সুকুমারবাবু বোধহয় দিল্লীতে U. G. C.-র কর্মচারী ছিলেন। লণ্ডনে পড়ার সময় ষ্টার্লিং সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বেশ যোগাযোগ ছিল। ১৯২৭/২৮ সালে ষ্টার্লিং সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। যদিও প্রেসিডেন্সী কলেজের রেজিস্টার সম্পূর্ণভাবে প্রিন্সিপ্যাল ষ্টেপলটনের পরিকল্পনা ও কীর্তি, তবু ইহার সমাপ্তির সময় ষ্টার্লিং সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অন্ততঃ ইহার পুরোভাগে একটা ছবি আছে—যেখানে সাহেব করণিক ও চাপরাশী পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। বিলাতে বসিয়া ঐ ছবি তিনি মাঝে মাঝে দেখেন, কিন্তু অনেকের নাম ও মুখ ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক করিয়া লইবার জন্য সুকুমারকে লিখিয়াছেন। তখন ইহাদের অনেকেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। কিন্তু সাহেব তাঁহার স্মৃতিতে ইহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে চান। আমি সুকুমারবাবুর প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে এই সাহেবের পরমাশ্চর্য প্রেসিডেন্সী কলেজ-প্রীতিতে বিস্মিত ও অভিভূত হইলাম। শুনিলাম মৃত্যুর পূর্বে

তিনি উইল করিয়া তাঁহার সম্পত্তির সিংহভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজের (দরিদ্র) ছাত্রভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

আমাদের আমলে ইংরেজির দুইনম্বর অধ্যাপক হোমসাহেব ব্যারো ও ষ্টার্লিং হইতে খুব ভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন ; অন্ততঃ আমরা ছাত্ররা তাঁহাকে অন্যভাবে দেখিতাম। ব্যারো ও ষ্টার্লিংকে কেহ পণ্ডিত বা শিক্ষক হিসাবে দেখিত বলিয়া আমার মনে হয় না। ব্যারো সাহেবের ইংরেজি রচনা বেশ সুললিত ও সুখপাঠ্য ছিল, কিন্তু তাহা গুরুত্ব দেওয়ার মত নয় ; চার্লস ল্যাম্বের অনুকরণ করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার লিখিত কলেজ ম্যাগাজিনের মুখবন্ধ হইতেছে সেইজাতীয় রচনা যাহা রচনাপদবাচ্য নয় (Writing that is no writing)। একটি প্রবন্ধ অবশ্য ব্যতিক্রম—After visiting Agra। বিপত্নীক লেখক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন স্থপতিশিল্প শোকপ্রকাশের বাহন হইতে পারে কি না। ইহা ক্ষণস্থায়ী প্রশ্ন মাত্র ; গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা বা তাজমহলের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের কোন চেষ্টা ছিল না। আমরা ১৯২২-২৩ সালে থার্ড ইয়ার ক্লাসে শেক্স-পীয়রের ওথেলো পড়ি। পরের বছর ইহা পড়াইবার ভার নেন প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো। আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার পড়া শুনিতে চাই এবং বলি ঐ সময় আমার কোন ক্লাস থাকে না। তিনি আমাকে বলিলেন, প্রথমে তিনি কেবল অর্থ বলিয়া যাইবেন, তাহা যে-কোন টীকাসম্বলিত বইয়ে পাওয়া যাইবে ; পরে যখন তিনি সাধারণভাবে নাটকের উপর মন্তব্য করিবেন, তখন ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহার ক্লাসে আসিতে পারি। সেইদিনকার আলাপের পর তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা রহিত হইয়া গেল। আমাদের আমলে—পূর্বে কি করিয়াছিলেন জানি না—ষ্টার্লিং বি-এ'র প্রশ্নকর্তা ছিলেন ; কাজেই তিনি বি-এ ক্লাসে পড়াইতেন না। আমাদের আই-এ ক্লাসে বাইবেল পড়াইতেন। সাহেব প্রথম দিনই বলিয়া লইলেন যে আমরা বাঙ্গালীরা গদ্যও সুর করিয়া (Sing-song) পড়ি ; ইহা ইংরেজি গদ্য ও অনেকটা পদ্য পাঠেও বেমানান। সেই আমলে রোল নম্বর অনুসারে বসিতে হইত। আমাদের প্রত্যেককে চার লাইন করিয়া পড়িতে হইত ; কেহ একটু সুর দিতে গেলেই সাহেব তাহাকে লইয়া হাসাহাসি করিতেন। নিজে নিজের ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন ; ইহা বোধ হয় অত্যুক্তি নয় ; কারণ অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষও তাঁহার উচ্চারণমাধুর্যের প্রশংসা করিতেন। শুনিয়াছি তিনি এম-এ.-তে 'বি' গ্রুপের —অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের—শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাহার ছাত্র এত কম থাকিত যে তিনি কাহাকে কি পড়াইয়াছেন জানি না। আমি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলাম বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, মানপত্র লিখিতে হইলে প্রথমে আমার ডাক পড়িত। ষ্টার্লিং সাহেবের বিদায়ের সময়ও আমাকে মানপত্র লিখিতে হইয়া-ছিল। তখন তাঁহার বদান্যতার বিষয় আন্দাজ করিতে পারি নাই। কি লিখিব ভাবিয়া বিব্রত হইয়াছিলাম ; যাহা হউক টুকিটাকি সংগ্রহ করিয়া খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম সাহেব খুশি হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ একটা উল্লেখে। যদি তাহা সত্য হয়—তাঁহার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ হয় নাই—তাহা হইলে বলিব সাহেব বাস্তবিকই খুব সদাশয়।

পূর্বেই বলিয়াছি হোমসাহেব ছিলেন আর-এক ধরনের মানুষ। তিনি সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল, তীক্ষ্নদৃষ্টি, সমালোচনাপ্রবণ। তিনি অল্পবয়সে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়াই বিলাত হইতে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ পান। শেক্সপীয়রের সংস্করণের অবধি নাই ; আধুনিককালের সংস্করণের মধ্যে আর্ডেন শেক্সপীয়র খুব মর্যাদাপূর্ণ। তিনি এই সংস্করণে As You Like It সম্পাদন করেন। তাঁহার ছাত্র হিসাবে আমি গর্বের

সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে Ralli কর্তৃক সংকলিত শেক্সপীয়র সমালোচনার ইতিহাসে হোম-সাহেবের ভূমিকা শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। কলেজে তিনি অনার্স ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইতেন। তিনি যখন I. E. S. চাকুরিতে প্রবেশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন (১৯১০), তখন এম. এ. ক্লাস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তুলিয়া নেওয়া হয় নাই। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বি-এ অনার্স ও এম-এ—উভয় পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল এবং যদিও দুইটি পরীক্ষা দিতে হইত, তিনি এই বিশাল পাঠ্যক্রমকে চার বছরে ভাগ করিয়া পড়াইতেন। ছাত্রেরা অর্ধেকটা তাঁহার কাছে পড়িয়াই সম্পূর্ণ ইতিহাসের উপর বি-এ পরীক্ষা দিত। আমি এই বিভাজনের যৌক্তিকতা বিচার করিতে চাই না : তিনি যে-ভাবে আমাদের নোট দিতেন তাহাও তর্কাতীত নয়। কিন্তু তাঁহার পড়াইবার ভঙ্গী এমন সুন্দর ছিল যে আমরা যে-সকল বই বা সাহিত্যিক যুগের কথা শুনিতাম—অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা, চসারের ক্যানটারবারি গল্প—তাহা পড়িতে উদ্বোধিত হইতাম ; বন্ধুবর প্রবোধ তো চসার পড়িয়া ট্যাবার্ড সরাইখানার একটা নূতন গল্পই লিখিয়া ফেলিল, যাহার কথা আগেই বলিয়াছি। আমার সব চেয়ে ভাল লাগিত তাঁহার স্বচ্ছ, স্পষ্ট সাহিত্যিক দৃষ্টি আর অতিভাষণ বিরোধিতা। আমরা মাত্র একবছর তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। তিনি রেনেসাঁস পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন : রেনেসাঁসের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা 'apotheosis of Man' ; এবং অল্প কথায় খুব স্পষ্ট করিয়া এই শব্দ কয়টি বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর তিন কুড়ি বছর কাটিয়া গিয়াছে ; বেশি না পড়িলেও এক রেনেসাঁস বিষয়েই অনেক বই পড়িয়াছি কিন্তু ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা এবং তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখি নাই। রোমান্টিক শব্দটির বহু সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু কোন সংজ্ঞাই জুৎসই মনে হয় না ; হোম-সাহেবের শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক স্যার অলিভার এলটন তো ক্লাসিক ও রোমান্টিক শব্দ দুইটিকে বিভ্রান্তিকর (Thought-confounding words) বলিয়া একেবারে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অধ্যাপক হোম বলিতেন যে রোমান্টিক কথাটার নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া হয়ত অসম্ভব ; কিন্তু কাব্যের রোমান্টিক ধর্ম বলিয়া একটা ধর্ম আছে। কোন কবিতা বা কবিতার অংশ পড়িলেই তাহা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি এই দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলেন ঃ

> Charmed magic casements, opening on the foam
> Of parilous seas in faery lands forlorn.

অধ্যাপক হোমের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি মাত্র এক বছর আমাদিগকে পড়াইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বেশ কয়েক মাস আমাদের টিউটোরিয়েল ক্লাস করিতেন। এবং ব্যবস্থা হইল যে ঘণ্টায় চারটি ছাত্র তাঁহার সঙ্গে রচনা শিক্ষা করিবে। খুব কাছে আসিবার জন্য তিনি এই চারজনকে আবার দুই ভাগ করিলেন। আমি আর যতীন পড়িলাম প্রথম ঘণ্টার প্রথমার্ধে দশটা হইতে সাড়ে দশটা। প্রথম দুই সপ্তাহে দুই প্রবন্ধ দেখাইয়া যতীন কাটিয়া পড়িল ; রহিলাম আমি একা। অধ্যাপক হোম স্পেন্সার-বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং সম্পাদনা করিয়াছিলেন শেক্সপীয়রের As You Like It ; সবই রোমান্টিক ব্যাপার। কিন্তু তাঁহার মনটা ছিল ক্লাসিক-পন্থী ; জনৈক ফরাসী মনীষী বলিয়াছেন, কম কথায় বেশি অর্থ বোঝান ক্লাসিক-রীতির ধর্ম। আমার ঝোঁক ছিল অতিভাষণের দিকে ; কেহ কেহ বলেন ইহা প্রাচ্য ভূভাগের ব্যসন। হোমসাহেব কঠিন হস্তে এই মনোবৃত্তি সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন। আমার সতীর্থ যতীন বন্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছিল '. . . .destroyed the

lives of many people....' অধ্যাপক হোম ইহা পড়িয়াই টেবিলে পেন্সিল ঠুকিয়া মন্তব্য করিলেন, 'Why not the simple Teutonic word "Kill"?' অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের কাছে শুনিয়াছি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পড়াইবার অনুমোদন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাঁহারা সিনেটের সভায় বিতর্ক শুনিতে যাইতেন। আশুতোষের একটা যুক্তি ছিল যে কেন্দ্রীয় সংস্থায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হইলে নানা বিষয় এবং বিষয়ের নানা বিভাগ পড়ান সম্ভব হইবে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। তিনি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন'....agriculture, sericulture, horticulture....।' অমনি অধ্যাপক হোমসাহেব ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া মন্তব্য করিলেন, 'What simpler people call "gardening"!' তাঁহার জন্য কোন রচনা লিখিতে গেলে বিশেষণের বিশেষণ তো দূরের কথা, বিশেষণ প্রয়োগ করাই ভয়ের ব্যাপার ছিল। আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, 'তুমি যদি ফের 'very' কে বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ কর তাহা হইলে প্রত্যেকবার এই জাতীয় প্রয়োগের জন্য একটাকা করিয়া জরিমানা করিব।' আমি ভাল লিখিতে শিখিয়াছি এমন দাবি করি না ; তবে তাঁহার কঠিন শাসনের বন্ধন না থাকিলে আরও খারাপ লিখিতাম সন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট হইতে যে তিরস্কার পাইয়াছি তাহা অমূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করি : তবে শেষ যে প্রবন্ধ পেশ করিয়াছিলাম তাহা পড়িয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার বিষয়টা—তিনিই নির্বাচন করিয়াছিলেন ঃ

> 'A primrose by a river's brim
> A yellow primrose was to him,
> And it was nothing more'.
>
> —Peter Bell

ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই উক্তি তাঁহার নিজের কাব্যসম্পর্কে কতটা প্রযোজ্য ?

মাত্র তের বৎসর কাজ করিয়া অধ্যাপক হোম প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কলেজের খুব ক্ষতি হইল এবং আমরাও খুব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। এই চাকুরিতে তাঁহার আরম্ভই শুভায় হয় নাই। প্রথমদিকে তিনি একজন ছাত্রের কানে হাত দেন। ইহা লইয়া নাকি খুব হৈচৈ হয়। কিছুদিন হোমসাহেবের ক্লাস বয়কট করার চেষ্টা করা হয়। ইহা সবই আমার শোনা কথা। সাহেব বুঝিতেই পারেন নাই যে কানে হাত দেওয়া অসম্মান করার সামিল। তিনি অধ্যাপক ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'What if I had caught him by any other part of the body?' এই স্বল্পভাষী লোকটির মনের ভাব বোঝা শক্ত। বোধ হয় ওটেনসাহেব-ঘটিত ব্যাপার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ক্লাস তুলিয়া দেওয়া, অসহযোগ আন্দোলন তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিল। ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়াইতে তিনি আনন্দ পাইতেন না, চেষ্টাও করিতেন না। কোন্ বৎসর মনে নাই ; তিনি এম-এ ক্লাসে হ্যামলেট পড়াইতে যাইয়া 'Hamlet, the Elezabethan' নামে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া দিলেন। ইহা যে Oliver Elton-এর A Sheaf of Papers-এ ছাপা হইয়াছে তাহা সাহেবের খেয়াল নাই। Elton তাঁহার শিক্ষক ; কোন সময়ে পাণ্ডুলিপির নকল তাঁহাকে দিয়াছিলেন। অনিচ্ছার কাজ : তাহাই পড়িয়া দায় সারিলেন। ১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের কাজ ছাড়িয়া লা মার্টিনিয়ার স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া যান। আরও বছর-দশেক কলিকাতায় ছিলেন। আমার প্রেমচাঁদ বৃত্তি শেষ হয় ১৯৩২ সালে। শেষের দিকের গবেষণাপত্রের তিনি পরীক্ষক ছিলেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন স্মৃতি নাই। আর কোন দিন তাঁহাকে এই কলেজে দেখি নাই ; ম্যাগাজিনের

সম্পাদক হইয়া তাঁহাকে প্রবন্ধ দেওয়ার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম, কোন সাড়া পাই নাই। কলেজের অধ্যাপক ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সর্বাপেক্ষা ভাব ছিল বলিয়া সবাই বলিত। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক ঘোষ যখন অবসর নেন, তখন তাঁহাকে, স্টার্লিং সাহেবকে এবং আরও অনেককে চিঠি দিয়াছিলাম। শুধু একজন জবাব দেন নাই—তিনি হোম। অধ্যাপক ঘোষকে নাকি তিনি বলিয়াছিলেন, 'When I lectured in your college I felt I was speaking to a dead wall.' ইহা আমাদের প্রতি অবিচার এবং নিজের মনোভাবেরও সত্য পরিচয় নয়, কারণ তিনি অনার্স ও টিউটোরিয়েল ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে কখনও উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা আমি মনে করি না। La Martiniere স্কুলে নাকি তাঁহাকে রাজসিক বসতবাটি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ওখানকার ছাত্রগণ? তিনি আবার তিনশত মুদ্রার বিনিময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ইস্লামিয়া কলেজে এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। সেখানে তিনি হল্‌মিসাহেব (Holme) নামে উল্লিখিত হইতেন। অধ্যাপক ঘোষ এই নামকরণ তাঁহার নজরে আনিলে তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিয়াছিলেন, 'Don't speak of them!' পরে শুনিয়াছি স্বদেশে ফিরিয়া Longmans Green & Co. প্রকাশনসংস্থায় চাকুরি লইয়াছিলেন। মনে হয় তাঁহার জীবনে কোন একটা জায়গায় একটা মস্ত ফাঁক ছিল। যাহা হউক তাঁহার সঙ্গে স্বল্পকালীন সংস্রব আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ্‌।

২

ইংরেজির অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে আমার ঋণের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিতেন। আমার যোগ্যতাকে তিনি খুব বেশি মূল্য দিয়াছেন এবং অতন্দ্রদৃষ্টি দিয়া আমার স্বার্থসংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে বলিতে গেলে আমি ঠিক নিরপেক্ষ মতামত দিতে পারিব কিনা সন্দেহ ; তাই যখনই কিছু লিখিয়াছি, ইতস্ততঃ করিয়াছি। এইখানে শুধু একটা কথা বলিব। প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকদের অনেকেই আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিতেন। আমার হাতের কাছে বহুভাষাবিৎ হরিনাথ দের জীবনীগ্রন্থ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে হরিনাথ দে বিরচিত Palgrave-এর কবিতা-সংকলনের (Golden Treasury Book IV)-র অর্থপুস্তকের উল্লেখ আছে এবং প্রিন্সিপ্যাল টনি এবং বিখ্যাত শেক্সপীয়র সমালোচক ডাউডেন সাহেবের প্রশস্তির কথা আছে। এই কবিতাসংকলন আমাদের বি-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক ছিল এবং এই কারণেই পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য হরিনাথ দের অর্থপুস্তক খুব প্রণিধান সহকারে পড়িয়াছি। এই বইটি আমাদের পড়াইতেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি হরিনাথ দের পাণ্ডিত্য ও মনীষাকে ছোট করিয়া দেখাইতে চাইনা এবং সেই যোগ্যতাও আমার নাই। হরিনাথ দে নানা সমালোচনা গ্রন্থ হইতে সমালোচকদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তুলনার জন্য আলোচ্য কবিতার অনুরূপ কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। তখন দেখিয়াছি তিনি মোটামুটিভাবে এলটন, হারফোর্ড, গ্যারড, বিয়ার্স প্রভৃতি রচিত সমালোচনাগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্লাসে কোন সমালোচকের নাম উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেকটি কবিতা পড়িয়া তাহার উপর যে মন্তব্য করিতেন তাহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব রসোপলব্ধির পরিচয় বহন করিত এবং আমাদের রসোপলব্ধিও জাগ্রত করিত। ইহার স্বাদ স্বতন্ত্র। এম-এ-তে আমাদের পাঠ্য ছিল সুইনবর্ণের Atalanta in Calydon ; গ্রীক্ ছাঁচে, গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে আধুনিক কবির

নাটক। ইহা কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ পড়াইতেন। আমরা যখন পড়িতে আসি, তখন মনোমোহন ঘোষ সদ্য প্রয়াত। সুইনবার্ণের বই তো পাঠ্য আছে, কিন্তু পড়াইবেন কে? ইহার ভার পড়িল শ্রীকুমারবাবুর উপর। অনেকে মাথা নাড়িলেন। কবি মনোমোহন ঘোষ অক্সফোর্ডে গ্রীক পড়িয়াছেন এবং তিনি গ্রীক কাব্যরসের রসিক। শ্রীকুমারবাবু মূল গ্রীক পড়েন নাই ; তাহা না হয় বাদ দিলাম, কারণ অনুবাদের মাধ্যমে বৃহত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের আস্বাদ দেওয়ার রীতি আধুনিককালে সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। স্যার আশুতোষ তো ইহাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আমরা গ্রীক ঈস্কাইলাস, ইতালীয় দান্তে, জার্মান গ্যেটে এম-এ-তে অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে পড়িতাম। আর একটা আপত্তিতে স্বয়ং অধ্যাপক ঘোষও সায় দিয়াছিলেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, তিনি গ্রীক্ নাটকের অনুকরণে লেখা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল নাটক পড়াইবার যোগ্যতা রাখেন কিনা, বিশেষতঃ মনোমোহন ঘোষের জায়গায়। মনোমোহন ঘোষ কি রকম ভাবে এই নাটক পড়াইতেন জানি না। কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতাম শ্রীকুমারবাবু ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যের ধর্ম-সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন। তাহার আলোকে তিনি সুইন-বর্নের নাটকে ক্লাসিক ও রোমান্টিক লক্ষণের অপূর্ব বিশ্লেষণ করিতেন এবং এইভাবে সমগ্র কাব্যটির তাৎপর্য এবং গুণাগুণ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হইত। মনোমোহন ঘোষের নিকট কি পাইতাম জানি না, কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাহা পাইলাম তাহা অবিস্মরণীয়।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি তখন সবচেয়ে নামকরা শিক্ষক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, আমিও একাধিকবার লিখিয়াছি। তবু আর একবার, শুধু তাঁহার শিক্ষণপদ্ধতি-সম্পর্কে কিছু না লিখিলে তাঁহার প্রতি কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং সব কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অধ্যাপক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনেক সহজাত ক্ষমতা ছিল। একটি, ইংরেজি উচ্চারণ এবং সুমধুর কাব্যপাঠ। তাঁহার যখন মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে, তখন বার্কলে-হিল নামে একজন বড় মনোবিজ্ঞানীকে দেখান হইয়াছিল। হিলসাহেব যখন তাঁহাকে পরীক্ষা—মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষার প্রধান মাধ্যম কথাবার্তা—করেন আমি ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলাম। খানিকক্ষণ পরেই সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে তিনি নানা দেশে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু এমন মিষ্টভাষণ ও এমন সুন্দর ইংরেজি কোথাও শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এইসব কারণে একটা ধারণা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে তিনি যেন নাটকীয় ভঙ্গিতে শেক্সপীয়র পাঠ করিয়াই আসর মাৎ করিয়া দিতেন। কিন্তু এই কথাটা অর্ধসত্য অথবা তদপেক্ষাও কম সত্য। তাঁহার পঠন-ভঙ্গিমা তাঁহার অধ্যাপনাকে ঐশ্বর্য দান করিত বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার ব্যাখ্যাননৈপুণ্যের বহিঃপ্রলেপের মত। বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে নাটককে তাৎপর্যমণ্ডিত না করেন তাহা নহে। আমার একটি অভিজ্ঞতা খুব মনে আছে। দুপুরবেলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে আশুতোষ বিল্ডিং-এর আশুতোষ হলে, সিবিল থর্ণডাইককে সংবর্ধনা জানান হইতেছে। হঠাৎ উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা খ্যাতিনাম্নী অভিনেত্রীকে একটু শেক্সপীয়র-অভিনয়ের নমুনা দিতে বলিল। তিনি বিনা আপত্তিতে স্বামী স্যার লুই ক্যাসনকে চেয়ারে বসাইয়া Twelfth Night নাটকের ডিউক ও Viola-র প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিলেন। মনে হইল আমরা যেন মুহূর্তের মধ্যে এক অ-পার্থিব লোকে চলিয়া গেলাম। এই রূপান্তরীকরণের সবটাই অভি-নেত্রীর রচনসৌষ্ঠব ও অঙ্গসঞ্চালনের ফল। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের অধ্যাপনানৈপুণ্য সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় কৃতিত্ব। ইহার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।

প্রথমে শেক্সপীয়র ছাড়িয়া তাঁহার চসার পাঠনের কথা বলি। চসার খুব বড় কবি। তাহা হইলেও আমাদের দেশে তো বটেই, নিজের দেশেও তিনি শেক্সপীয়রের মত পরিচিত নহেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের চসার-অধ্যাপনা শেক্সপীয়র-অধ্যাপনা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। চসারের সমসাময়িক ইতিহাস, তখনকার সমাজব্যবস্থা, ধর্মযাজকগণের জীবনযাত্রা, সরাইখানায় আড্ডাধারীদের গালগল্প, এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের পথ-ঘাট, যানবাহন তাঁহার নখাগ্রে বিধৃত হইয়া ছিল। ইহার ফলে ১৯২৪ সালের কলিকাতায় বসিয়া প্রতি বুধবার আমরা ঘণ্টাখানেকের জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে চলিয়া যাইতাম ; তাহা যেন আমাদের কলিকাতার মতই সুপরিচিত এবং ওখানকার লোকগুলিও—ক্লার্ক, ফ্রায়ার, মংক—আমাদের রামবাবু, শ্যামবাবুর মতই চেনা-জানা লোক ; আমাদের সামনে যে সহাধ্যায়ানীরা বসিয়া থাকিতেন ওয়াইফ অব বাথ তাঁহাদিগের মত নহেন, কিন্তু সেই কুখ্যাত রমণী তাঁহাদের অপেক্ষা বেশি জীবন্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেন।

অধ্যাপক ঘোষের আর একটা বড় সম্বল ছিল Middle English (মধ্যযুগীয় ইংরেজি) ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান। আমাদের দেশের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভাষা যেমন আধুনিক বাংলা হইতে বিভিন্ন, আধুনিক ইংরেজি ও চসারের ইংরেজির মধ্যে ব্যবধানও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের দেশে পদাবলী গান খুব প্রচলিত এবং অনেক প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার কীর্তনগানে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হইয়াছেন, এখনও হয়েন। বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্পর্কে কিছু কিছু ভাল সমালোচনাও পড়িয়াছি। কিন্তু চসারের ভাষা, ছন্দ ও কাব্য এবং সমসাময়িক ইতিহাস প্রভৃতিতে স্যার যেমন পরিস্নাত ছিলেন এমন কোন বৈষ্ণবকাব্যরসিক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। যদিও আমি বি-গ্রুপের অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইংরেজির ছাত্র ছিলাম না, তবু অধ্যাপক ঘোষের নির্দেশনায় আমিও মিড্‌ল্ ইংলিশ ব্যাকরণ বেশ রপ্ত করিয়াছিলাম। নাম না করিয়াও আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তির উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষক হরিনাথ দের কারসাজিতেই নাকি তিনি এই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ এই অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। শিক্ষক যদুনাথ সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা অগণিত ছাত্রেরা প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের ভাষাতত্ত্বের উপর অধিকারের প্রমাণ পাইয়াছি।

আমার বাবা ইংরেজি অনার্স পাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজে পড়িয়াছিলেন ; তাঁহার অন্যতম পাঠ্য বই ছিল রিচার্ড দি থার্ড। শেক্সপীয়রের এই নাটকের টনি-সম্পাদিত সংস্করণ খুব সুপরিচিত। বাবা যে বই পড়িয়াছিলেন তাহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে আমিও সেই বইখানাই ব্যবহার করিয়াছি। বাবা হলওয়ার্ড সাহেবের শেক্সপীয়র অধ্যাপনার খুব তারিফ করিতেন ; অবশ্য তিনিই রিচার্ড দি থার্ড পড়াইয়াছিলেন কিনা বাবা তাহা বলেন নাই। সেই আমলের ঢাকা কলেজের অন্যান্য ছাত্রের কাছেও আমি হলওয়ার্ড সাহেবের শেক্সপীয়র পাঠনের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। আমাদের আমলে ২রা জুলাই নূতন শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হইত ; একটানা তিন মাস কলেজ করিয়া পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিলে, বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রিচার্ড দি থার্ড কতটা কি পড়ান হইয়াছে?' কে পড়াইতেছেন তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। আমি উত্তর দিলাম, এখনও বইটি আরম্ভই হয় নাই। তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই বলিলাম, অধ্যাপক ছোট্ট ভূমিকায় বলিলেন ইহা শেক্সপীয়রের প্রথম দিকের রচনা। অনেকটা মার্লোর ধাঁচে লেখা। সুতরাং আমাদিগকে প্রথম মার্লোর নাটকগুলি পড়িতে হইবে এবং তিনি পরীক্ষা লইবেন। পরীক্ষা অবশ্য গ্রহণ করেন নাই, তবে মাঝে মাঝে টুকটাক জিজ্ঞাসা করিয়া যাচাই করিয়া লইয়াছেন আমরা উহা পড়িয়াছি কি না! তা'ছাড়া তাঁহার নির্দেশকে অমান্য করিবে কে? নিজে ক্লাসে প্রথমে

ল্যাম্বের অনুকরণে লিখিত কুইলারকুচের Historical Tales from Shakespeare হইতে ষষ্ঠ হেন্‌রী নামাঙ্কিত শেক্সপীয়রের তিন খণ্ড নাটকের গল্পগুলি পড়িলেন। এই নাটকেরই তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় রিচার্ড (ডিউক অব গ্লস্টার) প্রথম অবতীর্ণ হয়েন। সেই দৃশ্য হইতে তৃতীয় হেন্‌রী তৃতীয় খণ্ড শেষ পর্যন্ত মূল শেক্সপীয়রের নাটক স্বীয় মন্তব্যযোগে পড়াইয়াছেন। এখন ছুটির পর রিচার্ড দি থার্ড আরম্ভ করিবেন। সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া বাবা সবিস্ময়ে বলিলেন যে তিনি পড়াইবার এইরূপ পরিকল্পনা ও পদ্ধতির কথা কখনও ভাবিতেও পারেন নাই। আর কেহ পারিয়াছেন?

আমাদের এম-এ-তে হ্যামলেট পড়িতে হইত , ইহা আমাদের আগের বছরও পাঠ্য ছিল। ইউনিভার্সিটিতে ইহার জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের জন্য অধ্যাপক ঘোষ দুই ক্লাস একত্র করিয়া স্পেশাল লেকচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরাও আসিত, মোটের উপর বেশ জমজমাট ক্লাস হইত। এই নাটকে একটি দৃশ্যে নায়ক রাজকুমার প্রধান অভিনেতার কাছে অভিনয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা সুবিদিত এবং এই নির্দেশাবলী তখনকার দিনের স্টেজ সম্পর্কে আমাদের খানিকটা আভাস দেয়। অধ্যাপক ঘোষ ইহা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম' নাটক হইতে বটম ও তাহার দলের পিরেমাস অ্যান্ড থিসবী নাটকের মহড়া ও অভিনয় পড়িয়া দিলেন। তাঁহার অপূর্ব কাব্যপাঠে ক্লাসে ছেলেদের তো হাসির রোলে গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম ; আমি ও তারাপদ মুখার্জি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম অবগুণ্ঠিতা ছাত্রীরা হাসি চাপিতে যাইয়া সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই পঠন আবৃত্তি নহে ; পাঠনেরই অঙ্গ। শেক্সপীয়রীয় স্টেজ ও অভিনয় সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমিও প্রবন্ধ লিখিয়াছি। কিন্তু এই দুই একেবারে ভিন্ন ধরনের নাটক হইতে ধীমান্‌ হ্যামলেটের তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং গর্দভোপম বটম ও তাহার বন্ধুদের আজগুবি অভিনয়কে একসঙ্গে দেখিলে এলিজাবেথীয় থিয়েটারের যে সরস সজীব আলেখ্য পাওয়া যায় সেই কথা কি আর কেহ বলিয়াছে? আমরা যখন বি-এ পড়ি তখন প্রথম পত্রে দুইখানা শেক্সপীয়র নাটক পাঠ্য ছিল—ওথেলো ও কমেডি অব এরারস। দ্বিতীয় নাটকখানি ল্যাটিন নাট্যকার প্লটাসের মিনেক্‌মী হইতে গৃহীত ; প্রায় বলা যাইতে পারে মিনেক্‌মীরই বর্ধিত সংস্করণ। লাটিন নাটকের অনুবাদের যে সংস্করণ শেক্সপীয়র ব্যবহার করিয়া থাকিবেন তাহা অধ্যাপক ছাপিয়া ছাত্রদের মধ্যে আট আনা দামে বিক্রী করিলেন, ছাপার খরচ তুলিবার জন্য। তাঁহার মুদ্রণব্যয় উঠিয়াছিল কি না জানি না। আমরা শস্তা দামে একখানা ভাল বই পাইলাম ও তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। পরীক্ষার পূর্বে আমরা অনার্সের ছেলেরা স্যারকে ধরিলাম তিনি শেক্সপীয়রের কমেডিটা আমাদের পড়াইয়া দিন। ঠিক হইল সন্ধ্যার পর একতলায় কমনরুমে ক্লাস হইবে। তিনি টেবিলের একদিকে বসিতেন আর আমরা ছেলেরা আর এক দিকে। পড়াইতে পড়াইতে তিনি একদিন হঠাৎ ক্রোচের একটা মন্তব্যের উল্লেখ করিলেন। প্রবোধ ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ক্রোচে কে?' যতই আস্তে বলুক, স্যার তো কাছেই বসিয়া ; তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'Not heard of Croce!' যেন এত বড় অপরাধ আর হয় না। প্রবোধ তো লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল, আমরা আর সবাই চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু ইহার পর ক্রোচে সম্পর্কে আর উদাসীন থাকা যায় না। স্যার টীকাকারদের উল্লেখ করিলেও সমালোচকদের কথা বড় একটা বলিতেন না। কিন্তু আধুনিক সমালোচনার সঙ্গেও পরিচয় রাখিতেন। তদীয় শিক্ষক পার্সিভেল সাহেব বিলাত হইতে আধুনিক শেক্সপীয়র সমালোচনার নমুনা দেখিতে চাহিলে তিনি তিনখানা বই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন : ব্র্যাডলীর Shakespearian Tragedy, ক্রোচের Ariosto, Shakes-

peare and Corneille আর কুইলারকুচের Shakespeare's Workmanship। তাঁহার নির্বাচনে তেমন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব এই তিন সমালোচক সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা খুব উল্লেখযোগ্য। অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা বাদ দিলাম।

অধ্যাপক ঘোষ যে ব্যাখ্যা করিতেন তাহার মধ্যেও সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা ছিল এবং খুব জানা কথাও নূতন হইয়া দেখা দিত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। হ্যামলেট নাটক সম্বন্ধে এত লেখা প্রকাশিত হইয়াছে যে মার্টন প্রফেসর এফ. পি. উইলসনের মতে, যে সমগ্র হ্যামলেট-সমালোচনা-সাহিত্য পড়িতে চেষ্টা করিবে সে জীবনে আর কিছু পড়িবার সময় পাইবে না—এমন কি হ্যামলেট নাটকও পড়িতে পারিবে না। মাতাকে নববধূবেশে দেখিয়া, তাহার ব্যভিচারের কথা শুনিয়া, পিতার মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য জানিয়া, রোসেনক্রানট্‌জ জাতীয় বন্ধুর স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া, অসরিকের মত রাজ-পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া ডেনমার্কের রাজকুমার সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন ; সমগ্র ডেনমার্ক তাঁহার কাছে একটা ন্যক্কারজনক বন্দীশালা বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক ঘোষ এই নাটকের প্রথমাংশ পড়াইবার সময় ওফেলিয়ার পিতা পোলোনিয়াসের রুচিহীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন ; নোংরা রাজনীতি করিতে করিতে লোকটির স্নেহ, মমতা, সুরুচি সবই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি অনূঢ়া যুবতী কন্যার গোপন প্রেমপত্র নিঃসঙ্কোচে রাষ্ট্রের অন্যান্য দলিলের মত রাজারাণীর কাছে পেশ করিলেন। এই রুচিহীন লোকটিই ডেনমার্কের প্রধান নাগরিক। এই মন্তব্য যখন শুনি তখন মনে হইয়াছিল যে পুরাণ নাটকের উপর নূতন আলোকসম্পাত হইল। হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার ওজস্বিনী বক্তৃতা তিনি গদ্গদকণ্ঠে পড়িয়া মন্তব্য করিলেন, 'Mostly Elizabethan rant.' মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ; যে খোলা স্টেজের জন্য শেক্সপীয়র নাটক লিখিতেন, যেখানে অধিকাংশ দর্শক মাটিতে ভিড় করিত সেইখানে জমকালো বক্তৃতা অপরিহার্য এবং কাব্য ও অলংকারের মধ্যে সীমারেখা টানা সব সময় সম্ভব হইত না।

ওথেলো অবশ্য পরিণতবয়স্ক কিন্তু ডেস্‌ডিমোনার অপর পাণিপ্রার্থী রোডেরিগো তরুণ বিত্তশালী যুবক। ইয়াগোও তরুণ, যদিও মিথ্যার প্রতিমূর্তি এই দুর্মন বিজ্ঞ অভিজ্ঞ বহুদর্শী সৈনিক বলিয়া নিজেকে প্রচার করিতে চায়। কিন্তু তাহার বয়স মাত্র আটাশ বৎসর এবং ইহা বন্ধু রোডেরিগোর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। সুতরাং ভারিক্কী চাল দেওয়ার জন্য সে বলিল যে সে এমন একজন লোক যে জগৎটাকে দেখিয়াছে four times seven years ; এক দুই বৎসর নয়, পুরো সা—ত বৎসর—এবং তাহারও চতুর্গুণ। ইহার পরে তাহার ভূয়োদর্শন সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আটাশ বৎসর বলিলে কিন্তু এই চাল বেচাল হইয়া যাইত। 'Good name in man and woman is the immediate jewel of their soul'—এই বক্তৃতাটি খুব সারগর্ভ কবিতা এবং আমাদের আমলে ইহা অনেক কাব্যসংকলনে দেখা যাইত। আমি তো ফোর্থ ক্লাসে ইহা পড়িয়াছি। কিন্তু যে ইয়াগো রোডেরিগোর অর্থ অপহরণ করিয়া বেচারাকে ফতুর করিয়া দিল, যে ওথেলো, ক্যাশিও, ডেসডিমোনার সর্বনাশ করিল সেই শয়তানের মুখ দিয়াই শেক্সপীয়র 'Who steals my purse steals trust' এই নীতিকথা বলাইবেন ইহা কি সম্ভব? ব্যাপারটিকে অন্যভাবে দেখা যাইতে পারে। সেনাপতি ওথেলো সর্বময় কর্তা : তাঁহার ঠিক নীচে হইল ক্যাশিও, তাহার নীচে হইল ইয়াগো। যে কোন ভদ্রলোকের কাছে হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রদোষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা শুধু অসৌজন্য নয়, অপমানজনকও বটে আর ওথেলো ইহাদের মনিব ; তাঁহার স্ত্রীও আলোচনার অতীত। সেইজন্য ইয়াগো প্রথমে

ক্যাশিয়োর কামুকতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহার অভিযান শুরু করিল। ক্যাশিও পানোন্মত্ততার জন্য বরখাস্ত হইয়াছে ; সুতরাং তাহার সম্পর্কে অন্য দোষারোপ করা সহজ। তারপর কাছেই রহিয়াছে রক্ষিতা বিয়ান্‌কা (Bianca)। সেই তো ক্যাশিয়োর এই দুর্বলতার প্রমাণ। এইভাবে জমি তৈরী করিয়া সে সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া প্রথমে স্ত্রী-লোকের নিষ্কলঙ্ক সুনামের কথা উত্থাপন করিল : 'Good name in man and woman..' 'Woman' শব্দটি বিভ্রান্ত স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়াই এই সুদীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতার উদ্দেশ্য। এইভাবে জমি তৈরী হইলে ডেসডিমোনার চরিত্রহীনতার কথা উত্থাপনের পথ পরিষ্কার হইবে। ওথেলো নাটক সম্পর্কে কালগত ব্যাপ্তির প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে ; ইয়াগো যেদিন এই অপবাদ আনিযাছে তাহার পরের দিন রাত্রিতেই ডেসডিমোনা নিহত হইয়াছে। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? ডেসডিমোনা ও ক্যাশিও ব্যভিচার করিবার সময় কোথায় পাইল? আর নিতান্ত বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে ওথেলো এত অধীর হইতে পারেন না। অপবাদ আনয়ন ও ট্রাজেডির মূল ব্যাপার—ডেসডিমোনা নিধন—ইহাদের মধ্যে যে ব্যবধান অনুভব করা যায়, দিন গণিতে গেলে তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্য Double Time বা দুই রকমের সময় গণনার থিওরি পর্যন্ত উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ রকম দ্বিধা-বিভাগে রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হইয়া যায়। অধ্যাপক ঘোষ বলিতেন এই নাটকের শেষাংশ যে এত দ্রুততালে চলিয়াছে তাহার একটা কারণ ইয়াগো সব সময় লক্ষ্য রাখিয়াছে যে ওথেলো আর ক্যাশিয়োর সাক্ষাৎ না হয়। ইহাদের দেখা হইলেই উন্মত্ত ওথেলো প্রশ্ন করিবেন আর লজ্জিত, পদচ্যুত কিন্তু স্থিরমস্তিষ্ক ক্যাশিয়ো সমস্ত ফাঁস করিয়া দিবে। অধ্যাপক ঘোষের আর একটা অনুমানও খুব তাৎপর্য সমৃদ্ধ : দলনীর পরিচারিকা কুল্‌সমের চরিত্র আঁকিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কি ওথেলো নাটকের এমিলিয়ার চরিত্র স্মরণ করেন নাই?

অধ্যাপক ঘোষের আমি সব চেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলাম এমন কথা বলিতে পারি না, তবে ইহা সুবিদিত যে আমি তাঁহার সঙ্গে যত সময় কাটাইয়াছি তাহা বোধহয় আর কোন ছাত্র কাটান নাই। অন্য কতকগুলি লক্ষণ আমার চোখে পড়িত তাহার কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ তাঁহার তন্ময়তা ও অপ্রতিহত কৌতূহল। আমরা যখন পড়িয়াছি তখন তাঁহার অধিকাংশ পঠনই ছিল আসন্ন পাঠনকে কেন্দ্র করিয়া। যে বই বহু বৎসর ধরিয়া পড়িয়াছেন এবং পড়াইয়াছেন তাহাও প্রতিবার নূতন করিয়া পড়িয়া লইবেন এবং নূতন কিছু জানিবার থাকিলে সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিবেন। জনাকীর্ণ হইলেও কলিকাতায় রাস্তাঘাটে তখন স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া বেড়ান যাইত ; এখানে ওখানে কত পুরানো বইয়ের দোকানে স্যারের সঙ্গে গিয়াছি। ইহা লক্ষ্য করিতাম তাঁহার মন কোথাও স্থাণু হইয়া থাকিত না। নূতন কথা, নূতন তথ্য পাইলে সব সময় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মত যাচাই করিয়া লওয়ার আগ্রহ ছিল। আবার কখনও কখনও অযৌক্তিক কিছু দেখিলে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। Shakespeare Institute-এর প্রতিষ্ঠাতা Allardyce Nicoll ; কিন্তু তাঁহার শেক্সপীয়র সম্পর্কিত রচনা স্যারের মনঃপূত ছিল না। একদিন কলেজের ফেরৎ কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান ঘুরিয়া সন্ধ্যার দিকে কেন বৌবাজারের পথে যাইতেছিলাম মনে নাই। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা। আমি বলিলাম, লন্ডন মার্কারি পত্রিকার সম্পাদক, প্রথিতযশা প্রবন্ধকার Sir John Squire শেক্সপীয়রের উপর একটা বই লিখিয়াছেন, আমি এইমাত্র একটা দোকানে দেখিয়া আসিলাম। অমনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানে গেলেন এবং বইটি কিনিয়া বাড়ি ফিরিলেন। কয়েকদিন পর আমাকে বলিলেন, বইটি একেবারে বাজে। কয়েক বছর পর একদিন তাঁহার পড়ার ঘরে বই নাড়িয়া

চাড়িয়া দেখি তিনি পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, এই বইয়ের উপর অর্থব্যয় করিয়া ভুল করিয়াছি। যতদিন সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন, মনে হইত ইঁহার শেখা আর শেষ হইবে না। এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছাত্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইঁহাদের উভয়ের ছাত্র এবং আমারও ছাত্রকল্প তারকনাথ সেনের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য আমি খুব লক্ষ্য করিতাম। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারকনাথ—ইঁহারা একবার কোন মতে পঁহুছিলে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষ সব সময়ই বহু পুরাতনকে নূতন করিয়া চিনিয়া লইতে চাহিতেন। শুধু একটা কথা মনে হইত তিনি স্পষ্টতা, তীক্ষ্ণতা, পুঙ্খানুপুঙ্খতাকে ভালবাসিতেন এবং সেইজন্য যাহা গভীর, যাহা চুলচেরা বিশ্লেষণ না করিয়া সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে হয় তাহাকে যেন তিনি এড়াইয়া যাইতে চাহিতেন। সামান্য অপেক্ষা বিশেষের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তর আসক্তি ছিল। বোধহয় এই কারণেই তিনি টেন (Taine), ডাউডেন প্রভৃতি লেখকের ব্যাখ্যা ও সমালোচনার উপর বিরক্ত ছিলেন।

মানুষ হিসাবে কয়েকটা লক্ষণ আমার মনে খুব রেখাপাত করিয়াছে। তাঁহার ছাত্রপ্রীতি অধ্যাপনা খ্যাতির মতই প্রসিদ্ধ। ইহার প্রধান কারণ তিনি নিজেও আজীবন ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ সমালোচনা করিয়াছেন যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেন। এই মত যে কত ভ্রান্ত তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতেই প্রমাণিত হইবে। ১৯২৪ সালে আমরা তিনজন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চদশ স্থান অধিকার করিয়াছিল স্কটিশচার্চ কলেজের নবেন্দু বসু নামে একটি ছেলে। ইহাকে তিনি চিনিতেন না এবং ইহার সম্পর্কেও কিছু শোনেন নাই। প্রথম পত্রে ইহার উত্তর দেখিয়া স্যার সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যদিও এই পত্রের প্রধান পাঠ্য শেক্সপীয়রের নাটক আমাদিগকে তিনিই পড়াইয়াছিলেন। এই পরীক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই ; তাহা সত্ত্বেও তিনি ফার্স্ট ক্লাস নম্বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহারা যুক্ত (আধুনিক উত্তর) প্রদেশের লোক, ইহার ভাই শরদিন্দু এলাহাবাদে পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এম-এ ক্লাসে এই নবেন্দু বসুর সঙ্গে আলাপ হয় ; লোকটি স্বল্পভাষী, একটু উদাসীন রকমের এবং মোটেই মিশুকে নয়। কিছুদিন পর এম-এ পড়া ছাড়িয়া দেয়। যতদূর মনে আছে স্যার এলাহাবাদ যাইয়া ইহাদের খোঁজখবর করিয়াছিলেন। এমনকি ইহার ছোট ভাই শরদিন্দুর কথাও আমাকে বলিয়াছিলেন।

স্যারের চরিত্রের আর একটা লক্ষণ ছিল স্পষ্টবাদিতা। কেহ কেহ বলেন তিনি নাকি বাঙ্গালী সহকর্মীদের ভুল ইংরাজি সাহেবদের কাছে দেখাইয়া খাতির জমাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাও মিথ্যা অপবাদ। ভুল ইংরেজি, ভুল তথ্য, অস্পষ্ট চিন্তা এবং বাগ্‌বাহুল্য —তিনি কখনও ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্ক্রিমজার ও হাওয়েলশ সাহেব। তিনি ক্লাসের মধ্যেই তাঁহাদের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিতেন। আমরা যখন এম-এ পড়ি তখন তিনি অনেক দিন সন্ধ্যায় আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া হস্টেলে আসিতেন এবং আসিলেই আমরা তাঁহাকে সিঁড়ির কাছে একখানা চেয়ার দিতাম। সেইখানে বসিয়া নানারূপ গল্প বলিতেন ;তন্মধ্যে অম্লানবদনে সহকর্মীদের নিন্দাও করিতেন। এই সব রসাল গল্পের যে একটা নিন্দনীয় দিক্ আছে তাহা বক্তা বা শ্রোতৃবর্গের মনে হইত না, যদিও ইহাও সত্য যে এই সব আলোচনা সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—এখন সবাই চলিয়া গিয়াছেন, এখন সব কথাই বলা যায়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়গোপালবাবু বক্তৃতা দিলেন—বিষয় 'Maeterlinck and Tagore'। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ঘোষ। বক্তৃতার শেষে দুই জনে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, 'মেটারলিঙ্ক সম্পর্কে যাহা বলিলেন তাহা বুঝিলাম, টেগোর সম্পর্কে যাহা বলিলেন তাহাও বুঝিলাম,

কিন্তু and-টা বুঝিলাম না।' আমি আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলকে দেখি নাই, বোধ হয় মোটাসোটা লোক ছিলেন এবং বক্তৃতা দিতে উঠিয়া তিনি যে শুধু বড় বড় শব্দ প্রয়োগ করিতেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁফাইতেন। সিনেটের কোন সভায় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন হোমসাহেব ও অধ্যাপক ঘোষ। একদা হোম নাকি মন্তব্য করিলেন, 'I thought he was a *seal* but now I find that he is a hippopotamus.'

এই নিরঙ্কুশ স্পষ্টবাদিতার লক্ষ্য সবাই হইতে পারিতেন। নানা কারণে—বিদ্যাবত্তার জন্য ততটা নহে—তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করিতেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে পরীক্ষার মান যাহাতে নীচু না হয় সেই দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি থাকিত এবং কঠিন পরীক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রমহলে ভয়েরও উদ্রেক করিতেন। ইউনিভার্সিটির কিন্তু গ্রেস নম্বর না দিলে চলে না। এই বস্তু প্রথম আমদানী হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে এবং লাভবান্ হইয়াছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। ইউনিভার্সিটির প্রধান পুরুষ আশুতোষের পলিসি ছিল পরীক্ষায় বেশি পাস করানো। সুতরাং তিনি এই ব্যবস্থাকে অনেকটা গা-সহা করিয়া ফেলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেবার ভাইস্-চ্যানসেলর হয়েন সেইবার বোধহয় বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে বেশ একটু বেশি মাত্রায় গ্রেস দেওয়া হয়। স্যার খুব চটিয়া গিয়া নূতন V. C. কে বলিলেন, 'You have inherited all the vices of your father.' একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে তিনি পিতাপুত্রকে নস্যাৎ করিয়া দিলেন।

স্যার খবরের কাগজ পড়িতেন না। সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকে নাইটহুড দেওয়া হইত। ১৯৩৮ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় দফা ভাইস্-চ্যান্সেলারি শেষ হইবে ; কিছুদিন আগেই সোৎসাহে আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'পত্রিকার প্রতি নজর রাখিও তো। এবার শ্যামাপ্রসাদের নাম নাইটহুডের মধ্যে থাকে কি না।' হিন্দুমহাসভার নেতাকে লিনলিথগো সরকার নাইট করিবে না ইহা জানা কথা। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে তাঁহাকে ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়। অন্য বিশেষ কারণ না থাকিলে ডি. লিট দেওয়া হয় পাণ্ডিত্যের জন্য, বিশেষ করিয়া সাহিত্য প্রভৃতিতে কৃতিত্বের জন্য। ইউনিভার্সিটির সর্বকনিষ্ঠ ভাইস্-চ্যান্সেলার, যিনি বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে যুক্তই নহেন, তাঁহাকে ডি. লিট উপাধি দেওয়া উচিত নয় ; ইহাই স্যারের মত। তিনি আমাদের কাছে বলিলেন, 'আমি শ্যামাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার এই ডিগ্রি গ্রহণ করিতে লজ্জা হইল না?' হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং স্নেহভাজন শিষ্য মৃদুহাস্যের সহিত এই ভর্ৎসনা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শ্যামাপ্রসাদ দুইবার স্যারের সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, একবার তাঁহার অবসরগ্রহণের সময়, আর একবার তাঁহার মর্মর মূর্তি স্থাপনের সময়। মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিবার সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই স্পষ্টবাদিতাকেই বক্তৃতার মুখ্য বিষয় করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ঘোষ বিচিত্র-চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের অনেক দিকের বিষয় আমি অন্যত্র লিখিয়াছি। তাঁহার সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিবার সাহস কোন দিনই ছিল না। সুতরাং ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের যে গুণ আমার কাছে সবচেয়ে বরণীয় বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা পার্থিব লোভের অভাব এবং লাভালাভের প্রতি ঔদাসীন্য। তাঁহার পিতা ধনী ছিলেন এবং সততা ও বিষয়বুদ্ধির বলে প্রচুর ধন উপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পিতা খুব হিসাবী ছিলেন ; তিনি যে দান করিতেন তাহার মধ্যেও সংযম ছিল। স্যারও অনেক সময় হিসাব করিতে বসিয়া যাইতেন—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে কত টাকা সুদ হইল বা নূতন বেতনক্রম চালু হইলে কবে তাঁহার বেতন

কত হইবে, কিন্তু এই সকল হিসাবনিকাশের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল না ; মুহূর্তের মধ্যে তাহা ভুলিয়া যাইতেন। অবশ্য বলা যাইতে পারে তিনি কোন দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহাকে কোন দিন পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু মহাভারতে অনেক বিষয়েই শেষ কথা পাওয়া যায় এবং সেখানে দেখি বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'অনন্ত কি?' আর যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছিলেন, 'পুরুষের লোভ'। চাকুরিজীবীরা ছা'পোষা লোক ; তাহারা আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের মত বিশ্বজয় করিতে চায় না ; তাহাদের লক্ষ্য ঠিক উপরের গ্রেডে উন্নীত হওয়া আর ভয়, কে ফাঁকি দিয়া বা কৌশল করিয়া তাহাকে ডিঙ্গাইয়া গেল। আমার জনৈক বন্ধু বলিতেন, 'সব-ডেপুটিদের জাত মারিয়াছেন খাঁ বাহাদুর মোমিন আর ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জাত মারিযাছেন অতুল চ্যাটার্জি। প্রত্যেক সব-ডেপুটিই অহোরাত্র চিন্তা করে কেমন করিয়া ধাপে ধাপে উঠিয়া মোমিনের মত কমিশনার হওয়া যায় এবং প্রত্যেক ভারতীয় সিভিলিয়ানের স্বপ্ন বড়লাটের কর্মসমিতির সদস্য হইয়া বিলাতে যাইয়া হাই কমিশনার হওয়া।' দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া দেখিলাম যে মোমিন, অতুল চ্যাটার্জিরাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

যাহা হউক, আমাদের শিক্ষাবিভাগেও উত্থান-পতন আছে এবং অন্তর্জ্বালার অবধি নাই। ১৯০৫/১৯০৬ সালে নাকি ডেপুটিদের বেতন অপেক্ষা অধ্যাপকদের বেতন বেশ কম ছিল এবং পিতৃদেবের প্রেরণায় ইউনিভার্সিটির প্রথমবারের সুপারিশক্রমে স্যার ডেপুটি হইলেন। সেইবারকার আর একজন ইউনিভার্সিটির সুপারিশে ডেপুটি হইয়াছিলেন অমল-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—ইংরেজির খুব নামজাদা ছাত্র! তাঁহার মেধার তীক্ষ্ণতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি মোমিন—অতুল চ্যাটার্জি হওয়ার মধ্যপথে ধাক্কা হইয়া স্বেচ্ছায় চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুদিন ইংরেজিতে কবিতা লিখিয়াছিলেন—স্যারের কাছেই **শুনিয়াছি**—তারপর গেরুয়া পরিতে শুরু করিয়াছিলেন। স্যারও হয়ত এইরূপ কিছু করিতেন, কিন্তু অল্পদিনেই বিরক্ত হইয়া চাকুরি বদলাইবার অভিপ্রায়ে স্যার আশুতোষের দ্বারস্থ হইলেন। হাকিমির দুই বৎসর শেষ হইতে না হইতেই জেমস সাহেব তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া প্রেসি-ডেন্সী কলেজে আনাইয়া লইলেন। পরবর্তীকালে তাঁহার অন্যতম অনুরাগী হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেব। ব্যারোর এই গভীর অনুরাগের খুব মূল্য আমি দিই না—তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ সাহেবকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, প্রাক্তন ছাত্র এবং সহকর্মী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একদিন ব্যারোর সঙ্গে দেখা করেন। ব্যারো খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, 'Do you think because you are here, no senior man should be transferred to this college?' অথচ এই সময়ই ব্যারো নাকি সরকারকে ক্রমাগত লিখিতেছিলেন যে অন্য কাহাকেও বদলি না করিয়া অধ্যাপক ঘোষকে I. E. S.-এ উন্নীত করা হউক। স্যার ঐ সকল কথা জানিতেন না এবং গ্রাহ্যও করিতেন না। কিন্তু ঐ অনিচ্ছাযাচিত অসম্মানের কথা তিনি ভোলেন নাই এবং আর কখনও এই জাতীয় ভুল করেন নাই। বিষয়-আশয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি ঔদাসীন্য অপরের প্রতি ব্যবহারেও দেখা যাইত। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি লিখিতেছি। স্যারদের বাড়ির ভিতরে ঢুকিলেই সামনে একটা তক্তপোষ দেখা যাইত—ভৃত্য দ্বারকা ও দীনুর বসার জন্য। ইহার পূর্বদিকে বড় বৈঠকখানা। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে ; ওখানে সেইদিন কোন আলো ছিল না। আমি দেখি এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসিয়া আছেন—তাঁহার চেহারা ও পোশাকে আভিজাত্যের লক্ষণ অন্ধকারেও সুস্পষ্ট। আমি একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া আছি—একা হইলে পাশের ঘরেই যাইতাম—এমন সময় দীনু সংবাদ দিল, বড়বাবু আসিতেছেন। স্যারও একটু পরেই আসিলেন ;

আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন সমাপন করিলে দুইজনে আমার কাছেই অল্পক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। তারপর তিনি চলিয়া গেলে আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং স্যার বলিলেন, 'ও যোগীন—আমার কাছে পড়িত।' আমি তখনও জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকায়, তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'আরে—ঐ—নাটোরের যোগীন।' বুঝিলাম, ইনি রাণী ভবানীর বংশধর, বঙ্গের অন্যতম প্রধান ভূম্যধিকারী নাটোরাধীপ মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়!

অধ্যাপক ঘোষ কর্মবীর ছিলেন না, অধ্যাপক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী ছিলেন না, দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহার চিত্ত ধর্মের অপার্থিব আলোকের সন্ধান করে নাই। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশের ডাকে সরকারি কর্ম পরিত্যাগ করেন নাই, বরং কর্মজীবনের সমাপ্তির পর পেনসনভোগের ভরসা রাখিতেন। তাঁহার স্মরণীয় কাজ একটি। পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকেরা সাহেবী অথবা আধা-সাহেবী পোশাক পরিতেন; ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে আমাদের ফোর্থ ইয়ারে তিনিই প্রথম ধুতি পরিয়া কলেজে আসিয়া তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আর একটা বিষয় লক্ষণীয়। গ্রে স্ট্রীট (রাজনৈতিক) হত্যা মামলায় শেষবারের মত জুরির বিচারের চেষ্টা হয়, কিন্তু বারংবার নির্দোষ রায় হওয়ায় সরকার পরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করেন। গ্রে স্ট্রীট মামলায় একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের দুই অধ্যাপকের নাম উঠে; সরকারি কর্মচারী বলিয়া একজনের সম্পর্কে স্বভাবতঃই আসামী পক্ষ আপত্তি করেন, কিন্তু অন্যজনের সম্পর্কে আপত্তি তোলে সরকারি কৌঁসুলী! সেই দ্বিতীয় অধ্যাপক আমাদের স্যার। সুভাষচন্দ্র বসুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পড়িলাম যে তাঁহাকে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করা হয় তখন একজন অধ্যাপক তাঁহার প্রতি অনুকূল বা সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমার মনে হয় ইনি আমাদের স্যার, কারণ ইহার কুড়ি বৎসর পর ঈশানচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হইলে ভিয়েনা হইতে সুভাষচন্দ্র পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সমবেদনা জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন। ইনি কর্মবীর, ত্যাগবীর, ধর্মবীর কোনটাই ছিলেন না। অপর দিকে খুব কাছে আসিয়াও তাঁহার চরিত্রে কোন মহৎ দোষ—নীচতা, অকৃতজ্ঞতা, মাৎসর্য, পরাপচিকীর্ষা—দেখিতে পাই নাই। তাঁহার দোষত্রুটিগুলিও মৃদু পরিহাসের বিষয় ছিল। একটা ব্যাপারে একটু খট্‌কা লাগিয়াছিল। অন্যত্র তাহার উল্লেখ করিব।

৩

ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গেও আমার খুব প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পর্কে অন্যত্র ('Portraits and Memories' গ্রন্থে) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ইতিহাসের অধ্যাপক বিনয়-কুমার সেন আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার প্রয়াণে আমি আত্মীয়-বিয়োগব্যথা অনুভব করিয়াছিলাম। তবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অনার্স পঠন-পাঠনের মান এত উঁচু ছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সের সিলেবাস সেই তুলনায় এত লঘু ছিল যে অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলেও অ-গভীর হইতে বাধ্য। সেইজন্য আমি শুধু ইংরেজি বিভাগের অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপকের কথা বলিয়াই বর্তমান প্রসঙ্গের ছেদ টানিব।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে খুব উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষাবিভাগকে ভারতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইলে যে অল্প কয়েকজন অধ্যাপক I. E. S.-এ উন্নীত হয়েন ইনি

তাঁহাদের অন্যতম। খুব নম্র অমায়িক ধরনের লোক ছিলেন। এক নম্বর ঘরে তাঁহার লেকচারই ছাত্র হিসাবে আমার প্রথম লেকচার। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে আমরা যদি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাঁহাকে দেখাই তিনি অবসর সময়ে তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবেন। যাহারা তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল আমি তাহাদের একজন। আমার ও প্রবোধের লেখা তিনি পছন্দ করিতেন। এক রবিবারে আমাদের মধ্যে তিন জনকে—প্রবোধ এইসব সামাজিক ব্যাপারে থাকিত না—তাঁহার বাড়িতে আহ্বান করিলেন ; আমরা সকালে পড়িব এবং দুপুরে আহার করিব। তিনি পরের বৎসরই হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া বদলি হয়েন। তখনও আমাদের দুই-একটা উত্তর দেখিয়া দিয়াছিলেন। তারপর অবশ্য অনেকদিন আর দেখাশোনা হয় নাই। শুনিয়াছিলাম তিনি আমাদের অনার্সের এক পত্রের পরীক্ষক ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে ভোলেন নাই। অবসর লইয়া তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহার বাড়ি গেলে দেখি, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু হাওড়ায় সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসের পরীক্ষার্থীদের The Lady of the Lake শেষ হয় নাই ; আমি যেন তাহা পড়াইয়া দিই। যেহেতু কাজটা একেবারে অনাহারী, সেইজন্য সরকার আপত্তি করিলেন না। এই সময় তাঁহার নিজের লেখা দুইখানি বই উপহার দেন। একখানা Kalidas and Vikramaditya। পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই বইখানি একখণ্ড আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। আর একজন ইংরেজির অধ্যাপকও শুধু ফার্স্ট ইয়ারেই পড়াইয়াছিলেন। আমার বিশেষ সৌভাগ্য তিনিও আমাকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইনি কবিতা পড়াইতেন আর খুব রসিক লোক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সরসতা আমরা খুব উপভোগ করিতাম। ১৯২১ সালে সেকেন্ড ইয়ারে তিনি আর পড়ান নাই। কারণ তিনি বেথুন কলেজে বদলি হইয়া যান। বাৎসরিক পরীক্ষায় ইংরেজির নম্বর তিনি আমাদিগকে প্রমোশনের দিন সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই খুব ভাল নম্বর পাইয়াছিল ; তবে আমি সবার উপরে দুই-চার নম্বর বেশি। নরেনবাবু আর আমার জ্ঞাতি দাদামশায় হাইকোর্টের প্রখ্যাত ব্যবহারাজীব গুণদাচরণ সেন খুব বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা থাকিতেন ভবানীপুরে আর আমরা হিন্দু হস্টেলে, আর পরে ঐ পাড়ারই মেসে। দাদামহাশয়ের সঙ্গেও কদাচিৎ দেখা হইত। ১৯২৯ সালে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করি তখন একটি নম্র, ধীরস্থির ছেলে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম উচ্চারণ করিতেই আমি বলি যে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। তখন ছেলেটি জানায় তাঁহার পিতাই আমার সঙ্গে পরিচয় করিতে বলিয়াছেন। প্রায় দশ বছর আগেকার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়া পূজ্যপাদ শিক্ষক যে তাঁহার ছেলেকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন ইহাতে আমি খুব অভিভূত হইয়াছিলাম। এই ছেলেটির নাম নিখিলনাথ চক্রবর্তী। সে ইতিহাসে খুব ভাল ছাত্র হিসাবে কলেজে পরিচিতি লাভ করে এবং এখন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রণী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই যে নিখিল আমার সঙ্গে পরিচিত হইল, সেই দিন হইতে এই পরিবারের সঙ্গে আমার আত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

ইংরেজির অধ্যাপক মঞ্জুগোপালবাবুর কাছেও আমি বেশি দিন পড়ি নাই। তিনি কলেজে প্রবেশ করেন আমাদের ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে—অর্থাৎ শেষের বৎসর। তাঁহার মত অজাতশত্রু, বিদ্বেষলেশহীন লোক আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। তিনি আমাকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি তাঁহার কাছে চিরঋণী এবং আটাশি বৎসরে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু সেই কথা বলার জন্য এখানে তাঁহার নামোল্লেখ করিতেছি না। একটা ছোট্ট ঘটনায় তখনকার দিনের প্রেসিডেন্সী

কলেজের পঠন-পাঠনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বি-এ ক্লাসে পড়ার সময় আমার নানা অসুখের জন্য পড়াশোনায় বিঘ্ন হয়। ইংরেজি গদ্যসংকলনে একটা প্রবন্ধ ছিল Law and Justice-সম্পর্কে। লেখকের নাম বোধ হয় Hobhouse। পরীক্ষার প্রাক্কালে উহার মধ্যে একটা প্রবচনের উল্লেখ দেখি যাহার তাৎপর্য ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। স্থির করিলাম, এখন থাক, সকালে প্রথম পত্রের পরীক্ষার পর কলেজে যাইয়া দেখিব। মঞ্জুবাবু উহা পড়াইতেন ; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব ; নাহয় স্যার তো আছেনই। তাহাই করিলাম। ঘটনাচক্রে মঞ্জুবাবুর সংগে সিঁড়িতেই দেখা। তাঁহার কাজ সারিয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাক্যটি বুঝাইয়া দিলেন এবং এই অর্ধস্ফুট প্রবচনটির অর্থগ্রহণ করিবার জন্য তিনি কোন্ কোন্ গ্রন্থ দেখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বড় অক্সফোর্ড অভিধানে ঠিক এই প্রবচনটি না থাকিলেও ইহার কাছাকাছি কি কি প্রয়োগ পাইয়াছেন, সবিস্তারে বলিয়া দিলেন। এই শেষের তথ্য লিখিয়া লইলাম এবং পরের দিন দেখি এই বাক্যটিই ব্যাখ্যার জন্য আসিয়াছে। খুব সুন্দর করিয়া অক্সফোর্ড অভিধানের উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যাটি লিখিয়া দিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াইতে হইলেই অধ্যাপককে এইরূপভাবে প্রস্তুত হইতে হয়। অন্য জায়গায় এই জাতীয় প্রস্তুতি অবান্তর, অর্থহীন।

সেই আমলে ইংরেজির যে দুইজন সবচেয়ে তরুণ অধ্যাপক ছিলেন এবং যাঁহারা কেহই স্থায়ী হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্পর্কে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ইঁহারা হইলেন বীরেন্দ্রবিনোদ রায় ও ফিরোজ দস্তুর। চট্টগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণকায় বীরেন্দ্রবিনোদ রায় ১৯২০ সালে এম-এ পাস করেন। আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন ইঁহারা এম-এ পরীক্ষা দিতেছিলেন ; সেই বৎসরকার দুইজন ছাত্র—উভয়েই হিন্দু হস্টেলবাসী—ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ফণিভূষণ চক্রবর্তী যিনি পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। ফণীবাবু বহুশ্রুত কিন্তু তিনি পরীক্ষার জন্য তোয়াক্কা করিতেন না ; তাঁহাকে এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস দেওয়ার জন্য বড় রকমের গ্রেস দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। বীরেন্দ্রবিনোদ বি-এ পরীক্ষায় এত বেশি নম্বর পাইয়াছিলেন, যে নেহাৎ সর্বকালীন রেকর্ডধারী চণ্ডীপ্রসাদ খৈতান (গণিত) না থাকিলে হয়ত-বা ঈশান বৃত্তিই পাইতেন। এম-এ পরীক্ষায়ও তিনি অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফিরোজ দস্তুরকে আমি ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে দেখিয়াছি ; তাঁহার ফুটফুটে রং এবং তিনি খাঁটি সাহেবী পোশাকে কলেজে আসিতেন। তিনি বি-এ-তে তৃতীয় হইয়াছিলেন ; প্রথম হইয়াছিলেন বিরাজনন্দন যতীন্দ্রমোহন মজুমদার আর দ্বিতীয় হইয়াছিলেন প্রফুল্লকুমার রায়। 'এ' ও 'বি' গ্রুপে ইংরেজির ভাগ হওয়ার পর দুইজন খুব নামী ছাত্র 'বি' গ্রুপ পড়িয়াছেন—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ফিরোজ দস্তুর। বিনা দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার মানসিক প্রবর্তনাবলেই ভাষাপ্রধান 'বি' গ্রুপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফিরোজ দস্তুর সম্পর্কে সেই কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। নিজেই তিনি আমার কাছে প্রফুল্লকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উপরে সরস্বতীর বরপুত্র যতীন্দ্রমোহন তো ছিলেনই। পরবর্তীকালে দস্তুরের পৃষ্ঠপোষকরা বলিয়াছিলেন, দস্তুর সব্যসাচী—'এ' গ্রুপ ও 'বি' গ্রুপ উভয়ত্র তাঁহার সমান অধিকার। সুনীতিবাবুকে বাদ দিলে ইংরেজির শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা কিন্তু 'এ' গ্রুপই পড়িয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, ফিরোজ দস্তুর 'বি' গ্রুপ পড়িলেন, 'Old Testament Miracle Plays' বিষয়ক থীসিস দিলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইলেন। তাঁহার থীসিস সম্পর্কে অধ্যাপক ঘোষ ও তাঁহার সহযোগী পরীক্ষকরা বলিয়াছিলেন 'Easy 90 p.c'.

যাহা হউক, এই দুইজন কৃতী ছাত্র যখন কলেজে প্রবেশ করিলেন তখন উপরিতলার

অধ্যাপকেরা প্রথমে সকলেই খুশি হইলেন যে ইঁহাদের অভ্যাগমে কলেজের ভাল হইবে। কিন্তু মালিক ওটেন সাহেব পূর্বেই অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষ নিজে কেম্ব্রিজের দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ; কলেজ হইতে বাহির হইয়াই সর্বসাকুল্যে বাঙ্গালী প্রফেসরদের তিনগুণ বেতনে এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ—যতই ভাল হউক সরাসরি প্রফেসর (পরবর্তী পরিভাষায় অ্যাসিস্ট্যান্টি প্রফেসর) হইতে পারে না। কিন্তু প্রথমে মনে হইল—একজন যাইবেন। যতদূর স্মরণ করিতে পারি, কলেজ হইতে দস্তুরের নাম সুপারিশ করা হয়, কিন্তু উপরে তদ্বির করিয়া বীরেন্দ্রবিনোদ দস্তুরকে হটাইয়া দিলেন। তারপর বীরেন্দ্রবিনোদের অপসারণ ও দস্তুরের পুনঃপ্রবেশ। অক্সফোর্ড হইতে হিরণকুমার বন্দোপাধ্যায় আসার পর কর্মচ্যুত হইয়া দস্তুর—প্রধানতঃ অধ্যাপক ঘোষের চেষ্টায়—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি পাইলেন, আর পরীক্ষার সাফল্যের জোরে বীরেন্দ্রবিনোদ স্কটিশ চার্চ কলেজে বহাল হইলেন।

সেই দিনের এই নাটক আজ বিস্মৃত : অভিনেতারা সবাই প্রয়াত। তবু ইহার দুই-একটা দিক্ আছে যাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ইহার মধ্য দিয়া ঔপনিবেশিকতার একটা লক্ষণ পরিস্ফুট হয়—যাহার কথা বহুপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন। শাসক-সম্প্রদায় বিজিত জাতির লোকদের মূল্য যাচাই করিতে পারেন না। ওটেন সাহেবের নিষ্করুণ মন্তব্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো সাহেব খুব ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তবে আমার স্বাধীনতাসংগ্রামী গান্ধীবাদী বন্ধু সুরেশদা বলিতেন, 'ইঁহার ন্যায়পরতা দেখিয়া মনে হয় ইনি কতকগুলি ইঁদুরকে খাঁচায় পুরিয়া নিক্তির ওজনে যোগ্যতা অনুসারে তাহাদের খাবার বণ্টন করেন।' যে ব্যবস্থার ফলে ন্যায়বিচারের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল তাহাই ভ্রান্ত ও দূষিত। ব্যারো লিখিয়াছিলেন—আমি যতদূর মনে করিতে পারি ব্যারোর কথা উদ্ধৃত করিব—এই প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় যেখানে দুইজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি (men of exceptional merit)-সম্পর্কে বিচার করিতে হইবে, সেখানে পরীক্ষায় কৃতিত্ব অপেক্ষা ইঁহাদের শিক্ষকদের—স্টার্লিং, হোম ও প্রফুল্লবাবুর মত সমধিক গ্রাহ্য। ইঁহারা তিনজনেই দস্তুরকে বেশি ভাল বলেন, which accords with my impressions (আমারও তাই মত)।' এই রায়ের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্রবিনোদ ওটেনের কাছে এক দরখাস্ত দিলেন ; তাহা অধ্যাপক ঘোষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার মাত্র। তাঁহার বক্তব্য—'হোম ও স্টার্লিং-এর কোন নিজস্ব মত ছিল না : কুচক্রী পি সি. ঘোষের প্রেরণায়ই তাঁহারা দস্তুরের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। খুব কটু মন্তব্য করিয়া ওটেন সাহেব এই দরখাস্ত প্রিন্সিপ্যাল স্টেপলটনের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্টেপলটন সাহেব আবার তাহা অধ্যাপক পি. সি. ঘোষকে পাঠাইয়া দেন। আমি স্যারের কাছে ইহা দেখি।

বীরেন্দ্রবিনোদ রায় যাহা করিয়াছিলেন তাহা গর্হিত। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যদি কাহাকেও তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনে দুঃখ বা ক্ষোভ হইতে পারে। কিন্তু ইহা লইয়া নালিশ করা বা কুৎসা রটনা করা অন্যায়, বিশেষ করিয়া এমন একজন লোকের বিরুদ্ধে যাঁহার নিকট তাঁহার ঋণও অবিসংবাদিত। আমার নিজের কথা বলিতে পারি। আমার চাকুরিজীবনে তিন-তিনবার (আমার মতে) আমার ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হইয়াছে কিন্তু নালিশ করা দূরে থাক, কাহারও কাছে ইহার উল্লেখ করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। এই বিষয়ে ফিরোজ দস্তুর অধিক উদারতা দেখাইয়াছেন। যখন তাঁহাকে সরাইয়া বীরেন্দ্রবিনোদ প্রবেশ করিলেন তখন তিনি কোনরূপ উষ্মা প্রকাশ

করেন নাই এবং পরে আমাকে একাধিকবার বলিয়াছেন যে সেই সময়ে বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ের নিয়োগই ন্যায়সঙ্গত হইত।

যে চারজনের মত প্রাধান্য পাইল তন্মধ্যে ব্যারো আর স্টার্লিং-এর মত একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদিগকে আমি বেশ কাছের মানুষ হিসাবে দেখিয়াছি ; যাঁহাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার ইঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মূল্যায়ন করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি ইঁহাদের ছিল না। 'লাল মুখ', বড় চাকুরি করিতেন—এই পর্যন্ত। অধ্যাপক হোম ও অধ্যাপক ঘোষ সম্পর্কে সেই কথা বলা যায় না। তাঁহারা সুপণ্ডিত, তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যাপক। তাঁহাদের বিচার এত সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবু হোমসাহেব মনঃসংযোগ করিয়া এই মত দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার বিচারবুদ্ধি ও সাহিত্যিক প্রজ্ঞার অন্তরালে ছিল সাম্রাজ্যবাদীর বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য। আমার দুইবার দুইটি ইতিহাস লিখিতে হয় : একবার পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রগতির পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন, আর একটি প্রেসিডেন্সী কলেজের একশত বৎসরের (১৮৫৫—১৯৫৫) ইতিহাস। দুইবারই অনেক সরকারি দলিল, রিপোর্ট প্রভৃতি হাতড়াইতে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক হিসাবে হোম সাহেবের কয়েকটা বার্ষিক রিপোর্ট আমি দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা আছে বলিয়াই আমি খুব অভিনিবেশসহকারে তাঁহার মন্তব্য পড়িয়াছি। উহার মধ্যে ছাত্রদের সম্পর্কেও মতামত লিখিত আছে ; কেহ কেহ আমার প্রায় সমসাময়িক এবং কেহ কেহ আমাদের কিছু আগের হইলেও আমার অপরিচিত নয়। আমি তাঁহার এইসব মন্তব্য পড়িয়া, তিনি অধ্যাপক ঘোষকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়াছিলাম, 'When I taught at your college I felt I was speaking to a dead wall'.

ঘটনাচক্রে আমি এই দুই নবনিযুক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। বীরেন্দ্রবিনোদ তখন থাকিতেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উত্তরদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত একটা অভিজাত হোটেলে। ইহার নাম ছিল—ক্যালকাটা হোটেল ; আমাদের হিন্দু হস্টেলের কাছেই বলিয়া আমি তাঁহার কাছে প্রায়ই যাইতাম। তিনি খুব পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় তিনি প্রায় প্রত্যেক পত্রের জন্য প্রশ্নোত্তর লিখিয়া তাহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেই খাতাগুলি আমাকে দিয়াছিলেন ; আমি তাহা খুব অভিনিবেশসহকারে পড়িয়াছি। এইরূপ পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও মুন্সিয়ানা কোন ছাত্রের রচনায় দেখা যাইতে পারে আমি তখনও মনে করি নাই, এখনও মনে করি না। তিনি বেশ কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করিয়া মধ্যবয়সে লোকান্তরিত হয়েন। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁহার মত যশস্বী ইংরেজির অধ্যাপক তাঁহার সময়ে কলিকাতায় খুব বেশি ছিল না। এই সেদিন কবি ও সাংবাদিক সমর সেন—ইনি বি-এ, এম-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট—পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছেলে-মেয়েদের উদ্যোগে প্রকাশিত একটা স্যুভেনির বা স্মারক গ্রন্থে এম-এ ক্লাসের শিক্ষকদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম যে বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ের শেক্সপীয়র-পাঠন তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং তিনি চল্লিশ বৎসর পরেও বি-এ ক্লাসে সেই হৃদয়গ্রাহী শেক্সপীয়র-ব্যাখ্যা ভুলিতে পারেন নাই।

ফিরোজ দস্তুর এলাহাবাদ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা করিয়া কোদাইকানালে অবসরজীবন যাপন করিতেন। তারপর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসায় এবং হৃদ্‌রোগের আভাস পাইয়া বোম্বাই-শহরে আত্মীয়স্বজনের কাছে চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে আমার সংযোগ প্রায় শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। দৃষ্টিহীন লোককে চিঠি লিখিয়া বিরক্ত করা উচিত নয় বলিয়া আমি কিছুদিন তাঁহার সংবাদ লই নাই। পরে হঠাৎ কাগজে দেখি, তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে মৃত্যুর অল্পদিন আগেও

আমার সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন। তিনিও সুপণ্ডিত, সদালাপী, সুবক্তা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহারা দুই জনেই 'men of exceptional merit (ভাষাটা ব্যারো সাহেবের); কিন্তু বীরেন্দ্রবিনোদ রায় যে যোগ্যতর ইহা আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি। ইঁহাদের লইয়া যখন টানাটানি—প্রায় Tug of War চলিতেছে, তখন আমি কলেজ পত্রিকার সম্পাদক এবং ইঁহারা উভয়েই ঐ পত্রিকায় লিখিতেন। আমি ও আমার সতীর্থ—পরবর্তীকালে ইতিহাসের গবেষক ও অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত—নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ হস্টেলে এক ঘরেই থাকিতাম। নরেন সিংহ বেশ মন্তব্য করিয়াছিল : ইঁহাদের দুইজনের কলেজ পত্রিকায় লিখিত রচনা পড়িলেই বোঝা যায়, কে যোগ্যতর। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফিরোজ দস্তুরের পক্ষাবলম্বন করিলেন কেন? অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ের পক্ষে ছিলেন : অবশ্য আমার মত তিনিও 'বি' গ্রুপের বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের বিচার-বিভ্রমে আমার মন আন্দোলিত হইয়াছিল এবং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অপরাজেয় অধ্যাপনানৈপুণ্য সত্ত্বেও ইহা মানিতে হইবে যে অধ্যাপক ঘোষের মনীষা সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতির তুলনায় গভীরতায় ন্যূন ছিল এবং যত বড়ই হউন, এই শ্রেণীর লোক পদলালিত্যে মুগ্ধ হয়েন এবং অর্থগৌরবকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেন্সী কলেজ—৪

পরিশেষ

১

প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় যে ছয় বছর কাটাইয়াছি, আমার আটপৌরে জীবনে তাহাই স্বর্ণযুগ। ছিলাম অজ পাড়াগাঁয়ে—যেখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবাহ হইল বিপ্লবী প্রবাহ, যাহার সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। সেখানে যতটুকু বিদ্যাচর্চা সম্ভব তাহা অবশ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বলিবার মত নয়। এখানে আসিয়া বিরাট সমুদ্রের চেহারা দেখিলাম। এই যে মানসিক সম্প্রসারণ ইহাই সবচেয়ে বড় লাভ। পরবর্তীকালে যদি কিছু উন্নতি করিয়া থাকি, এই পথেই করিয়াছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের একটা বড় সম্পদ ছিল ইহার গ্রন্থাগার এবং তাহার দক্ষ কর্মচারীরা। যখন সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ তারকনাথ সেন ও তাহার সহকারীদের দাক্ষিণ্য ও সৌজন্যে ইহার সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হই নাই। এখন শুনিতেছি যে লাইব্রেরির সেই অবস্থা নাই ; নূতন রামেরা প্রবেশ করায় সেই অযোধ্যাও তচনচ হইতেছে।

লাইব্রেরির বহু কর্মচারী আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছে। তাহাদের সকলের কথা বলা সম্ভব হইবে না। তবে একজনের কথা না বলিলে সেই আমলের প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে না। ইহার নাম মজিবর রহমান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক ; বোধ হয় চম্পাহাটির পাকাপাকি বাসিন্দা, তবে এক সময় যখন যাদবপুর একেবারে পাড়াগাঁ ছিল—বোধ হয় ১৯৩৫ সালে—যাদবপুর স্টেশনে তাহার সঙ্গে দেখা হইত ; তখন সে স্টেশনের কাছেই থাকিত এবং আমাকে তাহার বাড়ি যাইতে আপ্যায়ন করিত। আমি যাইতাম যক্ষ্মা হাসপাতালে এক মুমূর্ষু ছোট ভাইকে দেখিতে। সুতরাং মজিবর রহমানের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছি তখন আমার বয়স ষোল সতের ; মজিবর আমার বয়সী হইবে। তাহার স্কুলের বিদ্যা বেশি নয় ; ম্যাট্রিক পাস করে নাই। সে একজন বেয়ারা, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কিন্তু সে খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সেইজন্য তখনই সে আর্টস লাইব্রেরির কোথায় কোন্ বই থাকে, কাহার কাছে কোন্ বই 'ইস্যু' হইয়াছে, কবে ফেরত আসিবে ইত্যাদি বিষয় বেশ জানিয়া লইয়াছিল। অল্পদিনেই মজিবরের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে-সকল বস্তু আমদানি হইয়াছে তন্মধ্যে বাঙ্গালীর খুব প্রিয় হইল ফুটবল। খেলাটির নাম ইংরেজি ; গ্রামের মধ্যেও একদল আর একদলকে যুদ্ধে যে আহ্বান করিত তাহাকে বলা হইত—চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ লিখিতে হইত ইংরেজিতে। মজিবরের দলের চ্যালেঞ্জ আমি লিখিয়া দিয়াছি। এহ বাহ্য। খেলা প্রভৃতির জন্য মজিবর মাঝেমধ্যে কর্তা গোকুলবাবুর কাছে ছোটখাট শাস্তি পাইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার দক্ষতার খ্যাতি এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সবাই তাহার প্রতি এত নির্ভরশীল হয় যে তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব উঠে। শিক্ষাবিভাগে অপূর্বকুমার চন্দ খুব একজন প্রতিষ্ঠাবান অফিসার ছিলেন। লীগ আমলে তাঁহার চেষ্টায় নন্-ম্যাট্রিক হইয়াও মজিবর তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী অর্থাৎ অ্যাসিস্টান্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে উন্নীত হইল। আমরা সবাই খুব তুষ্ট ও তৃপ্ত হইলাম।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলিলেই মজিবর রহমানের অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এম-এ'র ইংরেজির যে নূতন সিলেবাস প্রবর্তিত হয় এবং যাহা এখনও চালু আছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ পত্রের বিষয় হইল শেক্সপীয়র। ইহার প্রথমার্ধ সামগ্রিক শেক্সপীয়র—তাঁহার পাণ্ডুলিপি, ফলিও, কোয়ার্টো প্রভৃতি সংস্করণের যথার্থতা, শেক্সপীয়রের জীবনী, সেই সময়কার রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি। পঞ্চাশের দশকে সুহাসচন্দ্র রায় অল্পদিনের জন্য ইংরেজির প্রধান হইয়া এই প্রথমার্ধ পড়াইবার ভার আমার উপরে পাকাপাকিভাবে অর্পণ করিলেন। আমি লাইব্রেরিতে যাইয়া প্রথমেই A. W. Pollard-এর *Shakespeare's Folios and Quartos* বইটি চাহিলাম। কিন্তু বইটি পাওয়া গেল না; সাধারণ্যে অপরিচিত, এই নীরস গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে, কে নিতে পারে আমি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। মজিবর সেইদিন অনুপস্থিত; অন্য কেহ কোন হদিশও দিতে পারিল না। বই যথাস্থানে নাই—এই পর্যন্ত। পরের দিন মজিবরের কাছে কথাটা তোলামাত্র সে বলিল, 'ওরা পাইবে না; এই বইটা লম্বা সাইজের। প্রফুল্লবাবু পড়িতেন। ইহা র‍্যাকে খাড়া করিয়া রাখা যায় না; পেছনে শোয়ান অবস্থায় থাকে। আমি আনিয়া দিতেছি।' পাঁচ মিনিটের মধ্যে বই হাতে করিয়া আমি আমার জায়গায় চলিয়া গেলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরি সম্পর্কে একটি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য অন্য একজনের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম একেবারে অন্য প্রসঙ্গে। নলিনীরঞ্জন সরকার বি-এ ফেল; ব্যবসায়ক্ষেত্রে বড়লোক হইয়া শিক্ষাগত ন্যূনতা-সত্ত্বেও বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন, এইরূপ কথা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা সেক্রেটারিরা লিখিয়া দেন তাহাও বলা হইত। কিন্তু সেক্রেটারিরা নিজেরা অন্যরূপ বলিতেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় দুই বঙ্গের বহু কমিটি হয়; ইহাদের উপরে থাকে কাউন্সিল। সেই কাউন্সিলের সভ্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে নলিনী সরকার, সঙ্গে হুগলীর ধীরেন মুখার্জী; আর পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি হইলেন নাজিমুদ্দীন, সঙ্গে সুরাবর্দী। অনেকগুলি কমিটির একটির অন্যতম সভ্য ছিলাম আমি। প্রথমেই ঠিক হইল সরকারের যে সম্পত্তি যেখানে আছে তাহা সেইখানেই থাকিবে। যাহা নিতান্তভাবে উভয়বঙ্গের, তাহারই বিভাজন হইবে। মুসলিম লীগ দাবি করিয়া বসিল যে প্রেসিডেন্সী কলেজ এত বড়, এত মহান্ যে ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের হইতে পারে না; ইহার সব-কিছু সমান সমান ভাগ করিয়া অর্ধেক ঢাকা যাইবে। একদিন নলিনী সরকার একা আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। একটু অবাক হইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, সম্পদ্‌বণ্টনের যাহা বোঝাবুঝি করার তিনি নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে করিবেন। তিনি জানেন প্রেসিডেন্সী কলেজে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরানো গ্রন্থ আছে; আমাকে দেখিতে হইবে নাজিমুদ্দিনের অনুচরেরা লাইব্রেরির কোনও বই চালান করিতে না পারে।

২

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রজীবনে আমার তিনটি বিপর্যয় হয়—দুইটি নিছক পরাজয় আর একটি বিরোধীদের বিক্ষোভ। প্রথম দুইটিতে আমি সাময়িকভাবে খুব দমিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু পরবর্তীকালে ইহাদিগকে সাফল্যের সোপান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। দীর্ঘজীবনে কোন ক্ষেত্রেই একটা বড়-কিছু করিয়াছি এমন দাবি করিতে পারি না। সুতরাং 'সাফল্য' না বলিয়া বলিতে পারি এই দুইটি বিপর্যয় শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দের কারণ হইয়াছে। এখন এইসব ঘটনার কথা সবিস্তারে লিখিতেছি।

১৯২২ সালে আমরা আই-এ পাস করি। পূর্বেই বলিয়াছি আমার সহাধ্যায়ী ও পরি-

চিতদের মধ্যে প্রবোধরঞ্জন সেন ছিল সবচেয়ে মেধাবী। কিন্তু তাহার বাল্য ও কৈশোর যেভাবে কাটিয়াছে, যেভাবে শহরের উপকণ্ঠে থাকিয়াও সে অযত্নলালিত বন্য বিটপীর মত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্যই তাহার বুদ্ধির সঙ্গে আশ্চর্য সরলতা মিশিয়া গিয়াছিল। ম্যাটিকুলেশন এবং আই-এ'তে উভয় পরীক্ষায় আমার ঠিক নীচে প্রবোধের স্থান ছিল। আমাকে কোন একটা পরীক্ষায় নীচে ফেলিতে হইবে বলিয়াই সে ইংরেজিতে অনার্স লইয়াছিল। যুক্তিটা এত উদ্ভট যে সে নিজে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। আমি ক্যালেণ্ডারবিলাসী পিতার পুত্র ; সেই কারণেই হউক অথবা উচ্চবৃত্তির আর্থিক মূল্যের জন্যই হউক, আমিও পরীক্ষায় ভাল ফল করিবার জন্য খুব ব্যগ্র ছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল যে বিদ্যা বা বুদ্ধির চরম কষ্টিপাথর, সেই মোহ আমার সেই বয়সেও হয় নাই। যাহা হউক, বি-এ পরীক্ষায় আমাকে হারাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা তখন অনেক দূরে। সুতরাং আমাকে তাড়াতাড়ি জব্দ করিবার জন্য সে একটা ফন্দি আঁটিল। পরবর্তীকালে ইহার জন্য সে গভীর অনুতাপ বোধ করিয়াছে এবং হয়ত তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সঙ্গে এই অনুতাপের যোগ আছে। এই-সকল কথা ভাবিয়া এবং তাহার স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহা লিখা উচিত হইবে কিনা সেই বিষয়ে আমি দ্বিধাবোধ করিয়াছি। কিন্তু আমার কথা বলাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ; এই ব্যাপারটা না লিখিলে সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

প্রবোধ একদিন একটা চিঠি দেখাইল—তাহার জনৈক বন্ধু সতীশ যেন রবীন্দ্রনাথের একটা সদ্যপ্রকাশিত কবিতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কাছে ব্যাখ্যার জন্য পাঠাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কতকগুলি কাব্যগন্ধী শব্দের সমষ্টি—দুই-চারটি কথা হয়ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে উদ্ধৃত—যাহা প্রবোধ নিজে অন্য দুই-একজনের সাহায্যে রচনা করিয়াছিল। সে আমাদিগকে ডাকিয়া সবাই মিলিয়া এই তথাকথিত রবীন্দ্রকাব্যের অর্থ করার অভিনয় করিল এবং অর্থ ঠিক হইলে আমাকে ও চারুকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ইহা লিখিয়া ফেলিতে বলিল। চারুকে কেন টানিয়া আনিয়াছিল জানি না : কারণ চারু প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহার নীচে হইয়াছিল এবং আই-এ পরীক্ষায় আরও নীচে স্থান পাইয়াছিল। হয়ত তাহাকে লইয়া চরম পরিহাস করিবার উদ্দেশ্যেই নিয়তি তাহাকে চারুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল।

যাহা হউক, আমি ও চারু সকলের নির্ধারিত ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলে প্রবোধ তাহা লইয়া একটা সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অথবা পূর্বেই সংবাদপত্রের সঙ্গে তাহার যোগা-যোগ করা ছিল। কিছুকাল পরে সে ও তাহার পারিষদ্‌গণ চার নম্বর ওয়ার্ডে একটা ঘরে সভা বসাইল। আমরা কারণ জানিতাম না। সভায় পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত কাহিনীটির বিবরণ এবং আমাদের রচনা----যাহা সেই সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা পঠিত হইল। হেমেন উঠিয়া এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল যে, যে ব্যাখ্যা আমাদের দুইজনের বলিয়া লিখিত হইয়া-ছিল তাহা তাহার এবং উপস্থিত অন্য অনেকের ব্যাখ্যা ; ইহা আমার ও চারুর উপর চাপান শঠতা। আমার কথা পরে বলিতেছি। চারুকে আনিয়া প্রবোধ আখেরে নিয়তির ব্যঙ্গের পাত্র হইল। কারণ প্রবোধের জীবিতকালেই প্রবোধ দেখিয়া গিয়াছে যে জরাসন্ধ নামে চারু প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করিয়াছে এবং হয়ত আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র তাহার নামই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে থাকিবে।

আমি খুবই অপমানিত ও অপদস্থ বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই লাঞ্ছনার ফলে আমি নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে শিখিলাম এবং আমার আজীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে 'কি ও কেন' এই প্রশ্নের মীমাংসায় একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত হইলাম।

বিজ্ঞান পদার্থকে পরীক্ষা করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার সমস্ত রহস্যকে স্পষ্ট করিতে চায়, বস্তুজগতের উপর প্রাধান্যই তাহার সাফল্যের প্রমাণ, কিন্তু তবু এক রহস্যের অপনোদন শুধু আর এক রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে। সাহিত্য ও শিল্পকলার কারবারই অ-বাস্তব, কল্পনার জগতের সঙ্গে অথচ তাহাকেও বাস্তবজীবনের সত্য উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। বস্তুজগৎ কিম্ভূতকিমাকার, বিশৃঙ্খল, কিন্তু সাহিত্য ও শিল্প কিম্ভূতকিমাকারকে, কদর্যকে রূপ দেয়, বিশৃঙ্খলকে সুশৃঙ্খল করে। অনেকে সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া মনে করেন, কারণ উহার বস্তু বাহ্যরূপের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সাহিত্যের বিষয় শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক ; ইহাদের সম্পর্কের তাৎপর্য কি ? শব্দ কি অর্থের বহিরাবরণ, না তাহার অন্তরাত্মার অঙ্গ ? সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমরা যে প্রকরণ রচনা করি তাহার কি কোন সার্থকতা আছে ? প্রবোধ সেইদিন যে রূঢ় ধাক্কা দিয়াছিল তাহার জন্যই আমি প্রায় ষাট বছর যাবৎ এইসব মৌলিক সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত-বিব্রত আছি। আজ ষাট বছর আগেকার এই ঘটনার যে উল্লেখ করিলাম, প্রবোধ জীবিত থাকিলে ইহাতে খুব লজ্জিত হইত এবং বিচলিত হইত। কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার কাছে আমার ঋণস্বীকার না করিলে আমার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

৩

আমার দ্বিতীয় পরাজয় আরও বেশি মর্মান্তিক।

তখন আই. সি. এস. পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। তিন পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করিয়া এই চতুর্থ পরীক্ষায় আশা-ভরসা লইয়া পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইলাম। আমাদের পূর্ব-বঙ্গে একটা চল্‌তি কথা ছিল, যার যত টাকা তার তত বুদ্ধি। যে পরীক্ষায় কৃতিত্বের ফলে যত টাকার চাকুরি পাওয়া যায় সেই পরীক্ষার মর্যাদা তত বেশি। বাবা-মা দারুণ আঘাত পাইলেন, আমিও খুব দমিয়া গেলাম। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস কমিয়া গেল, এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় মনে হইল। অবশ্য এই অবসাদ ক্রমে ক্রমে কাটিয়া গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই পরাজয়কে নিয়তির আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আগে তো পরীক্ষা ব্যাপারটার স্বরূপ আলোচনা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছি যে পরীক্ষা ডেমোক্র্যাসির মত। ইহাদের সপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে অন্য যে-সকল পদ্ধতি আছে তাহা ইহা অপেক্ষা আরও কম নির্ভরযোগ্য। এই নেতিবাচক যুক্তি বাদ দিলে ইহাদের আর কোন মূল্য নাই। আমি যদি মনে করি এই পরীক্ষায় যাহারা আমাকে পরাস্ত করিয়াছে তাহারা আমার অপেক্ষা যোগ্য, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে যাহাদিগকে আমি নানা পরীক্ষায় হারাইয়া দিয়াছি আমি সেই কারণেই তাহাদের অপেক্ষা যোগ্য। আমাকে কেহ কোন দিন বিনয়ী আখ্যা দেয় নাই, সেই অভিমান আমার কখনও হয় নাই। বাস্তবজীবনেও দেখিয়াছি আই. সি. এস. রমেশচন্দ্র দত্তদের অপেক্ষা বি. সি. এস. বঙ্কিমরাই অধিক পরিশীলিতবুদ্ধিসম্পন্ন।

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা খুব মোটা কথা। আমি ব্যক্তিগত ব্যর্থতায় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, সেইজন্যই এই উপলব্ধিতে পঁহুছাইতে সময় লাগিয়াছিল। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা সঙ্গত হইবে। আমাদের সমসাময়িকেরা কেহ কেহ এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া এই স্বর্গীয় চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের অনেককেই পরে দেখিয়াছি এবং তাহাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত আছি। তাঁহারা ভাল লোক নহেন অথবা তাঁহারা বুদ্ধিহীন এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু যতটুকু জানি, তাঁহারা এক কৃত্রিম জগতে

বাস করিয়াছেন ; সৌভাগ্যক্রমে অকৃতকার্যতার দৌলতে সেই কৃত্রিম জগতে আমাকে প্রবেশ করিতে হয় নাই। আমি আমার জগতে—বিদ্যাচর্চা ও পারিবারিক কর্তব্যের জগতে রহিয়া গিয়াছি। পলাশী, উদয়নালা প্রভৃতি যুদ্ধে ছলে, বলে, কৌশলে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে প্রথম যুগের ইংরেজদের মত ক্ষমতাশালী ও নীতিবোধবর্জিত লোক বিরল। ইঁহাদের শিরোমণি হইলেন ক্লাইভ। ইঁহারা রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বণিকের মানদণ্ড পরিত্যাগ করিলেন না। গোলমাল বাধাইল রাজকর্মচারীরা। তাঁহারা শাসনকার্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্যের লোভ ছাড়িতে পারেন না। ইহাতে সরকারি কাজ ও কোম্পানীর বাণিজ্য —এই দুই ব্যাপারে অসামঞ্জস্য দেখা দিল। শুনিয়াছি ক্লাইভই পরামর্শ দেন যে সরকারি সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন এত বাড়াইয়া দিতে হইবে যে তাহারা নিজেরা বাণিজ্য করিতে প্রলুব্ধ হইবে না। সেই বেতনটা যে কত বেশি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় দেড়শ বছর পরে সমরেজ স্মিথের একটি ছোট্ট কথায়। ইঁহার অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থ— A Young Man's Country—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই মিথ্যাবাদী একটি সুন্দর সত্য কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি দেখিয়াছেন যে বেতনের অর্ধাংশ সঞ্চয় করিতে পারা যায়। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

লর্ড ক্লাইভের পরামর্শানুসারে সিভিল সার্ভিসের বেতনাদি বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজ সরকারের স্বরূপ বদলাইল না। সাম্রাজ্যের আসল লক্ষ্য ইংরেজ বণিকের মুনাফা, ইহা রক্ষার ভার সেনাবাহিনীর উপর : ভারতীয় গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের নিয়ামক হইল পুলিশ, সামরিক কায়দায় যাহাকে বলা হইত পুলিশবাহিনী বা police force। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা ঠাট-পাট বজায় রাখিবেন এই পর্যন্ত। নিরীহ ভারতবাসীরা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল ; এইজন্যই এক নিরক্ষর বৃদ্ধা খুশি হইয়া হাইকোর্টের জজের নিকট সামান্য সাহায্য পাইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'বাবা, আশীর্বাদ করি তুমি দারোগা হও।' সাহেব সিভিলিয়ানরা ইহা বুঝিতেন ; কেহ বিদ্যাচর্চা করিতেন, কেহ কেহ কিছুই করিতেন না, প্রায় সকলেই অর্থসঞ্চয় করিতেন এবং ইণ্ডিয়ান ভৃত্যদের বাহুল্যে খোশমেজাজে থাকিতেন। পূর্বে যে তরুণ সাহেবের উল্লেখ করিলাম তিনিও চাকরের বাহুল্যে সকৌতুক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার ছোট গ্রন্থের প্রধান চরিত্র দুই পুলিশ অফিসার—সুপার সামসুজ্জোহা ও তাঁহার সহকারী হাফিজুদ্দীন। সাহেবরা কদাচিৎ নিজেদের চাকুরির তাৎপর্য সম্পর্কে ভুল করিয়াছেন। যে দুই-একজন করিয়াছেন তাঁহারাও খেসারত দিয়াছেন। প্রকৃত বাদশাহী মেজাজের বড়লাট ছিলেন লর্ড কার্জ্জন, তাঁহার আমলে সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন কিচেনার—তাঁহারই অধীনস্থ সিপাহীসালার। একটা সাধারণ ব্যাপার লইয়া এই দুই ওমরাহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল ; কার্জ্জন স্বভাবতঃই স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন ; কিচেনারও নাছোড়বান্দা। ব্যাপারটা লণ্ডনে গেল ; কিচেনারই বহাল রহিলেন, কার্জ্জনকে দেশে ফিরিতে হইল। কার্জ্জন এই অপমান ভোলেন নাই ; বছর দশ-বার পরে যখন দার্দ্দানেলিশ রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির বিপর্যয় হয় তখন তাঁহার আত্মতুষ্টি দেশপ্রেমকে ছাপাইয়া গেল। তিনি তখন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে ডিঙ্গাইয়া সেনানায়কদের আস্কারা দিলে এই জাতীয় পরিণতি হইবেই।

সে যাহা হউক, আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ সিভিলিয়ানরা ইহা মানিয়া লইলেন এবং খোশমেজাজে সহজভাবে জীবন কাটাইয়া দিলেন। ভিতরে দারোগা ও পুলিশ আর বাহিরে সেনাবাহিনী। ইহারা শাসন করিবে আর তাঁহারা ফাইলে সহি করিবেন। কিন্তু ভারতীয় আই. সি. এস্.রা মনে করিলেন তাঁহারা বি. সি. এস. বঙ্কিমচন্দ্র

ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশবাসী হইতে পৃথক্ এক সম্প্রদায়, কিন্তু তাঁহারা তো সাহেব নহেন। সুতরাং তাঁহারা এক কৃত্রিম জগতের সৃষ্টি করিলেন, যেখানকার মোহমায়া হইতে স্বয়ং রমেশচন্দ্র দত্তও একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই ত্রিশঙ্কুরা ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু এক বাষ্পাচ্ছন্ন জগতের বাসিন্দা। ইঁহাদের কথা বিস্তারিতভাবে লিখিতে গেলে অনেক কাগজ ও সময়ের অপচয় হইবে। আমি শুধু আমাদের কালের দুইজন কৃতী পুরুষের কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

১৯৩৫-৩৬ সাল। আমি চাট্গাঁ কলেজ হইতে বদলি হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াছি। অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল মহোদয়ের হঠকারিতা ও অপূর্বকুমার চন্দ মহাশয়ের নির্বুদ্ধিতার জন্য আমার বেতনই আট্কাইয়া গেল। বেশ কয়েকমাস আমার সংসার পবিত্র বসু চালাইতেন। যদিও আমি তদ্বির-পটিয়ান্ নই তবু তখন আমাকে প্রায়ই সেক্রেটারিয়েটে যাইতে হইত। তখন বিনয় বসুদের অলিন্দযুদ্ধের পর সেক্রেটারিয়েটে সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশে খুব কড়াকড়ি ছিল। পশ্চিমপ্রান্তের সিঁড়ির কাছে বসিয়া রাজপুরুষ দর্শনের কারণ দর্শাইয়া ও নিজের পরিচয় দিয়া আধিকারিক কর্মচারীর হাতে আরজি দিতে হইত ; তাহার বেশ খানিকক্ষণ পরে অভিলষিতদর্শন অফিসারের চাপরাশির প্রহরায় উপরে যাইতে হইত। আগন্তুকদের বিনোদনের জন্য কতকগুলি পাক্ষিক বা মাসিক পত্র টেবিলে থাকিত--সেই পত্রিকাগুলি সবই নিম্নশ্রেণীর। এইরূপ একটি পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটি লেখা চোখে পড়িল। লেখাটা ইংরেজিতে, কিন্তু পত্রিকাটা বাংলা বা দোভাষী ; এমনও হইতে পারে যে বাংলায় গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারা যায় না বলিয়া বাঙ্গালী সিভিলিয়ান বাংলা কাগজে ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ অপেক্ষা তাহার পাদটীকা অধিক নজরে পড়ে। প্রবন্ধটা মামুলি, অকিঞ্চিৎকর। লেখক কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনের কথা লিখিয়াছেন। ওখানকার ছাত্রাবাসকে digs বলে, তাহার অভিভাবিকা ল্যান্ডলেডি—কেহ কেহ খুব স্নেহময়ী, আবার কেহ কেহ অর্থপিশাচ। সবই এইরূপ মহামূল্য আজেবাজে কথা, কেম্ব্রিজের কথা লিখিতেছেন কিন্তু রাসেল, জি. ই. মুর বা কিনসের নামগন্ধ নাই। ইহাতে বলিবার কিছু নাই। উল্লেখযোগ্য হইল ভয়াবহ ফুটনোট। আমি তখনই লেখকবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছি ; কপিরাইট কাহাকে বলে জানিতাম। বই না লিখিলেও সবাই জানে পরের দ্রব্য না বলিয়া নেওয়ার মত, বিনা অনুমতিতে পরের লেখা ছাপান যায় না। তবু এক সংবাদ-পত্র অন্য সংবাদপত্র হইতে ছোটখাট উদ্ধৃতি দিতে পারে। ইহা থামাইবার জন্য লেখক ভয়াবহ warning দিয়াছেন, তাঁহার রচনার কোন অংশ কেহ পুনর্মুদ্রিত করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কি প্রয়োজন ছিল দেবা ন জানন্তি। বিশেষ কারণ না থাকিলে ঐ বাজে পত্রিকাও এই ছাইপাঁশ ছাপিত না।

বছর পনের পরে দেখি আমার জনৈক বন্ধু ও এই সাহেব এক বাড়িরই বাসিন্দা। বাহিরের দরজায় দেখি (সরকারের অর্থে ছাপানো) ভয়ঙ্কর নোটিশ। এই ফ্ল্যাটের মাননীয় সাহেবের ফুরসত নাই, কেহ তাঁহাকে বাড়িতে বিরক্ত করিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাঁহারা ফোনে কথা বলেন এবং প্রয়োজন হইলে ফোন করিয়া দেখাসাক্ষাৎ হয়। একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুর বাড়ি প্রবেশ করিয়া দেখি প্রতিবেশী সাহেব সমাসীন। আমি পাশের ঘরে—একটা কাঠের পর্দার আড়ালে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে গল্প করিতে বসিয়া গেলাম। পাশের ঘরের কথাবার্তা কিছু কিছু কানে আসিল, বিশেষতঃ আমার বন্ধু একটু উচ্চকণ্ঠ। ইঁহাদের সাক্ষাৎ শেষ হইল এইভাবে : আমার বন্ধু সরবে বলিল, 'এইরূপ দরখাস্ত বিধানবাবুর অফিসে দিবেন ; ইহা লইয়া লোকে হাসাহাসি করিবে। সরকারের সবচেয়ে বেশি বেতনবাহী দুইটি পদের একটি আপনি বছর দশেক ভোগ

করিয়াছেন। এখন অনটনের দোহাই দিলে কেরানীরাও হাসিবে। বরং আপনার বর্তমান কাজের ফিরিস্তি দিয়া দরখাস্ত দিতে পারেন।' ঠিক হইল পরবর্তী দরখাস্ত আমার বন্ধুই মুসাবিদা করিয়া দিবেন। পরে শুনিলাম, ৩৫ বছর আয়াসের পর ঐ সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে দেশসেবার প্রেরণা জাগে। সুতরাং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক টাকা বেতনে কাজ প্রার্থনা করেন ; সঙ্গে সরকারি বাড়িতে থাকার সুবিধাও ভোগ করিবেন। ডাক্তার রায় তাঁহাকে বলিলেন যে কতকগুলি জেলা—চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর—সুশাসনের পক্ষে খুবই বড়। ইহাদের দ্বিখণ্ডিত করা উচিত এবং কিভাবে কোন একটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় এই কাজের ভার এই সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ অফিসার লইতে পারেন। অল্প কিছুদিন পরে তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতার অজুহাতে দেশসেবার কিঞ্চিৎ অনুপানের জন্য দরখাস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমার বন্ধু কি মুসাবিদা করিয়া দিয়াছিল জানি না। সদাশয় ডাক্তার রায় তাঁহাকে প্রতি তিনমাস অন্তর পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। পেন্‌শন যেমন পাইতে ছিলেন তেমনই পাইতে থাকিলেন। ইহার পরও কিছুকাল গেল ; এবার ডাক আসিল যমরাজের নিকট হইতে। জেলাবিভাগের অসমাপ্ত কাজ এবং প্রচুর ধনসম্পত্তি—ইহা আমার বন্ধুর কাছে শোনা—রাখিয়া দিয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। চব্বিশপরগনাকে দ্বিখণ্ডিত করার কোন প্রস্তাব তিনি দিতে পারিয়াছিলেন বা সত্যি সত্যি সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন কথা শুনি নাই। যাহা হউক তাঁহার সেই ইংরেজি প্রবন্ধটি কেহ চুরি করিয়াছে কিনা তাহার প্রতি তিনি নিশ্চয়ই পরলোক হইতে দৃষ্টি রাখিতেছেন।

কত লোকের কথাই বলিতে পারি। আর একজন ত্রিশঙ্কুর কথা বলিয়া শেষ করিব। ছাত্রজীবনে তাঁহাকে দেখিয়াছি হিন্দু হস্টেলে ; আমার দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। নীচের ক্লাসের ছেলেরা উপরের ক্লাসের ছেলেদের সম্পর্কে যতটা কৌতূহলী হয়, উপরের ক্লাসের ছেলেরা ছোটদের সম্পর্কে সেইরূপ কৌতূহল বোধ করে না। তবু পরিচয় না থাকিলেও আমার মুখ দেখিয়া থাকিতে পারেন। ১৯৪৬ সালে দেশবিভাগের সময় যে-সকল কমিটি হয়, একটির সদস্য ছিলাম আমি ; তাহার অন্যতর সদস্য ছিলেন কান্তিচন্দ্র বসাক। প্রায়ই বসাকের দুইজন সতীর্থ—তাঁহারাও কোন কমিটির মেম্বর—আমাদের ঘরে আসিতেন এবং গল্পগুজব করিতেন। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দেশবিভাগ ; আর সেখানে তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কথাই বেশি উঠিত, কারণ ইহাদের কোন্ অংশ কোন্ দিকে যাইবে তাহা জল্পনার বিষয় ছিল। দেখিলাম ইনি উত্তরবঙ্গের লোক। আমি এই সময়ের অব্যবহিত পূর্বেই চার বছর রাজশাহী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলাম। আমিও দুই-চার কথা বলিতাম। ইহার বেশি অবশ্য কোন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ কায়েম হওয়ার পর এই সম্প্রদায়ের দুই বন্ধুর বাড়িতে আমি অনেক গিয়াছি এবং এই সাহেবের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই গৃহস্বামী আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলে তবে ইনি আমার সঙ্গে কথা বলিতেন। ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

কিছুকাল পরে কোন-এক সময়ে এই সাহেবের মেয়ে অন্য একজনের মাধ্যমে দিন নির্ধারিত করিয়া তাহার প্রয়োজনে আমার কাছে আসিয়াছিল। তাহার কথা শেষ হইলে সে আর একটু বসিয়া থাকিবে বলিল, কারণ তাহার বাবা তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানকার নম্বরের বারবার পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি সহজে আসিতে পারিবেন তো? মেয়েটি বলিল যে তাহার বাবা আমাকে চিনেন এবং তিনিই আমার বাড়ির হদিশ দিয়াছেন বা পঁহুছাইয়া দিয়া অন্যত্র গিয়াছেন (ঠিক কোন্‌টা এখন মনে করিতে

পারিতেছি না)। খানিকক্ষণ পরে বাবা ঠিক আসিলেন, গাড়ি হইতে নামিয়া আমার বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, মেয়ে উঠিয়া বাবার সঙ্গে মিলিত হইল। যিনি আমাকে চিনেন অথচ চিনেন না, তাঁহাকে আমি আর অভিবাদন করিলাম না। এই সম্প্রদায়ের ব্যতিক্রম হয়ত আছে। একজন আমার বন্ধু করুণাকুমার হাজরা। তাহার কথা অন্যত্র বিশদভাবে লিখিয়াছি। ৪৫ বছর পূর্বে ইঁহাদের দলে ভিড়িতে পারি নাই মনে করিয়া খুব মুষড়িয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই এই উপলব্ধি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে—বাঁচিয়া গিয়াছি।

একটা কথা না বলিলে এই আখ্যান অসম্পূর্ণ থাকিবে। এখনও শাসকগোষ্ঠী (আই. এ. এস.) গঠিত হইতেছে। এখনকার ছেলেরা খুব ভুলচুক করে ; কারণ ভুল করা মানুষের মৌলিক অধিকার—fundamental right। সংসদ বা কোন আইনসভার সদস্য না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রতিদিন ইহাদের জবাবদিহি করিতে হয়, নানা দলকে খুশি করিতে হয়। কিন্তু তবু ইহাদের সঙ্গে কথা বলিতে ভাল লাগে। ইহারা বাস্তব সমস্যা লইয়া সংগ্রাম করে ; ইহারা বাস্তব জগতের মানুষ, মধ্যপথে লম্বমান ত্রিশঙ্কু নহে।

৪

আমার তৃতীয় বিপর্যয়টা অন্যরকমের এবং ইহার সম্পর্কে আজও আমার মত পরিবর্তন হয় নাই। সেইজন্যই ইহার কথা সবশেষে বলিতেছি। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণ হয়। তখন আমার কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনা দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। নূতন সম্পাদক কেহ নিযুক্ত না হওয়ায় নূতন সেশনের প্রথম সংখ্যা আমিই সম্পাদনা করি। সাধারণতঃ কলেজ ম্যাগাজিনে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছোট ছোট টিপ্পনীর সমাহার আকারে লিখিত হয়। দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে দেশব্যাপী এমন একটা সাড়া পড়িয়া যায় যে আমি একটা দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিলাম এবং পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা দেখিয়া অনুমোদন করেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশিত হইলে আমার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ছাত্র-সম্প্রদায় আন্দোলিত হইল ; অনেকে পত্রিকা ছিঁড়িয়া ফেলে, কেহ কেহ পত্রিকা জড় করিয়া আতসবাজি করে। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ পর্যন্ত বিচলিত হয়েন, অবশ্য তিনি যে-কোন বিষয়েই সহজে বিচলিত হইতেন ; ভাবপ্রবণ লোক বলিয়া আবার সমালোচকদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিতও হয়েন। আমার বন্ধুগণ কিছুটা শঙ্কিত হইল। ঠিক মনে নাই, বোধহয় কিছুদিনের জন্য আমি মধুপুরে গা-ঢাকাও দিয়াছিলাম। আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করিয়াছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলিয়াছিলেন—ঐ প্রবন্ধে নিন্দা, কুৎসা, অপবাদ কিছুই নাই ; দেশবন্ধুর কর্মজীবনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধলেখক মহান্ নেতার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু তখন শ্রীকুমারবাবুর কথা শুনিবার মত মনের অবস্থা ছাত্রমণ্ডলীর ছিল না। ৩০/৪০ বৎসর পর দুই-চারজন পুরানো ছাত্র—যাহারা তখন আই-এ, বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়াছে—আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রবন্ধের মনস্বিতায় মুগ্ধ হইয়া আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শুধু কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই ইঁহাদের কথাও বলিলাম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরিবারের আদি নিবাস তেলিরবাগ গ্রাম আমাদের গ্রাম বানারির আধক্রোশ আন্দাজ পশ্চিমে। এই পরিবারের সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন করেন কালীমোহন দাশ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ—যতদূর শুনিয়াছি অগ্রজের মত অত বড় উকিল না হইলেও ব্যবহারাজীব হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তবে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন সমাজ-

সংস্কারক হিসাবে। বড় ব্যারিস্টার সতীশরঞ্জন, বর্মা হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ যতীশরঞ্জন তাঁহার ছেলে এবং ডক্টর পি. কে. রায়, তস্য ভ্রাতা ডাক্তার ডি. এন. রায় এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার জামাতা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন দাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন। গ্রামে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল কে. এম. ডি এম. ইনস্টিটিউশন, এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, পাকা বাড়িও ছিল। কালীমোহন দুর্গামোহনের সম্পত্তি হইতে এই দুই প্রতিষ্ঠান চলিত ; কিন্তু আমাদের ছোটকালে যাহা দেখিয়াছি—বাড়ি, স্কুল, চিকিৎসালয় সবই জীর্ণ। চিত্তরঞ্জন অথবা সতীশরঞ্জনের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। গ্রামের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমরা গ্রামের লোকেরা ইঁহাদের সংবাদ রাখিতাম। অনেক গল্প-গুজব শুনিয়াছি। তাহার মধ্যে যাহা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা উপস্থাপিত করিতেছি। এই দাশ-পরিবারের প্রধান পুরুষ কালীমোহন , যেন তাঁহারই অনুকরণে অন্যান্য বাড়ির কর্তাদের নাম ছিল আনন্দমোহন, ক্ষিতিমোহন, প্যারিমোহন, রাজমোহন ইত্যাদি। আবার কালীমোহনের পুত্র মনোরঞ্জনের নামানুসারেই সতীশরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন, বসন্তরঞ্জন, সুধীরঞ্জন ও সরলরঞ্জন, এমন কি পরের পুরুষে চিররঞ্জন, ধ্রুবরঞ্জন, অনিলরঞ্জন, এই জাতীয় সব নামকরণ হইয়াছে। পরিবারের কেহ কেহ যে ভাগ্যান্বেষণে বর্মা গিয়াছিলেন তাহাও যেন একজোটে। কিন্তু ইহাদের মূল আস্তানা ছিল ভবানীপুরে ; সেইখানে গোত্রের প্রধানের বাড়ির নাম ছিল 'কালীমোহন আলয়'। আমি যখন ১৯২০ সালে পড়িতে আসি তখনও এই সাইনবোর্ড দেখিয়াছি। ঊনিশ শতকের শেষভাগে ভবানীপুরে অনেকটা গ্রামের আবহাওয়া ছিল। আমার সোনাজেঠামহাশয় দুর্গাশংকর সেন ভবানীপুরে থাকিয়া সরকারের অধীনে ছোট চাকুরি করিতেন। হয়ত সংলগ্ন গ্রামের অধিবাসী বলিযাই তাঁহার সঙ্গে দাশ-পরিবারের বেশ আসাযাওয়া ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে একটা চিঠি দিয়াছিলেন। বাবা অগ্রজের বাড়িতে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন ; তাঁহার সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল চিত্তরঞ্জনের ভগিনীপতি শরৎ সেনের। এই সুশিক্ষিত বিপত্নীক ভদ্রলোক নাকি খুব বিদ্যানুরাগী ছিলেন ; বাবা তাঁহার সঙ্গে সেইজন্য মিশিতেন।

চিত্তরঞ্জন বড় ব্যারিস্টার ছিলেন ; দেশহিতৈষণা, আত্মীয়বাৎসল্য, বন্ধুবাৎসল্য, কাব্যরচনা, সাহিত্যানুরাগ, দানশীলতা, সর্বোপরি স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এইসব বিচিত্রচরিত্র, বহুমুখীন প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সম্পর্কে নানারকম মত প্রচলিত হয়, নানারকমভাবে গুণকীর্তন হয়, কিছু কিছু লোকে নিন্দাও করেন, যদিও দেশবন্ধুর মত লোকের সম্পর্কে সেইসব নিন্দা অপরপক্ষের স্তুতিবাদে চাপা পড়িয়া যায়। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন, আমার সোনাজেঠামহাশয় বলিতেন যে, চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যবহারাজীব, কারণ তিনি সবচেয়ে বড় ফৌজদারী মামলা অর্থাৎ আলীপুর যড়যন্ত্র মামলা এবং সবচেয়ে বড় দেওয়ানী মামলা অর্থাৎ দুমরাঁও মামলা জিতিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের গণেশান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত রাজনৈতিক রচনাসংগ্রহে আমি চিত্তরঞ্জনের অরবিন্দ ঘোষ-সম্পর্কিত বক্তৃতা পড়িয়াছি এবং এক সময় আলীপুর কোর্টের এই বক্তৃতা আমার মুখস্থ ছিল। তবু আমার ধারণা যে ঐ মোকদ্দমা ব্যবহারাজীবের তীক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োগের ক্ষেত্র নহে, কারণ বারীন ঘোষ প্রভৃতি পূর্বেই স্বীকারোক্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার আমলের দুই-চারজন লোক এমনও মনে করিতেন যে সরকারি ব্যারিস্টার (বোধ হয় নর্টন সাহেব) চিত্তরঞ্জনের চেয়ে কম নৈপুণ্য দেখান নাই। আমাদের দেশে সাধারণতঃ রাসবিহারী ঘোষ ও মাদ্রাজের বাশ্যাম আয়েঙ্গার সবচেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা শুধু ব্যবহারাজীব নহেন, জুরিস্ট, যাঁহাদিগকে আমাদের দেশে বলা হইত স্মার্ত্ত। আমার সোনাজেঠামহাশয় যাই বলুন, কলিকাতায়

ভারতবর্ষীয় ব্যারিস্টারদের সর্বপ্রথমে নেতা ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে সেই স্থান লাভ করেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। দেশবন্ধু কবি ছিলেন ; তাঁহার 'সাগরসঙ্গীত' কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি নিজে বৈষ্ণব কবিতার ভক্ত ছিলেন ; তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কবিতায় 'প্রাণ' নাই। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন ; প্রাচীনপন্থী 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন। কেহ কেহ 'সাগর-সঙ্গীত'কে 'গীতাঞ্জলি'-র সঙ্গে তুলনা করিতেন। কিন্তু সেই তুলনা কাব্যবিচারের সাক্ষ্য বহন করে না।

দেশবন্ধু দানশীল, আত্মীয়বৎসল, বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন ইহা সুবিদিত। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ—ইঁহাদের বদান্যতাও কম নয়। মতিলাল নেহেরুও অতিশয় সমৃদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন ; মহাত্মাজীর কথায় তিনিও প্র্যাকটিস্ ত্যাগ করেন এবং স্বীয় প্রাসাদোপম বাসগৃহ দেশের জন্য উৎসর্গ করেন। চিত্তরঞ্জনের দানের মধ্যে একটু 'কিন্তু' ছিল। জ্যেষ্ঠতাত কালীমোহন দাশের পুত্র মনোরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কালীমোহনের স্ত্রীকে চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠভ্রাতা বসন্তরঞ্জনকে দত্তক দেওয়া হয়। সুতরাং বসন্তরঞ্জনই 'কালীমোহন আলয়' নামক গৃহের মালিক হয়েন। মনোরঞ্জনের কন্যা কুসুম তখনও জীবিত। মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে আমি বেশ কয়েকবার দেখিয়াছি তাঁহার নাতনীর বাড়িতে। বসন্তরঞ্জন অল্পবয়সে মারা গেলে তাঁহার স্ত্রী বিপত্নীক নন্দাই শরৎ সেনকে বিবাহ করেন এবং বোধ হয় দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত বিলাতে বসবাস করিতেন। শুনিয়াছি যে চিত্তরঞ্জনই ইঁহাদের বিলাতের ব্যয়ভার বহন করিতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি শর্তে ঐ বিরাট বাড়ি ও জমি দেশকে দান করিয়াছিলেন জানি না, হয়ত কোন শর্তই করেন নাই। কিন্তু কালীমোহনের নামটা উঠিয়া গেল। যিনি পিতৃঋণ শোধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তিনি 'গোত্রের প্রধান' জ্যেষ্ঠতাতের নামটা রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। সেই সময়েই গ্রামের বাড়িতে লোকে এই অবলুপ্তিতে দুঃখ প্রকাশ করিত। ইহার বেশ কিছুকাল পরে ১৯৩১ সালে, আমি এই বংশের আনন্দমোহন দাশের পুত্র সরলরঞ্জন দাশের কন্যাকে বিবাহ করি। শ্বশুরমহাশয় স্বভাবতঃই দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার নিকট-সম্পর্কের জন্য খুব গৌরব অনুভব করিতেন। কিন্তু একদিন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের পাশ দিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলাম ; তিনি মন্তব্য করিলেন, 'কাহার বাড়ি কে কাহাকে দান করে ?'

আমি যখন আমার বিতর্কিত সম্পাদকীয় লিখি, তখন এত কথা ভাবি নাই, সব কথা যে জানিতাম তাহাও নহে। অজ্ঞাতসারে কোন কোন কথা মনে উঁকিঝুঁকি দিতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে দেশবন্ধুস্তুতির আতিশয্যের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আচ্ছন্ন হইতেছে। সেইজন্য আমি অন্য-সকল অবান্তর বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার ভাবমূর্তিকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার বক্তব্য ছিল, তিনি দেশকে নূতন প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত করিয়াছেন ; তাঁহার স্পর্শে মরা গাঙে বান আসিয়াছে, দেশ নূতন চেতনা লইয়া জাগ্রত হইয়াছে। আমরা যতই তাঁহার কোন একটা ক্ষেত্রের কৃতিত্বকে বড় করিয়া দেখিব ততই সমগ্র মানুষটিকে ছোট করিয়া ফেলিব। আমি আমার সীমিত বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছিলাম এবং অক্ষম ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাই শরৎচন্দ্র অনবদ্য গদ্যে এবং রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় দুই ছত্র কবিতায় বলিয়াছেন। সেইজন্য আমি আজও অননুতপ্ত।

এই ব্যাপারটা হইতে আমি একটা সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলাম যাহা কালক্রমে দৃঢ় হইয়াছে। শ্রীকুমারবাবু অন্য এক প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের অবতারবাদের দেশ ; এখানে সমালোচনা সম্ভব নয়।' বাস্তবিক পক্ষে আমরা প্রশংসা ও নিন্দা করিতে

পারি কিন্তু সমালোচনা করিতে জানি না। সেইজন্যই আমাদের দেশের রাজনীতিতে 'আয়ারাম গয়ারাম'-এর এত প্রাদুর্ভাব, আমাদের সাহিত্যবিচারে মানদণ্ড গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রসসৃষ্টিও ব্যাহত হইতেছে, আমাদের দেশে মামলার শুধু যে নিষ্পত্তি হয় না তাহাই নহে, যে নিষ্পত্তি হয় তাহা আমরা মানিয়া লইলেও গ্রহণ করিতে পারি না, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আটপত্র অপেক্ষা নবমপত্র প্রাধান্য পায় এবং সর্বত্রই যুক্তি ও যোগ্যতা অপেক্ষা আমরা তদ্বিরকে প্রাধান্য দিই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১

১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রাস্তা পার হইয়া দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসে এম-এ ক্লাসে যোগদান করিলাম। প্রথম ক্লাস ছিল-হ্যামলেট সম্পর্কে। অধ্যাপক শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বক্তৃতা করিলেন ; ভাল লাগিল না। পরে অন্যান্য আরও বক্তৃতা শুনিলাম। যে কারণেই হউক, কাহারও বক্তৃতা পছন্দসই হইল না। বাস্তবিকপক্ষে যে দুই বৎসর ওখানে ছিলাম, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কাহারও সংস্রব মনে কোন রেখাপাত করে নাই। কিরণচন্দ্র ছিলেন ওখানে আগন্তুক। হাইকোর্টের ছুটির দিন শনিবার ওখানে আসিতেন। অন্যান্য উকিল ব্যারিস্টাররা ২০০ টাকা করিয়া পাইতেন। তিনি একেবারে অনাহারী। মনে হয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রভাবে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর সেই প্রভাবের জোরেই কোনক্রমে টিঁকিয়া ছিলেন। অবশ্য তাঁহার দুইটি বড় অপরাধও ছিল। ১৯১০ সালে ইংরেজির এম-এ পরীক্ষায় মহামতি আশুতোষের নির্বাচিত প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রশ্নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া যাঁহারা পরীক্ষা বর্জন করিয়াছিলেন কিরণচন্দ্র তাঁহাদের মোড়ল। তদুপরি একযুগ পর বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি প্রথমেই আশুতোষের বহু বিজ্ঞাপিত Knowledge-maker কারখানার নিন্দা করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

অনেককাল পরে ওখানে লেকচার দিতে গিয়াছি, সিঁড়ির গোড়ায় নূতন-ভর্তি-হওয়া ইতিহাসের ছাত্রের সঙ্গে দেখা। মুখ খুলিতেই সে বলিল, 'স্কুল হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াছিলাম, প্রেসিডেন্সী হইতে আবার স্কুলে ফিরিয়া আসিয়াছি।' এই সময়ই জনৈক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রেসিডেন্সী কলেজে বসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 'প্রায়ই জনরব শুনি, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হয় না। ইকনমিক্সে যত কম ক্লাস হয় ততই ছাত্রদের মঙ্গল।' আমরা তিনজনেই নিজেদের বিষয়ে গোল্ডমেডালিস্ট। আর্টস বিভাগের অনেক ছাত্রই প্যারিচরণ সরকার স্ট্রীট পার হইয়া এইরূপ আশাভঙ্গের শিকার হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সব অধ্যাপকই ভাল ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। আর এখানে হীরালাল হালদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সাতকড়ি মুখার্জি, জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী কৃতী অধ্যাপকরূপে পরিচিত ছিলেন। আমি নিজে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণাণের দার্শনিক রচনা-সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করি না, কিন্তু ইহা অস্বীকার করি না যে অনেক ছাত্র তাঁহার অধ্যাপনার সুখ্যাতি করিত, যেমন অনেক ইংরেজির ছাত্র অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের ব্যাখ্যানে মুগ্ধ হইত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যাহারা ইউনিভার্সিটিতে আসিত তাহারা মনে করিত যেন অনেক উঁচু হইতে ধপ করিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। আর্টস-ছাত্রদের তো কথাই নাই, আমি যতটুকু বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহাদের মধ্যেও অনুরূপ ক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছি।

'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?'

এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে বলিতে হইবে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভ্যাগম।

আশুতোষ সিনেটের সভ্য হইয়াছিলেন ১৮৮৯ সালে এবং মারা যান ১৯২৪ সালে। এই পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি ইউনিভার্সিটির সেবা করিয়াছেন এবং অধিকাংশ সময় ইহার উপর অচলকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি যখন হঠাৎ পাটনায় দেহরক্ষা করেন, তখন মনে হইয়াছিল—ইন্দ্রপতন হইল, বাংলার শিক্ষাজগৎ অনাথ হইল, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যেন অচল হইয়া পড়িল। তাঁহার স্মৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শোকসভা হইয়াছিল, অতবড় সভা ওখানে কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু উপস্থিত ছিলেন, আমার যতদূর মনে আছে শুধু জনারণ্যের জন্যই মিটিং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিল না। ইহার প্রায় চার দশক পরের কথা বলিতেছি। এই সময়ের মধ্যে ভাগীরথী দিয়া বহু জল গড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৪২ সালে একদিন কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছি, দেখিলাম, রমাপ্রসাদবাবু রাধাকৃষ্ণাণের নিয়োগের ফাইল প্রভৃতি খুঁজিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পিতার শতবার্ষিকীর জন্য তিনি উদ্যোগ করিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহারও এই বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখিলাম না ; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে ঔদাসীন্য আরও বেশি লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই জাতীয় 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ব্যাপারে' সদাচারী প্রিয়রঞ্জন সেনের সাহায্য সব সময়েই পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ রমা-প্রসাদবাবু এককালে তাঁহার উপকারী বন্ধু ছিলেন ; অন্য অধমর্ণ অপেক্ষা প্রিয়রঞ্জন সেনের স্মৃতিশক্তি প্রখর। আর এই ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অর্থবহ। তাহার কারণ বলিতেছি। প্রিয়রঞ্জনবাবুকে সম্পাদক করিয়া একটা জন্মশতবার্ষিক কমিটি সংগঠিত হইল। দিল্লীতে দরবার করিয়া বিশেষ কোন লাভ হইল না। শুনিয়াছিলাম, কর্তৃপক্ষ বিশেষ ডাকটিকিট বাহির করিতেই রাজি হইল না ; আবার ইহাও শুনিয়াছি, শেষ পর্যন্ত দিল্লীকে এই ব্যাপারে রাজি করান গিয়াছিল। ঐ পর্যন্তই। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহকে আশুতোষের জীবনী লিখিবার ভার দেওয়া হয়। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন এবং ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আশুতোষের ভাবমূর্তি এখন অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। প্রিয়রঞ্জন সেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং এই কমিটি সরকারি অর্থানুকূল্যে আশুতোষের গৃহে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধ্যক্ষ করিয়া ভাষাশিক্ষণের এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিল। এখানে কয়েকদিন ভাষাচর্চা হইয়াছিল, কিন্তু অচিরেই গৌরী সেনের দেওয়া তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় দীপ নিভিয়া গেল। ১৯২৪ সালে এক বিরাট ট্র্যাজেডিতে দেশ মুহ্যমান হইয়াছিল, কিন্তু শতবার্ষিক উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন অনিবার্য প্রহসনে পরিণত হইল :

And none so poor to do him reverence.

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের উল্লেখে আমার আর একটা কথা মনে পড়িল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ আমার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। ইতিহাসচর্চায় সে সম্পূর্ণভাবে যদুনাথ সরকারের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিত। আশুতোষের প্রতি তাহার বিরূপতা ছিল এমন আভাস পাই নাই। তবে চাকুরিরক্ষার প্রয়োজনে যদুনাথ সরকারের প্রতি অনুরক্তি সে কখনও প্রকাশ করে নাই। আশুতোষের প্রয়াণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নূতন, স্বল্পকাল-স্থায়ী আশুতোষ-বিরোধী দল গড়িয়া উঠে তাহার প্রকাশ্য প্রবক্তা ছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষের শতবার্ষিক স্মৃতি-তর্পণে ইঁহাদের অপেক্ষা উপযুক্ততর 'শান্তি-পাঠক' পাওয়া গেল না। সিংহমহাশয়ের রচিত জীবনী তথ্যনিষ্ঠ বচনা ; কিন্তু তাহা পাঠক-সমাজে আদৃত হইল না এবং ভাষাপরিষদও বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গেল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা ছাড়া অনেকগুলি উপনিবেশও ছিল। অন্যতম প্রধান উপনিবেশ হইল এশিয়াটিক সোসাইটি। তাঁহার বহু

উপাধির মধ্যে F.A.S.B. অন্যতম, যাহা সব সময়ই তাঁহার নামের সঙ্গে যুক্ত থাকিত। অধ্যাপক নরেন সিংহমহাশয়ের লেখা জীবনচরিতে দেখি—লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত তিনি ছিলেন ইহার 'Chronic President'। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে খুব বেশি ফল না হইলেও উদ্যোগ-আয়োজনের বহু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটি কিছু করিয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। ১৯৪২ সালে আশুতোষের জীবচরিতকার নরেন সিংহের কাছে সংবাদ পাইয়া আমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে যদুনাথ সরকার জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই। সেই সভার মনোরম অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। বহুতলবিশিষ্ট বাড়ির উপরিতলার হলে লিফটে করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে উঠিতে হয়। সভা যখন আরম্ভ হইল, তখন হল ভর্তি; সবাই আসিয়াছেন একেবারে ব্যক্তিগত প্রবর্তনায়। সবাই শ্রদ্ধা জানাইতে, বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহী। আপনা হইতেই সভার কার্য-পরিচালনায় শৃঙ্খলা আসিয়াছে। বক্তৃতাগুলিও সংক্ষিপ্ত, সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। কোন বিল্ডিং, হল, প্রফেসরশিপ যদুনাথ সরকারের নাম বহন করে না। শুনিয়াছি আধুনিক কালের তিনজন বড় ঐতিহাসিক—গিবন, র‍্যাংকে ও মমসেন। আমি র‍্যাংকের বই পড়ি নাই, কিন্তু অপর দুইজনের রচনার সঙ্গে পরিচিত আছি। যদুনাথ সরকারের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। আমি মনে করি তাঁহার রচনা গিবন ও মমসেনের রচনার সমগোত্রীয়। ইহাই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে এবং সেই দিনকার ঐ সভা সেই অমরত্বের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি। রাজা স্বদেশে ও স্বকালে পূজিত হয়েন কিন্তু বিদ্বানের কীর্তি নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বী বহন করে।

২

ছোটকালে যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছি, সেইখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ছাত্রদের কথা আলোচিত হইত। সেই আকাশে উজ্জ্বলতম দুইটি নক্ষত্র হইল—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ সেন। প্রিয়নাথ সেন ছিলেন আমাদের বাড়ির কাছের মানুষ, কিন্তু আশুতোষ কিংবদন্তী পুরুষ। শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়। আমাদের এম-এ ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন রজনীকান্ত গুহ; তিনি প্রিয়নাথ সেনের বয়োজ্যেষ্ঠ। আশুতোষের মৃত্যুর পর কলিকাতায় বহু শোকসভা হয়। একটা সভায় রজনীকান্ত গুহ বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমলে (১৮৮৮—১৮৯৩) দুইজন ছাত্র সবচেয়ে বেশি নামজাদা ছিলেন—আনন্দমোহন বসু ও আশু মুখার্জি। আশুতোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৮৮০) দ্বিতীয়, এফ-এ পরীক্ষায় (১৮৮২) তৃতীয়, বি-এ পরীক্ষায় (১৮৮৪) প্রথম এবং গণিতে এম-এ পরীক্ষায় (১৮৮৫) প্রথম হয়েন এবং পরের বৎসর (১৮৮৬) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

স্যার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডে একটি বিফলতা আছে যাহা কলঙ্কের সামিল। তিনি বি-এ পাস করিয়াছিলেন এ কোর্সে অর্থাৎ তাঁহার পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান (ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি) ছিল না। ১৮৮৫ সালে গণিতে এম-এ'তে প্রথম হইয়া পরের বৎসর ১৮৮৬ সালে তিনি ফিজিক্সে এম-এ পরীক্ষা দেন; সেই পরীক্ষায় দুইজন প্রথম শ্রেণীতে, দুইজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেন। আশুতোষের স্থান হইল দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয়। ইহা যে-কোন ভাল ছাত্রের পক্ষেই অগৌরবের কথা। আমার বাবা ও অন্যান্য বৃদ্ধরা যাঁহাদের কাছে আমি এই বিপর্যয়ের কথা শুনি তাঁহারা বলেন, যে পরীক্ষকের কাছে তিনি খুব কম নম্বর পান তিনি নাকি মাদ্রাজের এক সাহেব অধ্যাপক; আশুতোষ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন এবং সেই সাহেব নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে

নালিশ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা আমাকে এই কাহিনী বলিয়াছেন তাঁহারা আশুতোষের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করিয়াই ইহা বলিয়াছেন। তাঁহারা এই সম্পর্কে নিজেরা কিছু জানিতেন না। এই কাহিনী সত্য কি না তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মানিতে হইবে যে, আশুতোষ বি-এ'তে ফিজিক্স পড়েন নাই এবং তিনি যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন সেই পরীক্ষার পরীক্ষকরা লিখিয়াছিলেন, তিনি দ্বিবিধ গণিতে 'passed a brilliant examination' এবং ফিজিক্সে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ('acquitted himself very creditably')। স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে ইঁহারাও ফিজিক্স-সম্পর্কে তত সপ্রশংস নহেন। যাহা হউক, পরীক্ষা দিতে হইলে পরীক্ষকের রায় মানিতে হইবে যেমন মামলা করিলে বিচারকের রায় মানিতে হয়। যদি প্রতিবাদের কাহিনী সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা আত্মবিশ্বাস হইতে আত্মম্ভরিতার সমধিক পরিচয় দেয়। আর একটা কথাও ভাবিতে হইবে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-নির্ভর। যদি এই কাহিনীর কোন ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, পরীক্ষকের বিচার যিনি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহার ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষায় ন্যায়বিচার হইতে পারে কিনা।

৩

আশুতোষ হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কাজ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব পাইবার জন্য লালায়িত হইলেন এবং ভারতদরদী ভাইস-চ্যান্সেলার সি. পি. ইলবার্টকে অনুরোধ করিলেন। ইলবার্ট স্বদেশে চলিয়া গেলেও তিনি নবনিযুক্ত বড়লাটকে সুপারিশ করায় আশুতোষ মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সিনেটের ফেলো নির্বাচিত হইলেন। আশুতোষ অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও অতিশয় কৌশলী লোক ছিলেন। আমরা সবাই দেখিয়াছি যে সাহেবদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ থাকিলেও এদেশীয়দের কাছে তাহারা সম্মিলিত একশত পাঁচ ভাই। অভিজ্ঞ বৃদ্ধেরা আমাদের ছোটকালে উপদেশ দিতেন—সাহেবে সাহেবে ঝগড়া হইলে তাহার মধ্যে থাকিতে নাই, কারণ টুপীতে টুপীতে ভাব হইয়া যায় এবং তখন মারা পড়ে মধ্যবর্তী বেয়াকুব ভারতবাসী। যুবক আশুতোষের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ : স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি সীজার বা নেপোলিয়নের মত কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। পরাধীন ভারতবাসী হইয়া, সরকারি কর্মচারী হইয়া তিনি এমন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন যে শাসকসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে ভয় করিতেন এবং তাঁহার কাছে পদে পদে পরাভূত হইয়াছেন। প্রথম যখন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে এই-জাতীয় সব গল্প শুনিতাম, তখন ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন কালক্রমে নানা পুরানো কাগজপত্র দেখিয়া সেই-সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছি। সিনেটের সভ্য হওয়ার পরই শুভানুধ্যায়ী বুথ আশুতোষকে সিণ্ডিকেটের সভ্য হওয়ার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ডিরেকটর ক্রফ্‌টসাহেব তাঁহার বিরোধী ছিলেন, কারণ শিক্ষা শেষ করার পর ক্রফ্‌ট আশুতোষকে যে চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন, আশুতোষ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আশুতোষের অন্যতম মুরুব্বি জজ ওকেনলি ছুটিতে দেশে যাওয়ায় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রভাবশালী সভ্য জ্যারেট সাহেবকে আশুতোষের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। জ্যারেট সাহেবের অনুগামী কিছু মুসলমান সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের এবং আশুতোষের নিজের শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত সমর্থনে আশুতোষ সিণ্ডিকেটের সভ্য হইলেন। ক্রফ্‌ট সাহেব তাঁহাকে রুখিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন।

সিণ্ডিকেট ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি। কর্মচঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাই কেন্দ্রস্বরূপ। যেখানে যাহা কিছু করা হইবে সিণ্ডিকেটের অনুমোদন চাই, অথবা সরাসরি সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তে করা হইবে। নানা বিষয়ের নানা কাজ, নানা জায়গার নানা সমস্যা। অনেক সদস্যই নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন, হয়ত যে দুই-চারটি বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ আছে বা কোন স্বার্থ জড়িত আছে সেই-সকল বিষয়ে কিছুটা জানেন। কিন্তু আশুতোষের জ্ঞানের পরিধি সর্বব্যাপী ; সকল বিষয়েই তিনি সমান অভিজ্ঞ এবং প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি তাঁহার নখদর্পণে। সুতরাং অনতিকাল মধ্যেই এই নবীন সদস্য স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমার জনৈক নিকট-আত্মীয় ১৮৯৬ সালে ঢাকা কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন। ঠিক আগের বছরের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের কি অভিযোগ ছিল এবং তাঁহাদের বন্ধুরা আশুতোষকে লক্ষ্য করিয়া একটি দরখাস্ত প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে দিলেন। সাহেব দরখাস্ত যথাস্থানে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে না পাঠাইয়া ফেরত দিলেন : যে ডক্টর মুখার্জির বিরুদ্ধে এই-সব অভিযোগ করা হইয়াছে তিনি সিণ্ডিকেটের মেম্বর থাকুন আর নাই থাকুন, তিনিই সিণ্ডিকেট—'he is the Syndicate itself'। তখনও আশুতোষের ভাইস-চ্যান্সেলর হইতে দশ বছর বাকি।

কর্মজীবনের শেষার্ধে আশুতোষের একটা খেয়াল চাপে ইংরেজি পরীক্ষায় অনুবাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ান। আশুতোষ ইহা লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি করিতেন যে অনেকেই তাহা পছন্দ করিতেন না। তবে আশুতোষের জীবদ্দশায় তাঁহাকে সোজাসুজি বাধা দিতে কেহ সাহস পাইতেন না। সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই গ্রীক ও লাটিন পড়িয়া আসিয়াছেন এবং অল্পবিস্তর জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান জানিতেন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষও নানাভাষাবিদ্ ছিলেন। কিন্তু তিনিই আমাকে বলিয়াছেন যে, ইংরেজি বোর্ডে যখন ভার্জিল, দান্তে বা অন্য কোন ইউরোপীয় লেখকের রচনা পাঠ্য করার প্রশ্ন উঠিত, তখন তাঁহারা ইংরেজির অধ্যাপকেরা কেহ একটি বা কেহ দুইটি অনুবাদকের নাম করিতে পারিতেন, কিন্তু আশুতোষ পর পর বহু অনুবাদকের কথা বলিতেন। তিনি যে এই-সকল অনুবাদ পড়িয়াছেন কেহ তাহা প্রত্যাশা করিবে না, কিন্তু তিনি মোটামুটিভাবে ইহাদের গুণাগুণ জানিতেন—স্যার ইহাকে বলিতেন, bibliographical জ্ঞান। এবার আমাদের আমলের কথা বলি। আমি ১৯২৪ সালে বি-এ পাস করি ; ১৯২২ সালে আই-এ পাস করিয়া দেখি, আমাদের অন্যতম পাঠ্যপুস্তক গলস্‌ওয়ার্দির Justice। কিন্তু আমাদের পাঠ্য-তালিকায়ই আমরা প্রথম এই নাম দেখিতে পাই। এখন এই বই পুরানো হইয়া বাসী হইয়া গিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে তখন কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকানে এই বই পাইলাম না। শুধু সেন ব্রাদার্স বলিল, এই গ্রন্থকারের Tatterdemalion তাহাদের আছে। বিলাত হইতে Justice আসিলে আমরা পাইব। বই আসিলেও বিপদ কমিল না। শুনিয়াছি ঐ বইয়ের comilfo নামে একটা শব্দে রিপন কলেজের একজন অধ্যাপক আটকাইয়া গিয়া আমাদের হোমসাহেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে হোমসাহেব কিছুই বলিতে পারেন নাই। আমাদের যিনি পড়াইতেন তিনি বলিলেন, comely folk। বি-এ পরীক্ষায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন শুনিয়াছি (ডক্টর) ডান সাহেব ; তিনি এই বই হইতে কোন প্রশ্ন দেন নাই। অনুমান করি, তিনি এই আধুনিক নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এই বইটি পাঠ্য করিয়াছিলেন আশুতোষ নিজের প্রবর্তনায়। তিনি আমাদের বছর এবং আমাদের আগের বছরের জন্য একখানা বই পাঠ্য করিয়াছিলেন বেলজিয়ান লেখক মেটারলিঙ্কের The Buried Temple। The Blue Bird, Monna Vanna প্রভৃতি নাটকের লেখক রবীন্দ্রনাথের দুই বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯১১ সালে নোবেল প্রাইজ

পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আমরা শুনিয়াছিলাম এবং অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা খুব ভালভাবে আমাদের পড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এই বইটিও অনেকটা অপরিচিত ছিল।

আশুতোষ যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার অনেক কারণ—তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ব্যাপক কৌতূহল, অশ্রান্ত কর্মশক্তি ও কর্মকৌশল। তাঁহার অপর একটি কৌশলের কথা লিখিয়াছি। শাসিত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তিনিই একমাত্র লোক যিনি শাসকসম্প্রদায়ের একতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার আর একটি অস্ত্র আরও বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহাকে বলা যায় সাত্ত্বিক উৎকোচপ্রদান। কথাটা শুনিতে হাস্যকর অথবা বিভ্রান্তিকর মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা তাঁহার বাস্তববুদ্ধির সাক্ষ্য দেয় এবং দুঃখের বিষয় যে যাহা সাত্ত্বিক তাহা অনতিকালের মধ্যেই তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পরাধীন ভারতে শিক্ষককুলের দারিদ্র্য তাহাদের প্রধান সঙ্গী। 'হৈমন্তী'-গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার—সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা।' এই বর্ণনা তখনকার দিনে কলেজের অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য ছিল। প্রাইভেট কলেজের প্রফেসররা মাসিক একশত টাকা বেতনে প্রবেশ করিতেন এবং হয়ত দুইশত টাকায় শেষ করিতেন। অনেকে ততদূরও উঠিতে পারিতেন না। যাঁহারা খুব নামকরা ছিলেন, যেমন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জানকীনাথ ভট্টাচার্য, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা তিনশত হইতে চারশতের মধ্যে বেতন পাইতেন। তখন টাকার ক্রয়মূল্য বেশি ছিল। তবু মাসিক একশত টাকা আয়ে সংসার চালান কঠিন হইত। সরকারি কলেজে একটা গ্রেড ছিল অর্থাৎ কিছুকাল পর পর বেতন বাড়িবে : কিন্তু সেই কিছুকালটা অনেক সময় অনেক কাল হইত। ১৯১২ সালে এম-এ পাস করিয়া সেই বৎসরই শ্রীকুমারবাবু সরকারি কলেজে পাকাপাকিভাবে প্রফেসরি পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কোন দিক হইতেই তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন এবং সাত বছরের সিনিয়র ; তিনি চাকুরি পাইলেন শ্রীকুমারবাবুর তিন বছর পরে। বেতন উভয়েরই ২০০ু টাকা। শ্রীকুমারবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রথম বেতন বৃদ্ধি হয় ছয় বছর পরে।

এমতাবস্থায় শিক্ষকদের আয় বাড়াইবার একটি পথ প্রাইভেট টিউশনি। তাহার অনেক ঝামেলা এবং নিশ্চয়তাও নাই ; বড়দের পক্ষে ইহা তেমন মানানসইও হয় না। সবচেয়ে সম্মানজনক হইল পরীক্ষকের সাম্মানিক অর্জন। এখন বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে, বহু দাতার সৃষ্টি হইয়াছে, আবার টাকার ক্রয়মূল্য যেভাবে লাফে-লাফে কমিয়াছে সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক বাড়ে নাই। আমাদের আমলে আমরা চাতক পক্ষীর মত যেভাবে পরীক্ষার জলের জন্য হাঁ করিয়া থাকিতাম, এই আমলের শিক্ষাবিভাগের চাকুরিয়ারা তাহা হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। তখনকার দিনের একমাত্র দাতা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় আর পদ অনেক —পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা, ট্যাবুলেটর ইত্যাদি। পরীক্ষকের কাজের মধ্যে ক্ষমতার অনুভূতিও থাকে। স্বয়ং আশুতোষ এই লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ; তাঁহার নিজের বিষয় গণিতের কথা ছাড়িয়া দিলাম, প্রবেশিকা পরীক্ষায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলার তিনি প্রশ্নকর্তা থাকিতেন অথবা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রশ্নপত্র রচনা করিতে হইত ; সংস্কৃতেও তিনি প্রশ্ন করিতেন। তিনি আইনজ্ঞ—এই সুবাদে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম-এ পরীক্ষায় তিনি International Law ও ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম-এ পরীক্ষায় Comparative Politics-এ পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন অথবা নিজেকে নিযুক্ত

করিতেন। শেষেরটিতে ক্ষমতালিপ্সার সঙ্গে খানিকটা আত্মপ্রচারও আছে। Comparative Politics পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যাইবে যে এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতে হইলে নানা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আশুতোষের কি সেই পরিচয় ছিল?

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরণ অর্থাৎ ১৮৮৯ হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন এবং কর্তৃত্ব করিয়াছেন। এই প'য়ত্রিশ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দান-খয়রাতের নূতন নূতন ক্ষেত্র তৈরি হয়—একটি আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের পাঠ্যপুস্তক রচনা আর একটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক নিয়োগ। এই-সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া তিনি নিজের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য কায়েম করিলেন। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। যখনকার কথা বলিতেছি তখন অবশ্য এই বিষয়ে কিছুই ঝাপসা ছিল না। তাঁহার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের এন. এন. ঘোষ (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ)। তিনি নামকরা সাংবাদিক ও নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী ছিলেন ও ইংরেজি রচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রচুর খ্যাতিলাভ করেন। ইংরেজরাও তাঁহার ইংরেজি রচনার দক্ষতা স্বীকার করিতেন। নূতন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য হইল; ইহার এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস। একটু অনাবশ্যক হইলেও আশুতোষ ইতিহাস পরীক্ষায় কুড়ি নম্বর পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন ভারতে ইংরেজের অবদানের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করিলেন—মিস্টার এন. এন. ঘোষ England's Work in India নামে গ্রন্থ লিখুন ও সেইজন্য চার হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। এই প্রস্তাব সাহেবদের কাছে মুখরোচক হইল এবং এন. এন. ঘোষের মত একজন ডাকসাইটে সিনেটর—তাঁহাব হাতে একটা জনপ্রিয় পত্রিকাও আছে—খুশি হইলেন। এইখানে তিনজন গণ্যমান্য সিনেটর-সিণ্ডিকের কথা বলিব। ইঁহারা তিনজনই খুব শ্রদ্ধেয় লোক। যোগীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (ইনি জে. এন. দাশগুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত), জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। জে. এন. দাশগুপ্ত আশুতোষ অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। তিনি ১৮৮৬ সালে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পান এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সরকারি বৃত্তি লইযা বিলাত যান এবং অক্সফোর্ড হইতে ইতিহাসে দ্বিতীয় শ্রেণী অনার্স সহ বি-এ পাস করেন। অবশ্য অক্সফোর্ডে এম-এ না থাকায় ইহাই চরম পরীক্ষা। আমাদের দেশের বি-এ পরীক্ষার জোরে—প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইলেও—কেহ কলেজে পড়াইতে পারেন না। দাশগুপ্ত সাহেব দেশে ফিরিয়া ইংরেজির অধ্যাপনা করেন। তারপর—হয়ত ইংরেজিতে নিজের ডিগ্রি অসম্পূর্ণ বলিয়াই ১৯০৯ সাল হইতে পুরোপুরি ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েন। অথচ তিনি ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম-এ পর্যন্ত ইংরেজির পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক অথবা প্রশ্নকর্তা হইতেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের উপর কোথাও একছত্র লিখিয়াছেন এমনও জানি না। ইহা ছাড়াও তিনি ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক একাধিক বিষয়ের পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্তা হইতেন। ইহাও শুনিয়াছি তিনি ট্যাবুলেটরও ছিলেন। আবার তিনি রীডারশিপ লেকচারও দিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গেও আশুতোষের দাক্ষিণ্য জড়িত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েন, আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই। জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দাশগুপ্ত অপেক্ষা এক বছরের কনিষ্ঠ। ইনিও দোফসলী লোক। ইনি বি-এ'তে ইংরেজি ও ফিলজফিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছিলেন; এম-এ পাস করেন ফিলজফিতে। ফিলজফিতে এম-এ ক্লাস খোলা হইলে ইনি মাসিক একশত টাকা বেতনে লেকচারার হয়েন। কিন্তু ইংরেজিতে অনার্সের দৌলতে অনেক

দিন ইংরেজিতে ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষরি এবং পরে বি-এ পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। কখনও কখনও বি-এ অনার্স (ইংরেজি) এবং এম-এ (ইংরেজি)-তেও পরীক্ষক থাকিতেন এবং ইংরেজিতে ডক্টরেট থীসিসও পরীক্ষা করিয়াছেন। ইনি কার্লাইল ব্রাউনিঙ প্রভৃতি লেখক-সম্পর্কে সবেতন রীডারশিপ বক্তৃতা দিয়াছেন এবং কার্লাইল-সম্পর্কে বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়াছিল। আশুতোষ যে এই গ্রন্থ মুদ্রণ বা রীডারশিপ লেকচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বদান্যতার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু ইহা যে ছাপিয়াছিলেন তাহা পাঠকসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা প্রমাণ করে।

যোগীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহাধ্যায়ী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জানকীনাথ ভট্টাচার্য। ইঁহারা উভয়েই রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে কাজ করিতেন—রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষ আর জানকীনাথ প্রধান অধ্যাপক। শুনিয়াছি সেই আমলে 'রামজানকী' পদটি মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান—এই তিন বিভাগে এমন ব্যুৎপত্তি আর কোন লোকের মধ্যে দেখা যায় নাই। তিনি সিনেটের সদস্য হইলেও এবং কখনও কখনও দুই-একটা পরীক্ষায় পরীক্ষক হইলেও আশুতোষ কখনও তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন বা কখনও তাঁহাকে কোন মর্যাদা দিয়াছেন এমন কথা শুনি নাই। জানকীনাথ ভট্টাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড আশুতোষের রেকর্ড অপেক্ষাও ভাল। তিনি ইংরেজিতে এম-এ পাস না করিলেও ইংরেজিতে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন। আমাদের আমলে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের বাহিরে ইংরেজির সবচেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন রিপন কলেজের জানকীনাথ ভট্টাচার্য ও বঙ্গবাসী কলেজের ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপরে ইঁহাদের অপেক্ষা কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। যোগীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সকল পরীক্ষা আগলাইয়া রহিলেন আর জানকীনাথের নাম কোথাও দেখি নাই কেন? পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া সুস্থির হইয়া বসিতে না বসিতেই শুনি, জানকীনাথ মারা গিয়াছেন। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বঙ্গবাসী কলেজের যশস্বী অধ্যাপক। বঙ্গবাসী কলেজে আমি দুইদিন তাঁহার পড়া শুনিয়াছি—বিষয়, একদিন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা আর একদিন শেক্সপীয়রের নাটক রিচার্ড দি থার্ড (Richard III)। এই ইংরেজির গোল্ড মেডালিস্ট ও জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ীর পরীক্ষক হওয়া না হওয়ার একটা গল্প শুনিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি করিব।

গল্পটি শুনিয়াছিলাম অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে। স্যার শুধু বড় শেক্সপীয়র-ব্যাখ্যাতা ছিলেন না, বাস্তবজীবনের অনেক ঘটনাকে রং ফলাইয়া বলিবার জন্য শেক্সপীয়রকে টানিয়া আনিতেন। আমিও তাঁহাকে বুঝাইতে শেক্সপীয়রকে টানিয়া আনিতেছি এবং শেক্স-পীয়রের একজন বিদূষককে। স্যারের উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি এত বেশি ছিল যে এই তুলনায় কেহ কিছু মনে করিবেন না আর স্যার জীবিত থাকিলে তো খুশিই হইতেন। শেক্সপীয়রের Touchstone সম্পর্কে বলা হইয়াছে : in his brain,........./.........he hath strange places cramm'd/with observation....... ....' । স্যারের মস্তিষ্কে, স্মৃতিভাণ্ডারে দেখা-শোনা-পড়া বহু ব্যাপার গিজগিজ করিত। তিনি সত্যবাদী ও স্পষ্ট-বাদী লোক ছিলেন এবং রসাল গল্প বলিতে ভালবাসিতেন। মনে হয় দুই-চার জায়গায় ছোটখাট ভুলচুকও থাকিতে পারে। যতদূর সম্ভব অন্য সূত্র হইতে তাঁহার বলা কাহিনী মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছি : কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। এই সতর্কবাণী বোধ হয় অনেক স্মৃতিকথা-সম্পর্কেই প্রযোজ্য—৭৮ বৎসর বয়সে আরব্ধ আমার এই গ্রন্থ-সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্যার ললিতবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন : নিজে কোন কিছু লিখিলে ললিতবাবুকেই দেখাইতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি,

ক্যালেণ্ডার দেখা আমার পৈতৃক ব্যাধি—ক্যালেণ্ডারে দেখিতে পাই ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ অনার্সের বাঁধা পরীক্ষক ছিলেন, কখনও কখনও দুই পত্রেরও পরীক্ষক হইতেন। হঠাৎ তিনি বাদ পড়িলেন কেন? স্যার বলিলেন, ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার পরীক্ষক বোর্ডের শেষের যে মিটিং হয়, সেইদিন ট্যাবুলেটররা পরীক্ষার ফলের খাতা লইয়া আসেন (এই প্রথা আমাদের আমলেও প্রথম দিকে চালু ছিল) এবং সেইদিন পরীক্ষক বোর্ডের মেম্বররাও সম্পূর্ণ ফলাফল দেখিতে পান এবং তাঁহারা উহা নাড়াচাড়া করেন। ইহার পরই সিণ্ডিকেট বোর্ডের রিপোর্ট বিচার করেন এবং অনতিকাল পরই পরীক্ষার ফল বাহির হয়। সুতরাং বোর্ডের শেষের সভায় ট্যাবুলেটরের খাতা মেম্বরবাবুরা একটু দেখিয়া লয়েন, ইহাতে কেহ আপত্তিকর কিছু দেখে না এবং বোধ হয় আইনতঃ ইহাতে আপত্তি করাও যায় না। যাহা হউক, আনুমানিক ১৯১২—১৪ সালে অন্যান্য মেম্বররা যখন ঐ খাতাটা দেখিয়াছেন তখন ললিতবাবুও একবার উহা দেখিবার জন্য টানিয়া লয়েন। হয়ত খেয়ালের বশেই অথবা হয়ত আগে যাঁহারা দেখিতেছিলেন তাঁহারা একটু বেশি নাড়াচাড়া করিতেছিলেন—যে কারণেই হউক আশুতোষ ইংরেজিতে বলিয়া উঠিলেন, 'Well, the results are confidential.' ঠোঁটকাটা ললিতবাবু জবাব দিলেন, এই যে সবাই এতক্ষণ দেখিয়া গেলেন, তখন ইহা বুঝি confidential ছিল না? এইরূপ জবাবের জন্য আশুতোষ প্রস্তুত ছিলেন না। তবু একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে মনে করিয়া, ঐ কথাটা চাপা দিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন এম-এ ক্লাস খোলার কথা পাড়িলেন, ইংরেজিতে সুযোগ্য শিক্ষকের দুষ্প্রাপ্যতার কথা বলিয়া ললিতবাবুকে মাসিক ১০০, টাকার বিনিময়ে কয়েকটা লেকচার দিতে অনুরোধ করিলেন। এই বিশুদ্ধ ঘুষই আশুতোষের প্রধান অস্ত্র। ললিতবাবু জবাব দিলেন, 'আমাকে বলছেন? আপনার চারদিকে এত "প্যাটেল" থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন?' এই বলিয়া তিনি সহজভাবে চলিয়া গেলেন। এই জাতীয় প্রত্যুত্তরে অনভ্যস্ত আশুতোষ নাকি মন্তব্য করিলেন, 'Lalit thinks he is indispensable. All right. I'll run the English Department without him.' ইহার পর ললিতকুমারের সঙ্গে ইউনিভার্সিটির আর কোন সম্পর্ক রহিল না।

ইচ্ছামত ইউনিভার্সিটি চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং একটা উপায় হইল পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিক্রয়। ইহাতে আর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত। খুব নির্দোষ উপায়ে সমর্থকপোষণ করা যাইত। শুধু ইহাতে শিক্ষার মান খর্ব হইয়া যায়, কিন্তু তাহা লইয়া আশুতোষ কখনও মাথা ঘামান নাই। আমরা সবাই যাহা জানি আশুতোষের তাহা অজানা থাকার কথা নয়। যখন ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয় তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে আইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও ছিল এবং মেডিক্যাল কলেজও ইহার সন্নিকটে ছিল, যেমন এখনও আছে। সুতরাং প্রথম প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে, মেডিক্যাল কলেজকে যুক্ত করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হউক। ইহা যে সম্ভব হইল না তাহার প্রধান কারণ ডাফ ও অন্যান্য পাদ্রীসাহেবদের ঘোরতর আপত্তি। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের কুক্ষিগত হইতে দিলেন না। সেই জন্মলগ্ন হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাদ্রীসাহেবদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চ সরকারি কর্মচারী সাহেবগোষ্ঠী এবং পাদ্রীগোষ্ঠী—ইঁহারা এক জাতি হইলেও ইঁহাদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য রহিয়া গেল। পাদ্রীরা সাহেবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ আশুতোষ তাঁহাদের জন্য যথাযোগ্য দক্ষিণার ব্যবস্থা করিতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের এক অধ্যাপককে দিয়া শেক্সপীয়রের দুইখানা নাটক সম্পাদিত করাইয়া আশুতোষ তাহা পাঠ্য করাইয়া দিলেন। সাহেব তিন হাজার টাকা দক্ষিণা পাইলেন। বিগত চারশ' বছরে শেক্সপীয়রের কপালে অনেক দুর্ভোগ জুটিয়াছে;

এই সম্পাদনা—টীকা, ভূমিকা, শেক্সপীয়রের রচনার পরিশোধন—সম্পাদকের নির্বুদ্ধিতা ও আশুতোষের শিক্ষার প্রতি অবহেলার পরিচয় দেয়। যখন বাইবেলের প্রতি আশুতোষের দৃষ্টি গেল তখন তিনি তিনজন সুযোগ্য সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন—রেভারেণ্ড ডক্টর হাওয়েলশ (শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এবং অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। ইঁহারা তিনজনেই বিদ্বান, চরিত্রবান এবং বাইবেল-বিশেষজ্ঞ। প্রথম দুই-জন ক্রীশ্চান, হাওয়েলশ সাহেব তো রেভারেণ্ড, আর হেরম্বচন্দ্রের ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার নীতি-নিষ্ঠার মতই সুবিদিত। ঠিক হইল ইঁহারা চারখণ্ডে বাইবেল হইতে ছাত্রপাঠ্য অংশ সংকলন করিবেন এবং জন প্রতি হাজার মুদ্রা পারিশ্রমিক পাইবেন। হাওয়েলশ সাহেব ভূমিকা লিখিলেন, হরেন্দ্রকুমার প্রুফ দেখিলেন আর তিনজনে মিলিয়া সংকলন করিলেন। বইটি সম্পর্কে একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা পড়িবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র আর খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে আশুতোষ হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য মহৎ প্রয়াস করিলেন। এইরূপ তুচ্ছ অথচ বিরাট্ কাজের পরিসমাপ্তিতে খুশি হইয়া আশুতোষ বলিলেন, ইহার জন্য এক হাজার টাকা করিয়া পারি-শ্রমিক খুবই কম হইবে; ইঁহারা জনপ্রতি দুই হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। এই ঘোষণায় মৈত্র মহাশয়ের বিবেক একটু বিচলিত হইল; কারণ তিনি ভূমিকাও লিখেন নাই, প্রুফও সংশোধন করেন নাই; তিনি সহযোগীদের সমান অর্থ গ্রহণ করেন কি করিয়া? আশুতোষ নাকি তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন, 'Principal Maitra, my remuneration is not so much for services rendered as for services to be rendered.' এই যুক্তি অকাট্য। মৈত্রমহাশয় দ্বিরুক্তি করিলেন না। মৈত্রমহাশয় সিণ্ডিকেটের প্রায় স্থায়ী মেম্বর। দু-হাজারী গল্পটি স্যারের কাছে শোনা; ইহার যথার্থতা পরখ করা এখন সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। এই তিন বিবুধ-জনে মিলিয়া যে কিম্ভূতকিমাকার বাইবেল সংকলন করিয়াছিলেন তাহা অসহায় ছাত্রদের মস্তকচর্বণ ছাড়া আর কিছুই করে নাই। তদুপরি হাওয়েলশের ভূমিকা ছিল ভুলে ও অস্বীকৃত ঋণে ভারাক্রান্ত।

৪

১৯০৪ সালে যখন বড়লাটের আইনসভায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাস হয়, তখন আশুতোষ উহার সভ্য এবং সেই বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, পুঙ্খানু-পুঙ্খ জ্ঞান বড়লাট কার্জনের মনেও রেখাপাত করে। কার্জন এবং আশুতোষের মিলন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কার্জনও অক্সফোর্ডের নামকরা ছাত্র ছিলেন, যদিও তিনি সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছিলেন, যেমন আশুতোষ ফিজিক্সে সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছিলেন। উভয়েই বিদ্যাভিমানী; কিন্তু কার্জন রাজনীতি ও দেশশাসনকার্যে প্রবেশ করিয়া এবং আশুতোষ আইন ব্যবসায়ে নিমগ্ন হইয়া বিদ্যাচর্চা করিতে পারেন নাই। ইঁহারা উভয়েই বাগ্মী এবং কাহারও আদর্শের বালাই ছিল না। কার্জন বক্তৃতায় বলিলেন, '.........the ideal University should be amply and nobly housed; it should be well-equipped, and.........handsomely endowed. In these conditions it would soon create an atmosphere of intellectual refinement and culture......' অস্যার্থ—আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহ থাকিবে, ইহার পর্যাপ্ত উপকরণ থাকিবে এবং তদুদ্দেশ্যসমাধানার্থ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবে। তাহা হইলেই ইহা মানসিক উৎকর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে পারিবে। তিনি ইহাও বলেন যে এখানে সব রকমের বিদ্যা

শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা দান করিবেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হইবে .....where all knowledge is taught by the best teachers.....and where its boundaries are receiving constant extension)। এই সময়েই (১৯০৪) আশুতোষও এই সুরে সুর মিলাইয়া বক্তৃতা দিলেন যে মানসিক উৎকর্ষ বিতরণ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব এমন সংস্থার উপর ন্যস্ত করিতে হইবে যাহার সদস্যসংখ্যা খুব কমও হইবে না, আবার খুব বেশিও হইবে না। এই সংস্থা বড় না হইলে ছোট গোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তির অধীনে আসিবে ; সেইজন্যই মাঝে মাঝে সদস্যদের পরিবর্তন প্রয়োজন, আবার বেশি বড় হইলে সুচারু কাজ হইবে না ('.........powers should be vested in select bodies of fit persons, sufficiently small to be efficient, yet large enough in number to prevent degeneration into an intellectual clique, changing sufficiently from time to time to prevent the dominance of personal politics. . . .')।

প্রকৃতপক্ষে কার্জন ও আশুতোষ উভয়েই বাগাড়ম্বর করিয়া আসল উদ্দেশ্য ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, শিক্ষার বিস্তার বা উৎকর্ষ ইঁহাদের কাহারও মনে ছিল না। কার্জন উচ্চশিক্ষার মান এবং শাসনব্যবস্থার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য ৯০% সিনেটরকে মনোনীত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইসব প্রকাশ্য বক্তৃতার পশ্চাতে যেসব নথিপত্র তৈরি হইতেছিল, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা যাহাতে অপ্রচুর না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ('our policy') ছিল এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতে গিয়া তিনি ভাববাচ্যের প্রয়োগ করিয়াছেন ; এই দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিবেন এমন কোন আভাস দেন নাই। আশুতোষের বক্তৃতা ও পরবর্তী কার্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, তিনি যাহা বলিলেন ক্ষমতা পাইলে তিনি তাহার বিপরীত কাজই করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব যাহাতে কোন একজন ব্যক্তির হস্তগত না হয়, সেই বিষয়ে তিনি শ্রোতৃবর্গকে সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু আদ্যন্ত ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য তিনি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতি কার্জনও চাহেন নাই ; আশুতোষও চাহিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে তাহা উপলক্ষণ মাত্র এবং সার্বিক অবনতির সঙ্গে তুলনা করিলে নগণ্য।

সিমলা মহাফেজখানার ১৯০৪ সালের দলিল হইতে উদ্ধৃতি দিয়া আশুতোষের জীবনীকার নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ জানাইয়াছেন যে ঐ বৎসর যখন ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাস হয় তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে একটি গোপন সার্কুলারে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে মনোনয়ন ও নির্বাচন এমনভাবে সংশোধিত করিতে হইবে যাহাতে 'our views' অর্থাৎ ভারতসরকারের অভিমত প্রাধান্য পায় ; সোজাভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইউরোপীয় সদস্য ও সরকারি সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ঐ সময়ে কলিকাতায় একশত সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্য আসিতেন পদাধিকার বলে, আর বাকি ৯১ জন মনোনীত বা নির্বাচিত—ইহাদের মধ্যে ৪৪ জন ইউরোপীয় আর ৪৬ জন ভারতীয় ; অবশিষ্ট একজনের (হুইলারের) মাতা বাঙ্গালী (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) ও পিতা সাহেব। বড়লাটের কাছে আশুতোষের নাম প্রস্তাব করেন স্বরাষ্ট্রসচিব রিসলি সাহেব। এই কট্টর সাম্রাজ্যবাদী সাহেব আশুতোষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে আশুতোষের শাসনকালে তাঁহাদের নীতিই অনুসৃত হইবে এবং শিক্ষার মান নীচু হইবে না। ভারতবন্ধু বলিয়া সুপরিচিত স্যার হেনরি কটন—ইনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টও হইয়াছিলেন—যখন মান নীচু করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, তখন নাকি

আশুতোষ গোপনে রিসলি সাহেবের কাছে আপত্তি করিয়াছিলেন। কার্জনের উত্তরাধিকারী লর্ড মিন্টো আশুতোষকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন এবং আশুতোষ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইউরোপীয়দিগকে মনোনীত করিতে কার্পণ্য করেন নাই—১৯০৬ সালে একুশের মধ্যে তের, ১৯০৭ সালে এগার জনের মধ্যে আট, ১৯০৯ সালে কুড়ির মধ্যে এগার, ১৯১০ সালে সাতাশের মধ্যে এগার, ১৯১১ সালে তিরিশের মধ্যে সতের, ১৯১২ সালে উনিশের মধ্যে বার, এবং ১৯১৩ সালে তের জনের মধ্যে আট জন ইউরোপীয় ছিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে আশুতোষ স্যার হার্বার্ট রিসলি ও স্যার হেনরি কটন এই দুইজন জাঁদরেল সিভিলিয়ানের মধ্যে বিভেদ দেখিতে পাইয়াছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি খুব দক্ষতার সহিত এই জাতীয় বিভেদ পরিপুষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, রিসলি সাহেবের দুইটি আশার একটিও পূর্ণ হয় নাই। আশুতোষ সরকারি, বেসরকারি, ইউ-রোপীয় নেটিভ—কাহারও নীতি অনুসরণ করেন নাই, তাঁহার নিজের নীতিই অপরকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রভাবে শিক্ষার মানের খুব অবনতি হইয়াছে এবং সেই তরঙ্গ তখনই এত প্রাবল্যলাভ করিয়াছিল যে ইহা আর রোধ করা সম্ভব হয় নাই।

ইউরোপীয় ও সরকারি সভ্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তিনি সিনেটকে এমনভাবে করায়ত্ত করিয়াছিলেন যে ভারতসরকারের সেক্রেটারি শার্প সাহেব বঙ্গের ছোটলাটের উপর তাঁহার প্রভাবে শংকিত হইয়া পড়েন। সিনেটের কিছু কিছু সদস্য আশুতোষের বিরূপতা করিলেও অধিকাংশকেই তিনি বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এইজন্য সিণ্ডিকেটে একমাত্র তাঁহার অনুগত লোকেরাই সিনেট বা ফ্যাকলটি হইতে নির্বাচিত হইয়া আসিতে পারিতেন। এই বিষয়ে স্যার একটা গল্প বলিতেন ; তাহা এত রসাল যে এখন ইহার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব না হইলেও উদ্ধারযোগ্য। ইহার মধ্যে তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে ; স্যার বলিতেন তিনি নিজেই ইহার সাক্ষী। গল্পটি একজন বেসরকারি আইনজীবী সিণ্ডিক-সম্পর্কে। ইঁহার সঙ্গে আশুতোষের নৈকট্য ছিল পারি-বারিক ঘনিষ্ঠতার সামিল। বাস্তবিকপক্ষে আশুতোষের কলেজ-জীবনের বন্ধু বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রখ্যাত ছাত্র মহেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া সিণ্ডিকেটের আর কোন সদস্য আশুতোষের এত কাছে আসিতে পারেন নাই। আশুতোষ ইঁহার উপর এত দাক্ষিণ্য বর্ষণ করিয়াছেন যে তাহা লইয়া দুই-একটা এমন কথা শোনা যাইত, যাহা সুনামের পক্ষে হানিকর। বক্ষ্যমাণ গল্পটি অবশ্য আপন মাধুর্যে ভাস্বর। আশুতোষের এক শ্যালক, যোগমায়া দেবীর সহোদর কিনা বলিতে পারি না, তবে বয়ঃকনিষ্ঠ—ভগিনীপতির কাছে একটা তদ্বির করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত, কর্মব্যস্ত, সদা-পারিষদবেষ্টিত ভগিনীপতিকে নিরি-বিলি পাইতেছেন না। একদিন কোনক্রমে সেই সুযোগ জুটিয়াছে, কিন্তু সেই সিণ্ডিক উপস্থিত এবং বিশেষ কারণে শ্যালকবাবু আবার এই সিণ্ডিকমহাশয়ের উপরে বিরক্ত। তবু অনন্যোপায় হইয়া শ্যালক ইঁহার উপস্থিতিতেই কথাটা তুলিলেন। আশুতোষ পরিহাসভরে বলিলেন, 'ইহা তো রেগুলেশনে আটকায ; সিণ্ডিকেট এই নিয়মবিরুদ্ধ প্রস্তাব মানিবে কেন ?' প্রার্থী আরও পীড়াপীড়ি করিলে উপস্থিত সিণ্ডিক নাকি মোলায়েম সুরে বলিয়াছিলেন, 'সিণ্ডিকেট রাজি না হইলে ইনি কি করিবেন ?' শ্যালকের উত্তর গুরুমুখে যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি : 'আপনি থামুন তো মশায়! সিণ্ডিকেট ওঁর কথা শোনে বা না শোনে তাহা আমি ওঁর সঙ্গে বুঝিব। দেখুন, সূর্যের উত্তাপে পীড়া দেয় কিন্তু তাহা মাথায় করিয়া দিব্য হাঁটা-চলা করা যায়। কিন্তু সেই উত্তাপে যখন বালুকণা

তাতিয়া উঠে, তখন পায় ফোস্কা পড়ে ; তাহা একেবারে অসহ্য।' অন্য একদিন আশুতোষ নিজেই নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আশু মুখুজ্জে গ্লাসে করিয়া যে পানীয় দিবে, সিণ্ডিকেট বিনা বিচারে তাহা পান করিবে।' এই-সব কাহিনী কোন্‌টা কতখানি সত্য তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে প্রতিপক্ষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, মিত্রপক্ষকে পারিতোষিক দিয়া, বদান্যতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ করিয়া, সর্বোপরি অনন্য কর্মকুশলতার দ্বারা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা

১

আগেই বলিয়াছি যে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট পার হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়িতে আসিয়া আমি হতাশ হই এবং বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের মধ্যেও যে এই হতাশার ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাও জানাইয়াছি। অথচ ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গৌরব এবং ইহাই আশুতোষের প্রধান কীর্তি। এই কথা আমাদের আমলে এবং তাহার পরেও তারস্বরে বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিয়াছে। আশুতোষ যেভাবে এই কাজটি সমাধান করেন তাহা প্রতি পদে তাঁহার ধীশক্তি ও কর্ম-কুশলতার সাক্ষ্য বহন করে। কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কে ১৯০৪ সালে যে আইন পাস করেন তাহার একটি ধারায় লিখিত হইয়াছিল যে ইউনিভার্সিটির কাজ হইল শিক্ষাদান করা এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাহার প্রফেসর ও লেকচারার নিযুক্ত করার অধিকার থাকিবে। কার্জন সমাবর্তন উৎসবে ভাববাচ্যে ইহাও বলিয়াছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে 'honourably endowed' হইতে হইবে। ইহার আক্ষরিক অর্থ যাহাই হউক, মোটকথা এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ, লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি প্রভৃতির উপকরণ, প্রফেসর লেকচারারের বেতন প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং তাহার জোগান দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বড়লাট ; একশত সিনেটরের মধ্যে তাঁহার মনোনীত ও অধীনস্থ আমলা সদস্যই ৯১ জন। সুতরাং সরকার এই দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। আবার লর্ড কার্জন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এদেশের ধনীরা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে কিছুই করেন না। আশুতোষ প্রথমে অতি সন্তর্পণে কিছু লেকচারের ব্যবস্থা করিলেন—১৯০৭—১৯১০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসররা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিলেন, সংস্কৃত পণ্ডিতমহাশয়েরা কিছু কিছু অধ্যাপনা করিলেন এবং অগ্রসর শ্রোতা ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ রীডারশিপ লেকচারের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে ব্যয় সামান্যই হইল : কাহারও গায়ে লাগিল না। অথচ আশুতোষ বরদান করিতে পারিলেন। যে বড়লাট লর্ড মিন্টো আশুতোষকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার নামে এক প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করিলেন—ইকনমিক্সের মিন্টো প্রফেসর। আশুতোষের লক্ষ্য তখনও কেহ ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বড়লাটের নামাঙ্কিত প্রফেসর পদের জন্য অর্থদান করিতে কোন আমলাই আপত্তি করিতে পারেন না এবং কোন বড়লাটই মানবিক দুর্বলতার অতীত নহেন। ইহার পর ১৯১২—১৩ সালে তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ কুড়ি লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি দান করিলেন—লর্ড কার্জনের ব্যঙ্গোক্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর মিলিল। সুতরাং ১৯১৩ সালে আশুতোষ সরকারের কাছে আরও দুইটি প্রফেসরের পদ সৃষ্টির আবেদন করিয়া সফল হইলেন—একটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের নামে (দর্শন) আর একটি নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে। বড়লাট হার্ডিঞ্জ সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন আর রাজার নামে প্রফেসরের পদসৃষ্টিতে কে আপত্তি করিবে ? সুতরাং দুইদিক্ দিয়াই বলা যাইতে পারে যে এখন বিশ্ববিদ্যালয় 'honourably endowed' হইতে লাগিল।

আশুতোষ এবার আরও সাহসী হইয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনুকরণে কলিকাতায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের জন্য Regius প্রফেসর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। এতদিনে সাহেবদের টনক নড়িয়াছে। তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে রিসলি সাহেব বড়লাট মিন্টোকে বলিয়াছেন যে আশুতোষ তাঁহাদের অর্থাৎ ইংরেজ রাজপুরুষদের পলিসি কার্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু আশুতোষ সিনেটকে হাত করিয়া স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ; এখন রিসলির উত্তরসূরি বাটলার ও শার্পসাহেবের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইল। তাঁহাদের মতে. তিনি অতিশয় 'ক্রোধী' (angry), অকৃতজ্ঞ এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভারতসরকার ও বঙ্গসরকারের বিরোধ হইতেছে, বঙ্গসরকারের মধ্যেও লাটসাহেবের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা Lyon ও ডিরেক্টর Hornell-এর বনিবনাও হয় না : এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাত কাঠামোর মধ্যে ফাটল দেখা যাইতেছে। পরবর্তীকালে শোনা গিয়াছে যে লায়ন সাহেব ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের সঙ্গে যে বিরোধের ফলে জেমস সাহেবকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহারও মূলে আশুতোষ। এই গুজবের সত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে ইহা সত্য যে আশুতোষ যে 'teaching' ইউনিভার্সিটি কায়েম করিলেন তাহার প্রধান বাধা আসিয়াছিল জেমস সাহেবের নিকট হইতে।

রাজা অষ্টম হেনরীর প্রদর্শিত পথে Regius প্রফেসর নির্বাচনে বাধা পাইয়া আশুতোষ নিরস্ত হইলেন না। তিনি বঙ্গের প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নামে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করিলেন এবং স্থির করিলেন. প্রবেশিকা ও মাধ্যমিক পরীক্ষার সংস্কৃতের যে বই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিতেছিল. সেই বইয়ের আয় হইতে এই প্রফেসরের বেতন পাওয়া যাইবে ; সুতরাং সরকারের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। এই পথ অধঃপতনের পথ। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, কিন্তু সরস্বতীকে যদি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে সরস্বতীর মান অমলিন থাকিতে পারে না। এই রন্ধ্রপথেই উচ্চশিক্ষার নাম করিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন। তিনি একবার (১৯০৭) বলেন : 'বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার পরিমাপ কেবল সংখ্যার দ্বারা সম্ভব হয় না...ছাত্রদের সংখ্যা নয়, তাহাদের গুণগত উৎকর্ষই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার স্থান নির্ণয় করিবে। 'You cannot estimate intellectual work by numerical standards alone. ....It is not the number but the quality of students......that determines the position of the university.' আবার অন্য প্রসঙ্গে—সাত বৎসর বাদে—বলিলেন (১৯১৪) '...খুব বিস্তীর্ণক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে স্নাতকোত্তর বিদ্যা ছড়াইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে।' (....post-graduate instruction on an extensive scale was pre-eminently desirable.)। ১৯১৭ সালে আশুতোষ আর একটি প্রস্তাব আনিলেন : প্রবেশিকা, মাধ্যমিক ও বি-এ পরীক্ষার ছাত্রদের দেয় ফি বাড়ান হউক। এই বর্ধিত ফি'র দ্বারা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ব্যয়সংকুলান হইবে। ইহার পরই কলেজ হইতে এম-এ ও এম. এস্-সি পড়াইবার স্বীকৃতি তুলিয়া লওয়া হইল। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খুলিলেন যেখানে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সেই শিক্ষার ব্যয় বহন করিবে বহুসংখ্যক প্রবেশিকা, মাধ্যমিক ও বি-এ পরীক্ষার্থীর ফি' এবং এম-এ পাঠার্থীদের মাসিক মাহিনা এবং পাঠ্যপুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ। আশুতোষ আর একটি বিষয়ের উপর খুব জোর দেন (জামাতা প্রমথনাথ বলিতেছেন 'clung obstinately') ; স্কুলগুলি কি শর্তে অনুমোদন পাইবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইতে পারিবে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য,

এই প্রথা অবলম্বন করায় তাঁহার ব্যক্তিগত আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট হইল কিন্তু শিক্ষার মানের অধঃপতন হইল। ইহা কীর্তি না অপকীর্তি?

Regius প্রফেসরের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আশুতোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সরকারি হাঁস আর রৌপ্যডিম্ব প্রসব করিবে না। সুতরাং তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে প্রচুর পাঠ্যপুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অধিকসংখ্যক প্রবেশিকা প্রার্থীর উপর। তিনি ভান করিলেন, উচ্চশিক্ষার অনুকূল শর্তাদি চাপাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি অর্থের কাঙ্গাল তাঁহার মুখে এইসব বুলি অর্থহীন। আমি মাত্র দুই-তিনটি স্কুলের কথা বলিব। যে স্কুলে আমি প্রথমে পড়িয়াছিলাম, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সেখানে affiliation চলিয়া যাওয়ার পরেও ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়াছে ও সার্টিফিকেট পাইয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে অনতিদূরে একটা গ্রাম্য স্কুল ছিল। সেই স্কুল খারাপ নয়। কিন্তু সেখানকার কর্তৃপক্ষ ইন্‌স্‌পেক্টররা যাহা বলিতেন তাহার বিরুদ্ধ-আচরণ করিতেন, অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই পরিদর্শকের প্রতি অসৌজন্য দেখাইতেন। আশুতোষের সিন্ডিকেট পরিদর্শকের রিপোর্ট কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না। আসল কথা, পরীক্ষার্থীর ফি অব্যাহত থাকা চাই। এখানে আশুতোষের আর একটি বাড়তি লাভও হইত। লোকের মনে এই ধারণা হইত, এই স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালী বীর ইংরেজ ইন্‌স্‌পেক্টরকে তোয়াক্কা করেন না। সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনার মানও যে নীচে নামিতে লাগিল সেই ক্ষতি অবান্তর। তৃতীয় গল্প শুনিয়াছি বাবার কাছে। ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার শেষ বার। ইহার পরই নূতন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। অবশ্য তাহা আরও সোজা হইয়াছিল। টেস্ট পরীক্ষার পর অন্যান্য শিক্ষকরা বাবাকে ধরিয়াছিলেন—এবার আর কোন ছেলেকে আট্‌কান ঠিক হইবে না, সবাই কপাল ঠুকিয়া দেখুক। তাহাই করা হইল। স্কুলের ফলাফল আগে পরে যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইল। মজা হইল ইন্‌স্‌পেক্টর স্টেপলটন সাহেবের পরিদর্শনের দিন। স্টেপলটন সাহেবের সব জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া দেখার অভ্যাস ছিল। স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার খাতায় স্কুলের ফল সাঁটা থাকিত। তিনি টেস্টের নম্বরগুলি দেখিতে দেখিতে একটা জায়গায় থামিলেন। একটি ছাত্র ৬০০/৭০০ যাহাই পূর্ণসংখ্যা থাক তাহার মধ্যে সর্ব বিষয় মিলাইয়া মাত্র একশ' পাইয়াছে। সাহেব একটু রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এইরূপ ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি দেওয়া হইল কেন? বাবা অমনি উত্তর দিলেন, 'But, Sir, he has passed'. সাহেব মন্তব্য করিলেন, 'Go and show this record to the Vice-chancellor Dr. Mookerjee!'

১৯২২ সালে আমি বাবার কাছে পালং গিয়াছি। অনেকটা অতর্কিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ওখানে উপস্থিত—খাদি প্রচার প্রভৃতির জন্য। কে তাঁহার ভ্রমণসূচি ঠিক করিয়াছিল, কি সূত্রে তিনি ওখানে গেলেন তাহা জানিতাম না। তবে তাঁহার মত বিশিষ্ট অতিথিকে গ্রামে রাখিবার মত জায়গা হইল স্কুলবাড়ি। তাঁহার পরিচর্যার লোকের অভাব ছিল না। তবে সামনে বসিয়া গল্প করিতে কেহ সাহস পাইতেছিল না। আমাকেই সবাই আগাইয়া দিলেন। যাহা হউক আচার্যদেবই বক্তা, আমরা শ্রোতা—আমিই প্রায় সর্বক্ষণ এবং সবচেয়ে কাছে থাকিতাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নগামী মানের খুব নিন্দা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া নিন্দা করিলেন বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্রদের। তিনি একাধিকবার বলিলেন, 'জানিস্ বাহিরের লোকে ইহাদিগকে বলে 'Mookerjee's M.A 's'! পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঘাঁটিতে যাইয়া দেখিয়াছি, কলেজ হইতে বিশেষ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ ক্লাস তুলিয়া লাভ হইল এই যে সব বিষয়েই—Mookerjee's M.A.-র দল সৃষ্টি হইল। তখন যে-সমস্ত কমিটি হইয়াছিল আচার্য

রায় তাহাদের কোন কোন কমিটিতে ছিলেন ; সিনেটের সদস্য তো তিনি বটেই। কিন্তু সেইখানে তিনি কোন বিরোধিতা করেন নাই। আশুতোষের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও সম্মোহনী শক্তির কাছে ইঁহাদের আপত্তি ও যুক্তি যেন 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। এই-সব কথা যখন ভাবি তখন অনেককাল পরের একটা গল্প মনে পড়ে। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাকসাইটে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। একদিন কলিকাতার এক সাদাসিধে, জনপ্রিয় মন্ত্রীকে ঘিরিয়া পাড়ার যুবকরা নানা অভিযোগ করিল এবং তিনি থাকিতে নানা অন্যায়ের কেন প্রতিকার হয় না সরোষে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। মন্ত্রীমহাশয় যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহা যেমন শুনিয়াছি তেমনই উদ্ধৃত করিতেছি, 'কচ্ছপ দেখেছিস? আমরা কচ্ছপের মত গুটি গুটি করে পা ফেলে সেক্রেটারিয়েটে যাই। যাওয়া-মাত্র ডক্টর রায় আমাদের টেবিলের উপর চিৎ করে রেখে দেন। তখন আমরা ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছুঁড়ি। পাঁচটা বাজলে তিনি আমাদের উপুড় করে দেন। আমরা আবার গুটি গুটি করে পা ফেলে বাড়ি চলে আসি।' এই বলিয়া তিনি কৌটা খুলিয়া মুখে পান পুরিয়া দিলেন।

আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়াই এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের জন্য লেকচার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং ক্রমে ক্রমে দুই-চারজন সর্বসময়ের জন্য পাকা শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই-সকল শিক্ষককে বেতন দিতে হইবে এবং চাকুরি স্থায়ী করিতে হইবে। আশুতোষই পরীক্ষার এবং এম-এ ক্লাসে ভর্তির কর্তা। অধিক সংখ্যক ছাত্র পাইলে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সহজ হইবে ; সেইজন্য তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং জ্ঞানের পরিধি বিস্তীর্ণ করিবার জন্য নানা বিষয়ের অবতারণা করিতে লাগিলেন। তিনি এক সংস্কৃতেরই নয়টি বিভাগ (a) হইতে (i)—খুলিলেন এবং এই প্রসঙ্গে এই শূন্যগর্ভ উক্তি করিলেন, যদিও Sanskrit শব্দটিতে মাত্র আটটি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে একটা বিরাট সাম্রাজ্য বিধৃত হইয়া আছে। এইরূপ উক্তিতে পণ্ডিতমহাশয়রা খুশি হইলেন এবং তাঁহাকে 'সরস্বতী' 'শাস্ত্রবাচস্পতি', 'সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিলেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত গ্রন্থে জামাতা প্রমথনাথ যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯১৪ সালে আশুতোষ যখন ভাইস-চ্যান্সেলরের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন ইউনিভার্সিটির এম-এ ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ১১৭৮। আশুতোষ ছাত্রদের যে individual attention বা ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তাহার অন্তরায় হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতন প্রায় বার হাজার (১১,৭৫০), আর সরকারি অনুদান মাত্র বারশ টাকা (বার্ষিক ১,৫০০০)। তবু আশুতোষের প্রস্তাবে স্নাতকোত্তর অর্থাৎ এম-এ ও এম-এস্‌সি পঠন-পাঠন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা গঠিত হইল। ১৯১৭ সালে কলেজ হইতে এম-এ পড়ার দায়িত্ব ও অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। তখনও বেশ বিরোধিতা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিলেন যে, ষাট বছর আগে কলেজে পঠন-পাঠন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ষাট বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহা পরিত্যাগ করা ঠিক হইবে না। এই ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজেরই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হইল। অথচ ডিরেক্টর হর্নেল ও প্রিন্সিপ্যাল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহাতে সায় দিলেন : সেই-জন্য কেহ কেহ ইহাকে আত্মহত্যার সঙ্গে তুলনা করিলেন। সবচেয়ে কড়া কথা বলিলেন শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের এম-এ ক্লাসকে গিলিয়া খাওয়াকে নরমাংসলোলুপতা বা রাক্ষসবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিলেন।

আশুতোষ যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন তাহার সাত বছর পর ১৯২৪ সালে আমি ছাত্র হিসাবে ইহার প্রথম পরিচয় পাই, আর ১৯৬০ সালে অধ্যাপক হিসাবে ইহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি। এই ব্যবস্থার প্রধান আপত্তি ইহার শিক্ষাগত দুর্বলতা। ভারতবর্ষের

শিক্ষাজগতে আশুতোষের মত প্রবল ব্যক্তিত্বশালী ও কর্মকুশলী পুরুষ দ্বিতীয় দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষাজগতের মানুষই নহেন। বেশি অর্থলাভের মোহে প্রবেশিকা পরীক্ষাকে তিনি এত সহজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে স্যাডলার কমিশনের কাছে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি বারজনের মধ্যে এগারজনই বলিয়াছিলেন যে এই পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। সেই অনুপাতে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি-এ পরীক্ষাকেও হালকা করিতে হইল। এ যেন কাঁচা ভিতের উপর বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ রচনা করা। তারপর ভর্তির সময় কোনরূপ নির্বাচন করা সম্ভব হয় নাই, কারণ সেইখানেও অর্থাগমের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। যে গ্রেস নম্বর পাইয়া কোনরকমে বি এ পাস করিয়াছে, আর যে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে তাহারা যদি একই ক্লাসে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের পক্ষে উপযুক্ত কোন লেকচার দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। প্রথম কয়েক বৎসর আশুতোষ তাঁহাদিগকেই পোস্ট-গ্রাজুয়েট লেকচারার করিয়া দিলেন যাঁহারা এম-এ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করিয়াছেন। হীরালাল হালদার নাকি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, আশুতোষ একদল অহিরাবণ সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অহিরাবণরা দেখিলেন যে তাঁহারা যাহা শিখিয়াছেন তাহাই অধিকাংশ ছাত্র বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মান আর বাড়িল না। আর যাঁহারা বিদ্যাচর্চা করিয়া যাইতে লাগিলেন—তাঁহাদের সংখ্যা কম—তাঁহারাও সেই অনির্দেশ্য সূত্র বাহির করিতে পারিলেন না যাহার দ্বারা এই জনতাকে বাঁধিতে পারেন। ইহার ফল কি দাঁড়াইল বলিতেছি। আমি যখন এম-এ'র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি সাহিত্যবিষয়ক রচনাসম্বলিত একটা খাতা আমার কাছে থাকিত। তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন ; তিনি কলেজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আর আমি সম্পাদক। কখনও কখনও ঐ খাতার প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হইত। একদিন শ্রীকুমারবাবু খাতাটা চাহিয়া লইয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পর আমাদের জনৈক শিক্ষক বলিলেন, তিনি অমুক কবিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না পড়াইয়া সেই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িবেন। তারপর দেখি শ্রীকুমারবাবুর সেই খাতা! ভদ্রলোক অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ; প্রবন্ধটা যে তাঁহার নিজের লেখা তাহাও দাবি করিলেন না, কাহার রচনা তাহাও বলিলেন না। কিন্তু ইনি কষ্ট করিয়া প্রবন্ধটি বাড়িতে একবার পড়িয়াও আসেন নাই। পড়িতে পড়িতে কেবলই থতমত খাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Simplon Pass কবিতাটির উল্লেখ ছিল। তিনি গম্ভীরভাবে পড়িলেন—Simpleton Pass! আমি ছাড়া কেহই খেয়াল করা প্রয়োজন বোধ করে নাই। ক্লাসের পরে আমার ঠিক এক বছর আগের—6th year-এর এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। আমার কাছে থাকাকালে সেও খাতাটা পড়িয়াছিল। লজ্জা ও মজা—উভয়ই আমরা ভাগ করিয়া লইলাম। এইরূপ ঘটনা যে কলেজে না ঘটে তাহা নহে। কিন্তু সেখানে ইহা ধরা পড়িত। এম-এ ক্লাসের জনারণ্যে Simplon ও Simpleton-এ কোন পার্থক্য নাই।

২

আশুতোষ বহুভাবে বঙ্গদেশে শিক্ষার, বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। একটি হইল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। পূর্বেই জামাতা প্রমথনাথের হিসাব উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি—সরকার এক বছরে যে টাকা দিতেন, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের শিক্ষকদের এক মাসের বেতনেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইত।

আশুতোষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাধীনতা দাবি করিতেন—স্বাধীনতা তাঁহার প্রথম দাবি, তাঁহার দ্বিতীয় দাবি, তাঁহার শেষ দাবি। আর যে সরকারের কাছে তিনি টাকা চাহিতেছেন সেই সরকারের টাকার ব্যয়ের হিসাব না দেওয়ার দাবি তাঁহার প্রধান দাবি। যে সরকার টাকা দিবেন তিনি যদি এই দাবি না মানেন তাহা হইলে শিক্ষা ও স্বাধীনতা রসাতলে যাইবে। এই বিষয়ে সরকারের মনোভাব লাট কারমাইকেলকে লেখা বড়লাট হার্ডিঞ্জের একটি চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে : 'The financial condition of the University must be fully investigated....with a view to finding out....(what we have never obtained) a clear but exhaustive explanation of its position.' হার্ডিঞ্জ ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর এবং সরকারের প্রধান ছিলেন। আশুতোষের স্বাধীনতা এত সর্বব্যাপী যে যিনি টাকা দিবেন (ভারতসরকার) ও যাঁহারা টাকা দিতেছেন তাঁহাদের যিনি প্রধান (লাটসাহেব), তিনিও আয়-ব্যয়ের হিসাব জানিতে পারেন নাই। এই যে হিসাবকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখার প্রবৃত্তি, ইহার যাহা ফল হইল তাহা যেমন জঘন্য, তেমন পীড়াদায়ক ও কমিক।

বিধানচন্দ্র ইউনিভার্সিটির আয়ব্যয়ের বোর্ড (Board of Accounts)-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হইলেন তখনও সেই অবস্থা—প্রচুর ঘাটতি, প্রচুর চাহিদা অথচ কোন্ টাকা কোথায় যায় কেহ ঠিক বুঝিতে পারে না এবং পুঞ্জীভূত ঘাটতি সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটির খরচপত্র নির্বিঘ্নে চলিতেছে। বিধান রায় যে বাজেট এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করাইয়া আসিয়াছেন তাহার বাস্তবতা বা বৈধতা সম্পর্কে তাঁহার সন্দেহ হইয়া থাকিবে। সেইজন্য তিনি বিচারপতি রূপেন্দ্রকুমার মিত্রকে সভাপতি করিয়া এক কমিটি করিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব বিনয় দাশগুপ্তকে ইহার সদস্য করিলেন। কিন্তু অবস্থা যাহা ছিল তাহাই রহিল। বঙ্গ সরকারের ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবচেয়ে বড় বাজেট-বিশেষজ্ঞ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। দেশ-বিভাগের সময় পার্টিশন কমিটির মেম্বর হিসাবে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের কাজ আমি দেখিয়াছি ; পরে তিনি যখন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য হয়েন তখনও তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিয়োগপ্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার কাজ করিয়াছি। এইরূপ যোগ্য সরকারি কর্মচারী আমি দ্বিতীয় দেখি নাই। ডক্টর রায় দেখিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবপত্রে শৃঙ্খলা আনিতে হইলে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য প্রয়োজন। সুশীলবাবু কিছুদিন যাতায়াত করিলেন কিন্তু কোন সহযোগিতা না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অর্থসচিব বিনয় দাশগুপ্ত আমাকে বলিয়াছে যে, ডাক্তার রায়ের অনুজোপম সুহৃদ্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার সতীশ ঘোষ মহাশয়কে ডাক্তার রায় সস্নেহ ভর্ৎসনা করায় সতীশবাবু নাকি বলিয়াছেন, 'বাইরের লোককে কেন আমাদের কাগজপত্র দেখাইব ?' এই কথা শুনিয়াছিলাম বিনয় দাশগুপ্ত প্রমুখাৎ। ইহা সত্য কিনা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় দিন দিন কাজ চালাইয়া অগ্রসর হইলেও ইহার টাকাপয়সা কোথায় কিভাবে আছে কেহ জানে না। বহু টাকার সদ্ব্যবহার যে হয় না ইহা লইয়া নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ সব সময়েই উচ্চারিত হয় এবং তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাচ্যদেশীয় ক্লাসিক্যাল ভাষা হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া ঈশান অনুবাদমালা প্রকাশ করিবার জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই টাকা সুদে-আসলে এতদিনে লক্ষ টাকা হওয়ার কথা। একখানা বইও ছাপা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিবরণ চাহিয়া এবং আরও টাকা দানের প্রস্তাব দিয়া

স্যারের বিধবা পত্নী বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর পান নাই। অনুবাদের পাণ্ডুলিপি লইয়া একাধিক গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরনা দিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে আমার আত্মীয় ডাক্তার কুমুদনাথ সেন বিদেশগামী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষাধিক টাকা দিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করা হয় নাই। হাইকোর্টে যাইয়া সে মামলা জিতিয়াছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখনিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে নাই। সকলেরই লর্ড হার্ডিঞ্জের অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের রহস্য কেহই উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই।

৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে-সকল আইন কলেজ ছিল তাহাদের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। আশুতোষ তাহাদের দোষত্রুটি দেখিয়া যে কেন্দ্রীয় ল' কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তাহার সঙ্গে আমাদের সবিশেষ পরিচয় হয়। আশুতোষের নিজের ভাষায়ই বলিতে পারি, তিনি knowledge-maker বা জ্ঞানস্রষ্টাদের প্রতিই সমধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। ইহাদের প্রতি আগ্রহের আর একটি দিকও আছে। হাতের কাছে যে-সকল knowledge-maker আছে তাহাদিগকে চাকুরি দিতে পারিলেই তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িবে এবং ভাবী knowledge-maker-রা তাঁহার প্রসাদভিক্ষু হইবে। এইভাবে তাঁহার গৃহ সরস্বতীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

কেন্দ্রীয় স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ল' কলেজ খোলার কথাও তাঁহার মনে উদিত হইল। এই কলেজে তিনটি শ্রেণী থাকিল এবং ইহাদের ক্লাসগুলিকে যদি তিন ক্ষেপে—ঊষায় (early morning), প্রাতঃকালে (late morning) আবার সন্ধ্যায় (evening) নেওয়া যায়, তাহা হইলে কত উকিল, ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করা যায়! সর্বোপরি বন্ধু বিরাজমোহন মজুমদারের জন্য একটা চমৎকার ব্যবস্থা করা যায়। আশুতোষের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনচরিতে বিরাজমোহন মজুমদারের কাহিনী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—তাহার পরই হরিনাথ দে। বিরাজমোহন মজুমদার ১৮৮৯ সালে সায়েন্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি-এ পাস করেন এবং ১৮৯০ সালে কেমিস্ট্রিতে ছয় জন কৃতকার্য ছাত্রের মধ্যে নীচের দিকে স্থানলাভ করেন। ইহা সেই আমলেও আটপৌরে ব্যাপার। শুনিয়াছি, তিনি ভবানীপুরে এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করিতেন। আশুতোষ ১৮৮৮ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সাফল্যলাভ করিতে থাকেন, শুনিয়াছি তদপেক্ষা বছর-দশেক জ্যেষ্ঠ সারদাচরণ মিত্র যখন ১৯০২ সালে জজ নিযুক্ত হয়েন, তখন আশুতোষের নামও উত্থাপিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এম-এ পাস করিবার বেশ কিছুদিন পরে, ১৮৯৭ সালে বিরাজমোহন বি-এল পাস করিয়া হাইকোর্টে যোগদান করেন। ততদিনে আশুতোষের বেশ পশার হয়। ইহার পর নানা পথে বিরাজের গৃহে সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিরাজ করিতে থাকেন : তিনি ল' কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়েন। প্রিন্সিপ্যালকে প্র্যাকটিস করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। যদিও সেই আমলে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালই ল' কলেজ পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি প্র্যাকটিস্ করিতে পারিতেন। সাল ঠিক মনে নাই—১৯২৩/২৪ হইবে, আমি একজন উকিলের বাড়িতে মামলার তালিকায় দেখিতাম সব সময়ই বিরাজমোহন মজুমদার for the Deputy Registrar। ডেপুটি রেজিস্ট্রার কেন এত মামলা করেন এবং তিনিই-বা কেন কেবল একজন উকিলকে নিযুক্ত করেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম, কোন কোন মামলায় এমন

শরিক থাকে যাহারা হয় নিরুদ্দেশ বা উন্মাদ বা অন্য কোন কারণে মামলা করিতে অক্ষম। ইহাদের স্বার্থ ডেপুটি রেজিস্ট্রারের হেফাজতে ; তাঁহার কাছে একটা প্যানেল থাকে এবং সেই তালিকা হইতে তিনি উকিল নিযুক্ত করেন। সাধারণতঃ তিনি 'অনাথবন্ধু' বিরাজ-মোহনকেই নিযুক্ত করেন। যাহারা মামলা যুঝিতেছে তাহারাই মামলা করে ; ইঁহাকে শুধু হাজিরা দিতে হয়। যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিলাম. তবে একসময়ে অনেক মামলায় বিরাজমোহন মজুমদার for the Deputy Registrar—ইহা আমি দেখিয়াছি। কলিকাতা হাইকোর্টের মামলার প্রামাণ্য রিপোর্ট দেওয়াব জন্য আগে একটিমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল CWN (Calcutta Weekly Notes)। ইহার পর আর একটি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইল CLJ (Calcutta Law Journal)। ইহার সত্ত্বাধিকারী নাকি বিরাজ-মোহন মজুমদার। এখন (প্রধানতঃ) ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল বিরাজমোহন পরিচালিত ল' কলেজের বর্ণনা দিব।

আমি যখন এম-এ পড়ি তখন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে সব সময় থাকিতাম। সেই আমলে দারভাঙ্গা হলে পড়িবার জায়গা ছিল। চমৎকার ব্যবস্থা এবং বইয়েরও প্রাচুর্য। আমি সকালে সাতটায় স্নান করিয়া লাগোয়া হিন্দু হস্টেল হইতে ওখানে যাইতাম আর সন্ধ্যা সাতটায় ফিরিতাম : মাত্র ৩৭% ক্লাস করিয়াছি ; বাকি সময় ওখানে বসিয়া কাটাইযাছি। সকাল-বিকাল আইন কলেজে যাতায়াত দেখিতাম। শিক্ষকরা সাধারণতঃ আধঘণ্টা পরে যাইতেন। আগে আসিয়া কোন লাভ হইত না, কারণ তাহা হইলে ক্লাস একেবারে ফাঁকা থাকিত। এম-এ পড়া শেষ হইলে পুরো এক বছর ল' কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িয়াছি। একে এম-এ'র পড়া, তারপর তখন স্কলারশিপ শেষ হইয়া যাওয়ায় সকালে অর্থোপার্জন করিতে বাহির হইতে হইত। আইন কলেজে সব সময়ই কতকগুলি প্রবীণ ছাত্র থাকে, যাহারা সব খবর রাখে। তাহারা একটা শেকসনের নাম করিয়া দিল। ৮-৪৫ মিনিটে মুটকোর্ট, তারপর ৯-৪৫ মিনিটে ক্লাস ; ১০-৪৫ মিনিটে শেষ। আমার অধ্যাপক হাওড়া হইতে আসিতেন। তিনি নিয়মিতভাবে ১০-৫০ মিনিটে হাজির হইতেন। অমনি ছেলেরা চেঁচামেচি করিত। তিনি কোনরকমে নাম-ডাকার কাজ শেষ করিতেন, কারণ ছেলেরা বলিত—তাহাদের এম-এ ক্লাসে যাইতে হইবে। যেদিন মুটকোর্ট থাকিত, সেইদিন তিনি বাঁদিকে তাকাইয়া কাহাকেও বলিতেন, 'তুমি বাদীর পক্ষে সওয়াল কর', আর তখনই ডান দিকে তাকাইয়া অন্য একজনকে বলিতেন, 'তুমি প্রতিবাদীর সওয়াল কর।' ইহা বলিয়াই, তিনি নিজে খাতা খুলিয়া নাম ডাকিতে শুরু করিতেন। অন্যান্য ক্লাস যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক এইরকম প্রহসন নয় ; তবে সেইখানেও বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া দেখি নাই। আধঘণ্টা পার হইলে ক্লাস আরম্ভ হইত, কিছুক্ষণ শিক্ষক বক্তৃতা দিতেন ; যাহারা মন দিতেছে বলিয়া মনে হইত তাহাদের সংখ্যা ৫-৬ জনের বেশি হইবে না। যে ভিত্তির উপর এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইল সহজ পরীক্ষা, যাহাতে বেশি ছাত্র পরীক্ষা দেয় এবং তাহাদের দেয় 'ফি' হইতে ইউনিভার্সিটির আয় বাড়ে। শতবর্ষের ইতিহাসে দেখি ১৯২১—২২ সালে সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ইহার ষোল লক্ষই আসিয়াছিল ছাত্রবেতন ও পরীক্ষার্থীদের ফি হইতে। আমার এক বন্ধু এখন আধা-সন্ন্যাসী হইয়া কোন সাধুবাবা বা সাধুমার আশ্রমে যোগ দিয়াছে ; কাজেই তাহার নামটা আর করিলাম না। সে ছিল খুব তীক্ষ্ণধী এবং রোগা ও দুর্বল। অসুস্থতার জন্য ল' কলেজে কোন রকমে উপস্থিতি রক্ষা করিয়া সে ইন্টারমিডিয়েট ল' পরীক্ষা দিয়াছিল। পরে সে বি-এল.ও পাস করিয়াছিল। পড়াশোনা খুব কম করিত, কিন্তু হস্তাক্ষর ছিল মুক্তার মত। ইন্টারমিডিয়েট ল' পরীক্ষায় বোধহয় সম্পত্তি ও সম্পত্তি-হস্তান্তর-বিষয়ে পরীক্ষা

হইত। সে আমাকে তাহার পাসের চাবিকাঠি বলিয়া দিল। যে প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের আভাস আছে এইরূপ প্রশ্নই সে নির্বাচন করিয়াছিল এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্নস্থিত বাক্যগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিয়া আসিয়াছিল। প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু ফল বাহির হইলে দেখা গেল, কিছু না জানিয়া এবং প্রকৃত-পক্ষে কোন উত্তর না করিয়া সে পাস করিয়া ফেলিয়াছে!

এম-এ ক্লাস ল' ক্লাসের মত অতটা খেলো ছিল না। কিন্তু সেখানেও পঠন-পাঠনের হাওয়া ছিল না। আশুতোষ তাহা চাহেন নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে। তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অহমিকা। তিনি যে-সকল প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা কি কাজ করিবেন নিজেরাই ভাল করিয়া জানিতেন না। ১৯২৯ সালে তাঁহাদের কর্তব্য নির্ধারিত হয়; কিন্তু এম-এ ক্লাস স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার অনেক আগে। আমাদের সময় গণেশপ্রসাদ বিশুদ্ধ গণিতের হার্ডিঞ্জ প্রফেসর ছিলেন। আমাদের পাশের ঘরে এই ক্লাস হইত। সেইজন্য এই বিষয়ের সকল অধ্যাপকেরই মুখ চিনিতাম। তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ ননীগোপাল দাসকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, সে গণেশপ্রসাদের নাম শুনিয়াছে বটে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি যে বিশুদ্ধ গণিতের অধ্যাপক ছিলেন, তাহা ননী-গোপাল এম-এ পাস করার ৫৫ বছর পরে আমার নিকটই প্রথম শুনিল। গণেশপ্রসাদ সম্পর্কে আশুতোষের খুব উচ্চ-ধারণা ছিল, কারণ তিনি নাকি এলাহাবাদ, কলিকাতা ও গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড অবশ্য তেমন কিছু নয়—কারণ দেখিতে পাই তিনি কোনক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম-এ পাস করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আশুতোষ তাঁহাকে প্রথম আনেন মিশ্র বা ফলিত গণিতের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে। অল্প কিছুদিন হইল একদিন রেডিওতে মেঘনাদ সাহা সম্পর্কে একটি কথিকা শুনিলাম। সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহা গণিতের লেকচারার হিসাবেই যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু গণেশপ্রসাদের দাপটে টিঁকিতে পারেন নাই বলিয়া পদার্থ-বিদ্যা বিভাগে চলিয়া গেলেন। মিশ্রগণিত বিভাগে গণেশপ্রসাদের আর একটি কৃতিত্বের কথা বলিলেই টিচিং (teaching) ইউনিভার্সিটিতে তাঁহার উপযোগিতা বোঝা যাইবে। ১৯২৬ সালে আমার সতীর্থ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য এম. এস্-সি. পরীক্ষা দেয়। সত্যেন বসু ও মেঘনাদ সাহা চলিয়া যাইবার পর গণিতের নামজাদা অধ্যাপক রহিলেন নিখিল-রঞ্জন সেন। এম. এস্-সি.-র জন্য গৌরীকান্ত বিশেষ বিষয় হিসাবে বাছিয়া লইল Elasticity; পূর্বে হেমেনের কথা বলিয়াছি, তাহার বিষয় ছিল Theory of Tides। Elasticity-তে গৌরীকান্ত একমাত্র ছাত্র; মেধাবী বলিয়া তখন তাহার খুব নাম ছিল এবং সে ৮২%'র বেশি নম্বর পাইয়া 'হেমচন্দ্র প্রাইজ' পাইয়াছিল। এই পুরস্কার ঈশান বৃত্তির মত; সমস্ত বিষয়ের মধ্যে যে প্রথম হয় তাহাকেই ইহা দেওয়া হইত। গৌরীকান্ত আমাকে বলিয়াছে, Elasticity-র দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায়—ইহাই শেষ পত্র —বসিয়া সে প্রশ্নপত্র পড়িয়া হতবাক, কারণ প্রায় কিছুই লিখিতে পারে না। কোনক্রমে দেড়খানা প্রশ্ন লিখিয়া নির্দিষ্ট একঘন্টার পর গার্ডের হাতে খাতা দিয়া সোজা নিখিলবাবুর কাছে চলিয়া গেল। নিখিলবাবু যাহা বলিলেন তাহা পুনরুক্তিযোগ্য। (সেই আমলের) গণিতে প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী অবিনাশ বসু তখন কন্ট্রোলার এবং তিনিই মিশ্রগণিত বিভাগের বোর্ডেরও সভাপতি। প্রশ্নপত্রের প্রুফ দেখিতে তিনি তাহা নিখিলবাবুকে দিয়াছিলেন। নিখিলবাবু প্রশ্নপত্র পড়িয়া হতভম্ব হইয়া অবিনাশ বসুর কাছে চলিয়া আসেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা গণেশ তখন নিখোঁজ; তাঁহার তো ক্লাস নেওয়ার দায় নাই! এদিকে প্রশ্নপত্র

আটকাইয়া রাখা যায় না। তখনই নিখিলবাবু পরীক্ষার্থীর অবস্থা আন্দাজ করিয়াছিলেন। কি মনে করিয়া জানি না—গৌরীকান্ত নিজেই বলিতে পারে না—গণেশপ্রসাদ গৌরীকান্তকে ২৫ দিয়াছিলেন ; ২৪ দিলে তাহা শূন্য হইত।

৪

আবার বলিব আশুতোষ শিক্ষাজগতে প্রভুত্ব করিলেও তিনি এই কাজের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে অযোগ্য ছিলেন। যোগ্যতা অর্জন করিতে তিনি ইচ্ছাও করেন নাই। যোগ্য হইলেই দায়িত্ববোধ আসে এবং যথেচ্ছাচারে বিবেকের বাধা আসে। পূর্ববর্তী এক প্রসঙ্গে আমি নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়াছি। নেপোলিয়ন নাকি কোথাও বলিয়াছেন, 'ফরাসী বিপ্লবের উদ্ভব হইয়াছিল অহমিকায় ; স্বাধীনতালাভ একটা অছিলামাত্র' ('It was vanity that made the Revolution ; liberty was only the pre-text.........' Margaret Trouncer : *Oriflamme*).

আশুতোষও শিক্ষা, গবেষণা, শিক্ষাজগতের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতির কথা বলিতেন। কিন্তু তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্মপ্রচার। তাহার জন্য সুশিক্ষা জবাই হউক, গবেষণা কলঙ্কিত হউক, পরীক্ষায় নয়-ছয় হয় হউক,—তিনি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না।

আগেই বলিয়াছি তিনি খুব নির্দোষ সাত্ত্বিক উৎকোচ প্রদান করিতেন—পরীক্ষকবৃত্তির সুবিধাজনক বিতরণ। আর একটি হইল নিছক স্তুতির অর্ঘ্যদান। ইহা আমাদের দেশের সনাতন রীতি। আশুতোষ দাতা ; তাঁহার কাহাকেও স্তুতি করিতে হইত না। শুধু দীনেশচন্দ্র সেনকে বিশেষ কারণে তুষ্ট রাখিতে হইত। সেই কাহিনী পরে বলিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের কালে জন্ম নিলে, একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতেম চেয়ে কাননঘেরা বাড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। এখানকার প্রার্থীদের অর্ঘ্য, স্তুতি ও অকুণ্ঠিত সমর্থন। ধরা যাক প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারটা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাকি এই পদের উপর নজর ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আশুতোষের বিরোধী ছিলেন ইহা সবাই বলাবলি করিত এবং আশুতোষের মৃত্যুর পর একটি নিবন্ধে হরপ্রসাদ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হরপ্রসাদকে এড়াইবার জন্য আশুতোষ নাকি বলিলেন যে, ভাণ্ডারকরকে যখন পাওয়া যাইতেছে তখন অন্য লোকের প্রশ্ন উঠে না। সকলেই মনে করিলেন, ইনি রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর—যিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। কিন্তু কার্যকালে উপস্থিত হইলেন তদাত্মজ দেবদত্ত ভাণ্ডারকর। আমি যখন মাধ্যমিক পড়ি, তখন ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে ভাণ্ডারকরের নাম উঠিলেই বলাবলি শুনিতাম Don't mistake the son for the father'। তখনই নূতন কারমাইকেল প্রফেসরের প্রথম গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে স্তুতির বহর দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। অনেক কষ্ট করিয়া অধুনা দুষ্প্রাপ্য বই হইতে এই অমূল্যরত্নটি পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করিলাম :

To Sir Asutosh Mookerjee.........Saraswati/Sastra-Vachaspati/ who by his lofty ideals,/far-reaching foresight and unfailing vigilance/ has elevated the Calcutta University to the rank/of a teaching and research University/the only one of its kind in India./who by his unfailing and discriminate/liberality and encouragement/has led votaries of lerning to look upon him/as the Vikramaditya of the pre-

sent age/These lectures/are dedicated by the Author/In token of profound admiration and reverence.

ইঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অশোক'-ও আশুতোষকে উৎসর্গীকৃত হয় এবং সেইখানেও বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে আশুতোষের তুলনা করা হয়।

এই দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাণ্ডারকর দাবি করিয়াছেন যে তিনি পঁচিশ বৎসর যাবৎ অশোকের শিলালিপি পাঠে ব্যাপৃত ছিলেন। এই দক্ষতার কিছু বিচিত্র নমুনার আভাস পাওয়া যায়। আমার বন্ধু 'NCM' বলেন যে এই শিলালিপি-পাঠক নাকি কোথায় এক লিপি আবিষ্কার করেন যে কলিযুগে সরস্বতী গুম্ফ-শোভিত হইয়া আবির্ভূত হইবেন। আর একটি আবিষ্কারের কথা 'প্রবাসী'তে পড়িয়াছিলাম ; রামানন্দবাবু নিজেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন তাহা পিকউইকের Bill Stumps His Mark-এর অনুরূপ। রাজমিস্ত্রী কাশিমুদ্দীন কোন এক বাড়িতে তাহার নাম খোদাই করিয়াছিল। স্বল্পস্বাক্ষর এই মিস্ত্রী বড় বড় করিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া স্বীয় নাম উৎকীর্ণ করিয়াছিল। উৎসাহী গবেষক পাথর-খানাকে উলটাইয়া ধরিয়া ইহাকে ব্রাহ্মী বা খরোষ্টী বা অর্ধমাগধী হরফ মনে করিয়া ইহা প্রাক্ খৃীষ্টযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করিতে ব্যাপৃত হয়েন। আমার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই জাঁদরেল আবিষ্কারক ভাণ্ডারকর কিনা, অনুসন্ধিৎসু পাঠক 'প্রবাসী'-র পুরানো সংখ্যায় খুঁজিয়া দেখিবেন।

পরশুরামের 'ডম্বরুপণ্ডিত' গল্পে শিলিন্ধ্রী মালিনী বিক্রমাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া যে ছড়া রচনা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে লিখিয়াছিল রাজার নয় রত্নের অনেকেই 'কাচখণ্ড' ; বিংশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নেরাও অনেকেই কাচখণ্ড। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে পাশ কাটাইয়া যে ভাণ্ডারকরকে আশুতোষ সভাসদ্ করিলেন তিনি স্তুতিবাদে কতটা পটু ছিলেন তাহার বর্ণনা দিয়াছি। ইঁহারাই আবার সহজেই দলত্যাগী হয়েন। আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সমালোচক যদুনাথ সরকার যখন অনেকটা সেই সমালোচনার জোরেই ভাইস-চ্যান্সেলর হইলেন, তখন আশুতোষের অনুগামীদের মনে হইল যে ভাণ্ডারকর স্তুতির ভাণ্ডার লইয়া অপরদিকে ভিড়িবার উপক্রম করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা ভোট দিয়া প্রফেসর ভাণ্ডারকরের জায়গায় সদ্য অক্সফোর্ড-প্রত্যাগত সুরেন্দ্রনাথ সেনকে ইতিহাস বোর্ডের চেয়ার-ম্যান করিলেন। সরকারী পক্ষ বলিলেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন তো অক্সফোর্ড হইতে মাত্র বি-লিট্ উপাধি পাইয়াছেন : আশুতোষের অনুগামীরা জবাব দিলেন, ভাণ্ডারকর তো বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ মাত্র, থীসিস দিয়া কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই ডক্টরেট উপাধি পর্যন্ত পান নাই! সত্যের আত্মপ্রকাশের কি বিচিত্র গতি!

দেশদেশান্তর হইতে যে-সকল রত্ন আহরণ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাচখণ্ডের সংখ্যাই বেশি। আশুতোষ সর্বময় প্রভু : তিনি কাহারও কথা শুনিতেন না। প্রফেসরদের অনেককেই সাধারণের জন্য লেকচার দিতে হইত। একটা গুজব ছিল যে তখন আবার শ্রোতা জোগাড় করিবার জন্য ইউনিভার্সিটির অফিস ছুটি দিতে হইত। আশুতোষ একে সর্বজ্ঞ : তারপর মনে হয় মুখে তিনি যাই বলুন বিলাতী ডিগ্রীর জন্য তাঁহার খুব মোহ ছিল ; আধুনিক মনঃসমীক্ষকরা এই ধরনের দুর্বলতাকে বলেন inferiority complex বা হীনমন্যতা। ১৮৯৬ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী। তিনি হইলেন লেক্চারার আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইজনের মধ্যে যিনি দ্বিতীয় হইয়া-ছিলেন, সেই গণেশপ্রসাদ হইলেন প্রফেসর। এই ন্যায়েই ১৯০৪ সালের তৃতীয় শ্রেণীর শেষপ্রান্তলগ্ন প্রফুল্ল মিত্র হইলেন ঘোষ প্রফেসর, কারণ তিনি বার্লিনের ডক্টর। ইকনমিক্স আধুনিক শাস্ত্র, আধুনিক বিষয় : বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহার অভ্যুদয় আধুনিক কালে। তাহার

অধ্যাপক করিলেন প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাঁহার প্রধান কৃতিত্ব তিনি প্রাচীন ভারতে শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়া লণ্ডনে ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি পাইয়াছেন।

সবচেয়ে বড় কাচখণ্ড ছিলেন, আশুতোষের বড় সম্পদ—তিনি মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিশাল। নিউটন সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসিয়া উপলখণ্ড কুড়াইয়াছেন আর আচার্য্য শীল ৪৫ বৎসর বয়সে জ্ঞানসমুদ্র পার হইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। সবাই তাঁহার প্রশংসায় গদ্‌গদ ; বড় ব্যতিক্রম হইলেন আমাদের স্যার অর্থাৎ প্রফেসর প্রফুল্ল ঘোষ। তিনি যখন পড়াইতেন, খুব সীমিত সংযত ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন। আমাদের মনে হইত একটি কথা বেশি বা কম বলিলে ব্যাখ্যার গৌরবহানি হইত। কিন্তু গল্প বলার সময় আতিশয্যের প্রতি তাঁহার ঝোঁক দেখা যাইত আর তাঁহার সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা, এককথায় contempt ছিল ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উপর। তিনি মনে করিতেন ইঁহার পাণ্ডিত্য সবই ভণ্ডামি। অবশ্য এখানেও স্যার একটা জায়গায় থামিতেন। তিনি শুধু ইংরেজির কথাই বলিতেন। তিনি সহকর্মী জয়-গোপালবাবুকে খুব ঠাট্টা করিতেন, কারণ জয়গোপালবাবু আচার্য্য শীলের অনুগামী ছিলেন। রজনীকান্ত গুহ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইঁহাদেব তিনি তিরস্কার করিয়া কখন কি বলিয়াছিলেন, তাহাও আমাদিগকে বলিতেন। আমার কেমন যেন মনে হইত এইসব ব্যাপার সবটা সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯১০ সালে ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কথা বলিতেন। সেই-সব ব্যাপার এত আজগুবি যে তাহা অসম্ভব মনে করিতাম। পরে অপরের কাছেও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম না শুনিলেও সেই বছরের এম-এ ইংরেজি পরীক্ষার কথা শুনিয়াছি এবং ইহাও শুনিয়াছিলাম যে দুই-একজন ছাড়া সবাই পরীক্ষা না দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। জেমস্‌ ও অন্যান্য সুধী ব্যক্তিরা নাকি ছাত্রদের পক্ষে কিছু বলিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নকর্তা জ্ঞানবীর ব্রজেন্দ্র শীল, আশুতোষ কিছুতেই ছাত্রদিগকে ক্ষমা করিলেন না। পরীক্ষার্থীরা ঐ পত্রে শূন্য পাইলেন। স্যার গোটা-দুই প্রশ্নের কথাও বলিয়াছিলেন। আমার কেমন যেন বিশ্বাস হইত না। এখন স্মৃতিরোমন্থন করিতে বসিয়া সেই-সকল প্রশ্ন দেখিয়া চক্ষুস্থির! এইরূপ cultural বর্বরতা পৃথিবীর কোন বিদ্যালয়ে সম্ভব তাহা ভাবি নাই। স্যার যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সমগ্র পত্রটি তাহা অপেক্ষা অনেক ভয়াবহ। এই পত্রে আটটি প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা স্যার বলিতেন—যদিও বিশ্বাস করি নাই। কবি মিল্টন অমিত্রাক্ষর ছন্দের নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছান্দসিক প্রক্রিয়া খুব বেশি অভিনব ও দুরূহ হইল Samson Agonistes নাটকে। বার নম্বরের একটি প্রশ্ন এইরূপ :

Write the following as verse and punctuate :—

(a) But who is this what thing of Sea or Land female of sex it seems that so bedecked ornate and gay comes this way sailing like a stately Ship of Tarsus bound for the isles of Javan or Gadere with all her bravery on and tackle trim sail fill' and streamers waving courted by all the winds that hold them play an amber scent of odorous perfume her harbingers a damsel train behind.

স্বয়ং মিলটন এই গদ্যকে যতিচিহ্ন দিয়া অমিত্রচ্ছন্দে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন? ইহার পরে আরও দুইটি অংশ আছে তাহা আরও বিভীষিকাময়। অন্য একটি

পাঠ্যবই ছিল Butler-এর Hudibras. সেই সম্পর্কে একটি বার নম্বরের প্রশ্নের অংশবিশেষ এইরূপ :

Analyse the style of Butler into its salient ingredients with special reference to the satire, the burlesque, the mock-heroic elements in *Hudibras*. Distinguish between Butler's manner from that of (1) Rabelais, (2) Cervantes, and (3) Scarron.

কবি মনোমোহন ঘোষ নাকি প্রশ্নকর্তার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন :

That pompous pedant who half illumines the semi-barbarous region of—

চারুবাবু একটা ছড়া গুনগুন করিতেন :

লোকে খেলতে খেলতে খেলোয়াড়,
--জানতে জানতে জানোয়ার।

ইহা কাহার সম্পর্কে ?

আমি এই বিষয়ে এতটা লিখিলাম তাহার একাধিক কারণ আছে। পরীক্ষার্থীরা যে খারাপ প্রশ্নের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া পরীক্ষাগৃহ হইতে উঠিয়া আসে তাহার সূত্রপাতও আশুতোষের আমলে। এইরূপ পাগলামিকে সমর্থন করিয়া আশুতোষ শীলমহাশয়কে চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিলেন। শুধু তাই নয়। ১৯১০ সালে যিনি এই কুকাণ্ড করিলেন তাঁহাকেই ১৯১৭ সালে ইংরেজির প্রথম ডক্টরেটের পরীক্ষক করা হইল ; কি যোগ্যতার মানদণ্ডে তাহা আশুতোষই জানিতেন। শিক্ষাজগতে ইহাই সবচেয়ে সাত্ত্বিক উৎকোচ এবং সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। দক্ষিণার দিক দিয়াও এই কিংবদন্তী ঋত্বিক লাভবান হইতে থাকিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের টাকা আনা পয়সার হিসাব দেখিয়া ব্যয়ের ঠিক অংক লিখিয়াছিলেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন তাহাব সঠিক হিসাব আমি দেখি নাই। তবে মনে হয় আচার্যদেব কোচবিহারে পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন, কলিকাতায় তাহার দ্বিগুণ বেতনে নিযুক্ত হইয়া সকল কমিটিতে আশুতোষকে সমর্থন করিয়াছেন এবং যতদূর শুনিয়াছি, আশুতোষের সমর্থনেই পরে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অমর অবদান রহিয়া গেল ১৯১০ সালের সেই প্রশ্নবিভীষিকা!

আচার্য শীলের পরে দর্শনের অধ্যাপকপদে আসেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি বহুশ্রুত অধ্যাপক, তাঁহার বাগ্মিতা অনন্যসাধারণ এবং তিনি দেশে-বিদেশে বহু বড় পদ অধিকার করিয়াছেন এবং সর্বদাই সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের লোক, আশুতোষের সভায় আসিয়াছিলেন কর্ণাট প্রদেশ হইতে। আমি তাঁহার লেখা পড়িয়াছি এবং আমি সাহিত্যের যে শাখায় পল্লবগ্রাহিতা করি তাহার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক আছে। একটা প্রশ্ন আমরা অনেকে তখনও করিয়াছি, এখনও করি। এই প্রফেসরির জন্য অন্যতম প্রার্থী ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। কৃষ্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আশুতোষ কি যোগ্যতর দার্শনিককে বঞ্চিত করেন নাই ?

দশম পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও বরাট্ ('চন্দ্রশেখর')

১

পরীক্ষার দ্বারা বিদ্যাবুদ্ধির সঠিক পরিমাপ হয় কিনা সেই বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে, এবং পরীক্ষার বিরুদ্ধে বহু অকাট্য আপত্তিও উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাকে তুলিয়া দিয়া যদি অন্য কোন পদ্ধতিতে বিদ্যাবত্তার যাচাই করা হয়, দেখা যাইবে তাহা আরও দোষদুষ্ট। ইহার সবচেয়ে উজ্জ্বল চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন গজপতি দেবশর্মার বিদ্যাদিগ্গজ উপাধি-লাভের বর্ণনায়। পরীক্ষার সমস্ত দোষত্রুটি মানিয়া লইলেও, যখন ইহা অপরিহার্য তখন ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা শিক্ষাব্রতীর প্রধান কর্তব্য। সেইজন্য প্রয়োজন হইল ইহার মান বজায় রাখা, ইহার পরিচালনায় আদ্যন্ত সততা রক্ষা করা, এবং ইহার কৃতিত্বকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। আমাদের দেশে বিদ্যাবত্তার অন্য কোন মানদণ্ড নাই বলিলেই চলে, কারণ এখনও বোদ্ধা বিদ্বজ্জনসমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং আমাদের বিপদ অন্যরকমের : আমরা ইহাকে বেশি মর্যাদা দিয়া ফেলি। আমাদের আমলে দেখিয়াছি, কেহ সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ পাস করিলে সে নিজেকে উচ্চশিক্ষিত সমাজে চিরকালের জন্য অপাঙ্ক্তেয় বলিয়া সংকোচ বোধ করিত, আর যে প্রথম শ্রেণীতে পাস করিল সে মনে করিত, তাহার আর কিছুই শিখিবার নাই। বি-সি-এস্ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকিলেও আই-সি-এস্-রা মনে করিতেন যে তাঁহারা অভ্রান্ত, সর্বজ্ঞ।

আশুতোষ যখন লর্ড লিটনকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি ৩৪ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার একবৎসর পরেই আশুতোষের মৃত্যু হয়। সুতরাং ৩৫ বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের করিয়া ('made his own') লইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সেবক এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ইহাতে তাঁহার অসপত্ন অধিকার। বড়লাটের মন্তব্যের মধ্যে এই শ্লেষটুকু ছিল বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি, তিনি অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্র। সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থা-পনায় পরীক্ষাব্যবস্থা একেবারেই বানচাল হইয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশনে যাহাতে বেশি পরীক্ষার্থী পাওয়া যায় তাহাই হইল আশুতোষের প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য সেই পরীক্ষা সহজ করা হইল এবং এইভাবে পরীক্ষার মানের যে অবরোহণ সুরু হইল তাহা আর কোনদিন রোধ করা গেল না।

আমার হাতের কাছেই একখানা বই আছে যাহা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠার পূর্বে তথাকার শিক্ষার মান-সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ক্যালকাটা রিভিয়ুতে সেই আমলের সুপণ্ডিত আই-সি-এস ব্রজেন্দ্রনাথ দের আত্মজীবনীতে দেখিতেছি—ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মধ্যে অষ্টম সিভিলিয়ান। এই আটজনের মধ্যে ছয়জনই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র : অনুমান করি, সপ্তম কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র হইবেন—যদিও তাঁহার পাঠ্যাবস্থার ইতিবৃত্ত আমার জানা নাই। আর মাত্র একজন সেই সময়ে আই-সি-এস পাস করিয়াছিলেন—তদানীন্তন বোম্বাই প্রদেশের শ্রীপাদ বাবাজী ঠাকুর।

ইঁহারা সবাই আশুতোষ অপেক্ষা বয়সে বড়। শুনিয়াছি, ইহার পরে যে স্ট্যাটুটরি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয় সেখানেও বাঙ্গালী সূর্যকুমার আগস্তি, বরদাচরণ মিত্র, উমেশ বটব্যাল, আশুতোষ গুপ্ত প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের স্বাক্ষর রাখেন। অবশ্য এই বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তুলনামূলক দলিল আমার কাছে নাই। তবে ইহা ঠিক যে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের 'স্বর্ণযুগ' আরম্ভ হয় নাই। আশুতোষের প্রতিপত্তি যখন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সময় ১৯২২ সালে সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতেই গৃহীত হইল এবং ফল বাহির হইলে সবাই লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিল কৃতকার্য নয়জনের শেষের তিনজন বাঙ্গালী এবং তাহাদের মধ্যে একজন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাহার পরে বহুবার পরীক্ষা হইয়াছে কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর তাহার প্রাধান্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। বরং কখনও কখনও এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে আশুতোষ তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসরের সেবার দ্বারা যে ফল পরিপক্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবিতকালেই পচন ধরিয়াছিল। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের নবীন প্রফেসর। ঐ কলেজের খ্যাতনামা প্রাক্তন ছাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বড় কর্মচারী মোহিতকুমার সেন একদিন কলেজে আসিয়া বলিলেন যে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে নানা ধরনের চাকুরির পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেইসব চাকুরিতে প্রবেশ করিলে পরে খুব উন্নতি হয়, কিন্তু আমাদের ছাত্রেরা হয়তো তাহার সংবাদ রাখে না। পরে জানিয়াছি, তাহারা সংবাদ রাখে, পরীক্ষাও দেয়, কিন্তু 'তৈলঙ্গী'দের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। শুধু পরীক্ষার ফলকেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের মাপকাঠি বলিয়া ধরা ঠিক হইবে না। অধুনা বহু জ্ঞানান্বেষী ছাত্র, তরুণ শিক্ষক ও অগ্রসর ছাত্রদল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এই বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে যে উহা আই-এ-এস্ পরীক্ষার একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মাত্র। তবু এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখার মত। আমি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী (১৯৪২—৪৬) রিপোর্ট লিখিযাছিলাম। তখন নানা প্রদেশের (বর্তমানে রাজ্যের) আগেকার প্রতিবেদন পড়ার সুযোগ হইয়াছিল। তখনই জানিয়াছিলাম যে স্যার মেরিভেল স্ট্যাথাম নামক একজন শিক্ষাবিদ্ বেশ কিছুকাল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ডি. পি. আই. ছিলেন এবং তিনি ওখানকার স্কুল-শিক্ষার ভিত পাকা করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের স্বর্ণযুগের স্রষ্টা আশুতোষ ভিতকে নড়বড়ে করিয়া তাহার উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন।

১৯০৬ সালে ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়া আশুতোষ শিক্ষার উপরিতলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। আগের আমলে সর্বাপেক্ষা বড় সম্মান ছিল প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ। ইহার জন্য খুব কঠিন পরীক্ষা দিতে হইত এবং আট হাজার হইতে দশ হাজার টাকার মত বৃত্তি পাওয়া যাইত। স্টুডেন্টশিপ শেষ হইলে মৌয়ট মেডেল পাওয়া যাইত। কোন বৎসর কোন কারণে একাধিক লোককে এই বৃত্তি দেওয়া হইলে যিনি অপেক্ষাকৃত ভাল বিবেচিত হইতেন, তিনিই মৌয়ট মেডেল পাইতেন। কোন বার পরীক্ষায় কোন প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে সেই বৎসর বৃত্তি দেওয়াই হইত না। আবার কোন বার একাধিক পরীক্ষার্থী যোগ্য বিবেচিত হইলে জমানো বৃত্তি যোগ করিয়া একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া হইত। আগেই বলা উচিত ছিল যে আর্টস্ ও সায়েন্স দুইভাগ করিয়া একবার আর্টস্ এবং তার পরের বৎসর সায়েন্সে এই বৃত্তি দেওয়া হইত। জানকীনাথ ভট্টাচার্য এবং ই. এম. হুইলার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অবিনাশচন্দ্র বসু একই বৎসরে এম-এ পাস করেন। ১৮৮৮ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ও অবিনাশচন্দ্র বিজ্ঞানে এই পুরস্কার ও মৌয়ট মেডেল পান। ১৮৮৯ সালে আর্টস্ বিভাগে কোন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হইলেন না।

১৮৯১ সালে হুইলার ও জানকীনাথ প্রার্থী হইলেন এবং তাঁহাদের চেয়ে কনিষ্ঠ হীরেন্দ্র-নাথ দত্তও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। তিনজনেই পুরো বৃত্তি পাইলেন। কিন্তু অপরাজিত জানকীনাথের এইবার প্রথম পরাজয় হইল, কারণ মোয়েট মেডেল পাইলেন শুধু হুইলার।

২

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব পাইয়া প্রথমেই পি. আর. এস্.কে কুক্ষিগত করিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি নূতন বিধি প্রবর্তন করিলেন। এক বছরের ব্যবধান তুলিয়া দিয়া প্রতিবৎসরই বৃত্তিকে দুইভাগ করিয়া আর্টস্ ও সায়েন্সে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিলেন ; আট হাজার চারশো টাকার পরিবর্তে চার হাজার দুইশো করিয়া আর্টস্ ও সায়েন্সে বরাদ্দ করা হইল। দ্বিতীয় পরিবর্তন আরও মৌলিক। তাঁহার উদ্দেশ্য 'knowledge-maker' সৃষ্টি করা ; সুতরাং পূর্বে প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি বাতিল করিয়া তিনি শুধু মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতেই প্রেমচাঁদ বৃত্তি দেওয়ার বিধান দিলেন। ইহা একটা নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার কথা পরে বলিতেছি। ঠিক কবে এই নূতন বিধি সক্রিয় হইল বলিতে পারি না। ১৯২২-২৩ সালে আমি চাট্‌গাঁ মেলে ছুটির শেষে কলিকাতায় যাইতেছি। পথে স্টীমারে আমার এক মাতুলকে সহযাত্রী পাইলাম। তাঁহার পরিচিত আর একজন সহযাত্রী হর্ষনাথ সেন গৌহাটিতে গণিতের প্রফেসার ; জানিলাম দূর-সম্পর্কে তিনি আমারও আত্মীয়। যাহা হউক, বয়স্কদের আলাপে আমি কৌতূহলী শ্রোতা মাত্র। কথায় কথায় হর্ষনাথবাবু কেন প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য প্রার্থী হয়েন নাই, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে তদ্বির করিতে না পারিলে এবং সেজন্য কলিকাতায় না থাকিলে এই জাতীয় প্রচেষ্টা অসম্ভব। তাঁহার বন্ধু সুরেন গাঙ্গুলি প্রেমচাঁদ পাইয়াছেন। গাঙ্গুলিমহাশয় আগের বৎসর কর্তার সহিত দেখা করিলে কর্তা বলেন—এবার গিরীনকে দেওয়া হইবে, পরের বৎসর সুরেনবাবু চেষ্টা করিতে পারেন। হর্ষনাথ সেন আসামের ডি. পি. আই. হইয়াছিলেন ; তাঁহাকে আর কখনও দেখি নাই। পরিচয় না থাকিলেও সুরেন গাঙ্গুলিকে পরবর্তীকালে একাধিকবার দেখিয়াছি এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছি। গিরীনবাবুর কোনও পরিচয় আমি জানি না। কিন্তু পরে, পৈতৃক ক্যালেণ্ডার-নেশার প্রভাবে জানিয়াছি ইঁহারা তিনজনই বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্র—প্রায় সমসাময়িক এবং গিরীন্দ্রলাল প্রেমচাঁদ-বৃত্তি পান ১৯১৩ সালে এবং সুরেন গাঙ্গুলি পান ১৯১৪ সালে।

এইসব বিস্মৃত নাম এবং একদিনের ক্ষণিকের আলাপ, যাহার অন্য কোন প্রমাণ আমার নাই, আমি উত্থাপন করিতাম না যদি না সমস্ত প্রহসনটা ক্রমশঃ জাজ্বল্যমান হইত। বিশের দশকে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনাচারের উল্লেখ করিতেন। এই সময়ে দ্বিধাবিভক্ত প্রেমচাঁদ বৃত্তি আরও টুকরা টুকরা হইতে থাকে এবং ক্রমে আর্টস্ বিভাগে এই বৃত্তি চার-জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার প্রথা প্রায় বাৎসরিক হইয়া আসে। ফলে মাসিক বৃত্তিটা জনপ্রতি সাড়ে-বার টাকায় আসিয়া ঠেকে এবং রামানন্দবাবু 'সাড়ে-বার টাকার পি. আর. এস্.' নামে আধা-নূতন পদবী আবিষ্কার করেন। আমি নিজেও একজন সাড়ে-বার টাকার পি. আর. এস্. ; আমাদের বিদ্যার বহর দেখিয়া আমার জনৈক সহকর্মী আবার একটা বিশেষণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—'পৈরাসী'। বলা বাহুল্য, 'পৈরাসী' হইতে হইলে তদ্বির বিদ্যার সহিত পাল্লা দিয়া চলে এবং অনেক সময় আগাইয়া যায়।

৩

আশুতোষ ১৮৮৯ সালে সিনেটের সভ্য মনোনীত হয়েন এবং পরের বৎসরই সিণ্ডিকেটের সদস্য হয়েন। ইহার পর অনন্যসাধারণ বুদ্ধি, বিচিত্র কর্মকুশলতা এবং নিরলস অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি সিণ্ডিকেটে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইহারই পরিণতি ১৯০৬ সালে তাঁহার ভাইস্-চ্যান্সেলর পদ প্রাপ্তি ; এই পদে তিনি প্রথমে আট ও পরে দুই, সর্বসাকুল্যে দশ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি ক্ষোভ ও ক্রোধের সহিত গভর্নর লিটনকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ৩৪ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। কিন্তু এই সেবা প্রভুর কর্তৃত্ব, না ভক্তের অর্ঘ্য সেই বিষয়ে বহুপূর্বেই সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যত্র বড়লাট—তিনি চ্যান্সেলরও—একটু তিক্ততার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন যে, সরকারের কাছে অর্থের আরজি ও দাবি পেশ করিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের হিসাব কখনও পাওয়া যায় না। আজ যে পর্বতপ্রমাণ আর্থিক বিশৃঙ্খলা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা দিয়াছে এইভাবে তিনি তাহার অংকুরের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষ যতদিন জীবিত ছিলেন, বঙ্গের আকাশ-বাতাস তাঁহার স্তুতিবাদে মুখরিত হইত। কেহ তাঁহাকে নবরত্নশোভিত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করিতেন, কাহারও ঘোড়ার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে সহিস সকালে গাড়িতে জুড়িলেই সে জোরকদমে ৭৭নং রসা রোডে আসিয়া পড়িত, চেষ্টা করিলেও গাড়ি অন্যদিকে ঘোরান যাইত না। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, দীনেশচন্দ্র সেন, অতুলচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি তাঁহার অমায়িকতার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার ভক্তরা দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর সবচেয়ে প্রকাশ্যস্থানে তাঁহার আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বরের সমাবর্তন উৎসবে সদ্য নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধি দেওয়ার সময় আশুতোষ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রশস্তি ১৩৫টি শব্দে এবং নিজে বঙ্গসাহিত্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৩ বৎসর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ ৪১৫টি শব্দে বিধৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর একটি সৌধ তাঁহার নামে উৎসগীকৃত হইয়াছে, তাঁহার নামাঙ্কিত একাধিক প্রফেসরশিপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আরও নানাভাবে তাঁহার স্মৃতিতর্পণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ৩৪/৩৫ বৎসরব্যাপী সেবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু অধোগতিই হইয়াছে ; এই অধঃপতনের কারণ আদর্শহীনতা, আত্মম্ভরিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার অভাব। বাস্তবিকপক্ষে, বিজ্ঞানের কথা বলিতে পারি না, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস্ বিভাগে তাঁহার একমাত্র স্মরণীয় অবদান ইহার পুস্তক-সংগ্রহ।

আমরা যখন পড়িতাম তখন আশুতোষের প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল, এমন কি ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতির পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইংরেজির মাধ্যমে ছাত্রেরা ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইবে—এইজন্য গ্রীক সাহিত্য তো ছিলই, ভার্জিল, দান্তে, কল্ডেরণ, গ্যেটে, শিলার প্রভৃতিও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। ইহা যে একজনের খেয়াল মাত্র, তাহার প্রমাণ, আশুতোষের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু, ব্যাপক বিচরণশীলতার একটা সুবিধাও ছিল ; অনুবাদের মাধ্যমে আমরা খানিকটা ইউরোপীয় সাহিত্য পড়িয়া লইতাম। আমাদের আমলে বি-এ অনার্সে পাঠ্য ছিল—মেটারলিংকের The Buried Temple ; এই গ্রন্থের প্রধান রচনা The Mystery of Justice (ন্যায়বিচারের রহস্য)। গ্রন্থকারের বক্তব্য—এতকাল পরে যতটুকু মনে আছে—ন্যায়বিচারের রহস্য মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ; ইহার

তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। মানুষ নিজেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ডাকিয়া আনে : মেটার-লিংকের বক্তব্যের সঙ্গে যদি আমরা গ্রীক কিংবদন্তী যোগ দিই, তাহা হইলে বলা যায় একপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত উত্তরপুরুষকেও করিতে হইতে পারে। মেটারলিংক নেপো-লিয়নের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। নেপোলিয়নের অনন্য-সাধারণ বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা তর্কাতীত, কিন্তু তাঁহার ন্যায়ান্যায়বোধ ছিল খুব অপরিণত। তিনি গোপনে প্রতিপক্ষ Due d' Enghien-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়া পার পাইলেন আর মনে করিলেন তাঁহার নিজের প্রয়োজনে সবকিছু করাই সম্ভব। ইহার পর তিনি একটি বড় কুকার্যে হাত দিলেন—স্পেনের রাজা ও যুবরাজের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া পিতা-পুত্রের মতান্তরের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের ভ্রাতাকে ঐ রাজ্যের সিংহাসনে বসাইলেন। এই অপকর্মের ফলেই দীর্ঘস্থায়ী পেনিনসুলার ওয়ার, যেখানে নেপোলিয়ন প্রথম ধাক্কা খাইলেন। তবু তাঁহার জয়যাত্রা অব্যাহত রহিল এবং সম্রাট নেপোলিয়ন মনে করিলেন তাঁহার যাহা খুশি তিনি তাহাই করিতে পারেন। এইভাবেই তিনি রুশ-অভিযানে অগ্রসর হইলেন ; এই অভিযান শুধু অন্যায় নয়, নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক। এই অভিযানে যে বিপর্যয় হইল তাহাই ওয়াটার্লুর পরাজয় ও সেন্ট হেলেনার নির্বাসন ডাকিয়া আনিল।

বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে, পরাক্রমশালিতায় আশুতোষ নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনীয়। পরাধীন দেশে জন্মিয়াছিলেন : তাই তাঁহার কর্মক্ষেত্র সমরাঙ্গনে প্রসারিত না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ রহিল। তিনি ১৯১০, ১৯১৪ এবং ১৯১৭ সালে কতকগুলি কুকর্ম করিলেন যাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনাশের গোড়াপত্তন করা হইল এবং ইহার সুদূর-প্রসারী প্রভাব নিজের উত্তরপুরুষকেও কলঙ্কিত করিল। আশুতোষ-তরণীর ভরাডুবি হইল তাঁহার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পর ১৯৪৯ সালে।

১৯১৪ সালের ব্যাপারটি পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। এখানে ১৯১০ ও ১৯১৭ সালের অপকর্মের বিবরণ দিব। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রখ্যাত পণ্ডিত হরিনাথ দে যে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির আধিকারিকের পদ হইতে বরখাস্ত হইয়াছিলেন উহা আশুতোষের কারসাজি—এইরূপ জনমত প্রচলিত ছিল। এমন কি হরিনাথের জীবনীকার সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে ১৯১১ সালে হরিনাথের মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—তখন আশুতোষের কর্তৃত্বাধীন—একটা শোকপ্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করিল না। আশুতোষই হরিনাথের বিতাড়ন-ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। কাউন্সিলের চারজন সদস্য রায় দেওয়া শেষ করেন ১৯১১ সালের জুন-জুলাই মাসে : তাহার আগে জানুয়ারী মাসে হরিনাথকে সাসপেন্ড করা হয়। চারজন সদস্যের মধ্যে আর্লসাহেব ও রস্‌সাহেব* নিজেরা কোন মতামত দেন নাই,—তাঁহারা আশুতোষের রায়কেই সমর্থন করিয়াছেন। আর্লসাহেব একটু টিপ্পনী করিয়াছিলেন, তাহাও আশুতোষের সমর্থনে, এবং আশুতোষের রায় এবং হরিনাথের কর্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে সব শেষ হইয়া যায় সেই মর্মে সুপারিশ করিয়াছিলেন। আশুতোষ তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে হরিনাথকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দেন। সভাপতি লর্ড বিশপের মনে কিছু কিছু দ্বিধা

*আশুতোষের সহযোগী রস্‌সাহেবের একটু বিশেষ পরিচয় দিতে চাই। ১৯১২ সালে অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর লর্ড কার্জনের কাছে অনুরোধ আসে যে রবীন্দ্রনাথকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হউক। কার্জন ভারত-বিশেষজ্ঞ ডেনিসন রস্‌কে রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে অক্সফোর্ডের ডিগ্রি জুটিল না।

ছিল। তিনি প্রথমে মনে করেন যে ইহা সত্য যে হরিনাথ ভীষণভাবে পদের অমর্যাদা ও কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, ইহা অতিশয় গর্হিত ও নিন্দনীয়। কিন্তু একটি কথা বলা যায় যে যদিও আর্থিক লেনদেনে অনেক জুয়াচুরি হইয়াছে তবুও এমন কোন সাক্ষ্য নাই যে হরিনাথ কোন অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন (......there is not, in the papers placed in my hands, evidence to prove that Mr. De received the profits of the fraudulent transactions which undoubtedly took place)। অবশেষে তিনি আশুতোষের মত গ্রহণ করিলেও হরিনাথকে কি সাজা দেওয়া হইবে সেই বিষয়ে কোন প্রস্তাব দেওয়া কাউন্সিলের কর্তব্য কিনা তৎসম্পর্কেও দ্বিধা পোষণ করিয়াছেন (The President is not aware how far it is the duty of the Council to suggest the penalty which Mr. De has deserved....)।

আশুতোষ লিখিয়াছেন, তাঁহার কাছে যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পেশ করা হইয়াছিল তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে তিনি প্রত্যাশাতীত সময় ও পরিশ্রম দান করিয়াছেন। ইহাতে কোন অতিশয়োক্তি নাই। এই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ এত অদম্য যে, পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি দীর্ঘতর অনুসন্ধান এবং সাক্ষী ও সাক্ষ্যের বিচারের জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহার এই উৎসাহ ও ঔৎসুক্য বিচারক বা কমিশনের সদস্যের নির্ধারিত কর্তব্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি অনেক নূতন সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন, হরিনাথের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়াছেন এবং নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। হরিনাথ যে হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে দিয়া তাঁহার জবাব লিখাইয়াছেন তাহাও তিনি জানেন এবং হরিনাথ প্রকাশ্যে কেরানী সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলিলেও গোপনে যে তাহাদের বন্ধুত্ব অটুট আছে, এই সংবাদও পাইয়াছেন এবং বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে হরিনাথ সাক্ষ্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে হরিনাথের অপকীর্তির লম্বা ফিরিস্তি দিয়াছেন যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রামাণিক দলিলের উল্লেখ করেন নাই এবং এই-সব অভিযোগের বিষয়ে হরিনাথকে অবহিত করাও হয় নাই।

সত্তর বৎসর পরে আশুতোষের রায় পড়িয়া আমার একটা কথা মনে হইতেছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে হরিনাথ ও বিতর্কিত সরোজেন্দ্র স্কুলে সহপাঠী ছিলেন এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে এই দরিদ্র অসৎ লোকটিকে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে চাকুরি পাওয়ার পূর্বে আশুতোষই সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। বিচারকের আসনে বসিয়া আশুতোষ বলিতেছেন যে হরিনাথের অনুরোধেই তিনি এই সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। হরিনাথ নিজের পরিচিত একজন লোককে নিজের অধীনে সামান্য কেরানীর চাকুরি দিবার জন্য আশুতোষকে অনুরোধ করিতে যাইবেন এবং আশুতোষের মত উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি অপরিচিত এই কেরানীকে অনাবশ্যক সার্টিফিকেট দিবেন—ইহা একটু বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। আর্লসাহেব বলিয়াছেন যে পাষণ্ড হরিনাথ আশুতোষকে পালটা আক্রমণ করিয়া নিজের শোচনীয় অবস্থারই পরিচয় দিয়াছেন। আমার মনে হয় যে আশুতোষের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত এই সরোজেন্দ্রর কার্যকলাপ যখন বিচার্য অভিযোগের অঙ্গ এবং তাহার নিয়োগের সহিত যেভাবেই হউক আশুতোষ যখন জড়িত ছিলেন, তখন নিরপেক্ষ বিচারের খাতিরে এই ব্যাপার হইতে আশুতোষের সরিয়া দাঁড়ান উচিত ছিল। আশুতোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিচারকেরা সততই এইরূপ করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও সর্বময় কর্তা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে হরিনাথের কুকর্মের ফিরিস্তি দিয়াছেন। যেহেতু এই-সকল অভিযোগ হরিনাথকে দেখান হয় নাই, তিনি

ইহাদের উত্তর দিবার কোন সুযোগ পান নাই। তাই আমি মনে করি, আশুতোষ এই-সব প্রসঙ্গ না তুলিলেই ভাল করিতেন, কারণ এইভাবে তিনি নিজের পক্ষপাতিত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। হরিনাথ বলিয়াছিলেন যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়িবার জন্য Oscan ও Umbrian Philology-সম্পর্কে পুস্তক ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে কেনা উচিত। আশুতোষ এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গ তুলিযাছেন। এই শাস্ত্র-সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে অকুতোভয়ে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে ভাষাতত্ত্বের জন্য কোন্ বই লাইব্রেরিতে থাকা উচিত সে-বিষয়ে ভারতবর্ষে যদি কাহারও বলিবার অধিকার থাকে—তিনি হরিনাথ দে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নহেন।

এই প্রসঙ্গেই আশুতোষ বলিয়াছেন ১৯০৭/৮ সালের পর তিনি হরিনাথের প্রকৃত চরিত্র (true character) জানিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রবঞ্চনার কথা, কেমন করিয়া নম্বর জাল করিয়া তিনি ফেল ছাত্রকে পাস করাইয়া দিয়াছিলেন (forged the marks and passed a candidate who had failed) এবং তিনি Oscan and Umbrian Philologyতে পাস করাইয়া দিবেন বলিয়া ছাত্রদের প্রলুব্ধ করিতেন তাহা ছোটলাট বেকার ও অন্যান্য প্রভাবশালী সাহেবদের গোচরে আনিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি আর তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। আমি শুধু ইহাই বলিব যে হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া আসার পরও ১৯১০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই তথাকথিত জালিয়াত ও জুয়াচোরকে পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। যে-কেহ ১৯১০ সালের ক্যালেন্ডার খুলিলেই দেখিতে পাইবেন ১৯১০ সালে হরিনাথ পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন।

মানুষ মিথ্যা কথা বলিতে পারে, কিন্তু দলিল সেই কাজ পারে না। সুতরাং আশুতোষের উক্তি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ১৯১০ সালেই হরিনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিপর্ব শুরু হয় এবং পরের বৎসর তিনি মারা যান। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়া শুনিয়া এই জালিয়াত ও জুয়াচোরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

৪

আশুতোষের আর একটি অভিযোগকে একটু বিচার করিয়া দেখিব, কারণ সেই বিষয়ে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। আশুতোষ ছোটলাট বেকার সাহেবকে হরিনাথের যে-সকল অপকর্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহার একটি এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লঙ্ঘন করিয়া তিনি এমনভাবে প্রেমচাঁদ বৃত্তির পরীক্ষা লইয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বন্ধু এই পুরস্কার পাইতে পারেন ('how he had conducted, contrary to the regulations, the Studentship Examination so as to enable a friend of his to obtain the prize')। এই বন্ধুকে আমরা সকলেই চিনি। তাঁহার নাম প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি ১৯০৭ সালে প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া এই বৃত্তি পান। তাঁহার বিষয় ছিল ইংরেজি ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। ইংরেজি চারপত্রের পরীক্ষক ছিলেন যথাক্রমে পার্সিভেল ও হলওয়ার্ড, আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষক ছিলেন হরিনাথ দে (তিনপত্র) এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (একপত্র); ইহা ছাড়া ইংরেজিতে নাটক সম্পর্কে ঐচ্ছিক একপত্র ছিল—যাহার পরীক্ষক ছিলেন হলওয়ার্ড সাহেব। পার্সিভেলের পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, পরীক্ষায় ন্যায়বিচার কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। তিনি

আশুতোষেরও শিক্ষক এবং এই সার্বভৌম পণ্ডিত ভাষাতত্ত্বেরও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হল-ওয়ার্ড সাহেবের ল্যাম্বের সটীক সংস্করণ এখনও প্রামাণ্য গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠককে কিছু বলিতে হইবে না। ইঁহাদের উপরে ভাইস-চ্যান্সেলর ও সিণ্ডিকেটও ছিলেন; ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ শুধু আইনবিশারদ নহেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন তাঁহার নখদর্পণে ছিল এবং সেই আইন-বলেই তিনি বহুবার পরীক্ষকদের বিচার উলটাইয়া দিয়াছেন। ইহাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়া হরিনাথ দে অবৈধভাবে তাঁহার বন্ধুকে বৃত্তি দিয়াছিলেন—ইহা কি বিশ্বাস্য? তারপর দেখা যায়, আশুতোষ ইহা আবিষ্কার করিলেন অপরাধ অনুষ্ঠানের অনেক পরে। কবে আবিষ্কার করিলেন, হরিনাথ দে কোন্ ধারা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা আশুতোষ বলেন নাই। এই-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রেকটর ছোটলাট বেকার সাহেবকে জানাইবার সার্থকতা কি? আমি যে-সকল কাগজপত্র দেখিয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, স্যার হার্ভে আডামসন ও স্যার হ্যারল্ড স্টুয়ার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকেও আশুতোষ হরিনাথের এই কুকীর্তি জানাইতে গেলেন কেন? ইঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন এবং বস্তুতঃ হরিনাথ দে-ও ভারতসরকারের বড় অফিসার। এইরূপ অনুমান করা কি অযৌক্তিক হইবে যে যাহাতে হরিনাথ উচ্চতর সরকারি মহলে কোন সমর্থন না পাইতে পারেন সেইজন্যই আশুতোষ পূর্ব হইতেই এই-সব রাজকর্মচারীদের কান ভারী করিয়াছিলেন? এই জাতীয় তদ্বির বিচারকের পক্ষে গর্হিত কাজ।

আশুতোষের অধীনে থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য এবং সেই প্রসঙ্গে হরিনাথ-উপাখ্যান আসিয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের কথা এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইবে: আশুতোষ যে তাঁহাকে এইভাবে আড়াল হইতে আঘাত করিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আমি ভাষা-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু তাঁহার কাছে ঈস্কাইলাস, দান্তে, চসার পড়িয়াছি এবং ইহা প্রতিদিনই অনুভব করিয়াছি, ভাষাতত্ত্বের উপর প্রগাঢ় জ্ঞান কেমন করিয়া তাঁহার সাহিত্য-ব্যাখ্যাকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছে। আশুতোষ এই প্রসঙ্গে Oscan and Umbrian ভাষাতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখ হইতেই বোঝা যায় যে তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। আমিও জানি না। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষের বিদায়সভায়—এখানে শ্যামাপ্রসাদবাবু উপস্থিত ছিলেন—ইতিহাসবিদ্ যদুনাথ সরকার অধ্যাপক ঘোষের Latin ভাষাতত্ত্বের উপর অসামান্য অধিকার-সম্পর্কে এক বিস্ময়কর চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

আশুতোষ স্বীকার করিয়াছেন যে হরিনাথ দের সঙ্গে তাঁহার খুবই সদ্ভাব ছিল এবং ১৯০৮ সালের পর তিনি তাঁহার উপর বিরূপ হয়েন, কারণ তখন তিনি হরিনাথের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারেন। হয়তো এই সময়েই হরিনাথও আশুতোষের প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পান। সন-তারিখ উল্লেখ না করিয়া দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, একদিন এস্প্ল্যানাডে দাঁড়াইয়া হরিনাথ আশুতোষের ভীষণ নিন্দা করেন, 'সবই ব্যক্তিগত আক্রমণ।' দীনেশচন্দ্র চুপ করিয়া থাকিলেও হরিনাথ চুপ করিয়া থাকেন নাই। তিনি নাকি আরও সকলের কাছে অপবাদ রটনা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই দীনেশচন্দ্র দেখেন যে আশুতোষ হরিনাথের নাম শুনিলেই অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠেন। দীনেশচন্দ্র সেন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'ঠিক কিভাবে কি হইল জানি না।' কিছুদিন পর হরিনাথ কর্মচ্যুত হইলেন। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই বিরোধের এই বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হরিনাথ সকল ব্যাপারে আশুতোষের অনুগত ছিলেন না; সরকারি চাকুরে হিসাবে হরিনাথ সব সময় 'আশুতোষের জোটের মধ্যে' যাইতে পারিতেন না, আর কতকগুলি

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি আশুতোষের কাছে হরিনাথের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া আশুতোষের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার করেন। দিলীপ মুখোপাধ্যায় নিন্দুকের নিন্দার কথা বলিলেও তাহার কোন স্পষ্ট গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কে আরও অনেকে আশুতোষের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কলেজ হইতে এম-এ ক্লাস তুলিয়া দেওয়ার সময় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী একবার তাঁহাকে নরখাদক রাক্ষসের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন ; আশুতোষ ব্যথিতচিত্তে তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন, এই পর্যন্ত। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আশুতোষের অসন্তোষের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান অধুনা অসাধ্য।

আমার মতে, যথার্থ কারণ সূর্যালোকের মত স্পষ্ট। সুনীলবাবু ঠিকই ধরিয়াছেন, দীনেশচন্দ্র কোন একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু ভীরুস্বভাব দীনেশচন্দ্র সেই কথাটা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। যেমন আমার বড়-জেঠিমা ভয়ে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। আমাদের স্কুলজীবন হইতে কলেজে প্রবেশের পূর্বকাল পর্যন্ত বিলাত যাওয়ার অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। কাজেই তখন সবচেয়ে বড় চাকুরি ছিল ডেপুটিগিরি। ডেপুটিগিরির পরীক্ষা যখন তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন শিক্ষিত সমাজ আন্দোলন করিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন অতিশয় চরিত্রবান অবং অনন্যসাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন স্নাতককে ('Graduate of high chracter and great academic distinction') মনোনীত করিবেন এবং ছোটলাট তাঁহার কাউন্সিলের পরামর্শ লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ দুইজনকে নিযুক্ত করিবেন। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯০৬ সালে জনৈক ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পাসকোর্সে বি-এ পাস করে ; ১৯০৮ সালে কেমিস্ট্রিতে পরীক্ষা দিয়া সে তৃতীয় শ্রেণীতে এম-এ পাস করে। ১৯১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট নয়জন গ্রাজুয়েটকে মনোনীত করেন এবং সেই নয়জনের মধ্যে চারজন নিযুক্ত হয়েন। ই'হাদের মধ্যে একজন এই পাসকোর্সে বি-এ এবং তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ। এই সময়েই আশুতোষ বেকার, এ্যাডামসন, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদের কাছে হরিনাথ দের বিশ্ববিদ্যালয়ে অপকর্মের কথা বলিতেছিলেন, এবং মনে হয় যে এই প্রার্থীর অনুকূলে তাহার great academic distinction বা শিক্ষাগত অনন্যসাধারণ যোগ্যতার কথাও বলিয়া থাকিবেন। আমি যতদূর জানি, ইহার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এইরূপ বিস্ময়কর অনাচার আর হয় নাই।

এই অঘটন কেন ঘটিল তাহা লইয়া কানাঘুষা শোনা যাইত। ইহা কি সত্য নয় যে এইজাতীয় অবৈধ মনোনয়ন ও নিয়োগের অন্তরালে কোন অবৈধ সংস্রবের প্রভাব ছিল এবং সেই কথাই হরিনাথ দে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া আশুতোষের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন ? আশুতোষ তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে দীর্ঘতর অনুসন্ধানে তিনি প্রস্তুত আছেন। এদিকে আর্লসাহেব সর্ববিষয়ে আশুতোষের সহিত একমত হইয়া একটি পুনশ্চ (P.S.) যোগ করিলেন যে এই ব্যাপার লইয়া ফৌজদারি মামলার প্রয়োজন নাই। দীর্ঘতর অনুসন্ধানে আশুতোষ প্রস্তুত আছেন বলিয়া সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে হরিনাথের সাক্ষীদিগকে তাঁহার জেরার সম্মুখীন হইতে হইবে ; কে বলিতে পারে আশুতোষকেও হরিনাথের কৌঁসুলীর কাছে ডেপুটি নিয়োগ-সম্পর্কে জেরার সম্মুখীন হইতে হইত কি না ? ফৌজদারি মামলা নিষিদ্ধ করিয়া কাউন্সিলই সে সম্ভাবনার উপরে যবনিকা টানিয়া দিলেন।

আমি আশুতোষ বা হরিনাথের কাহিনী লিখিতে বসি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও পরীক্ষক হিসাবে ইহার উচ্চমান ও মর্যাদার যে অবনতি সেইকালে হইয়াছে,

তাহাই লিপিবন্ধ করিতেছি। ইহা নেপোলিয়ন কর্তৃক Due d' Enghien-এর অপসারণের সঙ্গে তুলনীয়। হরিনাথকে বরখাস্ত করা হইলেও চাপা অপবাদ কিন্তু চাপা পড়িল না। তিনটি পথে ইহা গুঞ্জরিত হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়-মনোনীত অন্য ডেপুটিরা এই সহকর্মীকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করিতে লাগিলেন, আইন কলেজের ছাত্ররা বলাবলি করিতে লাগিলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের করণিকরা আড়ালে ইহার রসাস্বাদ করিতে থাকিলেন। ১৯১০ সালে হরিনাথ-বিতাড়ন আর তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে অমরত্বদান—ইহাদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল কি?

৫

হরিনাথকে জব্দ করিয়া আশুতোষ আরও সাহসী হইলেন এবং ১৯১২—১৩ সালে তিনি একটা গর্হিত কাজে জড়াইয়া পড়িলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সেকথা উত্থাপিত হইবে। ১৯১৪—১৫ সালে তিনি পরীক্ষার ফি'র উপর নির্ভর করিয়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসকে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিলেন। শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলেন—ইহা হইল 'robbing Peter to pay Paul'। আমার বক্তব্য, যে তিনি যে-ব্যবস্থা করিলেন তাহার দ্বারা পিটার এবং পল উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, অর্থাৎ যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট পঠন-পাঠনের উন্নতির কথা তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেন, তাহার দ্বারা এম-এ, এম-এস্‌সি ও উচ্চতর পঠন-পাঠনের ক্ষতি হইল এবং আন্ডার-গ্রাজুয়েট কলেজগুলির মানোন্নতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হইল।

প্রেমচাঁদবৃত্তি পরীক্ষার অবমূল্যায়নের কথা পূর্বেই বলিযাছি। আশুতোষ সাড়ম্বরে ইউনিভার্সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রী পি-এইচ. ডি-র প্রবর্তন করিলেন এবং ১৯০৮ সাল হইতে সতীশ বিদ্যাভূষণ, আবদুল্লা সুরাবর্দী, ব্রজেন্দ্র শীল, হীরালাল হালদার প্রভৃতি এই ডিগ্রী লাভ করিলেন। নিয়ম ছিল, সেই আমলের পি-এইচ্‌ ডি-র থীসিস প্রকাশ করিবে বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা ন্যায়সঙ্গতও বটে, কারণ Advacement of Learning বা বিদ্যার বিবর্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ। কিন্তু এখানেও নানাভাবে তদ্বির প্রবেশ করিল। প্রথমেই দেখা গেল যাঁহারা প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা তিন বৎসর বৃত্তিনির্দিষ্ট কাজ সমাপন করিয়া সেই নিবন্ধকেই ডক্টরেটের জন্য পেশ করিতে লাগিলেন। যতদূর জানি, যদুনাথ সরকার ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়া এই ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেন। প্রথম দিকে পরীক্ষার মান বেশ উঁচু ছিল। আমার সীমিত বুদ্ধিতে যতটুকু বলিতে পারি মধ্যযুগের ভারতীয় তর্কশাস্ত্র-সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিবন্ধ এবং নব্য হিগেলিয়ান দর্শন-সম্পর্কে হীরালাল হালদারের নিবন্ধ ঐসকল বিষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রথম যে নিবন্ধ দাখিল করেন তাহার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন পি. কে রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁহারা পরীক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহবান করেন, দাশগুপ্ত সেই পরীক্ষায় হাজির হইলেন না বলিয়া সেবার ব্যর্থকাম হইলেন।

পি. কে. রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য-জাতীয় লোক নমনীয় নহেন। অথচ একনায়কত্বের প্রধান প্রয়োজন পার্শ্বচরদের নমনীয়তা। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন যে নূতন আইন পাস করিলেন তাহাতে কলেজগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ইউনিভার্সিটির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। যতদূর মনে আছে, এই পদের জন্য যে-সকল আবশ্যিক শর্ত নির্দিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে একটি হইল উঁচুদরের বিদ্যাবত্তা। পি. কে. রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কলেজ ইন্‌স্‌পেক্টর। তিনি খুব নামজাদা লোক, বিলাতে এডিনবরায় ডি. এস্‌-সি

পরীক্ষায় লর্ড হলডেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম হইয়াছিলেন। হলডেনের সহযোগিতার জন্যই—অবশ্য অগস্টিন বীরেল প্রভৃতিও ছিলেন—এ্যাসকুইথের প্রথম ক্যাবিনেটকে বলা হইত পণ্ডিতের ক্যাবিনেট। পি. কে. রায় আশুতোষ অপেক্ষা বয়সে বড় এবং শিক্ষকস্থানীয়। প্রথম কলেজ-পরিদর্শকের পদের জন্য তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির কথা ভাবা যায় না এবং তাঁহার নিয়োগের বেশ খানিকটা পাবলিসিটি ভ্যালু—প্রচারমূল্যও—আছে। তাঁহার ব্যক্তিত্বও খুব প্রখর ছিল। স্যারের কাছে শুনিয়াছি, সাহেবী পি. কে. রায় নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বাঙ্গালীয়ানা অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক চার্লস্ রাসেল (Russell) কি একটা ব্যাপারে কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অমনি অধ্যক্ষ বাহির হইয়া আসিয়া মি-স্-টা-র রাসেল মি-স্-টা-র রাসেল বলিয়া ডাক দিয়া সাহেবকে সমঝাইয়া দিলেন। ঢাকা কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি হরিনাথকে প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য এথিক্স্ পড়াইতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম বক্তৃতায়ই হরিনাথ যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই যে এথিক্স্ বলিয়া কোন মৌলিক শাস্ত্র নাই ; ইহার কোন প্রতিজ্ঞাই স্বতঃপ্রামাণ্য নয়। কথাটা পি. কে. রায়ের কানে গেল ; পি. কে. রায় হরিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আর এথিক্স্ পড়াইতে হইবে না'।

কলেজসমূহের ইন্স্পেক্টর হইয়া পি. কে. রায় বেশ একটা সাড়া জাগাইয়া দেন। তাঁহার দুইটি কাজ স্মরণীয়। তিনি ঢাকা কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখেন, একটি ক্লাসে এফ. সি. টার্নার ইংরেজি পড়াইতেছেন। টার্নার ছিলেন অংকের অধ্যাপক ; তাঁহার লিখিত ডাইনামিক্স্ বই আমিও পড়িয়াছি। তাঁহার ইংরেজি পড়াইবার যোগ্যতা-সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, সাহেব উত্তর দিলেন, ইহা তাঁহার মাতৃভাষা এবং সেইজন্যই তিনি পড়াইতেছেন। পি. কে. রায় যে মন্তব্য করেন তাহা নানারূপে ছড়াইয়া পড়ে ; অবশ্য তাৎপর্যে কোন ব্যতিক্রম নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সাহেব যদি বাংলা শিখিতে চাহেন তবে কি তিনি যে-কোন বাঙ্গালীর নিকট শিখিবেন, না কোন যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙ্গালীর শরণাপন্ন হইবেন? সাহেব ইহাতে লজ্জিত হইয়া ছুটি লইয়া বিলাত যান এবং কিছুকাল পড়াশোনা করিয়া ইংরেজি পড়াইবার যোগ্যতা (ডিপ্লোমা) অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমার দুইবন্ধু —সুরেশচন্দ্র দে ও কিরণচন্দ্র বসু ১৯১৮ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েন এবং ১৯২০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। তাঁহারাই বোধ হয় পুরানো ঢাকা কলেজের শেষবারের ছাত্র। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথম দিন প্রিন্সিপ্যাল ক্লাসে আসিয়া ইংরেজি পড়ান এবং দুইটি কথা বলিয়া পাঠন আরম্ভ করেন—(১) তাঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণ আর (২) পি. কে. রায়ের কটূক্তিতে তাঁহার এই বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন। আর একটি কাহিনীও তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। রাজশাহী কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইয়া তিনি এক ক্লাসে ঢুকিয়া দেখেন—অধ্যাপক ফিলজফি পড়াইতেছেন। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বেশ খানিকক্ষণ পড়া শুনিলেন। পরে, পরিদর্শনের কাজ সমাপ্ত করিয়া সেই অধ্যাপককে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি লজিক লইয়া আর একবার এম-এ পরীক্ষা দাও। তাহা না হইলে তুমি ঠিকমত এই বিষয় পড়াইতে পারিবে না'। এই অধ্যাপকের পক্ষে বলিতে হইবে যে তিনি লজিক লইয়া পুনরায় পরীক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাধা আসিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান হইতে। এই ভদ্রলোক খেদের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যদি লজিক লইয়া পরীক্ষা দিতে পারিতেন, তবে তাঁহার নিজেরই উপকার হইত।

৬

কলেজ পরিদর্শনের জন্য ভারতসরকার বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা অনুদান দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং একটা লিখিত বা অ-লিখিত শর্ত ছিল যে এই পদাধিকারী উচ্চবিদ্যাবত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন। পি. কে. রায় শুধু নামজাদা লোক ছিলেন না ; তিনি লণ্ডন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি ছিলেন। এই জাতীয় লোক এই পদে আসিলে সহজেই অডিটর জেনারেল বা হাইকোর্টের মত অনেকটা স্বাধীন হইতে পারেন এবং স্যার লরেন্স জেনকিন্স্-জাতীয় চীফ জাস্টিসের মত কর্তৃপক্ষের কণ্টকও হইতে পারেন। এই পদে বশংবদ লোক থাকিলে সিণ্ডিকেটের সুবিধা। আশুতোষের হাতে বশংবদ লোকের অভাব ছিল না ; তিনি দেখিলেন, এই পদের জন্য বিবেচনা করা যায় এইরূপ লোক দুইজন। প্রথম জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—প্রবীণ ব্যক্তি এবং ফিজিক্সের অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত। এদিকে তখন রেজিস্ট্রারের পদও খালি হইয়াছে। সেখানেও একজন উপযুক্ত অর্থাৎ বশংবদ লোকের প্রয়োজন। জ্ঞানচন্দ্র দুইটি পদেই আনাগোনা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে আর একজন লোকের প্রতি আশুতোষের নজর আকৃষ্ট হইল—ইনি হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। হরেন্দ্রকুমার সিটি কলেজ হইতে আসিয়া প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার ও পরে পোস্ট-গ্রাজুয়েট সংসদের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ভিতরের কথা জানি না, এমন হইতে পারে যে জ্ঞানচন্দ্র রেজিস্ট্রারের কাজ বেশি পছন্দ করিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে আশুতোষ অনুভব করিলেন, ইঁহাদের আসল যোগ্যতা—বশ্যতা—থাকিলেও বাহিরের জৌলুস ততটা নাই যাহাতে পি. কে. রায়ের শূন্য আসনে ইঁহারা মানানসই হইবেন। উভয়েই প্রথম শ্রেণীর এম-এ, কিন্তু উভয়েই পাসকোর্সে বি-এ। একটা ডক্টরেট না থাকিলে ঐ পদে তেমন শোভন হইবে না। জ্ঞানচন্দ্র আশুতোষের সমবয়সী ; ফিজিক্সের ডক্টর হইতে হইলে ল্যাবরেটরীতে যাইতে হয়। হরেন্দ্রকুমার ঘরে বসিয়া থীসিস লিখিতে পারেন, বাকিটা কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। এমনও হইতে পারে, হরেন্দ্রকুমারের মনে গবেষণার প্রেরণা জাগ্রত হইল এবং তিনি ১৯১৭ সালে ডক্টরেটের থীসিস দাখিল করিলেন।

হরেন্দ্রকুমারের থীসিসের বিষয়—The origins of the English Novel (1516-1914)। ইহা দাখিল করা হয় ১৯১৭ সালে এবং ১৯১৮ সালে তাঁহাকে এই ডিগ্রি দেওয়া হয়। তাঁহার জীবনীকারেরা গর্বের সহিত বলিয়া থাকেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইংরেজির ডক্টর। আমি পঞ্চম ডক্টর এবং সেইজন্য পূর্বসূরির গৌরবে আমার গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকগুলি ব্যাপারে খটকা লাগে এবং নিজে এই পথের পথিক বলিয়া সেই প্রশ্ন পেশ করিতেছি। হরেন্দ্রকুমার বহু ইংরেজি বই ছাপিয়াছেন, কিন্তু এই কীর্তিকে অপ্রকাশিত রাখিয়া পাঠকসমাজকে বঞ্চিত করিলেন কেন? বিদ্যোৎসাহী এবং হরেন্দ্রকুমারের পৃষ্ঠপোষক আশুতোষই-বা ইহাকে আড়ালে থাকিতে দিলেন কেন? ইহার বিষয়বস্তুই-বা কি? ইংরেজি উপন্যাসের উৎপত্তি হইতেই কি ৩৯৮ বৎসর (১৫১৬—১৯১৪) লাগিয়াছিল? থীসিসের শিরোনাম হইতে এইরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। এই দীর্ঘ গর্ভবাসের রহস্য বুঝিতে পারি না। ১৯১৪ সালে পূর্ণাবয়ব শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কি হরেন্দ্রকুমার সেই বোধিসত্ত্বের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে বসিলেন? না, তিনি 'Origins' শিরোনামা দিলেও ইংরেজি উপন্যাসে ক্রমবিকাশ লিখিয়াছিলেন? 'Origins'শব্দের এইরূপ অর্থ খুব অভিনব বটে।

কেহ কেহ বলিবেন যে এই-সকল বিষয় তো পরীক্ষকরা বিচার করিবেন। থীসিস যখন তিনি জগৎসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই, তখন সেই সম্পর্কে সন্দেহ ও প্রশ্ন করার

অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে। হরেন্দ্রকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইংরেজির ডক্টর। ই'হার গবেষণা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন—মিঃ ব্যারো, মিঃ স্টার্লিং ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। মিঃ ব্যারো ও মিঃ স্টার্লিং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সদ্য পাস করিয়া ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া আসিয়াছেন এবং ই'হাদের ইংরেজি জ্ঞানের প্রধান পরিচয়—ই'হাদের মাতৃভাষা ইংরেজি। এই দুইজনের কেহই ইংরেজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের কোন পরিচয় দেন নাই এবং কেহ কোন বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। এই জাতীয় লোককে সেই আমলের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রি ডক্টরেটের পরীক্ষক তিনিই করিতে পারেন যিনি পরীক্ষার মান রক্ষার জন্য আগ্রহী নহেন, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে 'Graduate of great distinction' বলিয়া চালাইতে পারেন।

তৃতীয় পরীক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একাই একশ'। অন্যত্র তাঁহার ইংরেজি এম-এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নমুনা দিয়াছি। তাঁহার নবীন জীবনীকার অধ্যাপক মোহান্তি লিখিয়াছেন যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের তুলনায় তিনি লিখিয়াছেন কম এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটা দিকের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন...'well-versed in Oriental and Western Literatures' (বহুবচন লক্ষণীয়)। কি ভয়ানক ব্যাপার। আচার্য শীলের সাহিত্য-সম্পর্কে একটি বই আমরা অনেকেই দেখিয়াছি—New Essays in Criticism। তাহা সেই ছাত্রমেধ যজ্ঞের প্রশ্নের মত বিভীষিকার সৃষ্টি করে না ; তবে ইহা ইংরেজিতে ডক্টরেটের থীসিস দেখার যোগ্যতারও কোন আভাস দেয় না। ই'হার ভয়ানক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে একটা বিষয়ে বেশ টনটনে সাধারণ-জ্ঞান ছিল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় চাকুরি পাইয়া আসিলেন এবং সেই বিতর্ক-কণ্টকিত সময়ে আশুতোষ তাঁহাকে সকল কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিলেন। ঐ-সকল বিষয়ের যত বিবরণ পড়িয়াছি তাহা হইতে মনে হয় তিনি কোথাও আশুতোষের বিরুদ্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই, এবং ছাত্রবৎসল আশুতোষ ১৯১০ সালের ইংরেজি এম-এ'তে ছাত্রমেধ যজ্ঞেও তাঁহাকে পূর্ণ-সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র শীলের জীবনচরিতের উপসংহারের জীবনীকার মন্তব্য করিয়াছেন...'his scholarship and wisdom have not found adequate expression in his published writings'। ইহা ব্যারো ও স্টার্লিং সম্পর্কেও প্রযোজ্য, কারণ তাঁহারা ইংরেজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচায়ক কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখেন নাই। হরেন্দ্রকুমারও সেই পথই বাছিয়া লইলেন। ইংরেজি উপন্যাস-বিষয়ে তাঁহার 'Scholarship and Wisdom' জগতের কাছে অপ্রকাশিত রহিয়া গেল।

ব্যারো আর স্টার্লিং বিদ্বান বা বিদ্যার্থী ছিলেন না। তরুণ বয়সেই এদেশে আসিয়া উচ্চপদ ও উচ্চবেতনের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন, এদেশে অন্ততঃ শিক্ষাবিভাগের সাহেবদের রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং অন্যান্য অনেক সাহেবদের মত তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহী। জেম্স্ সাহেবকে কেন অবসর গ্রহণ করিতে হইল তাহার সঠিক কারণ আজও স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই। তবে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পঠন-পাঠনের স্বীকৃতি তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে আশুতোষের অশ্রান্ত বিরোধিতাই ইহার মূল, অন্ততঃ অন্যতম কারণ এইরূপ গুজব খুব প্রচারলাভ করিয়াছিল। এই দুই সাহেব ইহা বুঝিয়া থাকিবেন যে যদি ঐ থীসিসের সত্যকার বিচারই কাম্য হইত তাহা হইলে বিলাতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহজেই পাওয়া যাইত। তাঁহাদিগকে কেন পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে ইহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। আর রহিলেন ব্রজধামের ইন্দ্র যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও আধুনিক, ললিতকলা ও বিজ্ঞান, যেখানে যাহা-কিছু আছে সব গলাধঃকরণ করিয়া হজম (বদহজম ?)

করিয়াছেন আর সর্বোপরি মহোদধি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু গ্রন্থকর্তা ও কর্তৃপক্ষ যে ইহা প্রকাশ করিতে সাহস পাইলেন না, ইহাতে এই অদ্ভুত বস্তুটির অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়।

৭

কিভাবে পরীক্ষাকে খেলো করিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতিসাধন করেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। যাহাতে অধীনস্থ কলেজগুলির পঠন-পাঠনের উপযুক্ত মান বজায় রাখা হয় সেইজন্যই কলেজ-পরিদর্শকের পদ সৃষ্ট হয় এবং প্রথম যিনি এই পদে নিযুক্ত হন তাঁহার পরিদর্শনের নমুনা দিয়াছি। হরেন্দ্রকুমারের আমলে এই ব্যাপারটা খুবই লঘু হইয়া যায়। শুনিয়াছি তিনি এই কাজটা অনেকটা তাঁহার কেরানীর উপর ছাড়িয়া দিতেন। কেরানী যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। হয়ত সেই-সব তথ্যাদি দেখিয়াই তিনি কলেজের হাঁড়ির খবর বা নাড়ির খবর সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কলেজে ঘুরিয়া খুব বেশি পরিদর্শনের প্রয়োজন হইত না। তখনকার দিনে একটা গল্প খুব প্রচলিত ছিল। কলিকাতার যাত্রীদের যে ট্রেন ময়মনসিংহে পঁহুছিত, তাহার অল্প-কিছু পরেই কলিকাতাগামী ট্রেন ময়মনসিংহ হইতে ছাড়িত। প্রচলিত গুজব এই যে ময়মনসিংহ কলেজ পরিদর্শন করিতে গেলে হরেন্দ্রকুমার আর কষ্ট করিয়া কলেজে যাইতেন না বা তথায় অযথা কালক্ষেপণ করিতেন না। স্টেশনের ওয়েটিংরুমে কলেজের অধ্যক্ষ ও বড়বাবু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাইয়া যাইতেন ও কাগজপত্র দিয়া যাইতেন এবং তিনিও অপেক্ষমাণ ট্রেনে উঠিয়া পড়িতেন। এই গল্প একেবারে কিংবদন্তী হইতে পারে এবং এখন ইহার যাথার্থ্য যাচাই করা সম্ভবও নহে।

হরেন্দ্রকুমারের কলেজ পরিদর্শনের একটা বিশিষ্ট স্টাইল ছিল। ইহার সম্পর্কে গল্প-গুজব যাহা প্রচলিত ছিল তাহা মুখরোচক হইলেও, বর্তমান আলোচনায় অবান্তর হইবে। আমি শুধু তাঁহার প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিদর্শনের উল্লেখ করিব, কারণ আমি উহার প্রত্যক্ষদর্শী। হরেন্দ্রকুমার একবছর এই কলেজে এম-এ পড়িয়াছেন, এফ-এ ও বি-এ পড়িয়াছেন রিপন কলেজে। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ তুলিয়া লওয়া হয় তখন তিনি এই শিরশ্ছেদে লাভবান হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহাকেই নবগঠিত পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সচিব নিযুক্ত করা হয়। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজই শীর্ষস্থানীয়। ইহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিলে শুধু যে এই কলেজকেই তিনি সৎপরামর্শ দিতে পারিতেন তাহা নহে, এই কলেজ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে অন্যান্য আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কলেজ পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারিত। তখন আমি প্রেসিডেন্সীতে অধ্যাপক। একদিন কলেজে গিয়া দেখি হরেন্দ্রকুমার বসিয়া সিগারেট খাইতেছেন এবং প্রফেসারদের বসিবার ঘরের এক অংশে যে যখন আসিতেছেন তাঁহার সঙ্গে গালগল্প করিতেছেন। প্রবীণ অতিথি--আমিও বসিলাম। কথাবার্তা যাহা হইতেছিল তাহার সঙ্গে কলেজ বা শিক্ষাব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। খানিকক্ষণ পর আমাদের মধ্যে কে-একজন প্রশ্ন করিলেন, তিনি পরিদর্শন কাজে কখন যাইবেন। তিনি উত্তর করিলেন, বুড়ো মানুষ, এই বিরাট বাড়ির উঁচু সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিবেন না বা এবাড়ি-ওবাড়ি ঘোরাঘুরি করিতে পারিবেন না। অমুক বাবু (অর্থাৎ তাঁহার সহচর কেরানী) তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই বলিয়া তিনি আর একটা সিগারেট চাহিলেন। বাহির হইয়া দেখিলাম, তাঁহার সহযোগী জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একা একা পায়চারি

করিতেছেন—Remote, Unfriended, melancholy, slow। আর একজন বিজ্ঞানী বোধ হয় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখি নাই, এখন নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরের ক্লাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, হরেন্দ্রকুমার ঐঘর হইতেই পরিদর্শন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি পি. কে. রায়ের প্রবর্তিত পন্থা বদলাইয়া কলেজ পরিদর্শনের নূতন স্টাইল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সতের বৎসর এই জাতীয় পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া এই বিদ্যোৎসাহী পরিদর্শক যখন শিক্ষাদান ব্যাপারে ফিরিয়া গিয়া ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক হইলেন, তখন কলেজ-পরিদর্শকের নিকট হইতে শিক্ষাগত উঁচুদরের যোগ্যতা আর কেহ প্রত্যাশা করিল না। এই শাঁসাল চাকুরি শুধু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নৈকট্যের চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইল আর তাহার শুভাগমনে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষাদানের মান কতটা উন্নীত হইয়াছিল তাহা ব্যবস্থাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হরেন্দ্রকুমারের ছাত্রগণ বলিতে পারেন। এই সময়কার জনৈক প্রথম শ্রেণীর এম-এ লিখিয়াছিলেন, এই সময়েই কবি কীট্সের মৃত্যু হয়। অনুধাবনীয় আবিষ্কার বটে!

৮

১৯১৭ সালে হরেন্দ্রকুমার পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাসংস্থার সেক্রেটারী হয়েন এবং আর একটি যুগান্তকারী ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হয়েন। এই বিষয়ে বিশের দশকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার কোন উপযুক্ত জবাব কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন দলিল প্রকাশিতব্য কিনা জানি না। যাহা তখন পড়িয়াছিলাম, যাহা পরে শুনিয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটা প্রশ্ন রাখিয়া যাইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিচার হইয়াই থাকে, সর্বদেশে ও সর্বকালে ; কিন্তু পরীক্ষকরা যাহা স্থির করেন তাহাই মানিয়া লওয়ার রীতি। এতবড় পণ্ডিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে ফিজিক্সে খারাপ ফল করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মুরুব্বিরা কিন্তু তাহা উল্টাইতে চাহিলেন না। ১৯১৭ সালের ইংরেজি অনার্স পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা করিয়াছিলেন স্টিফেন, জে. এন. দাশগুপ্ত, পাদ্রী হাওয়েলস্ ও পাওয়ার এবং হরেন্দ্রকুমার আর পরীক্ষক ছিলেন হেরম্ব মৈত্র, প্রফুল্ল ঘোষ, স্টার্লিং, হাওয়েলস্, (রেঙ্গুনের) এ. ডি. কীথ ও স্টিফেন। ইহা কি সত্য যে পরীক্ষকদের পরীক্ষায়—সেই আমলে প্রধান পরীক্ষকের ব্যবস্থা ছিল না—ছয়জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায় এবং ষষ্ঠ হইয়াছিলেন শ্রীরামপুর কলেজের অনিলবিহারী ভট্টাচার্য ; অনিলবাবু দিল্লী হিন্দু কলেজে আমার সহকর্মী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর বছর-দুই আগেও আমার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। তাঁহার অধ্যক্ষ পূর্বোল্লিখিত হাওয়েলস্ নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ''you were the last man in the first list.' ইহা কি সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্যার আশুতোষ একটি আইন দেখাইয়া বলিলেন যে পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা একযোগে পরীক্ষণ-কাজ সমাপ্ত করিবেন? রেঙ্গুনবাসী এ. ডি. কীথ কলিকাতাস্থ প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নাই। সুতরাং যে আইন এতকাল কেহ জানিত না সেই আইন অনুসারে কীথ যে উত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং অন্যতম প্রশ্নকর্তা হরেন্দ্রকুমার এই কার্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মর্যাদা রক্ষা করেন! হরেন্দ্রকুমারের এই পুণ্যকার্যের ফলেই কি আরও পাঁচজন প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন, যাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন আশুতোষ-তনয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?

সেইবারকার পরীক্ষার বিষয়ে আরও কিছু কিছু গল্প স্যারের কাছে শুনিয়াছি, যাহা

মুখরোচক হইলেও প্রমাণাভাবাৎ পুনরুল্লেখ্য নহে। কোন ভবিষ্যৎ-ঐতিহাসিক পুরানো দলিলপত্র পরীক্ষা করিলে এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। কিন্তু সেই বিষয়েও সন্দেহ আছে। এইবার এক অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। পরীক্ষক যে মূল্যায়নই করুন না কেন, সেই মূল্যায়ন এবং তাহার দলিলপত্রও বদলান যায়। ইহার পর পরীক্ষণবিভাগের খাতাপত্রের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা আর রক্ষা করা কি সম্ভব? পরীক্ষার ফল-সম্পর্কে কৌতূহল আমার পৈতৃক নেশা বা ব্যাধি। ১৯২১ সালে এম-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে হস্টেল হইতে প্রবীণরা যখন ফল দেখিতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ গেলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সেখানে ফিরোজ দস্তুরকে দেখিলাম ; কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক বলিয়া তাঁহাকে চিনিতাম, যদিও তখন আলাপ ছিল না। ঐবার ইংরেজি 'এ' গ্রুপে ১৭ জন প্রথম শ্রেণীতে পাস করিলেন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হইলেন এক বন্ধনীভুক্ত চৌদ্দজন। ইউনিভার্সিটিতে একটা প্রথা ছিল—এম-এ পরীক্ষায় যদি অল্প ব্যবধান থাকে তাহা হইলে ব্যবহিত ছাত্রদ্বয়কে একত্র করিয়া একবন্ধনীতে পুরিয়া দেওয়া। ১৮৯১ সালে ইংরেজিতে অক্ষয়কুমার ঠাকুর (T) এবং প্রমথ চৌধুরী (C) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েন। সাধারণ নিয়ম অনুসারে চৌধুরী (C) প্রমথনাথ ও ঠাকুর (T) অক্ষয়কুমার—এই ক্রম অনুসারে নাম দুইটি বসান উচিত ছিল। কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রকাশিত হইল ঠাকুর অক্ষয়কুমার এবং তার নীচে চৌধুরী প্রমথনাথ। ইহার অর্থ ঠাকুর চৌধুরী হইতে কিঞ্চিৎ বেশি পাইয়াছে। ১৯২৭ সালে আমি (S) এবং মজুমদার (M) পদবীধারী প্রার্থী এক ব্রাকেটে প্রথম হই। মজুমদার মহাশয়ের নাম আমার পরে লিখিত হয়। শুনিয়াছি তিনি আমার চেয়ে মাত্র তিন নম্বর কম পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই যে চৌদ্দজন এক ব্রাকেটে চতুর্থ হইলেন ইহার কারণ এই যে, কর্তার এক প্রিয়পাত্রের পুত্রের তিরিশ নম্বর কম ছিল। সুতরাং উপরে যে ১৩জন ছিলেন তাঁহাদের নাম গুণানুসারেই সাজান হয়—সেন, চক্রবর্তী, গুপ্ত, চন্দ ইত্যাদি। এখন সব জায়গায় ইন্টারভিউর ছড়াছড়ি। আগে ইন্টারভিউ ছাড়াই লোক নিযুক্ত হইত। যখন 'ইন্টারভিউ' প্রবর্তিত হইল, তখন ইংরেজিতে স্যারই বোর্ডের একমাত্র অথবা প্রধান বিশেষজ্ঞ থাকিতেন। একবার দেখা গেল, ১৯২১ সালের সেই চতুর্থ চৌদ্দজনের একাধিক ব্যক্তি একই পদের প্রার্থী হইয়াছেন। খেয়ালী লোক, স্যার ঠিক করিলেন এম-এ পরীক্ষায় ঠিক কে কত নম্বর পাইয়াছিলেন ইহা দেখিয়া তিনি বোর্ডের সভায় যাইবেন। কন্ট্রোলার অফিসে যাইয়া খাতা বাহির করিয়া তিনি অবাক। পুরানো কাগজ সব সরাইয়া ফেলিয়া নূতন কাগজ ঢোকান হইয়াছে, এবং সেখানে কোন দাগই নাই, সবাই কেমন করিয়া ঠিক ৪৮০ পাইয়াছে! ইহা স্যারের কাছে শোনা, আমি নিজে প্রত্যক্ষ করি নাই। কিন্তু ইহার পরের বৎসর আবার ফল দেখিতে যাইয়া দেখি আমাদের হস্টেলের একজন ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। টাইপ-করা যে ফল জালে ঘেরা বোর্ডে টাঙান হইয়াছে তাহাতে কালি দিয়া একটা টান দিয়া তাঁহার নাম প্রথম শ্রেণীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম, তিনি কর্তাকে ধরিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবার হুকুম আনিতে আনিতে ফল টাইপ-করা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কন্ট্রোলার পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ততদিনে এই ধরনের তদ্বির সম্পর্কে সঙ্কোচের বালাইও চলিয়া গিয়াছে। ছাপা ক্যালেণ্ডারে তাঁহার নাম প্রথম শ্রেণীতেই আছে। এইরূপ ঘটনা প্রতিবৎসরই এত ঘটিতে থাকে যে ইহার হিসাব দিতে গেলে মহাভারত লিখিতে হয়। এই ধরনের তদ্বির শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালে কর্তার দৌহিত্র, তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলরের কনিষ্ঠপুত্রের এমন সকরুণ পরিণতি ডাকিয়া আনিল যে বেচারী দিব্যেন্দুকুমার মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইল। তদ্বিরের চাপে তাহার পরীক্ষার খাতায় এত বেশী নম্বর বাড়ান হইয়াছিল যে পরে দেখা যায় একটি প্রশ্নে পরীক্ষকের হাতে

সে দুই পাইলেও প্রধান পরীক্ষকের দাক্ষিণ্যে সে দশের মধ্যে এগার পাইয়াছে এবং তদন্তের পরিণামে তাহার প্রথম শ্রেণীভুক্ত হওয়া সার্টিফিকেট ফিরাইয়া লইয়া তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিতে হয়। যতদূর জানি, দিব্যেন্দুকুমার আর এদেশে ফিরে নাই।

৯

আশুতোষ শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া অনেক দিনের একটা পুরানো রহস্য-সম্পর্কে যেন একটু নূতন আলোক পাইলাম। আশুতোষের চতুর্থক্ষেপের ভাইস-চ্যান্সেলারি যখন শেষ হইয়া আসে তখন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল যে তাঁহাকে পঞ্চমবার অর্থাৎ ১৯১৪ সালের মার্চ মাসের পর আর ভাইস-চ্যান্সেলর রাখা হইবে না। ইহা আমরা গ্রামে বসিয়াও শুনিয়াছিলাম : শত-বার্ষিক ইতিহাসে জামাতা প্রমথনাথও তাহা বলিযাছেন। পরে শুনিয়াছি, অনুমান করা গিয়াছিল যে এইরূপ স্বনামধন্য পুরুষের যোগ্য উত্তরসূরি হইতে পারেন দুই প্রখ্যাত ব্যবহারাজীবের যে-কোন একজন—রাসবিহারী ঘোষ ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তাঁহারা উভয়েই আশুতোষের আইন-শিক্ষক ও বন্ধু। আশুতোষের পদত্যাগ অনেকটা পদচ্যুতির মত। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা রাজি হইবেন না ইহাও শোনা গিয়াছিল। উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের প্রথম ইচ্ছা ছিল আর. ন্যাথান নামে একজন বেতনভুক্ সাহেবকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা। কিন্তু সংবাদটা ফাঁস হইয়া যাওয়ায় এবং ন্যাথান সাহেব অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহা সম্ভব হইল না। যথাসময়ে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম ঘোষিত হইল এবং তিনি আশুতোষের স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ইহা সকলেই মানিযা লইলেও আপত্তি জানাইল একটি ঘোড়া। পূর্বেই বলিয়াছি, জনৈক অনুরক্ত সিন্ডিক দক্ষিণে না আসিয়া উত্তরে নবোদিত সূর্যকে নমস্কার করিতে ব্যগ্র হইলেন ; কিন্তু তাঁহার গাড়ির ঘোড়া নাকি দক্ষিণাভিমুখী না হইয়া ছাড়িবে না। দেখা গেল, ঘোড়ার horse-sense অভ্রান্ত। ক্ষমতার উৎস যেখানে ছিল সেখানেই রহিল, শুধু ভাইস-চ্যান্সেলরের চেয়ারে অপর একজন বসিলেন।

হতাশ হইলেন প্রধান ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। তাঁহারা দেখিলেন যে নূতন V.C.-ও আশুতোষের কথা শুনিয়াই চলেন—'wedded to ways which cannot be approved and..is unable to strike any better line of his own'। তাঁহারা ইহাও দেখিলেন যে বঙ্গসরকার আশুতোষকে আর পছন্দ না করিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বে অভিভূত। তবু কিছুকাল তাঁহারা চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন (Let sleeping dogs lie......')। সুতরাং সর্বাধিকারীর কার্যকালের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইল—১৯১৮ সাল পর্যন্ত। ১৯১৭ সালে কেন্দ্রীয় কর্তারা আবার চাঙ্গা হইলেন , এবার তাঁহারা কিছু করিবেন। উদ্দেশ্য আশুতোষকে ঘায়েল করা। সুকৌশলী আশুতোষ বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন যে প্রবল প্রতিপক্ষ ভারতসরকার আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। সিনেট-সিন্ডিকেট আশুতোষের হাতে থাকায় সর্বাধিকারীকে নিয়োগ করিয়া সরকারের কিছু লাভ হয় নাই ; ক্ষমতার উৎস যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে। ১৯১৮ সালে দেবপ্রসাদের কার্যকলাপ শেষ হওয়ার আগেই সরকার যে এই-সকল কথা ভাবিতেছিলেন, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ-লিখিত জীবনচরিত পাঠ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সিনেট ও সিন্ডিকেটের উপরে আশুতোষের অবিচল প্রভাব থাকায়

সরকার অন্যভাবে ক্ষমতা কাড়িতে পারেন। এমনও হইতে পারে যে পূর্বে প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করিয়া ন্যাথান সাহেবের মত একজন বেতনভুক্ দক্ষ প্রশাসককে সব সময়ের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে সিনেট ও সিণ্ডিকেটের ক্ষমতা অমনি খর্ব হইয়া যাইবে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আশুতোষ-জামাতা প্রমথনাথ এই সময়টার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : '১৯১৭ সালের অভ্যাগম হইল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মাথায় করিয়া। কতকগুলি বিপ্রতীপ ঘটনা ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টাকা নষ্ট হইল. সেই টাকা থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন দেওয়া যাইত।' প্রমথনাথ ইতিহাসবিদ্ ; ইতিহাসবিদের প্রথম গুণ স্পষ্ট, নির্ভুল বর্ণনা। প্রমথনাথ কথার মারপ্যাঁচে যেন আসল ঘটনাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রধান বিপ্রতীপ ঘটনা সেবারকার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বোধহয় ১লা মার্চ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। ঢাকা কেন্দ্রে আমাদের স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষা দিত। সেবারকার ছাত্রদের লইয়া বাবা ঢাকায় আসিয়াছিলেন ; একটা বিবাহ উপলক্ষে আমি আগেই ঢাকা আসিয়াছিলাম। পরীক্ষার আগের দিন আমাদের স্কুলের কয়েকজন ভূত-পূর্ব ছাত্র সেবারকার প্রশ্নের হুবহু নকল লইয়া উপস্থিত হইলেন। দুই দিন পরীক্ষার পর প্রহসন থামাইয়া দেওয়া হইল। ৩১শে মার্চ পুনরায় পরীক্ষা হইল এবং সেই প্রহসন পুনরায় অভিনীত হইল। তারপর জুন মাসে পরীক্ষা লওয়া হইল। প্রমথনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থের অপচয়ের কথা বলিয়াই থামিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হাজার হাজার দরিদ্র পরীক্ষার্থীর যে কয়েক লক্ষ টাকার অপচয় হইল সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি গেল না। আশুতোষ হরিনাথ দেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন—একই সঙ্গে ডিটেকটিভ, কৌঁসুলী, বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আরও পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত ছিলেন, যদিও হরিনাথ দের সঙ্গে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট-সম্পর্ক ছিল না এবং তাঁহার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কপর্দকও হরিনাথ আত্মসাৎ করেন নাই। কিন্তু যে কেলেঙ্কারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এত অপযশ ও অপব্যয় হইল সেই বিষয়ে সত্যানুসন্ধান করিতে আশুতোষ কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলেন নাই।

আমরা গ্রামে শুনিতাম যে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে অপদস্থ করিবার জন্য আশুতোষই প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় কখনও কাহারও কাছে এই অপবাদ শুনি নাই। এখন সরকারি দলিলপত্রের পূর্ব-গোপনীয়তা নাই। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের জীবনচরিত ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই লিখিতেছি। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে লাটসাহেব নিযুক্ত করিয়াছিলেন অনেকটা অনন্যোপায় হইয়া। অন্য প্রভাব-শালী লোক হাতের কাছে পাইলেন না এবং একাধিক কারণে ন্যাথান সাহেবকে সর্বসময়ের জন্য বেতনভুক ভাইস-চ্যান্সেলর করা গেল না। দেবপ্রসাদ হইতেও সরকার যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই পান নাই : দেবপ্রসাদ নিজে কিছুই করিতে পারেন নাই। এই-সব কথা ভাবিয়া সরকার বিচলিত হইয়াছেন এবং নূতন কি করা যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংবিধান তখন চালু ছিল তাহার মধ্যে অবৈতনিক V. C.-র খুব বেশি ক্ষমতা ছিল না। সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যদের ভোটেই সব-কিছু নির্ধারিত হইত। সেই কারণেই দেবপ্রসাদ ইচ্ছা করিলেও নূতন কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। নানা কারণে ন্যাথান সাহেবের নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। যদি সেইরকম কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইত তাহা হইলে আইন বদলাইয়া সিনেট ও সিণ্ডিকেটের অনেক ক্ষমতা তাঁহার উপরে অর্পিত হইতে পারিত। এমন কি সিণ্ডিকেটকে তুলিয়া দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। সুতরাং যাঁহারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে সিনেট, সিণ্ডিকেট বা উপাচার্য

যাহাই করুন না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস, যাঁহারা প্রশ্নপত্র গ্রহণ করেন, মুদ্রণালয়ে পাঠান, প্রুফ দেখার ব্যবস্থা করেন, মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দূর-দূরান্তরে প্রেরণ করেন তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব না থাকিলে সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর কিছুই করিতে পারিবেন না। এইরূপ মনোভাবই এই অভিযানকে প্রণোদিত করিয়াছিল—ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফলও হইল। এক ভি. সি.-র জায়গায় আর এক ভি. সি. আসিলেন, কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতার উৎস যেখানে ছিল সেইখানেই রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা

১

আশুতোষের ভক্তবৃন্দ বলিয়া থাকেন যে আশুতোষের সবচেয়ে বড় কীর্তি তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য যথাযোগ্য স্থান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আমলেই প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্যন্ত মাতৃভাষা অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধি দেন ২৬শে ডিসেম্বর একটি বিশেষ কনভোকেশনে। সেখানে আশুতোষ নিজেই ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতে যাইয়া নিজের কথা একটু বেশি করিয়া বলেন। তিনি বলেন, প্রায় তেইশ বছর আগে সিনেটের জনৈক অনভিজ্ঞ যুবক সদস্য মাতৃভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করিতে চাহিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। পনের বৎসর পর সেই সদস্য পুনরায় চেষ্টা করিয়া পুনরায় ব্যর্থ হয়েন। পরের বৎসর সেই সদস্য (এখন ভাইস-চ্যান্সেলর) বড়লাট (চ্যান্সেলর) লর্ড মিন্টোকে রাজি করাইতে পারিলেন ; মিন্টো বলিলেন, অন্য যে-কোন বিষয়ের মত মাতৃভাষাকে বি-এ পরীক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইবে এবং ইহা আবশ্যিক বিষয় বলিয়া ধার্য হইবে। আশুতোষের এই দাবির একটু ছোট সংশোধন প্রয়োজন। আশুতোষের জীবনীকার নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলিতেছেন (পৃঃ ৫৫) : ১৮৯১ সালে কনভোকেশন বক্তৃতায় ভাইস-চ্যান্সেলর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভাষাকে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দেন এবং সেই 'broad hint' বা স্পষ্ট ইঙ্গিতের ভিত্তিতেই আশুতোষ আর্টস্ ফ্যাকাল্টির সভায় অনুরূপ প্রস্তাব আনেন। আশুতোষ নিজের গুণগান করিতে যাইয়া গুরুদাসকে বেমালুম বাদ দিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া আর একটি অপ্রিয় বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ তাহার পটভূমিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠন ও তাহার দোষগুণ বোঝা যাইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র আজকাল হাজরা রোডে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে ছাপা হয়। আগে কোথায় ছাপা হইত সঙ্গত কারণেই কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশ করিতেন না ; তবে দূরে কোন জায়গায় ছাপা হইত সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুজব ছিল ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রশ্নপত্র বিলাতে ছাপা হইত : প্রশ্নপত্রের বাংলা হরফ দেখিয়া সেইরূপ হওযাই সম্ভব বলিযা মনে হইত। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে ছিল—উত্তরবঙ্গ, আসাম বিহার, উড়িষ্যা এবং ব্রহ্মদেশ। এই কারণেই প্রশ্নকর্তা-নির্বাচন এবং প্রশ্নপত্র-রচনা পরীক্ষার প্রায় একবছর আগে করা হইত। অন্ততঃ ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ১৯১৪ সালের ১লা মার্চ যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হয়, সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে অবশ্যই ছাপা হইয়া গিয়া থাকিবে এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিতরণের কাজও শুরু হইয়া থাকিবে। উহার পরিবর্তন তখন আর সম্ভব নহে। ঐ বছর নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রবীন্দ্রনাথকে ২৬শে ডিসেম্বর বিশেষ সমাবর্তনে ডক্টরেট দেওয়া হয়। ততদিনে মুদ্রিত হইয়া যাওযা ১৯১৪ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একটি প্রশ্ন ছিল Re-write in chaste and elegant Bengali :—'যেদিন লিখিবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এসে প'ড়ে যে দিশাহারা হ'য়ে যেতে

হয়। একসাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস্‌ সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক যদিবা বলা হয় ত অনেক প'ড়ে থাকে। একটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?' রবীন্দ্রনাথের এই রচনাংশটির ভাষা chaste and elegant Bengali নহে বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগকে উহার সংশোধনের ভার দেওয়া হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন সেই সংবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর অধুনালুপ্ত সান্ধ্যদৈনিক Empire-এ। এই কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন এবং অন্য অনেকেও লিখিয়া গিয়াছেন। প্রভাতকুমার টিপ্পনী করিয়াছেন (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৪৫১) : 'এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হইবার পূর্বেই সেনেট কবিকে এই উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন ; নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইবার পর কবিকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করা হয় এ অভিযোগ ঐতিহাসিক সত্য নহে।' প্রভাতবাবুর এই টিপ্পনী ঐতিহাসিক অসত্য। সেনেটের যে সভায় রবীন্দ্রনাথকে ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই সভা বসে ১৫ই নভেম্বর। তাহা আহূত হইয়াছিল অন্য এক উপলক্ষে। ঐ সভার বিবরণী পাওয়া যায় ১৯১৩ সালের সিণ্ডিকেট ও সিনেটের বিবরণী ৭ম খণ্ডে (Part VII-এ) এবং এই বিষয়টির উল্লেখ আছে 4586A সংখ্যক দফায়। 'A'র সংযোজন হইতে অনুমান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাড়াহুড়া করিয়া ইহা নথিভুক্ত করা হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, রাসবিহারী ঘোষ ঐ বৎসর আগস্ট মাসে দশলক্ষ টাকা দান করার পর তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়ার সংকল্প করা হয়, যেমন ১৯১২ সালে তারকনাথ পালিতের বিরাট দানের পর তাঁহাকে ১৯১৩ সালেই ডি-এল উপাধি দেওয়া হয়। রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে কিছু কিছু বিদেশী অধ্যাপকের নামও যোগ করা হয়। ইহাতেও আমার মূল বক্তব্য অটুট থাকে—রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরই আশুতোষের নেতৃত্বে ডি-লিট উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বড়লাট উপাধিদান-কালে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন— 'On the modest brow of the last of these....'—তাহাও এই ইঙ্গিতই সমর্থন করে যে রবীন্দ্রনাথের নামের সংযোজন সকলের পরে স্থিরীকৃত হয়।

যে-সকল তথ্য এখানে উত্থাপিত হইল তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় মিথ্যা অভিসন্ধিমূলক প্রচার অভিযানের শিকার হইয়াছেন। এই অভিযান যে কত সুদূর-ব্যাপী তাহা একটি ছোট্ট বইয়েও দেখিতেছি। বোম্বাই হইতে অধুনা প্রকাশিত 'অমর চিত্রকলা'র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ১৩৬নং গ্রন্থের লেখক কল্যাণাক্ষ ব্যানার্জী (বঙ্গানু-বাদিকা দেবরাণী মিত্র)—এই গ্রন্থে দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিবার পর আশুতোষ তাঁহাকে ডি-লিট দেওয়ার প্রস্তাব করিলে ইউনিভার্সিটির অন্যান্য সদস্যেরা তাঁহাকে হঠাইয়া দিয়া বলিলেন—'এ হোতেই পারে না।' এই প্রোপাগাণ্ডা কাহারা করিয়াছেন এবং করিতেছেন?

২

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার কথা বলিব। দীনেশচন্দ্র সেন 'আশুতোষের স্মৃতিকথা' ও অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্গতভাবেই আশুতোষের যথেষ্ট প্রশস্তি করিয়াছেন। শুধু এস্‌প্লানাডে হরিনাথ দে কি কথা বলিয়া আশুতোষের উপরে বোমা বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করেন নাই। অতুলচন্দ্র ঘটকের 'আশুতোষের ছাত্রজীবন'

গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'তাঁহার বিশাল কর্মজীবন মনে পড়িলে হঠাৎ কল্পনা হয়, এই যে চণ্ডীতে সহস্রহস্ত মাতৃমূর্তির কথা পড়িয়াছি কিম্বা গীতায় সহস্রশীর্ষ পুরুষবরের কথা শুনিয়াছি—সে-সকল বুঝি এইরূপ অসামান্য কর্মী, অসামান্য মেধাশীল কোন মহাপুরুষের জীবন্তমূর্তি হইতে পরিকল্পিত হইয়াছিল।' অন্যত্র তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে আশুতোষ কোন কোন সংকল্প মনে পুষিয়া রাখিতেন ; ঠিক সময় উপস্থিত হইলে তাহা প্রকাশ করিতেন। তিনি যে ১৯১৯ সালে দীনেশচন্দ্রকে প্রধান করিয়া বাংলায় এম-এ পড়ান আরম্ভ করিলেন তাহার বিষয় পূর্বে কাহাকেও কিছু বলেন নাই। সমস্ত বিষয়টি পাকা করিয়া শিক্ষক ও পরীক্ষকদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে বলেন ; প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৯২০ সালে।

আমি ১৯২৬ সালে এম-এ পড়া শেষ করি কিন্তু পরীক্ষা দিই নাই। স্কলারশিপ শেষ হইয়া যাওয়ায় উপার্জনের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য ব্যয় তো ছিলই ; আবার তথাকথিত ল' ক্লাসেও ভর্তি হইয়াছিলাম। দীনেশচন্দ্র সেনের চতুর্থপুত্র বিনোদ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহাধ্যায়ী ছিল। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ও Eastern Bengal Ballads-এর কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশচন্দ্র সেনকে একজন সহকারী বা কেরানী দিত। কাজ বেশি নয়। বেতন ৬০ টাকা। এই কাজটির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিনোদ আমার অশেষ উপকার করিয়াছিল। ১৯২৭ সালে এম-এ পাস করিয়া তখনই দিল্লী হিন্দু কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের কাজ পাইয়া সেখানে চলিয়া যাই। দীনেশচন্দ্র সেনকে যেমন দেখিয়াছি, তাহার একটু পরিচয় দিলে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। ১৮৮৯ সালে ইংরেজিতে অনার্স-সহ বি-এ পাস করিয়া তিনি কুমিল্লায় হেডমাস্টার ছিলেন। তারপর প্রধানতঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়া তিনি যশস্বী হয়েন। কৃপণ ইংরেজ সরকারও তাঁহাকে ছোট একটা পেনশন দিলেন। বোধ হয় এই বইয়ের জন্যই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখন তিনি চাকুরি ছাড়িয়া সাহিত্যকেই পেশা করিয়া জীবনসংগ্রামে নামিলেন। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের সুলিখিত 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র। যাঁহারা সাহিত্যকেই পেশা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সবাই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন ; শরৎচন্দ্রই একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়াই যশ ও অর্থ লাভ করেন। 'রামায়ণী কথা' বাহির হয় ১৯০৩ সালে এবং দীনেশচন্দ্রের 'সতী', 'বেহুলা', 'জড়ভরত' প্রভৃতি পুস্তিকাও সমাদর লাভ করে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ও দাক্ষিণ্যে দীনেশচন্দ্রের খুব উপকার হয়। আমি যখন ১৯২৬ সালে তাঁহার কাছে কাজ আরম্ভ করি তখন তাঁহার দুইটি গুণ আমাকে আকৃষ্ট করে। প্রথম, তাঁহার ভাষায় লালিত্য ; যাহা-কিছু লিখিবেন—প্রবন্ধই হউক, চিঠিই হউক—তাহাই শ্রুতিমধুর। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিতাম, তিনি আপন ব্যাপারে এত নিমগ্ন থাকিতেন, অথবা নিজের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে এত উদ্বিগ্ন থাকিতেন যে, অন্য কোন বিষয়ে মন দিতে বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার মত সময় দিতে পারিতেন না ; সে প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। ইহাকে সংকীর্ণতা বলিতে পারেন, কিন্তু এইরূপ অদ্রোহী, নির্বিরোধ মনোভাব আমি খুব কম দেখিয়াছি।

যখন দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই তখন ১৯২১ সালে জানিয়াছিলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী মেডেল' দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহা পাইবেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী। ইহা প্রথমবার দেওয়া হইল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কয়েকদিন পর 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিলেন যে

রবীন্দ্রনাথকে এই পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয় তখন দীনেশচন্দ্র সেন আপত্তি করিয়াছিলেন। এই উক্তিটা এতই উদ্ভট যে আমি যদিও ইহা ভুলি নাই, তবু ইহাকে আমলও দিই নাই। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে দীনেশ সেন মহাশয়ের বাড়িতে একখানা চিঠি পড়িয়া আমি খুব থমকিয়া গিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, ওখানে আমার কাজ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু সেন মহাশয় ঐ কাজকে খুব গুরুত্ব দিতেন এবং আমি বেশ কিছুক্ষণ ওখানে না কাটাইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। ফলে তাঁহার বিশ্বকোষ লেনের বাড়ির বাহিরের ঘরে আমার কাজ উপলক্ষ্য করিয়াই বেশ একটা আড্ডা বসিত। সেখানে আমি তো সকালে বেশ খানিকক্ষণ থাকিতাম ; তাঁহার বড় ছেলে কিরণবাবু, সেজ ছেলে বিনয়বাবুও আসিয়া বসিতেন, আর আমার সতীর্থ বিনোদ ও তাহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীচন্দ্রও থাকিত। দীনেশ সেন মহাশয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া নিবিষ্টমনে তাঁহার কাজ করিয়া যাইতেন আর আমি সেখানে গিয়া তাঁহাকে আমার কাজের অগ্রগতির হিসাব দাখিল করিতাম। যতদূর মনে আছে, বিনোদ অথবা শ্রীচন্দ্র দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা ১৯২১/১৯২২ সালের একটা নাতি-হ্রস্ব চিঠি আমাকে দেখায়। লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনবদ্য হস্তলিপি : বলা বাহুল্য ইহাতে আমি আকৃষ্ট হই। কিন্তু চিঠিখানি একাধিকবার পড়িবার পর মনটা খিঁচড়াইয়া গেল। কবি স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্যময় ভাষায় ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কারণ নির্দেশ করেন নাই। চিঠিটা এখন কোথায় আছে বলিতে পারি না, আদৌ সংরক্ষিত আছে কিনা জানি না। কিছুদিন আগে বিনোদের এক মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহার সাহিত্যে বেশ অনুরাগ আছে। সে খোঁজ করিয়া আসিয়া বলিল তাহাদের কোন বাড়িতে ইহার সন্ধান পায় নাই।

দীনেশচন্দ্রের ছেলেদের নিকট হইতে জানিতে পারি যে 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের অভিযোগ পড়িয়া সেই অভিযোগের ভিত্তিহীনতার কথা বলিয়া দীনেশচন্দ্র কবিকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। কবি সেই চিঠির উত্তরে এই পত্রাঘাত করিয়াছিলেন। ইহার বক্তব্য : রামানন্দবাবু কোথা হইতে কি শুনিয়াছেন তাহা কবি জানেন না, তবে কবির প্রতি যে দীনেশবাবু বিরূপ তাহার অন্য প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু যেহেতু এই বিরূপতা দেশবিস্তীর্ণ সেইজন্য তিনি ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করেন না। কাহারও যদি কোন উপকার করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রতিদান না পাইয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষোভ নাই, দেশকে নাহয় ঋণী রাখিয়াই মরিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কি চিঠির কি উত্তর! কবি ইচ্ছা করিয়াই রূঢ় হইয়াছিলেন এবং কবির প্রতি আমার যতই শ্রদ্ধা থাকুক, মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই অসৌজন্যে আমি খুব বিরক্ত বোধ করিয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্র-নাথের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না, বরং ম্লানমুখে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁহার ঋণ বার বার স্বীকার করিলেন।

১৯২৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি বিভাগে কনিষ্ঠতম অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দিই। বছর-খানেক ঐ বিভাগের প্রধান ছিলেন অপূর্বকুমার চন্দ ; ১৯৩১ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া বদলি হইয়া যান। চন্দসাহেব বেশ খোলা-খুলিভাবে কথা বলিতে ভালবাসিতেন ; আমি কনিষ্ঠতম অধস্তন কর্মচারী হইলেও সাধারণ আলাপে আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকিত না। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং কবির খুব অন্তরঙ্গদের অন্যতম, ইহা সুবিদিত। একদিন রবীন্দ্রনাথের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতি করিলে আমি দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে সেই চিঠি ও তাহার অহেতুক রূঢ়তার কথা তুলিয়া চন্দসাহেবের কথার প্রতিবাদ করিলাম। চন্দসাহেব যেন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমি যখনকার কথা বলিতেছি

তখন দীনেশ সেন মহাশয় বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ, কলিকাতায় তাঁহার একাধিক বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সবই আছে। চন্দসাহেব আমাকে প্রশ্ন করিলেন, জানেন আপনি দীনেশ সেনের বসতবাটির জমি কে দিয়াছে? জানেন দীনেশ সেন কি করিয়াছে? যতদূর মনে আছে, তিনি এই বলিয়া তাঁহার আক্রমণাত্মক বক্তৃতা শেষ করিলেন, ungrateful scamp!' (অকৃতজ্ঞ নচ্ছার!)।

প্রথমটা একটু হকচাকিয়া গেলেও আমি যেন নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম। আমার পনের বছর আগেকার কথা মনে পড়িল। আমি তখন পালং স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি প্রতাপচন্দ্র সেন। তিনি বহু মাসিকপত্র রাখিতেন ; আমি খেলাচ্ছলে ঐ সকল পত্রিকার পাতা উলটাইতাম এবং মনে ধরিলে দুই-একটা প্রবন্ধ পড়িতাম। একদিন 'সবুজপত্র' উলটাইতে উলটাইতে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম—যেখানে লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ববৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা প্রশ্ন-পত্রের উল্লেখ করিয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। আমি বর্তমান অধ্যায়েই আপত্তিকর প্রশ্নটির উদ্ধৃতি দিয়াছি। এখন প্রবন্ধটির পরিচয় দিতেছি। ইহার নাম 'ছাত্রের পত্র', লেখক সুবোধ চট্টোপাধ্যায় ('সবুজপত্র' দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২২)। রবীন্দ্রনাথের রূঢ়তা এবং দীনেশচন্দ্রের ম্লান নীরবতা—ইহার যেন একটা ব্যাখ্যা পাইলাম। বুঝিলাম চন্দসাহেব বিশেষ করিয়া কোন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। আমি কলেজের অধ্যাপক ; লাইব্রেরীতে গিয়া সহজেই ক্যালেণ্ডার বাহির করিয়া দেখিলাম, প্রশ্নকর্তা দীনেশ-চন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কিন্তু প্রশ্নটি ভাইস-চ্যান্সেলরের—অর্থাৎ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে ('The papers were set in consultation with Hon'ble the Vice-chancellor')। বছর-খানেক আগে—১৯৬০ সালে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে আলাপে এই প্রশ্নের কথাটা উঠিয়া পড়ে। প্রতুল বিনা দ্বিধায় উত্তর করিল—'উহা দীনেশ সেনের কাজ'। প্রতুল প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র থাকাকালে নবপ্রতিষ্ঠিত 'রবীন্দ্রপরিষদ' নামক সংস্থার সম্পাদক ছিল। পরবর্তী কর্ম-জীবনে সে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ছিল। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়িয়া দিলেও ইহা সুবিদিত যে তাহার পিতা অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছিলেন এবং আমি নিজেই দেখিয়াছি, জীবন-সায়াহ্নে প্রমথ চৌধুরী প্রতিদিন উহাদের বাড়িতে খানিকটা সময় কাটাইয়া যাইতেন। প্রতুলের সহজ উক্তি এবং চন্দসাহেবের তীব্র উষ্মা ইহাই প্রমাণ করে যে, খুব পরিকল্পিত উপায়ে এইরূপ প্রোপাগাণ্ডা করা হইয়াছিল যে দীনেশ সেনই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যেমন প্রোপাগাণ্ডা করা হইয়াছিল যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার বহুপূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৩

কৃষ্ণ কৃপালনী তৎপ্রণীত রবীন্দ্রজীবনীতে সকৌতুকে এই প্রশ্নপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা নিছক কৌতুকের ব্যাপারই হইত যদি না ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিত। সেই কারণেই এই ব্যাপারটির দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্নকর্তা তিনজন—দীনেশ সেন, সতীশ বিদ্যাভূষণ ও আশুতোষ। বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বাদ দিতে হইবে। পালির পণ্ডিত,—তিনি দুইখানি বাংলা বই লিখিয়া থাকিলেও

তাঁহার সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংস্রব অকিঞ্চিৎকর। আশুতোষ তাঁহার চারপাশের সকলের জন্যই কিছু কিছু ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অনেকের রাই কুড়াইয়া বেল হইত, এবং এই জাতীয় নিয়োগে আর্থিক লাভের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের লোকের মনে আত্মপ্রসাদও সঞ্চারিত হইত। আশুতোষের সম্পর্কে সেই কথা খাটে না। তাঁহার প্রচণ্ড কর্মশক্তির একটা লক্ষণ—খুঁটিনাটি, বড়-ছোট সকল বিষয়ের উপর সমান নজর, সমান অধিকার। দীনেশ সেন-মহাশয় বলিয়াছেন যে ১৯০৭ সালে বি-এ'র পরীক্ষকপদের জন্য দরখাস্ত দিবার পর তিনি আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে আশুতোষ তাঁহাকে অবাক করিয়া দেন, কারণ ইতিমধ্যে আশুতোষ শুধু যে দরখাস্ত দেখিয়া ফেলিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত মনে করিয়া রাখিয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের আত্মজীবনী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পত্রবিনিময় নিবিষ্টমনে পড়িলে দেখা যায় যে অন্ততঃ ১৯১২—১৩ সাল পর্যন্ত ইঁহাদের মধ্যে খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই সম্পর্কে ছেদ পড়িয়া যায়। দীনেশচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন, 'ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার নিকট সর্বদাই উৎকৃষ্ট চিন্তার প্রেরণা—স্বর্গীয় শুভ-বার্তার ইঙ্গিত।...এ ক্ষতি তাঁহার নহে, সম্পূর্ণ আমার। তথাপি কি কারণে এই ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলাম—তাহা পরস্পরের কতকগুলি ভুলভ্রান্তির ইতিহাস, তাহা না বলাই ভাল।' ১৯১৮ সালে দীনেশচন্দ্র পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং লিখিলেন, 'আমি কোন সময়ে যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য অনুতপ্ত আছি।'...'আমি যে-সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট আমার ক্ষমাপ্রার্থনার দিন আসিয়াছে।' এই শেষের পত্রে তিনি সাংসারিক, জাগতিক দিক দিয়া কতভাবে কবির কাছে ঋণী তাহারও অকপট বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু হরিনাথ দে'র কথা বলিতে গিয়া যেমন দীনেশচন্দ্র 'বোমা' 'গুলি' প্রভৃতি অনেক শব্দ প্রয়োগ করিয়াও আসল কথাটা—অর্থাৎ হরিনাথ আশুতোষ-সম্পর্কে ঠিক কি অপবাদ দিয়াছিলেন—তাহা চাপিয়া গিয়াছেন, তেমনি এইখানেও তাঁহার 'অপরাধ'টা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। একবার পারিবারিক মনোমালিন্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু তাহার পরই সে উল্লেখ বৃহত্তর অপরাধের অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। পারি-বারিক সম্পর্ক তো পুত্র অরুণ সেনকে লইয়া, কিন্তু তাহা যে কবির সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে নাই তাহার প্রমাণ এই পত্রাবলীতেই আছে। ১৯১৯ সালে অরুণ সেনই পিতা ও কবির মধ্যে দৌত্যকার্য করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম শ্রেণীর লেখক না হইলেও সুলেখক। সুতরাং তিনি রবীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ঈর্ষার নাগালের বাহিরে। তাঁহার সম্পর্কে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি অকৃতজ্ঞ নহেন। 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' পড়িলে দেখা যায় যে আশাতীত সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তিনি দীনভাবে সকল উপকারীর কাছে অকপটে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি স্বীয় প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বিশুদ্ধীকরণের জন্য নির্বাচন করিবেন ইহা অবিশ্বাস্য; কারণ বড় গণিতজ্ঞ বা আইনজ্ঞ না হইলেও chaste and elegant বাংলা কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন। ১৯১৩ সালে তিনি ইহাও দেখিতে পাইয়াছেন যে নিন্দুকের অভাব না হইলেও বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব বিপুল স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। তারপর, যাঁহারা দীনেশচন্দ্র সেনকে জানিতেন তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন—তিনি ভীরু স্বভাবের লোক। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথকে যে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইলেও সেই বিপুল সম্বর্ধনাই রবীন্দ্র-বিরোধী কোন প্রচেষ্টা হইতে তাঁহাকে বিরত করিত।

সংসারে দীনেশচন্দ্র অনেক ঘা খাইয়াছেন। এই পথের বন্ধুরতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার জীবনে স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয় আশুতোষের বদান্যতা। তাঁহাকে বি-এ'র বাংলার পরীক্ষক করা হয় বোধহয় ১৯০৭ সালে। তারপর তিনি আশুতোষের স্নেহভাজন হয়েন এবং আশুতোষ তাঁহাকে বাংলার বিশেষ রীডার নিযুক্ত করেন। বহু লোক আশুতোষের নিকট বহু উপকার পাইয়াছেন—যেমন, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বসু। ইঁহাদের চারিত্রিক গুণ ও বিদ্যাবত্তা-সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান আছে। ইঁহাদের গুণাগুণের মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য বেশি। সুতরাং সেই প্রশ্ন তুলিব না। দীনেশচন্দ্রের মনোভাব তিনি নিজেই খুব স্পষ্ট করিয়া সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, 'সমুদ্রের মত প্রকাণ্ড আশ্রয় পাইলে যেরূপ যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী তাহার দিকে আপনা আপনি ছুটিয়া যায়, ধুর্জটি তাঁহার জটা খুলিয়া গঙ্গাধারাকে ছাড়িয়া দেন—সেই আশ্রয়ের ভরসায়...।' দীনেশচন্দ্র এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাইলেন ১৯১৩ সালে, যখন তাঁহার রামতনু লাহিড়ি-নামাঙ্কিত পদটি পাকা হয়। কিন্তু দীনেশচন্দ্রকে পাকা চাকুরি দিলেও আশুতোষ একটি কঠিন শর্ত আরোপ করিলেন ; প্রতি ছয়মাস অন্তর এই ফেলোকে তাঁহার কাজের হিসাব দিতে হইবে এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আশুতোষ প্রয়োজন মনে করেন অন্য কোন বিশেষজ্ঞের দ্বারা যাচাই করিয়া এই ফেলোশিপ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। অন্য কোন পদের এইরূপ কঠিন শর্ত আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না এবং কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে দীনেশচন্দ্রও ইহার মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

এবার আশুতোষের দিক হইতে ব্যাপারটা দেখা যাইতে পারে। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়—রবি তখন মধ্যাহ্ন গগনে ভাস্বর। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং 'অনামিকা' সাহিত্যসংস্থার সাহিত্যিকগণ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার আপত্তিও করেন এবং সাহিত্য পরিষদের জনৈক সদস্য তো এক মুদ্রিত প্রতিবাদ কবির কাছে পাঠাইয়া দেন। এই অধ্যায়ের খুব বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ বর্ণনা লিখিয়াছেন মদনমোহন কুমার তদীয় করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীগ্রন্থে। বিরোধী পক্ষকে কে চালনা করিয়াছিলেন এবং কোন্ সদস্য যে সাহিত্য ও নীতির ওকালতি করিয়া কবিকে প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহার নাম প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহা সত্য, এবং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, যে—কবিকে টাউন হলে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান হয়। উদ্যোক্তাদের যে তালিকা মদনবাবু দিয়াছেন, সেইখানে সুধীসমাজের বহু নাম দেখিতে পাই ; কিন্তু আশুতোষের নাম নাই। অথচ আশুতোষ অনেক বৎসর সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। হরিনাথ দে আশুতোষের বিরোধিতা করিয়াছিলেন ; অল্পদিনের মধ্যেই আশুতোষ যেভাবে হরিনাথ দে-কে বরখাস্ত করেন সেই কদর্য কাহিনী পূর্বেই বলিয়াছি। এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল এই কলিকাতাবাসী কবির উপর, যিনি কোন পরীক্ষায় পাস না করিয়াও চোখের সামনেই আশুতোষের যশোরশ্মিকে ম্লান করিয়া অবলীলাক্রমে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। আশুতোষ সকল পরীক্ষার উপরই খুব নজর রাখিতেন, শুধু তাঁহার কর্মতৎপরতার প্রেরণায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থলাভের তাগিদেও। যে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খুলিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প, তাহার রসদ জোগাইবে প্রধানতঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি'। সুতরাং ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্নের উপর তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। তিনি দীনেশচন্দ্রের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের উচ্চশির নত করিতে চাহিলেন।

যদি এই প্রশ্ন তেমন তীক্ষ্ণ, তীব্র বিরূপ সমালোচনার ঝড় তোলে, দীনেশচন্দ্রকে তাহার ভারবাহী হইতে হইবে। ১৯১২ সালে রবীন্দ্র-বন্দনার বিপুলতা দেখিয়া তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। একদিকে দীনেশচন্দ্রকে পাকা চাকুরি দিলেন এবং আরও প্রাপ্তি-যোগের লোভ দেখাইয়া রাখিলেন। অপরদিকে কঠিন শর্ত আরোপ করিয়া এই ভীরু সাহিত্য-সেবীকে বাঁধিয়া লইলেন। আশুতোষ বাংলার কিছুই জানিতেন না ; তিনিই বোধ হয় একমাত্র বাঙ্গালী যিনি কোথাও কখনও এক ছত্র রবীন্দ্রকবিতার উদ্ধৃতি দেন নাই। শুধু একবার 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই গান তখন মুখে মুখে গীত হইত।

আশুতোষের ধারণা ছিল তিনি কৌশল ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা দেশের শিক্ষিত সমাজকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের রচনাকে শুদ্ধ করাইয়া কবিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবেন। কেহ আর টুঁ শব্দ করিতে পারিবে না। কিন্তু বিধাতাপুরুষ হাসিতেছিলেন। তিনি সময় বুঝিয়া সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে দিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে নোবেল প্রাইজটি তুলিয়া দিলেন। স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিলেন, এই প্রাইজ ইউরোপের বাহিরে যাইবে ইহা পূর্বে কেহ ভাবে নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র এশিয়ার রাজকবি বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। তারপর আশুতোষ এই 'অপরাধ' ঢাকিবার জন্য যেসব কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

আশুতোষই যে এই গর্হিত অপকর্মের জন্য দায়ী তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণ কোন আস্ফালন, কোন কারসাজির দ্বারাই ঢাকা যায় না। শাস্ত্রবাচস্পতি আশুতোষ নিশ্চয়ই ন্যায়শাস্ত্রের অর্থাপত্তি প্রমাণের কথা শুনিয়াছেন। ইহার সুপরিচিত দৃষ্টান্তই ইহার সংজ্ঞা—মোটাসোটা দেবদত্ত দিনে আহার করে না। ইহাই নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে সে রাত্রিতে আহার করে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট উপাধি দান করিয়া আশুতোষ শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কে বা কাহারা দুইটি অভিসন্ধিমূলক প্রচার শুরু করিয়া দিলেন--(১) নোবেল প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্বেই সিনেট কবিকে সম্মানিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল এবং (২) ১৯১৪ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলার প্রশ্নের জন্য দায়ী দীনেশচন্দ্র সেন অর্থাৎ আশুতোষ ইহার সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু যখন 'সবুজপত্র' আশুতোষের বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের এক প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রশ্নটি ছাপিয়া দিল, তখন কি আশুতোষ নিদ্রিত ছিলেন? ইহা অবিশ্বাস্য। ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন যে আশুতোষের অনুমতি না লইয়াই দীনেশচন্দ্র এই প্রশ্ন সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রশ্নকর্তারা প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন। যেহেতু আশুতোষ সেই সময়ে, কাজে তো বটেই, নামেও ভাইস-চ্যান্সেলর, তিনি সুধীসমাজের কাছে ইহার জন্য প্রকাশ্যে জবাবদিহি করিবেন এবং অপরাধী দীনেশচন্দ্রকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। তিনি ইহার কিছুই করিলেন না, বরং নানাভাবে দীনেশ-চন্দ্রের উপর দাক্ষিণ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই অর্থাপত্তি সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে এই বর্বরতার জন্য দায়ী আশুতোষ নিজেই।

আশুতোষের পরবর্তী আচরণও এই প্রমাণকেই সমর্থন করে। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকেও তখন তাঁহার ভুলিলে চলিবে না। তাই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জায়গায় বিদ্যা-ভূষণকে বাংলার প্রধান পরীক্ষক করিলেন এবং এক্সটেনশন লেকচারের প্রবর্তন করিয়া প্রথমেই (১৯১৫) বিদ্যাভূষণকে নিযুক্ত করিলেন। আর দীনেশচন্দ্রের প্রতি এত দাক্ষিণ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, ইহা লইয়া নানা খোশগল্প চালু হইল। অনেকেই মনে করিলেন

যে দীনেশচন্দ্র স্তুতিবাদের দ্বারাই বিক্রমাদিত্যকে জয় করিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। দীনেশচন্দ্রকেই বিক্রমাদিত্য নানা উপায়ে প্রসন্ন করিতে চাহিলেন, যেন তিনি 'অনুতপ্ত' হইলেও, 'অপরাধ' স্বীকার করিলেও, কি 'অপরাধ', কিসের জন্য 'অনুতাপ' তাহা কদাপি প্রকাশ না করেন। কাজেই তিনি 'মুক্ত' হইতে পারিলেন না। আশুতোষ মনে করিলেন, তাঁহার 'ধোঁকার টাটি' বাজিমাত করিয়া ফেলিল। এইভাবে বছর-চারেক চুপ করিয়া থাকিয়া আশুতোষ অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি মনে করিলেন, এবার রবীন্দ্রনাথকেও হাত করিতে পারিবেন। তাই ১৯১৮ সালে এম-এ পরীক্ষায় বাংলা প্রবর্তনকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রসন্ন করিতে চাহিলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে সেই প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে ; এখন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিলে সেই কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে। নরশার্দুলেরও লজ্জা আছে। সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথের কাছে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। এতদিনে এই মহাদর্পী বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রতিভা আর মেধা এক বস্তু নহে। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া তিনি কবুল করিলেন, 'অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে, মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, সে সম্পদ বা শক্তি আমার নাই।' প্রশ্ন এই, যাঁহার সে সম্পদ ও শক্তি অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, সাহিত্য সম্মেলনের সেই প্রথম সভাপতি রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাল ঠুকিবার লোভ হইয়াছিল কেন?

১৯১৮ সাল নাগাদ আশুতোষ কোন লোকের মারফতে বাংলায় এম-এ পড়াইবার ব্যাপারে কবিকে জড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সে লোক কে বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা গেল, কবি তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় সেই ব্যক্তিকে লেখা চিঠির মাধ্যমে। সরাসরি আশুতোষকে কিছু বলিলেন না। আশুতোষ এবার অস্বস্তিকর অবস্থার দূরীকরণার্থে আজ্ঞাবহ দীনেশচন্দ্রকে নিয়োজিত করিলেন ; দীনেশচন্দ্র প্রথমেই পূর্ব 'অপরাধ'—কি অপরাধ সহজেই অনুমেয়—স্বীকার করিয়া চার বৎসর ব্যবধানের পর রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি ও আশুতোষ উভয়েই কবির 'মডার্ণ রিভিয়ু'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং আশুতোষ কবির পরামর্শপ্রার্থী ইত্যাদি ইত্যাদি। কবি খুব সৌজন্যপূর্ণ উত্তর দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে তিনি কলিকাতায় যাইয়া দীনেশচন্দ্র ও আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম-এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার মত যে পূর্বের (১৯১৩) 'প্রিয়বরেষু'র পরিবর্তে এবার লিখিলেন 'বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন'! দীনেশ-চন্দ্রের পরবর্তী পত্র হইতে দেখিতে পাই, শেষ পর্যন্ত কবি প্রশ্নকর্তারূপে স্বীয় নাম ব্যবহার করার অনুমতি দেন নাই। দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিয়াছেন এইভাবে : "বস্তুতঃ আশুতোষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কবিবরকে বঙ্গবিভাগে আনিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করা। কবি আশুবাবুর জীবিতকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই কাম্য গৌরব দেন নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহার দেহরক্ষার পরে কবি সহজে ধরা দিলেন...।"

এই ব্যাপারে কবির মনোভাব বোঝা কঠিন নয়। কবি চিরকালই আত্মপ্রতিষ্ঠ ; নিন্দুকের নিন্দা তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা তাঁহার আত্মবিশ্বাস টলাইতে পারে নাই। তাঁহার ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ বাহির হইতে হইতেই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিলেন। ইহার মর্যাদা তিনি যে বোঝেন নাই তাঁহাকে এত বোকা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বন্ধু এণ্ড্রুজের নিকট লিখিত পত্রে তিনি গগনবিহারী মিতার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন : উভয়েই পূর্ব ও পশ্চিম আকাশে দীপ্যমান। সুতরাং এই প্রশ্নের ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ভুলিয়া যাওয়া তত সহজ নয়।

১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথকে ঘায়েল করিতে গিয়া আশুতোষ স্বনির্মিত জালে আট্‌কা পড়িয়াছেন। সেই জাল হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই তাঁহাকে নানা ফন্দি আঁটিতে হইল। বাংলায় এম-এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে এবং রবীন্দ্রনাথকে তাহার মধ্যে আনিতে পারিলে অপরাজেয় শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইবে, এই ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেন একাধারে তাঁহার দূত ও সেনাপতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধরা দিলেন না। দীনেশচন্দ্র 'আশুতোষ স্মৃতিকথা'য় খেদের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে আশুতোষের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে কোন সংস্রবে আসিলেন না।

আশুতোষও হটিবার পাত্র নহেন। তিনি এম-এ'র বাংলা সিলেবাস হইতে সমস্ত জীবিত লেখককে বাদ দেওয়ার অজুহাতে রবীন্দ্র রচনাবলীকে বাদ দিলেন—যেন রবীন্দ্রনাথ অন্য জীবিত লেখকের সমগোত্রীয়! রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক চিঠিতে অবহেলাভরে সেই 'প্রশ্নের টুকরো'র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশুতোষকে যে তিনি ক্ষমা করেন নাই তাহা আশুতোষ বুঝিলেন। স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দীনেশ-চন্দ্র সেনকে তোষামোদ করিতে হইবে, যথোচিত উপঢৌকন দিতে হইবে যাহাতে দীনেশচন্দ্রই নীরবে এই অপরাধের ভার বহন করিবেন। এই পটভূমিকায় এম-এ'র পাঠ্যক্রম, অধ্যাপনার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাপদ্ধতি বিচার করিতে হইবে। আশুতোষের বাংলায় কোন জ্ঞান ছিল না ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কে কোন ধারণা থাকিলে তিনি 'জাতীয় সাহিত্য'-গ্রন্থে সংকলিত অ-পাঠ্য প্রবন্ধগুলি লিখিতেন না অথবা রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ-লিখিত এই রচনা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু আশুতোষের কল্পনা সব সময়ই আগ্রাসী : ইহা ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য অধিকার করিতে চাহিত। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকেরা অপেক্ষাকৃত কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট ; তাই আশুতোষের মৃত্যুর পরের বছরই তাঁহারা আশুতোষের উদ্ভট পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। বাংলার ক্ষেত্র বেওয়ারিশ রাজ্য ; কাজেই আশুতোষের বিকল্প ভাষা নামক আগাছাকে ১৯৪১ সালের আগে উৎপাটিত করা সম্ভব হয় নাই। এই আগাছা এক-চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিল। ১৯১৪ সালের ম্যাট্রিকের সেই অভিশপ্ত প্রশ্নের সঙ্গে সতীশ বিদ্যাভূষণ জড়িত ছিলেন। সুতরাং বাংলা ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে যে একপত্র ছিল, তাহার মধ্যেই মৌলিক ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া একটা গোটা পত্র পালি ও প্রাকৃতের জন্য সংরক্ষিত হইল। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হইলেও এই ব্যবস্থা কুড়ি বছর অপরিবর্তিত ছিল। এই বিচিত্র বন্দোবস্তের ফলে বাংলা সাহিত্যের জন্য মাত্র চারপত্র অবশিষ্ট রহিল। তাহারও লক্ষ্য বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন নয়, দীনেশচন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দেওয়া। প্রথম পত্রের পঠনীয় বিষয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং সেইজন্য পঠনীয় গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। ইহার উপযোগিতা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'বিশেষ যুগ' হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রহণ করার একমাত্র কারণ দীনেশ-তোষণ : দীনেশচন্দ্রের The Vaisnava Literature of Medieval Bengal-সম্পর্কে গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে ইহার পূর্ববর্তী যুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিছু কিছু উল্লেখ থাকিলেও কোন বিশ্লেষণ বা বিচার নাই। চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র অনেক লিখিয়াছেন ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে লিখেন নাই। অথচ বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে ইঁহাদের সঙ্গে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও তুলনা হয় না। প্রথমবার এই অংশের প্রশ্ন ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন অভয়কুমার গুহ। তিনি ১৯১৯ সালে চৈতন্য চরিতামৃতের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণবদর্শন সম্পর্কে গোপালদাস চৌধুরী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নও খুব বিচিত্র ব্যাপার। এই অর্ধে ছয়টি প্রশ্ন আছে ;

স্বভাবতঃই পাঁচটি বৈষ্ণবদর্শন, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকাব্য, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ-সম্পর্কে। কিন্তু অবশিষ্ট প্রশ্নটিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতিকবিতার তুলনামূলক সমালোচনা করিতে বলা হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থীরা উভয়ের কাব্য হইতে যথাযোগ্য উদ্ধৃতি দিতে আদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দীনেশচন্দ্রের বইতে দুই জায়গায় পাদটীকায় চণ্ডীদাসের দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইলেও, বিদ্যাপতির কাব্য হইতে কোন উদ্ধৃতি চোখে পড়ে না। ইহার চেয়েও গুরুতর আপত্তি আছে। চৈতন্যোত্তর যুগ-সম্পর্কে পাঁচটি প্রশ্ন আছে ; বিশেষ বিষয় হইল ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য। সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইবার পক্ষে প্রধান যুক্তি ধারাবাহিকতা শিক্ষা দেওয়া। দীনেশচন্দ্র বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের কাল চতুর্দশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং এই কারণে পরবর্তী গবেষকরা তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যোত্তর যুগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিলেন কে? প্রশ্নকর্তা অভয়কুমার গুহ, না মডারেটার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন?

দ্বিতীয় পত্রের প্রথমার্ধও দীনেশ সেনেরই এলাকা, কারণ, তাঁহার 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' হইতে ২৭ হইতে ১০১ পৃষ্ঠা নির্বাচিত হইয়াছে—ইহার মধ্যে আছে মানিকচন্দ্র রাজার গান, তারপর গোবিন্দচন্দ্রের গীত এবং সর্বশেষে ময়নামতীর গান। সবগুলিই বৌদ্ধযুগের সাহিত্য। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস এখান হইতেও বাদ পড়িলেন। তৃতীয় পত্রে আর একটু কাছের সাহিত্য আমদানি করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং উনবিংশ শতাব্দী হইতে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত চণ্ডীমঙ্গল হইতে তর্জমাসহ বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়া ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং বক্তৃতামালার ভূমিকায় তাঁহার ইতিহাসমূলক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের কোন সম্পর্ক আছে তাহা বলেন নাই এবং আর কেহ এই সম্পর্ক দেখিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু স্বয়ং আশুতোষ দীনেশ সেনকে এই কথা বলিয়াছিলেন ; বাংলায় এম-এ চালু করাইবার উদ্দেশ্যেই নাকি তিনি এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঞ্চম পত্রের প্রথমার্ধের বিষয় বাংলা গদ্যের বিবর্তন। স্মরণ রাখিতে হইবে, Bengali Prose Style-সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধের বিষয় হইল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে পশ্চিমের প্রভাব। উনবিংশ শতকের সাহিত্যের গদ্যগ্রন্থ পাঠ্য হইল না, প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধ কাব্য ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থই পাঠ্য হইল না। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ব্যোমমার্গে উড্ডীন হইয়া রচনাশৈলী ও পশ্চিমী প্রভাবের মূল্যায়ন করিবে, এই ভরসায় এই ব্যবস্থা করা হইল। বিকল্প ভাষার পরিকল্পনা জাতীয় সাহিত্য নামক আকাশকুসুমের পাপড়ি। দুই বৎসরে আর ছয়পত্র অধ্যয়ন করিয়া নূতন ভাষার অক্ষর-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কতটুকু শেখা যায় যে তাহার দ্বারা এম-এ'র মত উচ্চমানের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব? এম-এ'তে বাংলা পরীক্ষার যে ব্যবস্থাপনা ১৯১৯ সালে করা হইল সেই বিষয়ে আমি বহু কাগজপত্র দেখিয়াছি এবং তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। এমন একটা পাঠ্যক্রম রচিত হইল যাহার মধ্যে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস নাই, অথচ চৈতন্যোত্তর সাহিত্য আছে ; মধুসূদন আছে কিন্তু হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র নাই ; দীনবন্ধু গিরিশ ঘোষ বাদ পড়িয়াছেন ; ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নাই কিন্তু পালি প্রাকৃতের উপর সম্পূর্ণ একপত্র আছে ; গদ্যসাহিত্যের একখানা গ্রন্থ নাই, কিন্তু গদ্যরীতির বিবর্তন পঠনীয়।

এই মরুভূমির মধ্যে একটি ওয়েসিস বা মরূদ্যান দেখিতে পাই। ইহা হইল প্রথম বৎসরের অর্থাৎ ১৯২০ সালের ৫ম পত্রের প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ; তিনি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গদ্যরীতির বিবর্তনকে একেবারে নিজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধকে একই পত্রের অঙ্গীভূত করিয়াছেন এবং দুইটি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ (৫০+৫০) লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রশ্নগুলি স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট; কোথাও ঘোরপ্যাঁচ নাই অথচ সাহিত্যে অধিকার না থাকিলে এইরূপ রচনা লিখা অসম্ভব। এগার বৎসর আগে ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় ইংরেজির যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে এই প্রশ্নের তুলনা করিলে শূন্যগর্ভ পণ্ডিতম্মন্যতা ও প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পার্থক্য বোঝা যায়। যতদূর দেখি ছাত্রগণ এই অভিনব বিষয়ে—বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গসাহিত্যে পশ্চিমী প্রভাব-সম্পর্কে কোন পুংখানুপুংখ নির্দেশ পায় নাই। তাহারা অধ্যাপক ঘোষের প্রশ্নের সম্মুখীন হইল কি করিয়া? প্রশ্নকর্তা অধ্যাপক ঘোষ দীনেশচন্দ্রের Development of Prose Style বইটি তো একেবারে বাদ দিয়াছিলেন! বোধ হয় সেই জন্যই পরের বৎসর প্রথমার্ধে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বাদ দিয়া দীনেশচন্দ্রকে নিযুক্ত করা হয়! আর একটি নিয়োগ দেখিয়া একটু কৌতুক অনুভব করিলাম। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১০ সালে হরিনাথ দে'র বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন যে ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষক হরিনাথ বন্ধুকে অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে অবৈধভাবে প্রেমচাঁদ বৃত্তি দিয়াছিলেন। সেই অযোগ্য বন্ধুকেই কিন্তু আশুতোষ বাংলা ভাষাতত্ত্বের পরীক্ষক করিলেন, যদিও ইংরেজির এই অধ্যাপক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবেই বাংলা ভাষাতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

The Vaisnava Literature of Medieval Bengal আশুতোষকে উৎসর্গ করার সময় দীনেশচন্দ্র সেন দুই ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন :

> 'His noblest achievement of all,
> The place of his mothertongue in Stepmother's Hall.'

এই দুইটি পঙ্‌ক্তিই পূর্বে আশুতোষের আবক্ষ মর্মরমূর্তিতে উৎকীর্ণ ছিল। এখন নাকি তাহা আর ওখানে দেখা যায় না। ইহাই ইতিহাসের জবাব। আশুতোষ বঙ্গ সরস্বতীর উপর যে ব্যবহার করিয়াছেন তদনুরূপ শঠতা ও দুর্ব্যবহার কোন সপত্নীপুত্রই বিমাতার সঙ্গে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনে দিনে ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েটে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হয়, বি-এ পাসকোর্সে বাংলা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলায় অনার্স পাঠ্যক্রম চালু হয়। কিন্তু এই যে কলেজে কলেজে বাংলা পাঠ্যক্রম চালু হইল তাহা পড়াইবার ভার পড়িল সেই-সব অধ্যাপকদের উপর যাঁহারা সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন এবং দীনেশ-তোষণে ব্যগ্র আশুতোষের বাংলার মেকী সিলেবাস-এ যাহারা এম-এ পাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ্য ছিলেন না এমন কথা বলিব না, কিন্তু ইঁহারা কেহই উপযুক্ত ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাহিত্য অনুশীলন করেন নাই। ইঁহারা অ্যারিস্টটলের খোঁজ রাখেন নাই, অতুলচন্দ্র গুপ্তর কাব্যজিজ্ঞাসা পড়েন নাই, অনেকে দুর্গেশনন্দিনীর নায়কের নাম বলিতে পারেন না এবং 'মৃণালিনী' পাঠ্য করিবার প্রস্তাবে জনৈক পোস্ট-গ্রাজুয়েট লেকচারার আপত্তি করিয়া বলেন যে ঐ উপন্যাসটি তাঁহার পড়া ছিল না, এখন পড়িতে হইবে। শুধু সিলেবাসের মারফতে নহে, 'জাতীয় সাহিত্য' নামক সাহিত্যরসহীন প্রবন্ধাবলীর দ্বারা আশুতোষ নিজেই নূতন পাঠ্যসূচিকে মসীলিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন 'জাতীয় সাহিত্য' উঠিয়া গিয়াছে, সিলেবাসেরও অনেক বদল হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞতার সেই ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অধ্যাপনা—দিল্লী হিন্দু কলেজ (১৯২৭—২৯)

১

আমি এম-এ পড়িয়াছিলাম ১৯২৬ সালের সিলেবাসে। আশুতোষ ছিলেন পরিকল্পনায় বৃহস্পতি। তিনি যেমন অনুবাদের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় সাহিত্য গড়িবার আকাশ-কুসুম কল্পনা করিতেন, তেমনি ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের পরিচয় দিতে চাহিতেন—ঈস্কাইলাস, অ্যারিস্টফেনিস, দান্তে, গ্যেটে, শিলার, ক্যাল্ডেরন এবং (অব্যবহিত পরবর্তীকালে) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পাঠকবর্গ বিস্মিত হইবেন না। ইন্টারমিডিয়েটের পাঠ্য গদ্যসংকলনে আশুতোষের কনভোকেশন বক্তৃতা স্থান পাইয়াছিল এবং আমি শুনিয়াছি —এখন আর যাচাই করিয়া দেখিবার উৎসাহ নাই—একবার ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষায় অষ্টম পত্রে অন্যান্য সাহিত্যিক বিষয়ের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইয়াছিল। এই একটি প্রবন্ধের পূর্ণ সংখ্যা ১০০। আমি যখন, অর্থাৎ আশুতোষের মৃত্যুর পর এম-এ পরীক্ষা দিই, তখনই সিলেবাসের খুব বেশি পরিবর্তন হইয়া যায়। যতদূর মনে আছে—দান্তে, গোটে প্রভৃতির জায়গায় বেন জনসন, স্পেন্সার প্রভৃতি প্রবেশ করেন ; ইংরেজির এম-এ খাঁটি ইংরেজির এম-এ'তেই রূপান্তরিত হয়। ইহাতে আমার বেশ অসুবিধা হয়, কারণ তখন কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, দীনেশ সেন মহাশয়ের বাড়িতে আমাকে সকালটা কাটাইতে হইত। সুতরাং নূতন সিলেবাস সবটা আমি পড়িতে পারি নাই। পরীক্ষা ভাগ্যের ব্যাপার। কোনক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইতে পারিলাম। এক সৌভাগ্যের সঙ্গে আর এক সৌভাগ্য আসিয়া পড়িল অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে।

কেবল এম-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। দিল্লীতে অন্য একটা কলেজে চাকুরীর বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। ঐ কলেজে দরখাস্ত করিবার মানসে শ্রীকুমারবাবুর নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়াছি। সেখানে অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল-বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন যে দিল্লীতে হিন্দু কলেজ অন্যতর শ্রেষ্ঠ কলেজ ; সেখানে বেতনাদি ভাল। আমি যদি কলিকাতার বাহিরে চাকুরী লইতে চাই, তিনি ওখানে আমাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। পরে বুঝিলাম, দিল্লী হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রকুমার সেন তখন কলিকাতায়। বৎসর-খানেক আগে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উঁহারা এক ভদ্রলোককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাজে ইঁহারা তেমন খুশি নহেন। সুতরাং এবার কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়া খোঁজ-খবর লইয়া নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন। অধ্যক্ষ যখন কলিকাতায় আসিতেছিলেন তাঁহারই উপর অধ্যাপক অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। মঞ্জুবাবুরা ছোটকালে জয়পুরে মানুষ হইয়াছেন ; তাঁহার দাদা বহুদিন দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সেই সূত্রে প্রিন্সিপ্যালের জিজ্ঞাসা মঞ্জুবাবুর কাছে পঁহুছিয়াছে। বোধ হয় পরের দিনই মঞ্জুবাবু তাঁহার বন্ধু কাঁচব্যবসায়ী অমূল্য গাঙ্গুলিকে (ইনি বোধ হয় বিজ্ঞানের এম্. এস-সি.) সঙ্গে লইয়া আমাকে প্রিন্সিপ্যাল সেনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। এই

ইন্টারভিউতে আমার প্রধান হাতিয়ার ছিল শ্রীকুমারবাবুর প্রশংসাপত্র ; অবশ্য পরে শুনিয়াছি যে প্রিন্সিপ্যাল নিজেও আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। মুখে তিনি আমাকে বলিলেন, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিমত জানিয়া দিল্লীতে যথাসময়ে তিনি কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন। যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই আমি নিয়োগপত্র পাইলাম এবং ১৯২৭ সালের ১লা নভেম্বর হিন্দু কলেজে যোগ দিলাম। আমার পূর্বে যে ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে আমাকে সমান বেতন দেওয়া হইল।

কাজে যোগ দিয়াই শুনিলাম ভদ্রলোক আমার এই নিয়োগকে তাঁহার প্রতি অসম্মান বলিয়া গ্রহণ করিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি : তিনি আমার অপেক্ষা ৫/৬ বছরের সিনিয়র, তিনি ইংরেজির দুই গ্রুপের এম-এ : দুই কলেজে কাজ করিয়াছেন এবং প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য থীসিস দাখিল করিয়াছেন। এই থীসিসের অংশবিশেষ তিনি কলেজ ম্যাগাজিনেও ছাপিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অভিমানের মর্যাদা রক্ষা করিলেন। আমি সেই মুদ্রিত টুকরো থীসিস পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিলাম, এবং অধ্যক্ষকে বলিলাম, আমার বেতন ঠিকমত পাইলে অপরে কে কি পাইল সেই সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ বা অভিমান হইবে না। ১৯২৮ সালে শেক্সপীয়রের কমেডির বিষয়ে আমিও প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য থীসিস দাখিল করি। ইহা এত গোপনে পেশ করি যে দিল্লীতে যাঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁহারাও ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। নিয়তির গতি বিচিত্র। আমাদের বারের থীসিস পরীক্ষকরা অতিশয় তাড়াতাড়ি তাঁহাদের রিপোর্ট দেন, কিন্তু ইহার আগের বৎসরকার পরীক্ষকেরা রিপোর্ট দিতে খুব দেরি করেন। ফলে দুই বৎসরের পরীক্ষার ফল প্রায় এক সময়ই বাহির হয়। সৌভাগ্যক্রমে যে চারজন আমাদের বারে সাড়ে বার টাকার পি. আর. এস. পান, আমি তাঁহাদের মধ্যে স্থানলাভ করি ; আর আগের বারের প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা ব্যর্থকাম হইলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আমার সেই সহকর্মী যিনি আমার সঙ্গে সমান বেতন নেওয়া অপেক্ষা চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়া শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল কিনা জানি না, এমনও হইতে পারে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাওয়ার জন্য এমন ঢক্কানিনাদ করিয়া ব্যর্থ হইয়াই তিনি দুই বৎসরের ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া যান। তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রি লইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দু কলেজে বেশি দিন থাকেন নাই। পূর্বের যে বাঙ্গালী প্রিন্সিপ্যালকে তিনি বহুভাবে উত্যক্ত করিয়াছিলেন তিনি তখন গত হইয়াছেন। তাঁহার জায়গায় যিনি আসিলেন তিনি প্রয়াত প্রিন্সিপ্যালের পূর্ববর্তী প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহার কলেজের 'কি ও কেন' সব জানা ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই আমার এই প্রতিদ্বন্দ্বীর হিন্দু কলেজের কার্যকাল শেষ হইয়া গেল। তারপর তিনি উত্তর ভারতের নানা জায়গায় কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও টিঁকিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত খানিকটা আমারই সমর্থনে ও সাহায্যে তিনি কলিকাতায় 'থিতু' হইয়াছিলেন। আমার কৃতিত্ব বর্ণনা করার জন্য এত কথা লিখিতে বসি নাই ; তিনি যে নানা দেশ পর্যটন করিয়া শেষ পর্যন্ত স্থিতিলাভ করিলেন তাহাও আমার মূল বক্তব্য নয়। নিয়তি ছোট-বড় সব লোককে লইয়া কত বিচিত্র খেলাই খেলেন তাহারই উল্লেখ করিলাম।

দিল্লীতে আমার চাকুরীজীবনের হাতেখড়ি। ইহার পূর্বে দীনেশ সেন মহাশয়ের কাছে যে নকলনবিসি করিয়াছিলাম তাহাকে ঠিক চাকুরী বলা যায় না। দিল্লীর হিন্দু কলেজে মাত্র কুড়ি মাস ছিলাম। উল্লিখিত ভদ্রলোকের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছিল : নচেৎ ওখানকার চাকুরী সকল দিক হইতেই মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছিল। দিল্লীর শিক্ষাজগতে যে দুইজন স্মরণীয় লোকের দেখা পাইয়াছিলাম—নিশিকান্ত সেন ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

—তাঁহাদের কথা অন্যত্র বলিয়াছি।* আশুবাবুর সম্পর্কে আরও দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি পাঠ্যজীবনে খুব প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দিল্লী হিন্দু কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার উচ্চাভিলাষ থামিয়া গিয়াছিল। সেই আমলে দুই শ্রেণীর লোক শিক্ষাবিভাগে ভিড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—বিলাতী ডিগ্রিওয়ালা এবং রিসার্চ ডিগ্রিওয়ালা। এখন বিলাতফেরতদের কৌলীন্য একটু ম্লান হইয়াছে কিন্তু রিসার্চের প্রকোপ বাড়িয়াছে। গণিতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইহাদের উভয় দলেরই ডিগ্রির জলুস যতটা আছে, আঁক কষিবার উৎসাহ বা ক্ষমতা ততটা নাই। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তখন আয়তনে ছোট, কিন্তু ওখানে এবং আশেপাশে দুই-চারজন এইরূপ লোক আসর জমাইয়াছিলেন। এক ভদ্রলোক—বোধ হয় তিনি র‍্যাংলার ছিলেন—পুরানো খাতা লইয়া আসিয়া পাঠ্যবিষয়-সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন, আঁক কষিতে চাহিতেন না। আমি যখন দিল্লীতে কাজ করি, তখন ওখানে একটা পুল ছিল—যতদূর মনে আছে, রেল স্টেশনের কাছাকাছি—ডাফরিন ব্রিজ। র‍্যাংলার সাহেব নাকি ক্লাসে আসিয়া কেবলই বলিতেন—আমার অবশ্য শোনা কথা—When I was at C-A-M-B-R-I-D-G-E...ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিন এক ঠোঁটকাটা ছেলে বেশ জোরেই বলিয়া উঠিল—'And what about Dufferin Bridge?'

আশুবাবুর একটা মস্ত গুণ ছিল, তিনি আঁক কষিতে ভালবাসিতেন এবং আঁক দেখিলে ভয় পাইতেন না। আমি তাঁহার খুব সান্নিধ্যে থাকিতাম। তখনকার দিনের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাবের এলাকা ছিল খুব বিস্তীর্ণ—বর্তমান পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এবং পাকিস্তান-পাঞ্জাব। ওখানকার নানা কলেজের কেহ-না-কেহ—মনে হয় প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি এইরূপ একখানা চিঠি পাইতেন—তাঁহার কাছে দুরূহ আঁক লিখিয়া পাঠাইতেন আর আশুবাবু তাহা কষিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার খুব প্রিয় ছাত্র ছিল ভোজরাজ শেঠ। শুনিয়াছি, পশ্চিম-ভারতের এই কৃতী ছাত্র পূর্ব-ভারতের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়াছিল। আশুবাবুর মেধা ও মনীষার যথাযোগ্য পরিচয় সে লিখিতে পারিত।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে যেরূপ বিবুধজনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, দিল্লীতে সেইরূপ কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। ওখানকার অধ্যাপকদের মধ্যে আশুবাবুই সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজেই বলিতেন, তাঁহার উচ্চাভিলাষ স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সান্নিধ্যে আমার একটা উপকার হইয়াছিল—সেই কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আশুবাবু শুধু তীক্ষ্ণধী আংকিক ছিলেন না, কাব্যরসিকও ছিলেন। কলেজে পড়ান ও নিজের পড়া ছাড়া বাকি সময় আমি প্রধানতঃ তাঁহার সঙ্গে কাটাইতাম। আমাদের একটা হবি ছিল রবীন্দ্রকাব্য পাঠ। আশুবাবু বেশ ভাল পড়িতে পারিতেন। তিনি পড়িতেন, আমি শুনিতাম। অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পড়ায় 'স্বল্প-আয়ু এ জীবনের যে কয়টি আনন্দিত দিন', 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট'—প্রভৃতি কবিতা যেন নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইত এবং তাঁহার পাঠ এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনিও বোধ হয় আমার মধ্যে রসোপলব্ধির পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশেই আমি দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত শরৎ জন্ম-

* 'Portraits and Memories' গ্রন্থে ও 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে।

বার্ষিক সভার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ওখানকার বাঙ্গালী সমাজে পরিচিতি লাভ করি এবং পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় প্রবেশ করিবার প্রথম প্রেরণা লাভ করি।

আশুবাবুর কথা বলিতে গেলেই তাঁহার স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর কথা বলিতে হয়। তিনি খুব ভাল রান্না করিতে জানিতেন। মহম্মদাবাদের রাজার প্রধান বাবুর্চি নাকি এই মহিলার চিকিৎসক পিতার কাছে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিল এবং বিনিময়ে সে ডাক্তার-কন্যাকে রান্না শিখাইত। আমি তাঁহার প্রীতি ও সৌজন্যে আপ্যায়িত হইতাম ; কিন্তু তাঁহার রন্ধননৈপুণ্য আমাকে বিব্রতই করিত। ভাল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আমাকে একবার লক্ষ্ণৌতে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। দুই দিন থাকিয়া আমি প্রাণের দায়ে কলিকাতায় পলায়ন করিলাম। তবে আমার দুই-চারজন বন্ধু যাহারা তখন দিল্লীতে গিয়াছে তাহারা এই রন্ধনকুশলতার পরিচয় পাইয়াছে ; আর সবচেয়ে বেশি সুখ্যাতি করিতেন আমাদের 'স্যার'। এই অনন্যসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বেশ ভোজনবিলাসী ও ভোজনরসিক ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা যাওয়ার পথে রাত্রিতে শুধু গল্প করিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এই কথা অন্যত্র বলিয়াছি। স্যারের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দিল্লীতেও পঁহুছিয়াছিল। প্রভাবতী অবশ্য সামান্য লেখাপড়া জানিতেন ; ঝাঁসি ও লক্ষ্ণৌর মেয়ে, বোধ হয় বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ভাল বলিতে পারিতেন। যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, স্যারের জন্য কিছু খাবার পাঠাইবেন। যথাসময়ে অর্থাৎ রাত্রি বারটায় টিফিন-ক্যারিয়ারহস্তে দিল্লী স্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং খাবারের ইতিহাস বলিলাম। স্যার বিনাদ্বিধায় খাবারের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং নানা গল্প ফাঁদিলেন। খাবার এত সুস্বাদু মনে হইল যে তিনি রাঙ্গামাকে ইহার অংশ লইতে বলিলেন। রাঙ্গামা লাজুক লোক এবং সেকেলে বধূ। পরে তাঁহার খুব কাছে আসিলেও আমাদের সম্মুখে তাঁহাকে কখনও কিছু আহার করিতে দেখি নাই। যদিও ট্রেনের কামরায় অন্য কোন লোক ছিল না, তবু ঐ গভীর রাত্রিতে স্যারের সঙ্গে তিনি আহারে বসিবেন এইরূপ অদ্ভুত প্রস্তাব শুধু স্যাবের মত লোকেই করিতে পারিতেন। যাহা হউক, স্যার গল্প করিতে করিতে এবং মাঝে মাঝে পাচিকার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে করিতে টিফিন-ক্যারিয়ারটি নিঃশেষ করিয়া আমাকে ফেরত দিলেন, কিন্তু সেই সুস্বাদু আহারের স্মৃতি তাঁহার মনে অম্লান ছিল। ইহার অল্পদিন পরেই আমি কলিকাতায় আসি ; যখনই দিল্লীর কথা উঠিত, তখনই স্যার আশুবাবুর স্ত্রীর রন্ধননৈপুণ্যের উল্লেখ করিতেন।

লেখাপড়ার বিষয়ে কলিকাতা ও দিল্লীতে বেশ একটা পার্থক্য দেখিতাম। ওখানে দুইটি কলেজ তখন রাস্তার দুপাশে ছিল—সেন্ট স্টিফেনস্ আর হিন্দু কলেজ। অনার্স ও এম-এ'তে এই দুই কলেজ একসঙ্গে পড়াইত। সেই ক্লাসগুলিকে বলা হইত ইন্টার-কলিজিয়েট। সেন্ট স্টিফেনে যেসব পত্র এইভাবে পড়ান হইত তাহা আবার একটু ভাল করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা হিন্দু কলেজে ছিল—খানিকটা টিউটোরিয়েল ব্যবস্থার মত। ওখানকার সিলেবাসের তুলনায় আমাদের কলিকাতার সিলেবাস অনেকটা বিস্তীর্ণ ; কিন্তু ওখানে যাহা পড়ান হইত তাহা খুব নিবিড়ভাবে পড়ান হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এম-এ'তে আমাদের আট পত্রের পরিবর্তে ওখানে ছিল ছয় পত্র ; কিন্তু এক পত্র শুধু শেক্সপীয়র, আর এক পত্র শুধু মিলটন অর্থাৎ মিলটনের সমগ্র ইংরেজি কবিতা। যতদূর মনে আছে, আমি যখন ওখানে যাই তখন এক পত্র নির্দিষ্ট ছিল প্রি-রাফেলাইট কবিতার জন্য। বি-এ অনার্সেও এক পত্র শুধু শেক্সপীয়র ; উহার সঙ্গে হয়ত তুলনামূলক নাটকালোচনার জন্য ড্রিংক ওয়াটারের আব্রাহাম লিংকলন। আমি গদ্য দুই পত্র পড়াইতাম ; এক পত্রে কার্লাইলের Heroes and Hero-Worship ও Past and Present এবং সঙ্গে

রাস্কিনের তিনখানা ছোট বই। উপন্যাসপত্রেও ডিকেন্স ও থ্যাকারে। আমি কার্লাইলের Past and Present এবং ডিকেন্সের David Copperfield পড়াইতাম। শেক্সপীয়র বি-এ অনার্স ও এম-এ'তে পড়ান হইত সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে। মিলটনও ওখানেই পড়ান হইত। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ওখানকার মিলটন পড়ান পছন্দ করিত না। সুতরাং হিন্দু কলেজের এম-এ'র প্রথম বৎসরে—আমাদের আমলে বলা হইত পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীতে—মিলটন-সম্পর্কে লেকচার দিয়াই আমি আমার শিক্ষকজীবন আরম্ভ করিলাম।

তখন দিল্লীতে এই দুইটি প্রথম শ্রেণীর—অর্থাৎ এম-এ ক্লাস সম্বলিত—কলেজ ছিল যাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় উচ্চতর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিত। উভয় কলেজই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত ; সুতরাং তখনকার পরিমাপে ভাল বেতন দিতে পারিত। সেন্ট স্টিফেন্স অনেক দিনের কলেজ। এক সময় সি. এফ. এন্ড্রুজ ওখানকার অধ্যাপক ছিলেন। মানবসেবা ছাড়া কাব্যরসিক হিসাবেও তিনি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। সেন্ট স্টিফেন্সে বেশ-কিছু সাহেব প্রফেসর ছিলেন। বয়সের ও সাহেব-সম্পদের কৌলীন্যের জন্য সেন্ট স্টিফেন্স আভিজাত্যের দাবি করিত। কিন্তু সেই দাবি খুব সমর্থনযোগ্য মনে হইত না। ওখানকার ইংরেজির প্রধান ছিলেন সি. বি. ইয়ং, যাঁহার কাব্যসংকলন Great English Poems একসময় কলিকাতা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবই হিসাবে প্রচলিত ছিল। তিনিই শেক্সপীয়র পড়াইতেন এবং সুশিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সহকর্মী হিসাবে আমি তাঁহাকে চিনিতাম, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তা-সম্পর্কে খুব বেশি উচ্চধারণা পোষণ করি নাই। একবার শেক্সপীয়র-পত্রের পরীক্ষা লইয়া আমাদের হোমসাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতদ্বৈধ হয় এবং ব্যাপারটা তৃতীয় পরীক্ষক হিসাবে নির্মল সিদ্ধান্তের কাছে যায়। সেই অল্পবয়সেই ইয়ং এবং সিদ্ধান্তের জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচয় পাই। ওখানে একজন অল্পবয়সী ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন পার্সিভেল স্পীয়ার। পরবর্তীকালে তিনি ভারত-বর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু আমি পড়িয়াছি এবং সেই-সব গ্রন্থে খুব একটা মৌলিকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। এই দুই কলেজ ছাড়াও আর একটা বড় কলেজ ছিল দিল্লীর উপকণ্ঠে—একটা পাহাড়ের উপরে। এক আদর্শবাদী অবসরপ্রাপ্ত জজ লালা কেদারনাথ—সবাই তাঁহাকে রায়সাহেব বলিত,—পিতা রামজসের নামে একাধিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাহাড়ের উপরের কলেজটিই এম-এ পর্যন্ত পড়াইত। ইহা একটি সুন্দর উপনিবেশের মত। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের বন্ধু—আমার অপেক্ষা এক বছরের সিনিয়র—হরিচরণ ঘোষ ওখানে অর্থনীতি পড়াইত। তাহার বাড়িতেই আমি প্রথম উঠিয়াছিলাম এবং তাহার মার সস্নেহ সনির্বন্ধ আপ্যায়নে প্রায়ই ওখানে যাইতাম। ওখানেও ছোট্ট একটা বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের প্রধান ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক সুকুমার দত্ত। তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও আমি ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলাম অর্থাৎ প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছিলাম। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন সাবিত্রী দেবী পর্দানশীন গৃহিণী। রামজস কলেজের সুকুমার দত্ত ও ধীরেন্দ্র-নাথ ঘোষ (ইংরেজি), নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (দর্শন), নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (সংস্কৃত), বন্ধুবর হরিচরণ ঘোষ পরবর্তীকালে নিজ নিজ বিষয়ে এবং বিষয়ান্তরে প্রসিদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

২

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কে যে কথা সবচেয়ে স্মরণীয় তাহা হইল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইহার পরীক্ষার মানগত শ্রেষ্ঠতা ও গুণগত বিশুদ্ধতা। যতদূর মনে আছে ওখানে প্রথম শ্রেণীতে পাস করিতে হইলে ৬৫% ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫৫% পাইতে হইত ; কলিকাতায় যথাক্রমে ৬০% ও ৪৫%। আমি উচ্চগণিত-সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু আশুতোষের নানা স্তুতিবাদপূর্ণ জীবনচরিত এবং ক্যালেন্ডারের বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি যে তিনি ফিজিক্সে তেমন পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া ফলিত গণিতেও তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন না এবং সেইজন্যই বিশুদ্ধ গণিতের দিকেই তাঁহার বেশি ঝোঁক ছিল। আমরা দেখিতাম যে, যাঁহারা ফলিত বা মিশ্র গণিতে সুবিধা করিতে পারিবে না বলিয়া মনে করে অথবা বি-এ'তে অনার্সই পায় নাই, তাহারাই বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আশুতোষ আবার একসময় ইহার গালভরা নাম দিলেন—উচ্চতর গণিত বা Higher Mathematics, যেমন House of Lords-এর ক্ষমতা যত কমিতে লাগিল ততই তাহাকে Upper House আখ্যা দেওয়া হইতে লাগিল। আশুতোষ বলিলেন, গণিত অন্যান্য বিষয় হইতে কঠিন ; সুতরাং অন্য বিষয়ে শতকরা ৬০ নম্বরে প্রথম শ্রেণী নির্দিষ্ট হইলেও গণিতে ৫০% পাইলেই প্রথম শ্রেণী মিলিবে। ইহার পরই নাকি বিশুদ্ধ গণিতের জন্য 'Mookerjee's M.A.'s' আখ্যাটি উদ্ভাবিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, আমরা গণিতে যাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে পাস করাইতাম, দিল্লীর মান অনুসারে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে পাস হইত। শুনিয়াছি, বিশুদ্ধ গণিত এবং মিশ্র গণিত-সম্পর্কে এই নিয়ম এখন বদলাইয়াছে এবং প্রফেসর লেভি আসিয়া বিশুদ্ধ গণিতের সিলেবাসও বেশ খানিকটা শক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই দুই পরিবর্তন আশুতোষের তথাকথিত স্বর্ণযুগের যথার্থ পরিচয় দেয়। প্রবেশিকা বা মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও আজকাল প্রথম বিভাগে ৬০% পাইতে হয় ; আমাদের আমলে ছিল ৫০%। আমার মনে আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা প্রথম বিভাগে পাস করার রেওয়াজ এবং বিপুলসংখ্যক প্রথম বিভাগে পাসের বছরের কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা কৌতুক অনুভব করিত।

দিল্লীতে আর একটা জিনিস দেখি নাই—তাহা হইল পরীক্ষায় মেরামতি। পরীক্ষকরা যে প্রশ্ন করিতেন তাহাই ছাপা হইত এবং তাঁহারা যে নম্বর দিতেন তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হইত। আমি দুই বৎসরের কম সময় থাকিলেও দুইবারের পরীক্ষা দেখিয়াছি। ইহারই মধ্যে একবার ইংরেজি অনার্স ও এম-এ পরীক্ষার প্রশ্নের প্রুফ দেখার ভার আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, আর আশুবাবু তো তখন বাঁধা ট্যাবুলেটর ছিলেন। কলিকাতায় ১৯১৭ সালে প্রশ্নপত্র দুইবার ফাঁস হয় এবং ঐ বৎসর হইতে প্রকাশ্যেই বলাবলি করা হইত যে, প্রত্যেক বৎসরই পরীক্ষার ফলে কারিকুরি করা হইত ; প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা একটু ভাল ফল করিলেই নানা কথা রটিত এবং মনে হইত যে, রটনা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। ১৯২৭ সালের কথাই বলিতেছি। ঐ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজি রচনার জন্য মেডেল পাইল একটি পরীক্ষার্থী যে নাকি অনার্স তালিকায় খুব নীচুতে ছিল ; কেহ কেহ বলে, অনার্স পরীক্ষায় পাস করার জন্য সর্বনিম্ন নম্বর হইতে তাহার মাত্র আট নম্বর বেশি ছিল অর্থাৎ নীচু হইতে গণনা করিলে তাহার স্থান অষ্টম। সেই বৎসর তিনজন ফার্স্ট ক্লাসও পাইয়া-ছিল। যে ইংরেজি এত ভাল লিখিতে পারে তাহার পক্ষে অন্যান্য পত্রে এত খারাপ করা কি সম্ভব? সে কি কোন সিন্ডিকের ছেলে? আমি পরবর্তীকালে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দৃষ্টান্তটি অনন্য। আশুতোষ যদি ১৯১৭ সালের দুই-দুইবার প্রশ্ন

ফাঁসের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন এবং ঐ বৎসর ইংরেজি অনার্স পরীক্ষা-সম্পর্কে যেসব বিরূপ সমালোচনা প্রচলিত ছিল তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল হইত। দিল্লীতে এইজাতীয় গুজব বা কানাকানি এক-দিনও শুনি নাই।

পরীক্ষাকে খেলো করিয়া ফেলিবার এবং তাহার মধ্যে অসাধুতার ট্রাডিশন প্রবর্তন করিবার কৃতিত্ব আশুতোষের প্রাপ্য। দুঃখের বিষয় এই ট্রাডিশন এখন দেশবিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার আশু বিলোপের সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

দিল্লীর কলেজজীবনের বাহিরে কয়েকটি লোককে দেখিয়াছি যাঁহাদের সঙ্গে সংস্পর্শ প্রীতির সহিত স্মরণ করি। ইঁহাদের মধ্যে নিশিকান্ত সেনের কথা অন্যত্র লিখিয়াছি। তিনি সেন্ট স্টিফেন্সের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার এবং সেই হিসাবে অনেকটা কলেজ-জগতেরই লোক। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্রকুমার সেন আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রীত হইয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—এই কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও কর্মব্যস্ত লোক। অবশ্য আমার প্রতি তিনি খুব অনুকূল ছিলেন এবং প্রধানতঃ আমার কাছে সুখ্যাতি শুনিয়াই আমার বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়কে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। উত্তরকালে বীরেন্দ্রনাথ অর্থনীতিবিদ্ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে বৃত হয়েন।

আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় অধ্যক্ষ সেনের ছোট ভাই ডাক্তার সুধীন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন দিল্লীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্যাথলজিস্ট এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাক্তার আন্সারির স্নেহভাজন। সুধীনবাবু সদালাপী, অমায়িক, কাব্যরসিক এবং সঙ্গীতানুরাগী। ইঁহাদের মারফতে আমার পরিচয় হয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে ; বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিও সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমি ওখানে অল্পদিন ছিলাম। তবু ইঁহার চালচলনের কতকগুলি লক্ষণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করিয়াছিল। সাহেবী পোশাকেই হউক অথবা ধুতিচাদরেই হউক, এইরূপ সুবেশ লোক আমি খুব কম দেখিয়াছি। কোথাও জাঁকজমক নাই, কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র পারিপাট্য। তিনি খুব পরিহাস-রসিক ছিলেন, অথচ খুব স্বল্পভাষী। তিনি আমার মত ঢাকা জেলার লোক শুনিয়া আমি পূর্ববঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া দেখিয়াছি, সেই-সব প্রসঙ্গ এড়াইতে চাহেন ; মনে হইত ওখানে কোন অপ্রিয় বেদনাতুর কাহিনী আছে। সত্য-মিথ্যা জানি না, পরে কাহারও কাছে শুনিয়াছি, বীরুবাবু ছিলেন সেকালের নামজাদা সিভিলিয়ান জ্ঞানেন্দ্র-নাথ গুপ্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বীরুবাবুর আর একটা নেশা ছিল নাটক। ওখানে একবার পূজা কাটাইয়াছিলাম। বীরুবাবুর 'চিকিৎসা-সংকট'—নাটকের পরিচালনা এবং নন্দ'র ভূমিকায় অভিনয়নৈপুণ্য আমার আজও মনে আছে। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। উহা আমার অনুপস্থিতিতে বেঙ্গলী ক্লাবের এক সভায় পঠিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ শুনিয়া বীরুবাবু তাঁহার 'নৌকাডুবি'র নাট্যরূপ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন এবং আমার তাহা ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পরই আমি দিল্লী ছাড়িয়া আসি এবং তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন।

কলিকাতায় কর্মে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর অধ্যক্ষ সেন ও বীরুবাবুর—বোধ হয়, হৃদ্‌রোগে-মৃত্যুর সংবাদ পাই। খুবই সহজে ডাক্তার সুধীনবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবার এবং বীরুবাবুর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য পোস্যও ছিল। আশুবাবুও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া স্বল্প-আয়ু জীবনের কষ্টার্জিত সচ্ছলতার দিন শেষ করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করেন। শুনিয়াছি, অসুখের সময়

হিন্দু কলেজ তাঁহার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়াছিল ; বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ছুটির বেতন দিত।

৩

দিল্লী হিন্দু কলেজে যে দুই সেশন ছিলাম, তাহার মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে আমার বেশ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমার কাছে যাহারা ইন্টারমিডিয়েট বা মাধ্যমিক পড়িত, তাহাদের মধ্যে তিন জন আই. সি. এস্. পাস করিয়াছিল—রামভদ্রণ, নকুল সেন ও খুবচাঁদ। শেষোক্ত দুইজন মামাতো-পিসতুত ভাই বলিয়া স্মরণ হয়। বি-এ অনার্স ক্লাসে সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের সাবিত্রীপ্রসাদ বেশ ভাল ছেলে বলিয়া মনে আছে। অনেক কাল পরের কথা, সে আমার এক বন্ধু, ও তাহার সহকর্মীর কাছে আমার নাম শুনিয়া দেখা করিতে আসিয়াছিল। যতদূর স্মরণ করিতে পারি, সে তখন ভারতের পুনর্বাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। ছাত্রদের মধ্যে নকুল সেনদের সঙ্গে আমার সমধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল ; নকুল সেনের সঙ্গে ততটা নয় যতটা তাহার অগ্রজ ভীম সেনের সঙ্গে। ইহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র সেনের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়। ইহারা বোধ হয় বর্তমান হরিয়ানার রোতক (Rohtak) জেলার অধিবাসী। ইন্দ্র সেন আমার সঙ্গে এম-এ পাস করিয়া ওখানে দর্শন বিভাগে কাজে প্রবেশ করেন , পরে (বোধ হয় লণ্ডন হইতে) ডক্টরেট পান। ইঁহাদের কৌলিক পদবী Wadhwa (ঠিক উচ্চারণ বাংলায় লিখিতে পারিব না)। বোধ হয় ইহারা মাথুর ভাটনগর প্রভৃতির মত উত্তর ভারতের কায়স্থসম্প্রদায়-বিশেষ। এই পরিবারের প্রায় সবাই শ্রীঅরবিন্দ-ভক্ত আর ডক্টর ইন্দ্র সেন ও তাঁহার স্ত্রী পণ্ডিচেরী আশ্রমেরই পাকাপাকি বাসিন্দা। ভীম সেন আমার ছাত্র। ১৯২৭ সালে আমি এম-এ পাস করিয়া প্রফেসর হইয়াছি, আর ভীম সেন ঐ বৎসর এম-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়াছে। মনে হয়, সে আমার অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট। এখন স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সে রাজস্থান সরকারি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হইয়াছিল। তাহারা তিন-চারজন ছেলে উপস্থিত ছিল ; নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাহাদের কাছে মিলটন-সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াই আমি অধ্যাপকের কাজ আরম্ভ করি, এই কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে ভীম সেনের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয় ; সে আমার ছাত্র বটে আবার বন্ধুও বটে। তাহার সান্নিধ্য আমার চিত্তপটে যে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা একটি ছোট্ট ঘটনার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ১৯২৯ সালে দিল্লী ছাড়িয়াছি ; ভীম সেনের সঙ্গে বহুকাল দেখা নাই। অগ্রজ ইন্দ্র সেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের কাজে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে দেখা করিতেন এবং তাঁহার কাছে ভীম সেন ও অন্যান্য ভাইদের সংবাদ পাইতাম। আমার দিল্লী ত্যাগের বছর-পাঁচিশেক পরে কটকে ইংরেজি শিক্ষকদের কনফারেন্সে ভীম সেন উপস্থিত ছিল। সে অধ্যাপক প্রফুল্ল-কুমার গুহকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার পথে কলিকাতায় একদিনের জন্য নামিয়া এক বন্ধুর সাহায্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। আমার বৈঠকখানায় ঢুকিয়া সে বলিল, সে প্রফেসর সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি উত্তর করিলাম : 'তুমি কি ভীম সেন?' সে তো অবাক! সে তাহার পরিক্রমার বিবরণ দিয়া বলিল যে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জনাই সে কলিকাতায় নামিয়াছে এবং এটাই আমার বাড়ি ইহা জানিয়াই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে যে সেইদিন আমার বাড়িতে আসিবে ইহা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। অথচ আমি তাহাকে দেখামাত্র চিনিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সে আমাকে একেবারেই চিনিতে পারে নাই। ইহা সম্ভব হইল কি করিয়া? আমি বলিলাম, এই 'কেন'র কোন উত্তর নাই।

আমি আমার অধ্যাপক ও সহপাঠীদের নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়াছি। সুদীর্ঘ অধ্যাপকজীবনে কাহাকেও বিদ্যাদান করিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু ছাত্রদের সংস্পর্শে আমার মনে নানা জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হইয়াছে। ভীম সেনের কথাই এখানে বলি। সে আমার কাছে মিলটন পড়িত। এক দিন Samson Agonistes-সম্পর্কে সে যে একটা প্রশ্ন তুলিয়াছিল তাহার কথা আজও মনে আছে। স্যামসন শত্রুর কবলে পড়িয়াছিল ; তাহারা তাহাকে অন্ধ করিয়া বন্দী করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় রাখিয়াছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে সে শত্রুদের নিধন করিল এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়া বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইল। সব দিক দিয়া দেখিলেই ইহা অবিমিশ্র বিজয়ের কাহিনী, আনন্দপ্রধান কাহিনী ; সে নিজের দেশ ও জাতিকে মুক্ত করিল এবং নিজেরও শৃঙ্খলমোচন করিল। ইহাকে কেমন করিয়া ট্র্যাজেডি বলা যায়? পরবর্তী জীবনে আমি মিলটন চর্চা করি নাই এবং এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি নাই। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে গাঁথা হইয়া আছে। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১০ সালের এম-এ'তে ব্রজেন্দ্র শীলের Samson Agonistes-সম্পর্কে সেই ভয়াবহ প্রশ্নপত্র। একদিকে তীক্ষ্ম সাহিত্য-জিজ্ঞাসা আর অপরদিকে পাণ্ডিত্যের ভাঁড়ামি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সরকারী চাকুরী—প্রথম পর্ব

১

আমি যখন দিল্লীতে কাজ করিতাম তখন ওখানকার দীর্ঘ অবকাশ ছিল একটানা তিন মাস—জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, আর এখানকার কলেজগুলিতে ছুটির পর সেসন আরম্ভ হইত জুলাই মাসে। বাবার কাছে পালং যাওয়ার পথে শুনিলাম, প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি চাকুরী খালি হইয়াছে, কারণ হঠাৎ ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া বদলি হইয়াছেন। তখন গভর্ণিং বডির সুপারিশক্রমে নিয়োগ হইত। প্রিন্সিপ্যাল ব্যারো ও ডি. পি. আই. স্টেপলটন আমার যোগ্যতা অস্বীকার না করিলেও এই মত প্রকাশ করিলেন যে, এই পদে নিম্নতর সার্ভিস (আধুনিক পরিভাষায় কৃত্যক) অর্থাৎ লেকচারারদের মধ্য হইতে প্রমোশন দেওয়া উচিত। আমি বাহিরের লোক; তদুপরি নবীন। প্রবীণদের দাবি উপেক্ষা করা উচিত হইবে না। বার্সার হিসাবে শ্রীকুমার-বাবু গভর্ণিং বডির সদস্য। তিনি আমার দাবির সমর্থনে জোর দিয়া, ডি. পি. আই.-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কলেজের অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই আপত্তি তোলেন যে তাঁহারা রিসার্চ করেন না। কিন্তু যখন রিসার্চ-যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী সমুপস্থিত, তখন শুধু নবীনতার অজুহাতে—The atrocious crime of being a young man—তাহাকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইতেছে। তর্কযুদ্ধে শ্রীকুমারবাবুরই জয় হইল। আমিরুদ্দীন আহম্মদ নামক একমাত্র সদস্য নাকি সাহেবদের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। আমি এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম শুধু শ্রীকুমারবাবুর সৎসাহস স্মরণ করিয়া। তখনকার আমলে কোন অধস্তন কর্মচারীর পক্ষে ডি. পি. আই. ও প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে স্বাধীন মত প্রকাশের অন্য কোন দৃষ্টান্ত আমি স্মরণ করিতে পারি না।

দিল্লীর চাকুরী ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ৭ই আগস্ট (১৯২৯) যোগদান করিলাম। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের কাছে কোন নোটিশ দিই নাই, তাঁহারা আমার রিসার্চের যোগ্য মর্যাদা দিতে চাহিয়াছিলেন—অর্থাৎ বেতনবৃদ্ধির আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং যখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের কাজে যোগ দিলাম, ৬ই আগস্ট পর্যন্ত আমার বেতন চুকাইয়া দিলেন। তখন সাহেবদের এত প্রতিপত্তি ছিল যে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট বা বড়বাবুর দুই লাইনব্যাপী চিরকুট পাইয়া কাজে হাজির হইলাম। দুই মাস পরে যখন সরকারি আদেশ আসিল, তখন চক্ষুস্থির! জনৈক ইংরেজের জন্য এই পদ নির্দিষ্ট আছে—অবশ্য তিনি আসিলে আই. ই. এস.-র তুল্য মূল্য পাইবেন—এবং তাঁহার কাজে যোগ দেওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে ১লা ডিসেম্বর। যদি তিনি না আসেন তাহা হইলে চাকুরীর মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ান হইবে। ভাল পাকা আশ্রয় ছাড়িয়া এইরূপ অনিশ্চিত, ভঙ্গুর চাকুরী গ্রহণ করা চরম মূর্খতার কাজ হইয়াছিল। একে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতি আমার দৃঢ় সংসক্তি; তারপর বাবা-মা কেবলই মনে করিতেন দিল্লী বহুদূর; তদুপরি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর—তাহার ইজ্জত খুব বেশি। অবশ্য আমরা কেহই এই অস্থায়ী চাকুরী যে কত অস্থায়ী ও অনির্ভরযোগ্য তাহা বুঝিতে পারি নাই।

এই বিষয়টি একটু সবিস্তারে বলিতে চাই। তাহা হইলে তখনকার দিনের প্রশাসনিক অবস্থা বা দুরবস্থার চিত্র স্পষ্ট হইবে। ১৯১৯ সালে যে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা চালু হইল তাহার একটা ফল হইল আই. ই. এস. উঠিয়া গেল। মহম্মদ মুসা, বিনয়কুমার সেন ও স্নেহময় দত্ত—এই তিনজন অস্থায়ী আই. ই. এস. অস্থায়ীভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। ইহার পর বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পাকাপাকিভাবে আই. ই. এস. হয়েন। প্রভিন্সিয়েল চাকুরী হইতে আর কেহ আই. ই. এস. হইলেন না। যাঁহারা হইতে পারিতেন তাঁহাদিগকে ভরসা দেওয়া হইল প্রথম শ্রেণীর একটা প্রভিন্সিয়েল সার্ভিসের কাঠামো তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহা হইলেই ইঁহারা উন্নীত হইবেন। প্রিন্সিপ্যাল ও ইন্‌স্‌পেক্টররা ১৫০ ভাতা পাইবেন এবং কোন আই. ই. এস. লোক মৃতে বা প্রব্রজিতে বা অবসর গ্রহণ করিলে সেই জায়গায় প্রভিন্সিয়েল গ্রেডে অস্থায়ী লোক নিযুক্ত হইবে। অধ্যাপকদের মধ্যে এই গ্রেডে প্রথম নিযুক্ত হইলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—১৯২১ সালে যোগীন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুতে। এইভাবে পর পর আরও লোক নিযুক্ত হইতে লাগিল এবং সুরেনবাবুর আট বৎসর পর সোমনাথবাবুর সঙ্গে আমি প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেই নূতন সার্ভিস আর চালু হয় না। যাঁহারা কর্তাব্যক্তি তাঁহারা অধিকাংশই সাহেব এবং তাঁহাদের এই বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না ; কারণ কোন সাহেব তো এই সার্ভিসে আসিবে না! এ. জে. ড্যাশ নামক জনৈক শিক্ষাসচিব নাকি স্পষ্টই বলিতেন যে, যেহেতু কোন ইউরোপীয় ইহাতে জড়িত নাই তাই তাঁহার এইজন্য কোন মাথাব্যথা নাই। এইভাবে গড়িমসি করিতে করিতে ১৫ বৎসর কাটিয়া গেলে ১৯৩৬ সালে এই সার্ভিস চালু হইল এবং আমরা ১৯৩৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাকা কর্মচারী বলিয়া স্বীকৃতি পাইলাম। অন্য সকলের কথা বলিতে পারি না। আমার এই সাত বৎসর যে দুর্ভোগের মধ্যে কাটিয়াছে তাহা ভাবিলে এখনও আমার মন বিচলিত হইয়া উঠে। অথচ দিল্লীতে থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। এই সাত বৎসরের মধ্যে একবার আমার চাকুরীই চলিয়া গেল। তাহার কথা একটু পরেই বলিব। প্রত্যেক বৎসর আটাশে ফেব্রুয়ারি যতই কাছে আসিত ততই খুব অস্বস্তি বোধ করিতাম। একবার বদলি হওয়ার ফলে আমার চাকুরীতে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া আসিবার পর অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল বলিলেন, আমার চাকুরীতে ছেদ পড়িয়া গেল। নূতন চাকুরীতে প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং ইহার ফলে আমার বেতন অর্ধেকের কম হইয়া গেল। আমার বদলির একটু ইতিহাস আছে। সবটা বলিলে তখনকার দিনে তরুণ কর্মচারীদের দুরবস্থা স্পষ্ট হইবে। পিতার অসুস্থতার কারণ দর্শাইয়া চট্টগ্রাম কলেজের আই. ই. এস. প্রিন্সিপ্যাল অপূর্বকুমার চন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজির প্রফেসর হইলেন, ওখানকার ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক অধ্যক্ষ হইলেন এবং তাঁহারই জায়গায় আমাকে যাইতে হইল। চন্দ সাহেব আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে চাটগাঁয় আমার পাকা চাকুরী হইবে, সুতরাং প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। আমি তাঁহার এই আশ্বাস বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু আমি ইহা বুঝিয়া গিয়াছিলাম যে তাঁহার মত বড়সাহেব আমাকে সরাইয়া যখন আসিতে চাহেন, তখন এই বদলি স্মিতমুখেই গ্রহণ করা উচিত। তবু আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল হউক বা না হউক, এই জাতীয় বদলিতে আমার মত অস্থায়ী চাকুরের কোন ক্ষতি হইবে না তো? তিনি নিজের মর্যাদা বাড়াইবার জন্যই বলিলেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত কারণে তিনি বদলি হইতেছেন বলিয়া সরকারি কাগজপত্র লাটসাহেবের কাছে পেশ করা হইয়াছিল এবং লাটসাহেব লিখিয়া দিয়াছেন যে অন্য কোন কর্মচারীর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। পরে যখন চরম অনিষ্টের

সম্মুখীন হইলাম, তখন দেখিলাম যে চন্দসাহেব যেসব কথা বলিয়াছিলেন তাহার এক বর্ণও সত্য নয়। ইনি যে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন তাহা নহে। এই জাতীয় মুরুব্বি লোকেরা সত্য ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্যই করিতে পারে না। ছয়মাস শিক্ষা-দপ্তর ও অর্থদপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে তর্ক করিয়া যুক্তি দেখাইয়া আমি যথাস্থানে 'থিতু' হইলাম এবং একসঙ্গে ছয় মাসের বেতন পাইলাম। এই সময় চন্দসাহেবকে অনেক অনুরোধ করিয়াছি ; তিনি কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল যেভাবে আমাকে হয়রান করিয়াছিলেন তাহা অন্য রকমের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বুদ্ধিবিদ্যার দিক দিয়া অপূর্ব চন্দ একেবারেই তুচ্ছ মানুষ, ডি. এ. জি. সেইরকম লোক নহেন। আমার মনে হইয়াছিল যে তিনি এইভাবে নিজের বাহাদুরি জাহির করিতেই আমার উপর উপদ্রব করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকর্মীরা আমাকে বলিয়াছেন যে এইরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহ হইলে, যে বেতন কর্মচারী পাইতেছিলেন তাহাতে বাধা না দিয়াই আপত্তি জানান রীতি। এইভাবে এত লাঞ্ছনা পাওয়া সত্ত্বেও বলিতে হইবে আমি ভাগ্যবান। ঠিক আমাদের মত চাকুরীতে ফিজিওলজি বা শরীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঐ বিভাগে একই পদে অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কাগজপত্রে কখন নাকি ঠিক হইয়াছিল যে ঐ বিভাগে সিনিয়র সার্ভিসে কোন অধ্যাপক থাকিবে না, আবার কাগজপত্রেই সিনিয়র সার্ভিস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। শৌরীনবাবু যেখানে ছিলেন সেখানেই রহিলেন। প্রধান অধ্যাপকের পদও তাঁহার নিয়োগের সময় যে পর্যায় বা কৃত্যকভুক্ত ছিল সেই অবস্থায় অপরিবর্তিত রহিল ; কেবল রাইটার্স বিল্ডিংসের শিক্ষাদপ্তর-সংক্রান্ত দলিলে এই প্রধান অধ্যাপক কোন্ শ্রেণীর হইবে তাহা লইয়া কিছু লেখালেখি হইয়াছিল। হুকুম হইল যে শৌরীনবাবু কোন এক দিন নূতন করিয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং একই চাকুরী করিতে থাকিলেও তিনি আগের বেতন পাইতে পারেন না। নূতন গ্রেডে বেতন কম। সদাশয় সরকার তাঁহার বর্তমান বেতন কমাইবেন না, কিন্তু বেশ কিছুকাল—বোধ হয় আট বছর —তাঁহাকে ঐ একই বেতন গ্রহণ করিতে হইবে!!! আজকাল এইরূপ ব্যাপার হইতে পারে না। বোধ হয় এই-সকল জটিল হিসাব এবং গভীর তাত্ত্বিক চিন্তা কেহ এখন হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারিবে না। শৌরীনবাবু অনেক আবেদন-নিবেদন করিলেন। তাঁহার শেষ দরখাস্তের মোসাবিদা আমিই করিয়া দিয়াছিলাম। সরকার খুব সুদীর্ঘ ও সুন্দর উত্তর দিলেন। আমি যাহা যাহা লিখিয়া দিয়াছিলাম, সেই-সকল যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া সরকার লিখিলেন—দুঃখের সহিত বলা হইতেছে যে, এই-সকল যুক্তি সরকার গ্রহণ করিলেন না। কেন করিলেন না তাহা বলাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

আমার চাকুরীতেও প্রারম্ভেই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে চাকুরীতে প্রবেশ করিলাম, ৩০শে নভেম্বর চাকুরী খতম হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু কোন ইংরেজ তখনও নিযুক্ত হয়েন নাই, ১৯৩০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ আপনা হইতেই বর্ধিত হইল। কিন্তু তারপর? ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি বলিলেন যে, তখন তো আই-এ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য কাজ হালকা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এখনও আমাকে গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চাকুরীতে রাখার প্রয়োজন আছে, তিনি এই কথা লিখিয়া সেই পর্যন্ত অর্থাৎ আরও দেড় মাস (১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত) আমাকে কাজে রাখিতে পারেন। তবু ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক মিঃ চন্দকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। এই জিজ্ঞাসাটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। চন্দসাহেব তাহার সম্মতি দিলেন এবং আমার চাকুরী আরও

দেড় মাস রহিয়া গেল। চন্দসাহেব পরবর্তীকালে আমার প্রতি বিদ্বেষের অনেক পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা সুবিদিত। তবু এই দুঃসময়ে তিনি যে আমার ক্ষতি করিতে চেষ্টা করেন নাই ইহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই ঋণ আমি পূর্বেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি।

ব্যারো সাহেবের ঔদার্য অনেক উঁচু স্তরের। ইনি পণ্ডিত ছিলেন না, সেই বিষয়ে কোন অভিমানও ছিল না। পাণ্ডিত্য-বিষয়ে যেখানে যে অভিমত দিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার সীমিত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু ন্যায়বিচারের দিকে তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি ছিল। চাকুরীতে প্রবেশের সময় তিনি আমার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা মনে রাখেন নাই। আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই অথবা বলিতে সাহস করি নাই। কিন্তু স্বল্পভাষী হইলেও তিনি কিভাবে এই ব্যাপারটা দেখিতেছিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি একটা পাকা চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং একটা অর্ধপাকা—তখনকার পরিভাষায় quasi-permanent চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কাজেই ন্যায়তঃ আমাকে আশ্রয় দেওয়া তাঁহার কর্তব্য—তিনি এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, ১৭ই এপ্রিল আমার চাকুরী শেষ হইল বটে, এবং ইহাও ঠিক যে জনৈক ইংরেজকে—নামটা শুনিয়াছিলাম জনৈক মিঃ কিং—এই পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। তবে কাগজপত্র যতদূর দেখিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি মনে করেন ঐ নিয়োগ শেষ পর্যন্ত কার্যকর হইবে না; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে আমাকেই রাখা হইবে এবং জুলাই মাসের প্রথমে অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশের শেষে যদি আমাকে ডাকা হয়, তাহা হইলে যাহাতে ১৮ই এপ্রিল হইতেই আমার নিয়োগ হয় অর্থাৎ আমার চাকুরীতে ছেদ না পড়ে, তিনি তাহা দেখিবেন এবং আমি গ্রীষ্মাবকাশের বেতনও পাইব। গ্রীষ্মাবকাশের পর আমার ডাক হইল এবং আমি গ্রীষ্মাবকাশের বেতনও পাইলাম। কর্মচ্যুত হইলেও শেষ পর্যন্ত আমার চাকুরীতে ছেদ পড়িল না। ইহা শুধু ন্যায়বিচার নয়, মহানুভবতাও বটে।

১৯৩০ সালের ছুটিতে কলিকাতায়ই রহিয়া গেলাম। আমার কাজ হইল দিন গণা এবং অন্য কোন চাকুরীর চেষ্টা করা। ছুটিতে বাবা-মায়ের কাছে আর গেলাম না, তাঁহাদিগকে চাকুরীসংকটের কথা জানাইলাম না। এই সময়েই কেমন করিয়া শরৎচন্দ্রের সমালোচকরূপে বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহার কথা অন্যত্র—India Wrests Freedom—গ্রন্থে লিখিয়াছি। কয়েকটা প্রবন্ধ আগেই লেখা হইয়াছিল; আরও দুই-একটা লিখিলাম। আমার বন্ধু ও প্রেসিডেন্সী কলেজের সতীর্থ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলিল, প্রবন্ধগুলি তাহার 'রামধনু'-প্রেসে ছাপিলে খুব বেশি ব্যয় হইবে না। তাহার আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া গ্রন্থ-প্রণয়নে মনোনিবেশ করিলাম। কয়েক মাস পরে 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহা বেশ সমাদর লাভ করিল। দিল্লীর চাকুরী ছাড়িয়া যে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলাম ক্ষুদ্র গ্রন্থের অপ্রত্যাশিত সমাদর শুধু আশ্বাস বহন করিল না, উদ্দীপনারও সঞ্চার করিল। এই গ্রন্থেরই বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'শরৎচন্দ্র' নামে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক, ইহা পাঠকসমাজে এখনও বেশ জনপ্রিয়।

২

এই সময় আমার মনে আর একটা কথার উদয় হয়। তখন সাড়ে-বার টাকার প্রেমচাঁদ বৃত্তির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তবে যদুনাথ সরকার আসিয়া পরীক্ষার, বিশেষ করিয়া

ডক্টরেটের, মান উন্নীত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। তিনি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং মডার্ণ রিভিউতে বাদানুবাদের সময় জনৈক আধুনিক পি. আর. এস.-কে তিনি তাহা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় তিনিই নিয়ম করিয়া দেন যে পি. আর. এস.-বৃত্তির তিন বৎসরের কাজ শেষ করিয়া সেই বর্ধিত গবেষণাপত্র পেশ করিয়া পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য দাখিল করা যাইবে না ; ডক্টরেটের জন্য নূতনভাবে গবেষণা করিতে হইবে এবং এই সময় হইতেই যতদূর সম্ভব পশ্চিমদেশীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতদিগকে পরীক্ষক করিয়া শ্রেষ্ঠ গবেষণা-পরীক্ষার বিচার করাইতে হইবে। এক কথায় বলা যাইতে পারে ব্যারো, স্টার্লিং, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া ইংরেজির ডক্টরেট দেওয়া চলিবে না। এই সময় অন্ততঃ দুইজন ইংরেজির ছাত্র এই নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষিত হইয়া ডক্টরেট পাইলেন—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গাচরণ কর। আমার চিন্তাও এই খাতে প্রবাহিত হইল। দিল্লীতে থাকিতেই তখনকার দিনে যাহাকে আধুনিক সাহিত্য বলা হইত সেই দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের এম-এ পরীক্ষার মৌলিক রচনার অন্যতম বিষয় ছিল আধুনিক সংস্কৃতি। ইহাই একটি সম্পূর্ণ পত্র এবং রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ পরীক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহার কাছে কখনও পড়ি নাই, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও রসোপলব্ধির খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বিচারে আমি ঐ পত্রে উৎকর্ষের জন্য রেজিনা গুহ স্বর্ণ-পদক পাইয়াছিলাম। হয়ত এই সাফল্যও আমাকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দিল্লী থাকিতেই আমি এই বিষয়ে গবেষণায় অগ্রসর হইতে উদ্বুদ্ধ হই এবং আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুরু করি।

আমি তখন একটু ছুটি পাইলেই কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতাম এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে স্যার এবং শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করিতাম। এই সময়ই শ্রীকুমারবাবু ডক্টরেট পান ; তাঁহার পরীক্ষক ছিলেন রোমান্টিক সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে দুই দিকপাল হারফোর্ড ও এলটন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রখ্যাত প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব। ইঁহারা অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থীসিসের খুব সুখ্যাতি করেন ; আমরা তাঁহার অনুগত ছাত্রেরা ইহাতে খুব উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া আমি, কারণ ছাত্র হইলেও আমি এই থীসিস রচনার সঙ্গে খুব যুক্ত ছিলাম। আমার সহযোগিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত থীসিসে উচ্ছ্বসিত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে আমার সেই যোগ্যতা ছিল না ; অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ লেখককে সাহায্য করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু আমি ইহার সূচনার সঙ্গে অন্যভাবে যুক্ত ছিলাম এবং সেই কাহিনী অর্থবহ বলিয়া এখানে উল্লেখ করিতে চাই। আমাদের আমলে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ বিশেষ পাঠ্যরূপে পড়ান হইত। সপ্তমপত্রের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ছিল রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব—বিশেষ করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের মধ্যে কাব্যের ভাষা লইয়া বিতর্ক—যাহার সঙ্গে জড়িত ছিল কাব্যের সংজ্ঞা। পূর্বে বোধ হয় ইহা পড়াইতেন অধ্যাপক স্টিফেন এবং তাঁহার বক্তব্য তিনি A Syllabus of Poetics-গ্রন্থে অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের লাইব্রেরিকে ভালবাসিতাম কিন্তু ওখানকার শিক্ষাসত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি নাই। আমাদের সময় কে এই সাহিত্য-তত্ত্ব পড়াইতেন বা আদৌ কেহ পড়াইতেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু লাইব্রেরিতে স্টিফেনের A Syllabus of Poetics-গ্রন্থে সাহিত্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা পড়িয়া খুব মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ১৯২৬ সালে সেই বৎসরের এম-এ পরীক্ষা না দিয়া ১৯২৭ সালের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে এই সপ্তম পত্রে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কাব্যবিষয়ক

আলোচনা-সম্পর্কে দুই-একটা প্রশ্ন লইয়া শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করিতাম। কথা প্রসঙ্গে দেখিলাম, তিনি স্টিফেন সাহেবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার সঙ্গে একমত নহেন এবং আমার স্টিফেনের ব্যাখ্যার প্রতি অসন্দিগ্ধ আস্থা যেন তাঁহার মনকে ধাক্কা দিল। হয়ত তিনি নিজেই এই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন ; আমার সঙ্গে আলোচনা উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু তিনি বলিলেন যে A Syllabus of Poetics-এর ব্যাখ্যান খুব ভাসা-ভাসা ; এই জটিল বিতর্ক গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিছুকাল পরে দেখি, তিনি তাঁহার থীসিস লিখিয়া ফেলিয়াছেন এবং আমার এম-এ পরীক্ষার পর আমিই তাহার টাইপ-করা রচনার টুকিটাকি শোধনকার্যে ব্যাপৃত হই। এই ব্যাপারে আমার কৃতিত্ব অকিঞ্চিৎকর। একই বিষয়ে দুইটি অনন্যসাধারণ রচনার বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এত কথা লিখিলাম। স্টিফেনের আলোচনার প্রসাদগুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Critical Theory and Poetical Practice in the Lyrical Ballads'—গ্রন্থে নাই ; আবার এই গ্রন্থে যে গভীরতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্য আছে তাহা 'A Syllabus of Poetics'-এ পাওয়া যাইবে না।

আমি দিল্লীতে থাকিতেই অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডক্টরেট পরীক্ষায় সাফল্যের সংবাদ পাই। ইহার কিছুদিন পরেই আমিও প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করি। কলিকাতায় আসার পূর্বেই আমারও ডক্টরেট লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। ইহার জন্য আমি বিষয়ও নির্বাচন করিয়া কিছু কিছু পড়াশোনাও করিয়াছিলাম। লেখাপড়ায় সমস্ত বিষয়ে স্যারকে জিজ্ঞাসা করা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। স্যার এই সময়ে আমাকে দুইটি উপদেশ দেন—যাহা খুব স্মরণীয়। পরবর্তী জীবনে আমি অনেক থীসিস-রচনা পরিচালনা করিয়াছি, তাহার চেয়েও বেশি থীসিস পরীক্ষা করিয়াছি। নিজে অনেক বই লিখিয়াছি, অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ পড়িয়াছি। সব সময়েই স্যারের এই দুইটি মন্তব্য মনে আসিয়াছে। আমার প্রস্তাবিত বিষয়—আধুনিক সাহিত্যের ধারা—তিনি একেবারে বাতিল করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, থীসিস কোন একটা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে। সুতরাং ইহার বিষয় খুব সুনির্ধারিত, স্পষ্ট ও সীমিত হইবে। তাহা হইলে নানা দিক হইতে তাহার উপর আলোক-সম্পাত করা যাইতে পারিবে এবং সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 'আধুনিক সাহিত্যের ধারা'—এই জাতীয় বিষয় অতিশয় ব্যাপক ও অস্পষ্ট। সুতরাং ইহার পরিবর্তে আমার উচিত কোন বিশেষ আধুনিক লেখককে গ্রহণ করা। স্যার বার্ণার্ড শ'য়ের নাম করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ শিরোধার্য করিয়া আমি নানা দিক চিন্তা করিয়া বার্ণার্ড শ'কে নির্বাচন করিলাম।

স্যারের দ্বিতীয় উপদেশও প্রণিধানযোগ্য। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই একটা রোগ দেখা যায়—প্রকাশনব্যগ্রতা। এই রোগ আমারও ছিল এবং এখনও আছে ; তাহা না হইলে এত বই লিখিলাম কেন ? প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য শেক্সপীয়রের কমেডি-সম্পর্কে আমি যে নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম তাহা স্যারই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমার উহা প্রকাশ করিবার আগ্রহ হয় ; আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মলচন্দ্র মিত্র তো মুদ্রণের সুবিধার জন্য উহা সুন্দর করিয়া আর একবার টাইপ করাইল। কিন্তু স্যার আমাকে থামাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা এই বিষয়ে আমার প্রারম্ভিক গবেষণা ; আরও তিন বৎসর আমি ঐ বিষয়ের উপর পড়াশোনা করিব এবং বৎসরান্তে একটি করিয়া ছোট নিবন্ধ রচনা করিব। সর্বশেষে পরিশোধন ও পরিমার্জন করিয়া প্রকাশের কথা চিন্তা করিব। তাহার আগে প্রকাশনের কথা চিন্তা করা ঠিক হইবে না। ইহার পর চার বৎসর আমি এই দুইটি কাজেই আত্মনিয়োগ করি। সবিশেষ মনোযোগ দিই বার্ণাড শ'য়ের উপর থীসিসে, কারণ তাহা

উচ্চতর ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য পরিবেশিত হইবে। ১৯৩৩ সালে থীসিস দাখিল করি ; বিলাত ও মার্কিন মুলুকে উহা পরীক্ষিত হইতে প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসে এবং ১৯৩৪ সালে আমি ডক্টরেট ডিগ্রি পাই। এই সময়ের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে শেক্সপীয়রের কমেডি-সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ করি। তাহা পরীক্ষা করেন হোমসাহেব এবং বোধ হয় স্যারও সঙ্গে ছিলেন। ১৯৩৬ সালে The Art of Bernard Shaw গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যে থীসিস দাখিল করিয়াছিলাম তাহা মাজিয়া ঘষিয়া বই আকারে প্রকাশ করি। অনেকে এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন ; ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের রিডার ফ্রেডারিক পেজ এবং স্যার অর্থাৎ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এই কাজের সফল পরিসমাপ্তির পর আবার শেক্সপীয়রের কমেডি-সম্পর্কে কাজে হাত দিই। ইহা শেষ করি ১৯৪২ সালে এবং ঘষামাজার ভার দিই তারকনাথ সেনকে। তাহার সমালোচনা ও পরামর্শ অনুসারে আমি ইহার পরিবর্তন ও পরিশোধন করিয়া অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে প্রকাশনের জন্য দাখিল করি। তখন আমি ছিলাম রাজশাহীতে। এইসব পাণ্ডুলিপির বিচার হয় অক্সফোর্ডের বিলাতী অফিসে। তাই বেশ কিছুদিন গ্রন্থকারকে অপেক্ষা করিতে হয়। বছর-দুই পরে খোঁজ লইয়া জানিলাম—তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসান হয় নাই—শত্রুপক্ষের সফল কর্মতৎপরতার ফলে—আমার পাণ্ডুলিপি জাহাজডুবি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাকে আবার পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে হইল। বিলাতী বিশেষজ্ঞদের সম্মতি পাওয়ার পর উহা মুদ্রিত হইল ১৯৫০ সালে। ১৯২৮ সালে যে কাজ আরব্ধ হইয়াছিল তাহা পরিসমাপ্ত হইতে বাইশ বছর লাগিল। প্রকাশচঞ্চল তরুণ গবেষকরা এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার আখ্যানটি ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

৩

প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতে হইত, আর তৃতীয় বার্ষিক অনার্স ক্লাসে দুইটি করিয়া ছাত্র লইয়া টিউটোরিয়েল ক্লাস করিতে হইত। এই শেষোক্ত ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বাংলার পরিবর্তে বিকল্প ইংরেজি পড়িত একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্র। ইহা ছাড়া গোটা ক্লাসের ইংরেজির পরীক্ষার ভার আমার উপরে ছিল ; সেই সূত্রে নবগোপাল দাশ, ভবতোষ দত্ত, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাত্রদিগকে আমি চিনিয়া লইলাম। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে করুণাকেতন সেন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পূর্বেই অধ্যাপকমহলে পরিচিত ছিল। ক্লাসে আলাপ-আলোচনায় এবং পরীক্ষায় ভাল রচনার জন্য আরও কয়েকটি মেধাবী ছাত্র আমার মনে রেখাপাত করে—উমেশকুমার ঘোষাল, শঙ্করনাথ মৈত্র, শিশিরকুমার দত্ত ও সুবিমলচন্দ্র রায়। ইহারা পরে সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য একটা কারণে সুবিমলের সঙ্গে সংস্রব আমি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়িবার প্রায় চল্লিশ বৎসর পর সুবিমল একদিন আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করে। তখন সে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান ব্যবহারাজীব। সে নিজের সম্বন্ধে দুইখানা কাগজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল : এই দুইখানা কাগজ বিভিন্ন রকমের, কিন্তু আমি সমভাবে বিস্মিত হইয়াছিলাম। একখানা ব্যারিস্টারি পরীক্ষার ছাপান ফল, আমাদের দেশের গেজেটের মত। দেখিলাম, সে এই পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিল। নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিয়াছিলাম এবং ইহাও শুনিয়াছিলাম যে অন্য কোন বাঙ্গালী এই কৃতিত্ব লাভ করে নাই। সলজ্জ হাস্যে সুবিমল বলিল, এই তালিকায়

সে তৃতীয়। আর একটি কাগজ আরও বিস্ময়কর ; বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বা প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগের অব্যবহিত পরে সে আমার নিকট হইতে একখানা সার্টিফিকেট নিয়াছিল। কেন লইয়াছিল জানি না, কারণ সেই সময় কোন দিক হইতেই আমার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য হইতে পারে না। যাহা হউক, তাহার ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের সাক্ষ্যের সঙ্গে এই অকিঞ্চিৎকর কাগজটুকুও সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। হয়ত ইহার অকিঞ্চিৎকরত্বই ইহার একমাত্র আকর্ষণ। ইহা দেখিয়াও আমি খুব বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলাম।

এই সময়কার দুইটি ছাত্রের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ইহারা একই ক্লাসে পড়িত, কিন্তু খুব বিভিন্ন ধরনের ছাত্র ও মানুষ। প্রথমে রবির কথা বলিব—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সেই আমলের শ্রেষ্ঠ চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের ছেলে। সে ইংরেজি অনার্স লইয়াছিল ; আমার সঙ্গে টিউটোরিয়েল করিত, কিন্তু প্রায়ই ক্লাসে আসিত না ; আসিলেও আমি যে রচনা লিখিয়া আনিতে বলিতাম তাহা আনিত না এবং সেইজন্য আমি তিরস্কার করিতাম। কিন্তু তিরস্কার সে এমন অম্লানবদনে গ্রহণ করিত যে তাহার উপর রাগ করাও কঠিন হইত। কয়েকদিন পর অনার্স ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিষ্কৃতি পাইল এবং আমাকেও নিষ্কৃতি দিল। সেই সময় ছেলেরা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'-র নাট্যরূপ ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অভিনয় করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অভিনয়ে রবির বিলাসবিহারী ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। আমি যেন এই চরিত্রের নূতন পরিচয় পাইলাম। ইহার পর কলেজে তাহার আরও অভিনয় দেখিয়াছি—খুব স্মরণীয় হইল রবীন্দ্রনাথের মধুসূদন ঘোষাল ('যোগাযোগ')। এমনি করিয়া রবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠে এবং ১৯৫৪—৫৫ সালে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ি। ঐ সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন হয়। আমি অনেক দিন কলেজে পড়িয়াছি এবং তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিন শিক্ষকতা করিয়াছি। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংস্থা স্থাপিত হয়। সমস্ত ব্যাপারেই আমাকে থাকিতে হইত আর নাট্যপরিবেশন বিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা হইল রবি মৈত্র। তখন স্বল্পসংখ্যায় কিছু কিছু ছাত্রীও আমাদের প্রাক্তনীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের অভিভাবক হিসাবে আমাকেও নাটকের রিহার্সালে হাজির হইতে হইত। আমাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিযান 'বনফুল'-রচিত মধুসূদন-সম্পর্কিত নাটক। ভুবন রায়চৌধুরীর মধুসূদনই ছিল প্রধান আকর্ষণ, কিন্তু নৃত্যপটীয়সী মঞ্জুশ্রী চাকীর হেনরিয়েটাও সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। অভিনয়-শেষে বন্ধুবর তারাপদ মুখার্জি বলিল যে আমার বার্ণার্ড শ'য়ের Pygmalion নাটকপাঠ সার্থক হইল। ক্রমশঃ রবির একটি ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইল যাহা তাহার অভিনয়নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাক্তনীর বার্ষিক চাঁদা খুব বেশি ছিল না ; অনেক পুরানো ছাত্রই ইহার সদস্য হইতেন এবং যে যাঁহার কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় চাঁদা দিতে ভুলিয়া যাইতেন ; তারপর চাঁদা জমিয়া একটু বড় অঙ্কে পঁহুছিলে বিব্রতবোধ করিতেন। এইভাবে সমিতি অচল অবস্থার সম্মুখীন হইল। তখন রবি কাগজপত্র বগলে করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল এবং ভীষণদর্শন কাবুলীকে এড়ান সম্ভব হইলেও মধুরভাষী রবি মৈত্রকে এড়ান সম্ভব হইল না। এই প্রসঙ্গে দুইটি কাহিনী বলিব। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—এককালের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের নামজাদা টীকাকার ডি. এন. ঘোষ—আমাকে একদিন বলিলেন, 'আপনাদের রবি মৈত্র অদ্ভুত লোক। সেই দিন রাত্রিতে আমার বাড়িতে উপস্থিত। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন, যে আপনাদের সমিতিতে আমার ২৫৲ টাকা চাঁদা বাকি। রাত্রি ৯টার সময় কোন অপরিচিত লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিলে মনের কি অবস্থা হয় আন্দাজ করিতে পারেন! কিন্তু আধ ঘণ্টা গাল-গল্প করিয়া তিনি যখন

আমার বাড়ি হইতে বাহির হইলেন তখন কিন্তু পঁচিশ টাকা পকেটে করিয়াই বাহির হইলেন।' অপরটি চারুবাবু বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারু ভট্টাচার্য্য খুব রসিক লোক ছিলেন এবং আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল, অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক লোক-সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। আমার স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের গল্পের মত চারুবাবুর গল্পগুলিও কতটা বাস্তব আর কতটা কল্পনা তাহা বলিতে পারি না ; তবে (সাহিত্যিক) কল্পনা যে বস্তু হইতে সত্যতর, তাহা তো রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন। চারুবাবু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আচার্য্য বসুর আবিষ্কারাদি সম্পর্কে গ্রন্থও লিখিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিক উৎসবাদির সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই সংযুক্ত ছিলেন। সেই সময় আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতির তিনি সহ-সভাপতি বা সভাপতি ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে আড়ালে নিয়া বলিলেন যে জগদীশ জন্মশতবার্ষিকীর উদ্যোক্তারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছে চাঁদা তোলার জন্য আমরা যেন রবি মৈত্রকে কিছু দিনের জন্য তাঁহাদিগকে ধার দিই! নানা কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজের অ্যালামণী অ্যাসোসিয়েশন এখন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ; একটা বড় কারণ রবি মৈত্রের বয়োবৃদ্ধিজনিত অপটুতা ও অবসরগ্রহণ।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে কর্ম গ্রহণ করাব পর দুই বৎসর পবিত্রকুমার বসুর কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের বাসাবাড়িতে থাকিতাম এবং হাজরা ও রসা (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি) রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে বা বাসে উঠিতাম। অনেক দিন ঠিক পরের স্টপে একটি শীর্ণকায় ছেলে উঠিত। কেমন করিয়া সে জানিয়াছিল যে আমি এই সময় বার্ণার্ড শ'-সম্পর্কে গবেষণা করিতেছি। প্রথমে আমি তাহার গায়েপড়া আলাপ ও প্রশ্নে একটু উত্ত্যক্ত হইতাম, কিন্তু দুই-চারদিনের মধ্যেই তাহার বৈদগ্ধ্যে এবং জিজ্ঞাসায় আমি একটু বিস্মিত হই এবং তাহার সঙ্গে পরিচয় গভীর আত্মিক বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই ছেলেটির নাম শৌরীন্দ্রনাথ রায় ; সে তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ইতিহাসে অনার্স পড়িত। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার উপরওয়ালারা ঠিক করিয়াছিলেন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অনার্স ছাত্রদের জন্য খুব নিবিড় টিউটোরিয়েল-চর্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু পাস কোর্সের ছেলেদের শুধু মাঝে মাঝে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং আমি বাড়িতে বসিয়া সেই খাতা দেখিয়া ফেরত দিব। কলেজে শৌরীনের সঙ্গে আমার বড়-একটা সাক্ষাৎ হইত না, কিন্তু ট্রামে-বাসে আলাপ প্রশ্নোত্তরের পর্যায় ছাড়াইয়া ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। সে আমাদের আস্তানায়—তখন আর কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে থাকি না—আসা-যাওয়া করিতে আরম্ভ করিল এবং এক সময় সে পবিত্রকুমার বসুর সংসারের অঙ্গীভূত হইল। এইরূপ মেধাবী লোক আমি খুব কম দেখিয়াছি। সে ইতিহাসের খুব ভাল ছাত্র ছিল। সেই বেকার যুগে কোনক্রমে দিল্লীর মহাফেজখানায় সামান্য চাকুরী পাইয়াছিল এবং ক্রমে উহার অস্থায়ী ডিরেক্টর হইয়াছিল। অবসর গ্রহণের সময় তাহার পদ ছিল ডেপুটি ডাইরেক্টর (Deputy Director of Archives)। শুনিয়াছি এই বিষয়ে তাহার মতো বিশেষজ্ঞ লোক বিরল। আমি ইক-নমিক্স কিছুই জানি না ; কিন্তু পবিত্রকুমার বসু মনে করিত যে এই বিষয়ের গভীরতম প্রদেশে শৌরীনের প্রবেশ ছিল। আমি শৌরীনের সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অলিগলিতে প্রবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং আমার সীমিত সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তাহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। আমার ছাত্রদিগকে আমি দিয়াছি কম, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি অনেক।

৪

পাঠ্যাবস্থায় যে প্রেসিডেন্সী ছাড়িয়া গেলাম অল্পদিন পর সেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া একটা পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। বিশের দশকে আমরা যখন ইডেন হিন্দু হস্টেলে ছিলাম, তখন 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে যদুনাথ সরকার ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, অপব্যয়, আত্মীয় ও ভক্তপোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নানা প্রবন্ধ লিখেন। অন্যান্য আরও দুই-চারজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, যেমন বাগ্মী ও সুলেখক অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জিও স্থানান্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছিলেন। এই-সকল সমালোচনার সংহত ও ধারাবাহিক প্রতিবাদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পুনরুজ্জীবিত করিলেন। আশুতোষ মারা যান ১৯২৪ সালে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সঙ্গে চ্যান্সেলর লর্ড লিটনের তীব্র বাদানুবাদ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের হৃত প্রভুত্ব পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোরতম সমালোচক যদুনাথ সরকারকেই ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিলেন। এইবার একটা স্বল্পস্থায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে যদুনাথ সরকারকে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট। এই পক্ষের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা হইলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হইলেন সাহেব ও সরকারী কর্মচারীরা, বিশেষ করিয়া মুসলমান সদস্যরা। অপর দিকে রহিল আশুতোষের বিপুল বাহিনী—যাহাদিগকে যদুনাথ সরকার eunuchs of Byzantine Caesars আখ্যা দিয়াছিলেন। মোটামুটিভাবে আমার সহানুভূতি ছিল যদুনাথ সরকারের দিকে। অর্থের অপচয়ের ব্যাপারটা তখনও ভাল করিয়া বুঝিতাম না। কিন্তু আশুতোষের সুদীর্ঘ কর্তৃত্বাধীনে পরীক্ষায় যে নানাবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল উহা আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াই টের পাইয়াছিলাম এবং কলেজে আসিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গ্রামে বসিয়াই আমিও ইহার শিকার হইয়াছিলাম। ১৯১৭ সালের বি-এ অনার্স পরীক্ষার পর এই বিষয়ে অবিচারের কথা মুখে মুখে প্রচলিত হইয়াছিল এবং ঐ বারের ইংরেজির ডক্টরেটের কাহিনী আমি বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ের কাছে শুনিয়াছিলাম। সেই মুখরোচক কাহিনীর দলিলগত সাক্ষ্য নাই এবং বীরেন্দ্রবিনোদ রায়ও জীবিত নাই। ব্যারো, স্টার্লিং, ব্রজেন্দ্র শীল, জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জি প্রভৃতিকে দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির শ্রেষ্ঠ ডিগ্রির পরীক্ষা-ব্যবস্থা যদুনাথ সরকার বাতিল করিয়া দেন এবং যতদূর মনে হয় নিকট-আত্মীয়স্বজন পরীক্ষার্থী থাকিলে পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করেন।

ইহা ছাড়া আর একটা ব্যাপার ছিল। ক্রমে ক্রমে ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ছিলেন যদুনাথ সরকার তথা গভর্নমেণ্ট পক্ষের প্রধান বক্তা। সেই সময় তাঁহার সঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও যুক্ত ছিলেন, যদিও সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার তখন পরিচয় ছিল না। এই দলের আর একজন নেতা আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনও আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়িতাম তখন স্যারের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা হইত, মুখ্যতঃ ইংরেজির অধ্যাপক ও ছাত্রদের বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে। সেই প্রসঙ্গে আশুতোষের কথা অনেক সময় উঠিত এবং স্যার নিজে আশুতোষের পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতে আসিয়া দেখি, স্যারের সবচেয়ে বেশি স্নেহভাজন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই স্নেহ আন্তরিক অনুরাগ ; ইহার সঙ্গে বিদ্যাবত্তার কোন সম্পর্ক নাই।

যদুনাথ সরকার যদি সমালোচনা করিয়াই থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি ফল হইত বলা যায় না। তিনি গভর্নমেণ্টের সাহায্য লইয়া আশুতোষের দলকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া ভুল করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে তখন ইংরেজ-বিরোধিতা এমন বিপুল আয়তন লাভ করিয়াছে যে সরকার-সমর্থনপুষ্ট পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃত্ব করিতে বা অন্যায়ের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিলে লাঞ্ছিত হইতে বাধ্য। যাত্রার দলের ভীমের অনুকরণে আশুতোষ যে 'ফ্রিডম ফার্স্ট ফ্রিডম সেকেণ্ড' জিগির তুলিয়াছিলেন, আশুতোষের প্রসাদপুষ্ট কর্মীর দল তাহাকে মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে অবতীর্ণ হইলেন। যদুনাথ সরকার প্রকৃত বিদ্যানুরাগী ; তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া নিজের গবেষণাকার্যে ফিরিয়া গেলেন। বঙ্গের গভর্নমেণ্ট মনে করিয়া থাকিবেন যে এই চাল ঠিক হয় নাই ; তাঁহারা নূতন ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিলেন অধ্যাপক আর্কুহার্টকে। এদিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন এবং বিপর্যস্ত দলকে পুনঃসংগঠিত করিলেন। এই সময়ই দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিয়া অতিশয় বেদনার সহিত লক্ষ্য করিলাম যে আমার দুই শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান আসিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ঘোষ প্রেসিডেন্সী কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনেই হাকিমী চাকুরীর মোহভঙ্গ হইয়া যায় এবং তখন শিক্ষাবিভাগে ফিরিয়া আসার জন্য ব্যগ্র হইয়া তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বশালী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ জেমসের শরণাপন্ন হয়েন। জেমস সাহেবই তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগ ও সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকুরীতে ফিরাইয়া আনেন। স্যার টের পাইয়াছিলেন যে এই বিষয়ে আশুতোষ কিছুই করেন নাই। ১৯১২ সালে এম-এ পাস করিবার কয়েক মাস পর শ্রীকুমারবাবু যে প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকুরী পাইলেন, তাহাও জেমস সাহেবের প্রভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে জেমসকে বলার মত ঘনিষ্ঠতা ও প্রবীণতা স্যারের তখন না থাকিলেও স্যারের কৌশল ও ব্যবস্থাপনায়ই ইহা সম্ভব হয়। সেইজন্য পূর্বে এই দুই অধ্যাপকের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখিয়াছি ; ইঁহাদের মধ্যে কখনও কোন রকমের বিচ্ছেদ বা দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে ইহা কখনও মনে করি নাই। কিন্তু কাজে যোগদান করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখি, অধ্যাপক ঘোষ তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মীর প্রতি বেশ বিরূপ হইয়া গিয়াছেন। স্যারের মুখ আলগা, তিনি মনের ভাব গোপন করিতে পারেন না ; কাজেই তাঁহার এই বিরূপতাও বেশ প্রচারলাভ করিল। ইহাতে শত্রুপক্ষ হাসিল এবং আমরা যাহারা উভয়ের অনুগত, তাহারা লজ্জিত হইলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্তৃত্ব শ্যামাপ্রসাদবাবুর হাতে আসিয়া পড়িল। যদুনাথ সরকারের পাণ্ডিত্যের প্রতি স্যার শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদবাবুর প্রতি তাঁহার টান অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। যাঁহারা যদুনাথ সরকারের সঙ্গে ভিড়িয়াছিলেন তাঁহারা পুনরায় এদিকে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন—ইহাতে স্যারের শ্রীকুমারবাবুর প্রতি বিতৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। এই বিষয়ে শ্রীকুমারবাবু পরমাশ্চর্য সংযম দেখাইয়াছিলেন ; তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্যারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। স্যারের প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অবধি নাই। কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, নিরলস বিদ্যাচর্চা, অপূর্ব অধ্যাপনানৈপুণ্য, অফুরন্ত ছাত্রবাৎসল্যের মধ্যে এই বিদ্বেষ কলঙ্করেখার মত বেমানান মনে হইত।

একটি ছোট্ট ঘটনা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। ইহা অকিঞ্চিৎকর ; তবু আশুতোষ

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার যে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা যে মাত্র দুই বৎসর ব্যবধানে পুত্র শ্যামাপ্রসাদের আমলে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল ইহা তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার এক সহাধ্যায়ী বার-দুই বি. এস-সি'তে ফেল করিয়া, পাসকোর্সে বি-এ পাস করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন একটা শাখায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়া ঠিক ১৯৩০ সালে প্রেম-চাঁদের থীসিস দেয়। সেইবার আর একজন প্রার্থী ছিলেন আমার বন্ধু অমূল্যধন মুখো-পাধ্যায় ; তিনি আমাদের দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেসনে বিভাগীয় বৃত্তি পাইয়াছিলেন, আই-এ'তে চতুর্থ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান এবং বি-এ'তে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। কিন্তু পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ শুধু প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রকেই দেওয়া হয় এবং সেই কারণেই অমূল্যধনকে পড়া ছাড়িয়া চাকুরী লইতে হয়। দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে তিনি ইংরেজিতে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং ১৯৩০ সালে বাংলা ছন্দের মূলসূত্র-সম্পর্কে থীসিস পেশ করেন। তাঁহার পরীক্ষক হইলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি এক সময় যদুনাথ সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যাঁহাকে ভাইস-চ্যান্সেলর সুরাবর্দি—তৎকালে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ—সিনেট হইতে অপসারিত করিয়া-ছিলেন। স্যার আমাকে বলিতেন যে যদিও সিণ্ডিকেটের মেম্বর অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন সম্পূর্ণভাবে বিরোধী দলের লোক, তবু তাঁহার আদর্শনিষ্ঠার প্রতি শ্যামাপ্রসাদবাবু শ্রদ্ধা-শীল। বিনয়বাবু আমার শিক্ষক, আমাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং সিণ্ডিকেটের যে-সব বিষয় পরীক্ষা ও গবেষণাসংক্রান্ত, সেই-সব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। ১৯৩০ সালে আর্টসের পাঁচটি প্রার্থীর মধ্যে একটিকে যখন ছাঁটাই করার প্রস্তাব উঠে, তখন আমি —সদ্য প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী—এই বৃত্তির নিয়মাবলীর একটি ধারার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেই ধারা হইতে দেখা যাইবে যে অমূল্যবাবুর পরীক্ষায় কৃতিত্ব (academic distinction) উঁচুদরের এবং সেই কারণেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রকে বাদ দিয়া অমূল্যধনকেই বৃত্তি দেওয়া উচিত। শ্যামাপ্রসাদবাবু নাকি ইহাতে আপত্তি করেন এবং এমন কথাও নাকি বলা হয় যে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়েরও এম-এ পাস করিতে চার বছর লাগিয়াছিল ; তিনিও যে ফেল করেন নাই তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক, এই-সব নিকট অতীতের সব দলিলই হাতের কাছে ছিল বলিয়া বেশি তর্কাতর্কির অবকাশ ছিল না। অমূল্যবাবুর যোগ্যতা সিণ্ডিকেট মানিয়া লইলেন এবং তিনি পি. আর. এস. হইলেন। কাহিনীটা আমার বিনয়বাবুর কাছে শোনা। এই-সব তর্কবিতর্কের কোন বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে না। কাজেই আমি জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম কলেজ

১

১৯৩৩ সালের পূজার ছুটির দিন চাটগাঁ কলেজে কাজে যোগদান করি। সেই দিন নামেমাত্র যোগদান, কিন্তু সেই দিনই আমার একটা মধুর অভিজ্ঞতা হয়। ছুটির দিন বলিয়া সকালে জলসার মত একটা অনুষ্ঠান ছিল। ছেলেরা কয়েকটা নাটকীয় নক্সা অভিনয় করিয়াছিল এবং আমার ইহা খুব ভাল লাগিল। বাস্তবিকপক্ষে সেই সময় কতকগুলি অভিনয়নিপুণ ছেলে ওই কলেজে পড়িত। ইহারা নাকি কিছুদিন পূর্বে অধ্যক্ষ র‍্যামস-বোথাম সাহেব এবং তাঁহার কন্যাকে পরশুরামের 'চিকিৎসা-সংকট'-এর অভিনয়ের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিল। এইসব অভিনেতাদের কথা পরে বলিব।

আমি যখন ঐ কলেজে যোগ দিই বিপ্লবীনেতা সূর্য সেন তখন ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে ; জেল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করার চেষ্টা একবার ব্যর্থ হইলেও সরকার তখনও বেশ সশঙ্ক। এই শঙ্কিত অবস্থা তাঁহার ফাঁসির পরও ছিল ; ওখানকার কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি খুব সাবধানে সন্তর্পণে কাজ করিতেন। সওদাগর অফিসের সাহেবরাও যে বেশ সন্ত্রস্ত ছিলেন তাহাও অনুমান করা যাইত। বাস্তবিকপক্ষে আমার বছর-দেড়েক বসবাসের মধ্যে আমি একটিমাত্র সাহেবকে দেখিয়াছি। তিনি ডি. পি. আই. বটমলী ; মন্ত্রী আজিজুল হকের সঙ্গে কলেজে আসিয়াছিলেন। অথচ বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ইংরেজ তখনও ওখানে ছিলেন। চট্টগ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা তখন শান্ত ; কিন্তু একটা থমথমে ভাব ছিল। শহরের সর্বত্র পুলিশ ও মিলিটারি মোতায়েন ছিল ; তাহারা পথচারীদের দেহ তল্লাশি করিত। কলেজের হিন্দু হস্টেল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কলেজে গোলমালের অন্য কোন চিহ্ন ছিল না ; আর উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ছিল।

জওহরলাল নেহেরু আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, ফ্যাসিস্ট বিপ্লবীরা পুলিশ কর্মচারী আসানুল্লাকে হত্যা করিলে, সরকারও ফ্যাসিস্ট পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। আমি অন্যত্র বলিয়াছি, ইহা নেহেরুর স্বকপোলকল্পিত রটনা। চাটগাঁয় এইজাতীয় কিছু আমরা দেখি নাই। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা পাশাপাশি পড়িয়াছে, খেলিয়াছে, বিতর্কে যোগদান করিয়াছে, নাটক করিয়াছে, আড্ডা দিয়াছে। এখনও সেই আমলের ছাত্রেরা বাংলাদেশ হইতে আমার সঙ্গে কিছু কিছু সংযোগ রাখে। দেখিলাম জনৈক মুসলমান ছাত্র আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে আমার ও জনার্দন চক্রবর্তীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছে এবং জনার্দনবাবু যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাও প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়াছে। অবশ্য র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর সর্বত্রই তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং চট্টগ্রামের শান্ত আবহাওয়াও দূষিত হয়—এইরূপ শুনিয়াছি।

চাটগাঁ কলেজে আমি ইংরেজির সঙ্গে বাংলাও পড়াইতাম। বাংলার একমাত্র শিক্ষক ছিলেন জনার্দন চক্রবর্তী। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাংলা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে সংস্কৃত বা আরবীর পরিবর্তে ছাত্রেরা বাংলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। আমি শরৎচন্দ্র-সম্পর্কে বই লিখিয়াছি বলিয়া আমাকে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'—ইহাই বি-এ'তে পাঠ্য ছিল—পড়াইতে

অনুরোধ করা হয় এবং আমিও বিনা আপত্তিতে ইহা গ্রহণ করি। এই সময়ই আমার ডক্টরেট প্রাপ্তির কথা ঘোষিত হয়। একাধিকবার বলিয়াছি, আমাদের আমলে ডক্টরেটের মর্যাদা ছিল। চাটগাঁর ছাত্রেরা উৎসাহিত হইয়া সভা করিয়া আমাকে সংবর্ধনা জানায়। সেই সভায় আমার উদ্দেশ্যে লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়। তাহা খুব সুলিখিত বলিয়া আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। শুনিয়াছি, ইহা আমার বন্ধু ও সহকর্মী রসায়নের অধ্যাপক রণেন্দ্রকুমার দাশ রচনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ছেলেরা আমাকে অনুরোধ করায় আমি 'দত্তা'র নাট্যরূপ লিখিয়া ফেলি। তখন শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' অভিনীত বা প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানি না। পরে শিশিরকুমার কর্তৃক অভিনীত 'বিজয়া' দেখিয়া শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপের সমালোচনা করিয়া 'শরৎচন্দ্র'-গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদ যোগ করিয়া দিই। শরৎচন্দ্র নাটক-রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়া নাটকের সংহত, সংক্ষিপ্ত রূপ 'বিজয়া' বা 'রমা'-য় দিতে পারেন নাই। 'বিজয়া' তো উপন্যাস অপেক্ষাও বাহুল্য-ভারাক্রান্ত। সেই কারণে শিশিরকুমারের অভিনয়নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই নাটক তেমন সার্থক হয় নাই। সেই তুলনায় 'দেনা-পাওনা'-র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' অনেক বেশি সুসংবদ্ধ : বোধ হয় ইহার একটি কারণ—শরৎচন্দ্র 'ষোড়শী' রচনায় শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরের কথা আনিতেছি। শিশিরকুমার মৎপ্রণীত গ্রন্থ পড়িয়া আকৃষ্ট হয়েন ও নাট্যরসিক শ্রীঅমল মিত্রের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁহার শেষ পর্বের একাধিক নাটকের অভিনয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। তিনি শুধু প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন না, বিদগ্ধ সাহিত্য-পাঠকও ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী পরিচয়ে আমি মানসিক নৈকট্য অনুভব করিতাম।

কাগজপত্র, এমন-কি কাজের জিনিস হারাইবার দক্ষতা আমার অনন্যসাধারণ। আমার লিখিত 'দত্তা'-র পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে, রণেনবাবুর সুলিখিত অভিনন্দনপত্রও কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, যদিও তাহা চট্টগ্রাম কলেজের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ওখানকার ছেলেরা 'দত্তা'-য় খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। ননীগোপাল দাশগুপ্ত পরিবেশন করিয়াছিল রাসবিহারী, শচীন্দ্র সেনগুপ্ত বিজয়া ও ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য নরেন। ইহাদের সকলের অভিনয়ই স্মরণীয়। বিলাসবিহারীর ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করিয়াছিল সেও বেশ ভাল। তাহার চেহারা মনে আছে, কিন্তু নামটা ভুলিয়া গিয়াছি। ভাল হইলেও প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র মৈত্রের বিলাসবিহারীর মত অতটা উঁচুদরের নয়। (বোধ হয় ইহারই কিছু-দিন আগে) এইসব ছেলেরা পরশুরাম-এর 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' অভিনয় করিয়া আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিল। ইহার পূর্বে এই কাহিনীর সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয় নাই। ঐ নাটকে ননীগোপাল, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, হেমেন—ইহার পদবী ভুলিয়া গিয়াছি—রায়সাহেব তিনকড়ি এবং ব্রজেন্দ্র গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছিল। ইহার পরই ইহারা অংশতঃ আমারই পরিচালনায় 'রমা' মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে দুইটি প্রধান স্ত্রী-ভূমিকা থাকায় বহুরূপী ব্রজেন্দ্র নায়িকা রমার দায়িত্ব নেয় আর জ্যাঠাইমা হইয়া দেখা দেয় আমাদের প্রধান 'boy actress' শচীন। হেমেন ও চিত্তকে কলেজে সব সময়ই একসঙ্গে দেখিতাম, স্টেজেও তাহারা মানিকজোড়ের মত গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও বেণী ঘোষালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল। মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কাটিয়াছিল দুইটি পার্শ্বচরিত্র—রমার দজ্জাল মাসীর ভূমিকায় বঙ্কিম (যে-কোন অভিনেত্রী তাহার কাছে হার মানিত) আর মুদীর দোকানে আগন্তুক ব্রাহ্মণের ভূমিকায় উপবীতধারী সৈয়দ সামসুল কিব্রিয়া।

২

চাটগাঁতে যত ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজাদার এই কিব্রিয়া। সে ইংরেজিতে অনার্স লইয়াছিল এবং কলেজের খুব নিকটস্থ মুসলিম হস্টেলের সে ছিল অন্যতম আবাসিক। এই হস্টেলের সুপার ছিলেন খাঁ-বাহাদুর মহম্মদ হাসান। খাঁ-বাহাদুর মক্তবে পড়িয়া আরবীতে গভীর ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন ; প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, London School of Oriental Studies-এর প্রথম ডিরেকটর ডেনিসন রস—ইঁহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—যখন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তখন তিনি ইঁহার কাছে আরবী শিখিতেন। ইঁহার আরবী জ্ঞানকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার জন্য ডেনিসন রস সাহেব ইঁহাকে কলেজের প্রফেসর করেন এবং খাঁ-বাহাদুর খেতাবের ব্যবস্থা করিয়া দেন। খাঁ-বাহাদুর সম্পন্ন ভূস্বামী, সুপণ্ডিত, সকল দিক দিয়া মান্যগণ্য ব্যক্তি ; কিন্তু তিনি বি-এ, এম-এ পাস করেন নাই। যদিও তিনি মোটামুটি ইংরেজি জানিতেন তবু তাঁহার একটু হীনমন্যতা ছিল। চঞ্চলমতি কিব্রিয়াকে শায়েস্তা করিতে খাঁ-বাহাদুর নাজেহাল হইতেন। সে হস্টেলের নিয়ম মানিত না, গোলমাল করিত এবং নানাভাবে বৃদ্ধ সুপারকে উত্ত্যক্ত করিত। খাঁ-বাহাদুর তাহাকে মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিতে বলিলে, সে অমনি জবাব দিত, 'আপনি ইংরেজি অনার্স পড়ার কি জানেন? আপনি কি বি-এ, এম-এ পাস করিয়াছেন? কোন দিন কলেজে পড়িয়াছেন? আমি পড়া করি না করি তাহার আপনি কি বুঝিবেন?' এই সরল ও ভয়ংকর যুক্তি খাঁ-বাহাদুর নিজেই আমাকে জানাইয়াছিলেন। আমি বৃদ্ধকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারি নাই। শুধু কিব্রিয়াকে উপেক্ষা করিতে বলিতাম।

কিব্রিয়া আমাকেও জব্দ করিয়াছিল এবং তাহাও অবিস্মরণীয়। বিয়াল্লিশ বছর নানা জায়গায় চাকুরী করিয়াছি এবং কখনও কখনও ছাত্রদের কাছে জব্দ না হইয়াছি এমন নয়। কিন্তু কিব্রিয়ার কৌশল যেমন অভিনব, তেমনি অপরাজেয়। উহাদের অনার্স ক্লাসে গুটি-কয়েক ছাত্র এবং একজন ছাত্রী অনিমা রায়। হিন্দু হস্টেল উঠিয়া যাওয়ায় তখন হস্টেলের ঘরগুলি কলেজের অঙ্গ হইয়াছে। ছোট ছোট ঘর এবং অপ্রশস্ত বারান্দা। যতদূর মনে আছে আমি Several Essays নামে একটা বই পড়াইতাম। একে অনার্স ক্লাস, তারপর বইটাও কঠিন : কাজেই শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী—সবাই গম্ভীরভাবে পঠন-পাঠনে ব্যস্ত, এমন অবস্থায় রোজই (সন্নিকটস্থ মুশলিম হস্টেলের বাসিন্দা) কিব্রিয়া ঘণ্টার মাঝখানে উপস্থিত হইত। আমি প্রথম প্রথম তিরস্কার করিতাম ; সে হেঁট হইয়া শুনিত। পরে একদিন বলিয়া দিলাম, সে যদি সময় মত আসিতে না পারে তবে যেন ক্লাসে না ঢোকে। পরের দিন আমি পড়ান আরম্ভ করিয়াছি, বিষয়টা ছিল হ্যাজলিটের প্রবন্ধ—মৃত্যুভয় সম্বন্ধে। একটু পরেই দেখি বাহিরের বারান্দায় অনতিদূরে একটি টুলের উপরে বসিয়া বই খুলিয়া কিব্রিয়া খুব মনোযোগী ছাত্রের মত আমার পড়ান শুনিতেছে এবং অন্য ছেলেরা যখন বইয়ে দাগ দিতেছে অথবা খাতায় কোন কথা লিখিয়া লইতেছে, সেও তাহাদের অনুকরণ করিতেছে। কিছুই বলিবার নাই ; আমার নির্দেশ মতই সে ক্লাসে ঢুকিয়া পঠন-পাঠনের তালভঙ্গ করে নাই, অথচ আদ্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পড়া শুনিবার অভিনয় করিতেছে। ক্লাসের ছাত্রেরা অতিকষ্টে হাসি চাপিতেছে, আমি ততোধিক কষ্টের সহিত গাম্ভীর্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় শুধু মৃত্যুভয় নয়, মৃত্যুর অভিজ্ঞতাও হইতে পারিত। সেই দিনও তাহার উপর রাগ করি নাই ; আজও তাহার কথা সস্নেহে স্মরণ করিতেছি।

চাটগাঁয়ের আর একটি ছেলের কথা খুব মনে আছে—তাহার নাম ওয়াজিউল্লাহ্। সে নাকি আরবী খুব ভাল জানিত। বোধ হয় ঐ বিষয়েই অনার্স পড়িত। সে খুব দরিদ্র ;

অনেক কষ্ট করিয়া লেখাপড়া করিত। তাহার চেহারা, পরিচ্ছদ, চালচলন—সবই দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করিত। শুধু দুইটি বিষয়ে আভিজাত্যের স্বাক্ষর ছিল—তাহার হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতন, এবং সে বেশ বিশুদ্ধ ইংরেজি লিখিতে পারিত। আমি চাটগাঁ গিয়াছিলাম ছয় মাসের কড়ারে। পি-এচ. ডি. পাওয়ার পর বই ছাপিবার আগ্রহে এবং অন্যান্য কারণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম। নচেৎ এই ছেলেটির পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগ দিতাম। পূর্বে উল্লিখিত বীণাপাণি মামলার পর কাজ ছাড়িয়া বাবা কলিকাতায় আমার সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৯ সালই হইবে—ওয়াজিউল্লাহ্ আমার কলিকাতার বাসায় উপস্থিত। সে বছর-দুই আগে বি-এ পাস করিয়াছে ; কোথাও চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং পারিবারিক নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত হইয়াছে। এখন অতিশয় বিপন্ন এবং তাহার একমাত্র মুরুব্বি আমি। সে প্রায়ই আসিত। আমি অনেক সময় বাড়ি থাকিতাম না। কেমন করিয়া বাবার সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়া যায়। ভাল ইংরেজি লেখা বাবার জীবনের আদ্যন্ত আদর্শ এবং পাণ্ডিত্যের প্রধান মানদণ্ড। ওয়াজি-উল্লাহ্-র বিশুদ্ধ ইংরেজি রচনা দেখিয়া—বোধ হয় প্রথমে কোন বিষয়ে সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল—বাবাও খুব আকৃষ্ট হয়েন এবং তাহার জন্য কিছু করিতে ব্যগ্র হয়েন। সেই সময় বন্ধুবর পবিত্রকুমার বসু কলিকাতার কারেন্সী-অফিসার নিযুক্ত হইয়া আসে। বাবা তাহাকে ধরিয়া ওয়াজিউল্লাহ্-র কারেন্সী অফিসে একটা চাকুরী করিয়া দেন। পবিত্র বসু আমাকে বলিয়াছে যে এই নূতন কর্মচারীর আরবী জ্ঞানের কোন প্রয়োগ সেই অফিসে সম্ভব নয় বলাই বাহুল্য। ওখানে যে কাজ তাহাকে করিতে হইত তাহার সঙ্গে সাধারণ গণিতের—যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সম্পর্ক বেশি এবং সেখানে তাহার পটুতা ছিল খুব কম ; সুতরাং ঐ অফিসের পক্ষে তাহাকে খুব উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হইত না। ইহার কিছুদিন পরই অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালে জাপানী বোমার ভয়ে কলিকাতা ত্যাগের হিড়িক পড়ে। পরিবারের অধিকাংশকে লইয়া বাবা ফরিদপুর চলিয়া যান, আবার তাহার কয়েক মাস পর আমি রাজশাহী কলেজে বদলী হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করি। ওয়াজিউল্লাহ্-র আর কোন সংবাদ রাখিতে পারি নাই।

শুধু ওয়াজিউল্লাহ্ কেন, উপরে যাহাদের কথা বলিলাম তাহাদের প্রায় কাহারও সঙ্গে আর যোগাযোগ নাই। কে কোথায় আছে জানি না, সবাই বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। শুধু ইহা জানিতাম যে ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সরকারী স্কুলে কাজ করিত এবং এক সময় আমি তাহার কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারিয়াছিলাম। এইসব ছাত্রদের কথা যখন মনে করি তখন দুইটি বৃহত্তর প্রশ্ন মনে জাগে। আমি ঢাকা জেলার গ্রামের লোক এবং ফরিদপুর জেলায় গ্রামে বহু দিন কাটাইয়াছি ; চাকুরী-জীবনে দক্ষিণে চাটগাঁ ও উত্তরে রাজশাহীতে ছিলাম—এবার গ্রামে নয়, শহরে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ ও ঐক্যের কথা শুনিয়াছি এবং উভয় প্রকারের অভিযানের সঙ্গেই পরিচিত আছি। সর্বত্রই এই সমস্যা ও তাহার সমাধানের কৃত্রিমতা আমাকে পীড়া দিয়াছে। বিদেশী শাসকরা লর্ড মর্লি ও মিন্টো হইতে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড এবং লর্ড লিনলিথগো এই সমস্যাকে নিলাম ও বখরার দিক হইতে দেখিয়াছেন। তেমনি দেখিয়াছেন হিন্দু নেতারা—মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অনুগামীরা। সেইজন্য মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা বেশি সোচ্চার হইয়াছেন তাঁহারাই সুবিধা করিতে পারিয়াছেন—মহম্মদ সাফি, নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী এবং সর্বোপরি জিন্না। ইঁহারা সাধারণ মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা জানিতেন না এবং তাহাদের প্রকৃত উন্নতির কথা ভাবেন নাই। অবশ্য ফজলুল হকের মত মুষ্টিমেয় দুই-চারজন ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এই বখরা ও লুটের বাজারে মতি স্থির রাখিতে

পারিতেন না। এই-সব নেতারাও সেই-সব অনুগামীদের কথাই ভাবিতেন যাঁহারা বেশি রব করিতে পারিতেন। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রে দেখিতাম তারকনাথ সেন প্রমুখকে সরাইয়া এমন সব লোককে বহাল করা হইত যাহাদের অযোগ্যতা সর্ব অঙ্গে দেদীপ্যমান, অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইত 'I have tolden' (ইকনমিক্স) ও 'Be more clarified' (ইংরেজি) ; আর মুস্লিম লীগের যখন অপ্রতিহত দাপট, তখন ওয়াজিউল্লাহ্ এম-এ পড়িবার সুযোগ পাইল না এবং একটা সামান্য সরকারী চাকুরীর জন্য তাহাকে নির্ভর করিতে হইল এক গ্রামীণ অ-খ্যাত স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের তদ্বিরের উপর। সেই বৃদ্ধ কিভাবে ইংরেজ-মুসলমান জোটের ভয়ে চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন তাহাও আগেই বলিয়াছি।

আমার জীবনের প্রথম সতের বছর কাটিয়াছে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার গ্রামে এবং পরের সতের বছরও ওখানকার সমাজের সঙ্গে আমার সংযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। আমার মনে হইয়াছে যে আমাদের নেতারা অনুন্নত সমাজের প্রকৃত সমস্যাকে সাদা চোখে দেখিতে চেষ্টাই করেন নাই। উপরিতলার কয়েকজন ক্ষমতালোলুপ নেতার অধীর আগ্রহের জন্যই ভারতবর্ষ দুই ভাগে এবং পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যাহাকে পাকিস্তান বা পরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বলা হয়, সেখানকার লোকেরা তো রাজনৈতিক স্বাধীনতাই পায় নাই—ইংরেজের শোষণের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় জঙ্গীশাহীর উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে এবং উপরিতলার কয়েকজন লোক ভিক্ষালব্ধ অর্থে ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছে। খণ্ডিত ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে বটে, কিন্তু হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্ত—নাম দুইটি বঙ্কিমচন্দ্রের—যেখানে ছিল প্রায় সেইখানেই আছে। আমাদের প্রভুরা মনে করেন যে অনুন্নত ও সংখ্যা-লঘুদের জন্য কমিশন গঠন করিয়া এবং তাহাদের দুই-চারজনকে রাজ্যপাল, মন্ত্রী করিয়া অথবা উচ্চপদ দিয়া সমস্যার সমাধান করিব, কিন্তু ইহাতে শ্রেণীবিভাগ, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আরও উৎকট হইয়া পড়ে।

আমার চট্টগ্রামের জীবনের কথা বলার সময় এই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল বলিয়া ইহার আর একটি দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। আমাদের যে নেতারা স্বাধীনতা লইয়া বখরা-বাঁটোয়ারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশকে বিভক্ত করিয়া যে কি মূল্য দিলেন তাহার কথা একটুও ভাবিয়া দেখেন নাই। অনেককাল পরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নাগপুর গিয়াছি। সেইখানে চাটগাঁর পুরানো ছাত্র প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে দেখা। একবেলা তাহার বাড়িতেই কাটাইলাম। চাটগাঁ কলেজে সে ভাল ছাত্র ছিল। অনেক ঝুঁকি লইয়া মধ্যপ্রদেশে আসিয়া ভাগ্যক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দেশে তাহার বিশেষ কেহ ছিল না ; যাহারা ছিল তাহাদের কোন সংবাদও সে রাখিতে পারে নাই। কিন্তু এই দেশ-বিভাগের ফলে যে কোটি কোটি লোক গৃহহারা হইল, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল—ইহার কি প্রয়োজন ছিল? যাঁহারা এই বলিদানের নায়ক, সেই জাতীয় নেতারা এতই বিজাতীয় ভাবাপন্ন ছিলেন যে তাঁহারা ইহা উপলব্ধিই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৬ সালে এই ব্যবচ্ছেদের ফলে গদীতে লাফ দিয়া উঠিবার প্রাক্কালে সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল নেহেরু এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে দুই দলে ঝগড়া-ঝাঁটির জন্য তাঁহাদের বহুদিনের পরিকল্পিত economic policy বা অর্থনৈতিক সংস্কার বিলম্বিত হইতেছিল। সেইজন্যই তাঁহারা ভারতবিভাগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের economic policy-কে সুযোগ দিতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনবিসর্জন দিতে হইল। ঝগড়াঝাঁটিও থামিল না—পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বার-তিনেক যুদ্ধ হইয়াছে এবং এখনও ঝগড়া মিটে নাই। সব সময়ই 'সাজ সাজ' ভাব চলিতেছে। এবং সেইজন্যই যে অর্থ দেশের লোকের কল্যাণে ব্যয় হইতে পারিত তাহা সমরাস্ত্র-ক্রয়ে শোষিত হইতেছে। ইহাও মানিতে হইবে যে, এই-সকল যুদ্ধে ও চীনযুদ্ধে

যত লোক নিহত হইয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশি রক্তক্ষয় হইয়াছিল দেশব্যবচ্ছেদের ফলে।

যাঁহাদের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া দেওয়া হইল তাঁহারা দেশকে জানিতেন না, দেশের কথা না ভাবিয়া নিজেদের কথা ভাবিয়াছেন এবং দেশের প্রতি তাঁহাদের কোন মমতা ছিল বলিয়াও মনে হয় না। একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করিব। বক্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, সেই জোরেই হাকিম হইয়া বঙ্গদেশে নানা জায়গায় ঘুরিয়াছেন, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং চাকুরীর শেষ দফায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা হইলেন। ইঁহাদের একটা কাজ হইল শরণার্থীশিবির—আন্দুল রাজবাটী—হইতে একদল পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীকে দুইটি জাহাজে পুরিয়া আন্দামানে পাঠান। যদিও ইঁহারা আন্দামানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যতদূর জানি পূর্ববঙ্গ শরণার্থীদের মধ্যে আন্দামানবাসীরাই ভাল আছেন, তাহা হইলেও সেই আমলে সমুদ্রের ওপারে দ্বীপান্তর আন্দামানে যাওয়ার কথা শুনিলেই লোকের বুক কাঁপিত। সেইজন্যই এই-সকল কর্মচারীরা মনে করিলেন যে গভর্ণর যদি যাত্রার প্রাক্কালে ইহাদিগকে সহানুভূতি ও আশ্বাস দেন, তাহা হইলে ইহারা একটু সান্ত্বনা পাইবে এবং সকল দিক দিয়া এইরূপ বিদায়-সংবর্ধনা খুব শোভনও হইবে। গভর্ণর অবশ্যই রাজি হইলেন। এই গভর্ণরের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। শুনিয়াছি, ইঁনি নেহেরু পরিবারে খুব আপন-জন এবং ইঁহার ব্যবহারাজীব হিসাবে নাম ছিল, বিশেষ করিয়া ফৌজদারি কোর্টে খুব পসার ছিল। যাহা হউক, ইঁনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, মতিলাল বা চিত্তরঞ্জনের মত প্র্যাকটিস্ ছাড়েন নাই। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম না করুন, স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে বাধা নাই—আর দাতা যেখানে বন্ধু ও আত্মীয় জওহরলাল। ইঁনি নাকি আন্দুল রাজবাড়িতে শরণার্থী শিবিরে গিয়া এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি মনে করিলেন যে যাহারা তাহার কাছে সমবেত হইয়াছে ইহারা সবই ফৌজদারি মামলায় বিপক্ষের সাক্ষী এবং যাহাদিগকে কাছে পাইলেন তাহাদিগকে কঠোর জেরা করিতে লাগিলেন। শরণার্থীদের ম্লান মুখ আরও ম্লান হইল আর যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এই ভদ্র (?) লোককে আনিয়াছিলেন তাঁহারা ভাবিলেন, ইঁহাকে আনা অপেক্ষা পূর্বতন লাটসাহেব লিটন-এন্ডারসনকে আনিলে বরং ভাল হইত।

৩

কথায় কথায় প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি। অল্প দিন চট্টগ্রামে ছিলাম, কলিকাতা হইতে বেশ দূর ; কলিকাতা হইতে যাইতে দুইবার রেল-স্টীমার বদল করিতে হইত এবং পুরো চব্বিশ ঘণ্টা লাগিত। সেই কারণে এই স্থানান্তর অনেকটা নির্বাসন বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ওখানকার ছাত্রদের আনুগত্য এবং বন্ধুদের সাহচর্যে আমি বেশ আনন্দে ছিলাম। যতদূর বুঝিতে পারিতাম—সহকর্মীরা সবাই আমাকে ভালবাসিতেন এবং ইহা ছাড়া বাহিরের বন্ধুবান্ধব ছিলেন যাঁহাদের কথা মনে রাখার মত। একজন বিপ্লবী সতীভূষণ সেন। তিনি সূর্য সেনের দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। বিক্রমপুরে আমাদের নিকটবর্তী গ্রামের লোক এবং একাধিক সূত্রে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ইঁহাকে চাটগাঁয়ে অল্পই জানিতাম ; কিন্তু কলিকাতায় ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন এবং আমাদের আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল চাটগাঁয়ের তখনকার জীবনযাত্রা। সতীভূষণবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিজ্ঞানে—বোধ হয় ফিজিক্সে এম. এস-সি. পাস করিয়াছিলেন এবং কর্মজীবনে ছিলেন ব্যবসায়ী ও বিপ্লবী। ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী শান্ত-

প্রকৃতির এই মানুষটির জীবনদৃষ্টির মধ্যে দার্শনিকের দূরত্ব ও নির্লিপ্ততা ছিল। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে ইনি উগ্রতেজা অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের অগ্রজপ্রতিম উপদেষ্টা ছিলেন এবং 'মাষ্টারদা' সূর্য সেন যখন ইংরেজের প্রশাসনিক যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়া আত্মগোপন করিয়া জেলার অভ্যন্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন সতীভূষণবাবুই শহরে তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন। সতীভূষণবাবু সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ওখানকার অফিসার, ব্যবহারাজীব, ডাক্তার প্রভৃতির সঙ্গেও আমার বেশ পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু পরিচয়কে ছাপাইয়া গিয়াছিল শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্রের সান্নিধ্য। তিনি আমাদের বছরেরই ছাত্র, কিন্তু যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ, বি-এ পড়েন নাই, কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার সঙ্গে তেমন পরিচয় ঘটে নাই। তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতালাভই আমার জীবনে চাটগাঁ পর্বের সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এই চলন্ত বিশ্বকোষ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র (Portraits and Memories : 'N. C. M'.) সবিস্তারে লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

সহকর্মীদের মধ্যে রণেনবাবু ও জনার্দনবাবুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর সকলের মধ্যে ইংরেজির অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ কিছুদিন পূর্বে চাটগাঁ শহরেই নব্বুই বছর অতিক্রম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, বোধ হয় ১৯৮০ সালে। চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক তরুণ অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর সকল সম্প্রদায়ের লোক নানাভাবে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আর যে দুইজন সহকর্মীর সঙ্গে আমার বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁহারা উভয়েই জীবিত আছেন এবং এখন কলিকাতারই অধিবাসী: ইঁহারা হইলেন আব্দুল ওহায়েব মাহ্‌মুদ ও পরেশনাথ ঘোষ। মাহ্‌মুদ আমার অপেক্ষা বয়সে বেশ ছোট ; আমি যখন দুই কলেজে অধ্যাপনা করিয়া চাটগাঁ কলেজে যোগ দিই, তখন তিনি তরুণতম লেকচারার হিসাবে ওখানে অধ্যাপক-জীবন শুরু করেন। তিনি প্রথম হইতেই বেশ ভাল পড়াইতে পারিতেন বলিয়া সুনাম হয়। কিন্তু এটা তাঁহার প্রথম পরিচয় নয়। কলেজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রটিয়া যায় যে একজন বড় খেলোয়াড় কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন এবং সেইজন্য কলেজের ফুটবল টীমও যেন নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইল। অধ্যাপকদের মধ্যে ভাল খেলোয়াড় যে দেখা যায় না তাহা নহে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় শুনিতাম, ঢাকা কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক অংক ভাল জানেন না বলিয়া সুবক্তা হইলেও ফিজিক্সে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেন না, কিন্তু ফুটবল খেলায় তাঁহার আধিপত্য তর্কাতীত। খেলায় মাহ্‌মুদের অধিকার আরও বিস্তীর্ণ। তাঁহার ফুটবল খেলা 'ছবির মত', হকিতে দক্ষতা আরও পরিপক্ক আর খবরের কাগজ পড়িলেই দেখা যাইত, টেনিসে তিনি বঙ্গের স্বল্প কয়েকজন বাছাই খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই টেনিস খেলায় পারদর্শিতার সূত্রেই তরুণ মাহ্‌মুদের একটি অভিজ্ঞতা হয়—যাহা আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। অনেক জায়গায়ই ছোট ছোট সম্প্রদায় তাহাদের গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে যেখানে গোষ্ঠীর বাহিরের লোকেরা প্রবেশ করিলেও ঠিক মিশিয়া যায় না। এ যেন পারিবারিক গ্রুপ-ফটোতে আগন্তুকের আবির্ভাব। ব্রিটিশ রাজত্বে কোন কোন শহরে একটা করিয়া ইউরোপীয়ান ক্লাব থাকিত ; এটা রাজার জাতির ক্লাব, বিজেতা-দের ক্লাব। সেই কারণেই প্রজাদের বা বিজিত জাতিভুক্ত লোকেদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ বা অনভিপ্রেত। কিন্তু সাহেবদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কালা আদমীর মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, যদিও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এই হীনমন্যতা পরিহার করা উচিত। কিন্তু পরাধীনতার একটা অভিশাপ আত্মসম্মানবোধের অবক্ষয়। এই-সব তত্ত্বকথা ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ে আসা যাক। দুই-চারজন ভারতীয়—ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস,

ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের লোকেরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন। চাটগাঁ বন্দর-শহর—এখানে ইউরোপীয় ক্লাব জমজমাট প্রতিষ্ঠান। দুই-চারজন নেটিভ এখানে প্রবেশ করার সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। চন্দসাহেব (অপূর্ব-কুমার চন্দ) অল্পদিন ওখানে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন; কিন্তু আমার সঙ্গে চাটগাঁ বিষয়ে কখনও কোন কথা উঠিলেই তিনি ইউরোপীয় ক্লাবের প্রসঙ্গ তুলিতেন এবং তিনি যে কিছুদিন সেখানে ছিলেন তাহাও বলিতেন। আমরা যখন ছিলাম তখন বাহির হইতে কোন ওস্তাদ সাহেব টেনিস খেলোয়াড় ওখানে আসিলে ক্লাব হইতে মাহ্‌মুদকে আমন্ত্রণ জানান হইত প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য। তখন ভারতীয় মেম্বর ছিলেন তিনজন—একজন মিলিটারি ক্যাপ্টেন, আর দুইজন সিভিল রাজকর্মচারী। অতিথি যুবক মাহ্‌মুদ সাহেব লক্ষ্য করিতেন—তিন ভারতীয় যতই সাহেবদের সঙ্গে মাখামাখি করিতে চাহিতেন, সাহেবরা ইঁহাদের সঙ্গ এড়াইতে চেষ্টা করিতেন। আবার ইঁহাদের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সূক্ষ্ম পার্থক্য করিত। যে ক্যাপ্টেন যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষায় সাহায্য করিবেন হাকিম ও পুলিশ-সাহেব অপেক্ষা তাঁহার একটু বেশি খাতির ছিল।

উপরে যে কাহিনীটি বলিলাম, তাহার মধ্যেই মাহ্‌মুদসাহেবের সূক্ষ্ম সজাগ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইঁহার আর একটা গুণ মননশীল বহুমুখী কৌতূহল। তিনি ইতিহাসের ছাত্র, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বহুবিষয়ে সঞ্চরণশীল। এই বিশেষজ্ঞতার যুগে এই রুচিবৈচিত্র্য বোধ হয় অবিমিশ্র গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না এবং সেই ত্রুটি বোধ হয় মাহ্‌মুদের বিদ্যাচর্চায়ও আছে। তিনি অক্সফোর্ডে গভর্ণর-জেনারেল স্যার জন শোর সম্পর্কে নিবন্ধ লিখিয়া বি. লিট. উপাধি পাইয়াছিলেন। ডিগ্রি পাওয়ার বেশ কিছুদিন পর তিনি পরিমার্জন ও পরিশোধনের জন্য এই গবেষণা নিবন্ধটি আমাকে দেখিতে দেন। আমার রচনা অনেকে দেখিয়া দিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমিও তাহার অনুরোধ সানন্দে গ্রহণ করিলাম এবং নিষ্ঠার সহিত পালন করিলাম। তাঁহার রচনা বেশ ঝরঝরে, ঝকঝকে এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। কিন্তু তিনি উহা ছাপিলেন না। আমাকে অন্য ঐতিহাসিক বন্ধু বলিয়াছেন যে অন্তবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সময় সম্পর্কে অর্থাৎ কর্ণওয়ালিশ ও ওয়েলেশলীর মধ্যবর্তীকাল সম্বন্ধে নূতন কাজ হইয়াছে এবং মাহ্‌মুদের তাহা আলোচনা করিয়া স্বীয় গবেষণাকে 'আপ-টু-ডেট' করা উচিত। হয়ত তাঁহার তরী তখন স্যার জন শোরকে ছাড়িয়া অন্য তীরের অভিমুখে গিয়াছে। ইদানীং দেখিতেছি তিনি শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি, প্লুটার্কের কাছে শেক্সপীয়রের ঋণ, এমন কি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আমার অভিমত (থিওরি) এবং ব্র্যাডলির সঙ্গে আমার পার্থক্য এইসব বিষয়ে পড়াশোনা ও আলোচনায় উৎসুক। তাঁহার বোধ হয় কোন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য নাই, কিন্তু তাঁহার সজীব, সদাচঞ্চল জিজ্ঞাসা আমাকে আকৃষ্ট করে।

একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইব। কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে দেখি গ্যেটে-সম্পর্কে বক্তৃতা এবং বক্তা মাহ্‌মুদসাহেব; স্থান—গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট। ওখানে অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি, সভাপতিত্ব করিয়াছি এবং নিজেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছি। সবই অনুরোধ বা আমন্ত্রণে। সংবাদপত্রে নোটিশ দেখিয়া এই একবার ওখানে গিয়াছি। মঞ্চে উঠিয়া বক্তা শ্রোতৃবর্গের দিকে তাকাইয়া প্রারম্ভেই বলিলেন যে যে-সকল সুধীজন সভায় উপস্থিত আছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করিতেছেন। এই লক্ষ্য ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও যে একজন তাহা নিশ্চিত। কিন্তু আমার সুদীর্ঘ জীবনে সেইদিনকার অভিজ্ঞতা মুদ্রিত হইয়া আছে। গ্যেটে-সম্পর্কে সবাই জিজ্ঞাসু; আমার জিজ্ঞাসা তো আবার অনেকটা professional, কারণ ছাত্র হিসাবে এম-এ

ক্লাসে ফাউস্ট পড়িয়াছি ; আর ক্রোচে লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি বলিয়া গ্যেটেও আমার চর্চার মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু সেইদিন এক ঘণ্টার মধ্যে মাহ্‌মুদ সাহেব গ্যেটে-সম্পর্কে যে অর্থপূর্ণ প্রাঞ্জল বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিলেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে পারি এমন বেশি বক্তৃতা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে ইহাও ঠিক, মাহ্‌মুদ এই বিষয়ে আর অগ্রসর হয়েন নাই।

আমার চাটগাঁয়ের আর এক বন্ধুর কথা বলা বাকী আছে। তিনি পরেশনাথ ঘোষ। তিনি N.C.M.-এর মত পণ্ডিত নহেন—প্রকৃতপক্ষে N.C.M.-এর অবিশ্বসনীয় পাণ্ডিত্যের কথা আমি পরেশবাবুর মুখেই প্রথম শুনি—এবং তিনি মাহ্‌মুদ সাহেবের মত সঞ্চরণশীল বা চঞ্চলও নহেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার চার বছর উপরে পড়িতেন। আমি যখন প্রথম বার্ষিক অর্থাৎ আধুনিক গণনায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হই, তিনি সেই বৎসরই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতে আসেন এবং আমাদের মত তরুণদের অভ্যাগমে হিন্দু হস্টেলে জায়গা না থাকায় কলুটোলা মেসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতি আমি যে আকৃষ্ট হই তাহার মধ্যে তাৎপর্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে হস্তাক্ষর দেখিয়া লোকের চরিত্র চেনা যায়। আমি তাহা বিশ্বাস করি না, কারণ তাহা হইলে আমি নিজে খুব নীচে পড়িয়া যাইব। সেই আমলে আমাদের ক্লাসের অনেকের হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু সেই-সব হস্তাক্ষর প্রশংসা ও ঈর্ষার উদ্রেক করিলেও চরিত্রব্যঞ্জক নহে। তখন হস্টেলের প্রতি ওয়ার্ডে বছরে একবার তো বটেই, কখনও দুই-বারও হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির হইত এবং শক্ত মলাটে সোনার জলে নাম লিখাইয়া তাহা সংরক্ষিত হইত। সেইখানে একটি প্রবন্ধের হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি থমকিয়া গিয়াছিলাম। এমন স্পষ্ট, ঋজু, দৃঢ় অবিকম্পিত পৌরুষব্যঞ্জক হস্তাক্ষর আমি আর দেখি নাই। শেষের বিশেষণে মেয়েরা রাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহারা এখনও মেয়েলি ছাঁদ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, লেখাটা পড়িয়াছিলাম কিনা মনে নাই, তবে হাতের লেখা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া লেখক পরেশনাথ ঘোষের পরিচয় পাই বন্ধুবর পবিত্রকুমার বসুর কাছে। ইহার বছর-দশেক পরে এই পরেশবাবুর ছোটভাইয়ের বিবাহ হয় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছোট বোনের সঙ্গে। বিবাহে কন্যাপক্ষের আমরা ভলান্টিয়ার ; কর্মব্যস্ততায় পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয় নাই এবং সেই দিন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। আমাদের প্রথম-সাক্ষাৎ হয় চাটগাঁ কলেজে যোগদানের দিন। ওখানে কলেজে আমরা একই বিভাগের লোক, আবার আমার ভগিনীসমা, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া ফুলু তখন তাঁহার কাছেই ছিল। এইভাবে তখন অল্পদিনেই আমরা ঘনিষ্ঠ হই এবং প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা জন্মে তাহা আজও অটুট আছে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, কিন্তু দীর্ঘদেহী, উন্নতশির, প্রিয়ভাষী কিন্তু স্পষ্টবক্তা—এইরূপ লোক বেশি দেখা যায় না। কর্মজীবনে ও সাংসারিক জীবনে তাঁহাকে বহু বোঝা বহিতে হইয়াছে, কিন্তু কখনও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই।

পরেশবাবু সাধারণ জগতের সাধারণ মানুষ। আদর্শবাদী হইলেও দেশবন্ধুর মত ত্যাগবীর, সুভাষচন্দ্রের মত সংগ্রামী বীর নহেন এবং সত্যসন্ধ ও নির্ভীক হইলেও গান্ধিজীর মত সত্যাশ্রয়ী বা অভয়মন্ত্রের সাধক নহেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সরকারি কলেজে তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক বা লেকচারার ছিলেন, তারপর অর্থাৎ বেশ কিছুদিন পর—দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। তখনকার দিনে মনে হইত, ইহাই লেকচারারদের একমাত্র কাম্য এবং তাহা হস্তগত হইলে শুধু পেনশনের জন্য অপেক্ষা। নানা কলেজ ঘুরিয়া অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে পরেশবাবু পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে একটা চাকুরি পান ; তাহাও খুব আটপৌরে ব্যাপার। তিনি উহার সহকারী সচিব হয়েন এবং ইহার পরে যেকাজে যান তাহা আরও

আর্কিশ্রীংকর—দামোদরের বন্যাপীড়িত একটা অজপাড়াগাঁয়ে জনৈক ধনী ব্যক্তিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা কলেজের অধ্যক্ষ হয়েন। কেমন করিয়া এখন ঠিক বলিতে পারি না, হঠাৎ এই অখ্যাত পল্লীতে বসিয়া তিনি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হয়েন। তিনি যোগদান করেন ১৯৫৮ সালে এবং একাদিক্রমে সাত বৎসরকাল ওখানকার প্রিন্সি-প্যালের কাজ করেন। পরেশবাবু এই কাজে যে দক্ষতার পরিচয় দেন তাহা কীর্তিত হওয়ার যোগ্য এবং অনেকটা সেইজন্যই তাঁহার কথা সবিস্তারে বলিলাম।

আমি সরকারি ও বেসরকারি কলেজে বহুদিন কাজ করিয়াছি এবং আমার সবচেয়ে দীর্ঘ-সম্পর্ক প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে। ইহার শতবার্ষিকীতে আমি এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসও লিখিয়াছি। আমার মনে হয় যদিও পেডলার, পি. কে. রায়, কোয়াজি প্রভৃতি নামজাদা অনেক লোক এখানে অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা অধ্যক্ষতা করিয়াছেন অল্পদিন ; অধ্যাপক হিসাবেই ইঁহাদের খ্যাতি বেশি। যাঁহারা বেশিদিন অধ্যক্ষের কাজ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে (প্রথম) প্রিন্সিপ্যাল সাটক্লিফ, টনি ও জেমস্ উল্লেখযোগ্য। সাটক্লিফ-সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না, টনির অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্পর্কে আমার খানিকটা ধারণা আছে এবং তিনি নৈতিক আদর্শে খুব বিশ্বাসী ছিলেন ইহাও শুনিয়াছি, কিন্তু কলেজের সামগ্রিক প্রশাসনে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ কতটা প্রতি-ফলিত হইয়াছিল তাহা পরিমাপ করিতে পারি নাই। জেমস্ অনেকটা কাছের লোক : তিনি কলেজ হইতে চলিয়া যান ১৯১৬ সালে, আর আমি প্রবেশ করিয়াছি ১৯২০ সালে, জেমসের বিদায়ের চার বৎসর পর। কিন্তু জেমসের প্রভাব তখনও নানাভাবে অনুভব করা যাইত। আমার মনে হয়, জেমসের অধ্যক্ষতা এই কলেজের একটা স্মরণীয় অধ্যায় ; তাঁহার অপেক্ষা দক্ষতর অধ্যক্ষ এই কলেজে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ডাফ সাহেবের নেতৃত্বে মিশনারীরা আপত্তি করায় তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ সাটক্লিফ কলেজের পক্ষ হইয়া লড়িয়াছিলেন, এমন কোন সাক্ষ্য কোথাও পাই নাই। আর বিশ্ববিদ্যালয় যখন এম-এ ক্লাস উঠাইয়া দিয়া এই কলেজের শিরশ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইল তখন ইহার বিরুদ্ধে জেমস যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। জেমসের প্রধান অবদান তিনি কলেজে নূতন প্রেরণা দেন এবং নূতন প্রকল্পের সূচনা করেন। তাঁহার আমলেই বিজ্ঞানের জন্য বেকার ভবন নির্মিত হয়, আর্টসে সেমিনার, টিউটোরিয়েল প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়, ইকনমিক্স বিভাগ পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ; ভাল অধ্যাপক আমদানি করার জন্য তিনি সদা-সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহারই চেষ্টায় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হাকিমি পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রত্যাবর্তন কবিতে পারেন। এক কথায় তিনি এই কলেজকে নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেন ; এমন-কি যে স্বয়ংশাসিত বা অটোনমাস কলেজের স্বপ্ন আমরা এখন দেখি তাহার লিখিত পরিকল্পনা তিনি সত্তর বৎসর আগে পেশ করিয়াছিলেন।

বেসরকারি কলেজে অনেক বড় বড় অধ্যক্ষের কথা শুনিয়াছি। সবচেয়ে নামজাদা বোধ হয় এন. এন. ঘোষ, ই. এম. হুইলার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইঁহাদের প্রচুর পাণ্ডিত্য ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল। কিন্তু যতদূর জানি কলেজ প্রশাসনে ইঁহারা তেমন স্বাক্ষর রাখিয়া যান নাই। আমাদের আমলে সবচেয়ে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ; যতদিন তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রমাহাত্ম্য সর্বত্র অনুভূত হইত। কিন্তু তিনি নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট স্বভাবের লোক ছিলেন আর তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদান। তারপর তাঁহার উপরে অছিপরিষদ সজাগ-দৃষ্টি রাখিতেন। পরেশবাবুর

হুইলার বা রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মত বৈদগ্ধ্য ছিল না, কিন্তু শুধু নিষ্ঠা, উদ্যম ও শ্রান্তি-হীন অধ্যবসায়ের দ্বারা সাত বছরের চেষ্টায় তিনি মেদিনীপুর কলেজে আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করেন। এইরূপ রূপান্তরণের অন্য কোন দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়ে নাই। মেদিনী-পুর কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালে। প্রথমে শুধু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী অর্থাৎ কলেজের প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক এই দুইটি ক্লাস ছিল। যখন ইহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করা হয়, আশ্চর্যের বিষয়, তখন স্বল্প ব্যয়সাধ্য বি-এ ক্লাস খোলা হইল না; কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার সমধিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বি. এস-সি ক্লাস খোলা হইল। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থাও করা হইল। কিছুকাল পর ইহা পুরা-দস্তুর প্রথম শ্রেণীর কলেজে রূপান্তরিত হইল অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে বি-এ ক্লাসও যোগ করা হইল এবং ইকনমিক্সে অনার্সের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান—কোনটিরই প্রসার হইল না; অল্পকালের মধ্যেই অনার্স ক্লাস বন্ধ হইয়া গেল।

পরেশবাবু আসার পর এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, কলেজে বহু বিষয়ে অনার্স পড়াইবার অনুমোদন পাওয়া যায়, প্রত্যেক বিষয়েই নূতন নূতন শিক্ষক আসেন, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গ্রন্থে ও সাজসরঞ্জামে পরিপুষ্ট হয় এবং কলেজ আক্ষরিক অর্থেই মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়; সর্বত্র যেন একটা অপ্রত্যাশিত আলোক বিচ্ছুরিত হয়। আমার বন্ধু বিনয় দাশগুপ্ত বহুদিন অর্থবিভাগের সহকারী সচিব, ডেপুটি সচিব এবং প্রায় বছর-দশেক সচিব ছিল। সে বলিত যে স্বাধীনতার অভ্যাগমে শিক্ষাক্ষেত্রে 'অপব্যয়ার্থে' আমরা অনেক টাকা পাইয়া থাকি। দুই-চার জায়গায় অর্থের সদ্ব্যয়ও হইয়াছে।—মেদিনীপুরের লোকজনের কাছে যাহা শুনিয়াছি ও সরকারি সূত্রে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, এই সময়কার মেদিনীপুর কলেজ এই বিষয়ে অগ্রণী। যদিও বাঁধাধরা কোন বিধান দেওয়া হয় নাই, তবু এই সময়ে বহু ছাত্রই এখানে অনার্স লইয়া পড়িত এবং অনার্স পাস করার চেষ্টা করিত। এই বিষয়ে আমাদের একটু নিজস্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। ইংরেজির অধ্যাপকরা ছোট-বড় ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া বই খুঁজিতেন, আমাদের সঙ্গে পাঠ্যবস্তু-সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতেন। এই যে মান-উন্নয়নের প্রচেষ্টা, ইহাই পরেশবাবুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এবং এইখানেই তিনি অধ্যক্ষ জেমসের সঙ্গে তুলনীয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আবার প্রেসিডেন্সীতে

১

১৯৩৫ সালের মধ্যভাগে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইয়া আসিলাম। এইখানে আসিয়া যে বেতন বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। চৌদ্দ বছরের গর্ভযন্ত্রণার পর সরকারের প্রথম শ্রেণীর সার্ভিস বা কৃত্যক চালু হইল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকে উহাতে প্রমোশন পাইলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও হিরণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় সোমনাথ মৈত্র ও আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাকা হইলাম। সাত বৎসরের দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি হইল। আমরা বুড়োরা এই আমলের অনেক ব্যবস্থারই নিন্দা করিয়া থাকি। ইহা বার্ধক্যের পেশা, নেশা, সান্ত্বনা ও ব্যাধি। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে এই আমলে এইরূপ দুর্ভোগ প্রায় কাহাকেও ভুগিতে হয় না। আমরা পার পাইলাম বটে, কিন্তু আমাদের সহকর্মী শরীরতত্ত্ব বিভাগের শৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পারিলেন না। তাঁহার কথাটা পুনরায় তুলিতেছি এই কারণে যে, তিনি সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলেন যে অর্থদপ্তরের জনৈক 'নতুন-দা'—তিনি ডেপুটি নহেন, সিভিলিয়ান—এই বিচারমূঢ়তার জন্য দায়ী। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিলেও ইংরেজের সৃষ্ট এই আমলাতন্ত্র রহিয়া গেল এবং তাহার প্রধান হইলেন এই-সকল 'নতুন-দা'র দল। যাঁহার কথা শৌরীনবাবু বলিয়াছিলেন তিনি বহুদিন আমাদের মুখ্যসচিব ছিলেন। এই-সকল 'নতুন-দা' ক্লাইভের আমলের আমলাদের মত লোভী এবং কার্জনের আমলের আমলাদের মত সহৃদয়তাবর্জিত। স্বাধীনতার পর আমরা যে প্রত্যাশা ও আস্ফালনের তুলনায় অগ্রসর হইতে পারি নাই, তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজ চলিয়া গেলেও এই-সকল উচ্ছিষ্টদের আমাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছিল।

আমার নিজের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে আমি ডক্টরেট থীসিস দিই। তখন আমি পরস্পরবিরোধী উপদেশ পাই। বন্ধুবর পবিত্রকুমার বসু ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলে যে চাকুরির জন্য ইংরেজিতে থীসিস দিয়াছি উহাই যথেষ্ট; বিদেশী সাহিত্যে গবেষণামূলক রচনা করিতে গেলে মানসিক উৎকর্ষ বা পাঠক-সাধারণে প্রতিপত্তি, কোনটাই হইবে না। ভূতপূর্ব ছাত্র শৌরীন রায় তখন আমাদের বন্ধুপর্যায়ভুক্ত। সে আমাকে অন্যরূপ পরামর্শ দিল; তাহার মতে ইংরেজি সাহিত্যালোচনায়ই আমার মনোনিবেশ করা উচিত। আমি তখন দুইবন্ধুর কথাই শুনিয়াছিলাম, শৌরীনের কথা শুনি নাই। ইহার জন্য পরবর্তী জীবনে প্রতিদিন অনুতাপ বোধ করিয়াছি। প্রতিপত্তি কিসে কি হইয়াছে জানি না; কিন্তু মানসিক আনন্দ একান্ত নিজস্ব বস্তু। আমরা স্রষ্টা নই; আমরা যে অ-লৌকিক আনন্দ পাই তাহা উন্নত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আনন্দ। বাংলা সমালোচনা খুব অপরিণত। ইহা হাঁটিতে শিখিয়াছে ঈশ্বর গুপ্তের আমল হইতে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইহার পর কেহ কেহ ভাল সমালোচনা লিখিয়াছেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; রবীন্দ্রনাথকে এই ক্ষেত্রে না টানাই ভাল, কারণ সাহিত্য-পরিচয় দিতে যাইয়া তিনি যে-সকল উৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকারের সৃষ্টি। তিনি সমালোচনা নামক ডিসিপ্লিন বা চর্যার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। এই-সব কারণে

বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যে কোন ট্রাডিশন গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজিতে স্যার ফিলিপ সিডনীর কবিতার সমর্থনে নিবন্ধ (Apologie for Poetrie) প্রকাশিত হয় ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ; ইহা লিখিত হয় বোধ হয় তাহার বার বা পনের বছর আগে। ত্রুটি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও ইহা খুব উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ এবং ইহা আজও সর্বত্র পঠিত হইয়া থাকে। সিডনীর তুলনায় কোলরিজ (১৭৭২—১৮৩৪) আধুনিক, অথচ তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক। কোলরিজ আধুনিক সমালোচকদের অগ্রণী ; বোধ হয় বহুশ্রুত জর্জ সেন্টসবেরি ইঁহাকে পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের অন্যতম বলিয়াছেন। কোলরিজ কবিও ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বিচিত্রকর্মা হইলেন মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২)। তিনিও কোলরিজের মত কবি ও সমালোচক ছিলেন এবং উভয়েই সুবক্তা এবং সাহিত্যবিষয়ে বৈঠকী গল্পের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিতেন। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে মোহিতলালের খুব প্রতিপত্তি, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক মহলে ; হয়ত ইহার একটি কারণ মোহিতলাল অধ্যাপনা করিতেন এবং যতদূর শুনিয়াছি কোলরিজের মত ইনিও সাহিত্যবিষয়ক বৈঠকী গল্পে পটু ছিলেন। যাহা হউক, কোলরিজের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমি যে মোহিতলাল ও তাঁহার অনুগামীদের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিলাম ইহাতে আত্ম-প্রসাদ লাভ করি নাই আর আমার বন্ধুদের মধ্যে আমাকে ক্ষমা করেন নাই পণ্ডিতাগ্রগণ্য নির্মলচন্দ্র মৈত্র (N. C. M.)। তিনি আমার ইংরেজি রচনার আগ্রহী পাঠক এবং আমার বাংলা রচনা-সম্পর্কে তাঁহার তাচ্ছিল্য এত কঠোর যে তাহার আর পুনরুক্তি করিলাম না।

এই সময় আমি বাংলায় রবীন্দ্রনাথের উপর বই লিখি। 'শরৎপ্রতিভা' নামে পাঁচটি প্রবন্ধ-সম্বলিত যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষ হইয়া যায় এবং 'শরৎপ্রতিভা'-ই আয়তনে পরিপুষ্ট হইয়া 'শরৎচন্দ্র' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথমে এই দুই বই-ই আমি নিজে ছাপি এবং পুস্তকালয়ের মারফত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করি। এই-সব কাজে আমাকে সাহায্য করিত আমার ভাই বিমলচন্দ্র। ১৯৩৫—৩৬-এ যখন সেই বর্ধিত 'শরৎচন্দ্র' ছাপা হয়, তখন একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে যাহা আমাকে খুব প্রভাবিত করে। সেই কথাই এখানে উত্থাপন করিব : আর আমার আত্মকথায় 'স্যার' সর্বদাই আসিয়া পড়েন।

বিমল (সদানন্দ) ছাপাখানায় যে কাগজ কিনিয়া দিয়াছিল, বই মুদ্রণের পর দেখা যায় যে তাহার অল্পখানিকটা অংশ বাড়তি হইয়াছে। প্রেসই প্রস্তাব করে যে আমার জন্য ইংরেজিতে ও বাংলায় চিঠি প্রভৃতি লেখার প্যাড ছাপিয়া দিবে। যথারীতি আমার উপাধি-শোভিত নাম বাঁদিকে ছাপিয়া অনেকগুলি প্যাড লইয়া সদানন্দ বাড়িতে উপস্থিত হইল। সদানন্দ তখন একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সেলসম্যান ছিল ; পরে নিজেই ব্যবসায়ে নামে। দাদা সদ্য ডক্টরেট পাইয়াছে দেখিয়া কাহার কথায় জানি না, সে আমার উপাধিসম্বলিত Visiting Card-ও ছাপে, যদিও তাহা বড় একটা ব্যবহার করিতে হয় নাই। তখন আমি যে বাড়িটায় থাকিতাম তাহার মধ্যে আমার পড়ার ঘর ছিল তেতলায়, আর বৈঠকখানা ছিল একতলায়। একদিন স্যার আসিয়া সংবাদ দিলেন এবং আমি হন্তদন্ত হইয়া নীচে নামিয়া দেখি, তিনি চেয়ারে সমাসীন এবং তাঁহার দৃষ্টি নিবন্ধ ছাপান প্যাডের উপর। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'তোমাকে আবার—র রোগে পাইল কবে?' এই বলিয়া তাঁহার জনৈক পরম স্নেহভাজন, সুপণ্ডিত, সুপরিচিত ছাত্রের নাম করিলেন। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই স্যার সমঝাইয়া দিয়া বলিলেন, এই জাতীয় উপাধি-লেখা ছাপানো কাগজ professional

লোক অর্থাৎ উকিল, ডাক্তার, অ্যাকাউনটেন্ট প্রভৃতির পক্ষে শোভন এবং শিক্ষাজগতে উহা বেমানান।

আমি নতশিরে স্যারের মৃদু তিরস্কার গ্রহণ করিলাম এবং ইহার পর এই জাতীয় বাহাদুরি করিতে আর চেষ্টা করি নাই। আমি একটা গ্রাম্য স্কুলে পড়িতাম, যাহার চতুর্দিকে সবাই আমাকে লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিত। হয়ত সেইজন্যই নিজেকে জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল ; স্যার তাহাকে অবদমিত করিয়া খুব উপকার করিলেন। ইহার পর আত্মপ্রচারের ইচ্ছার উদয় হইলে অথবা সুযোগ আসিলে পিছাইয়া গিয়াছি এবং স্যারের সেদিনকার তিরস্কার আমার মনে আসিয়াছে। এই বিষয়ে ভাবিয়া আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। স্যার যে ভদ্রলোকের কথা তুলিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে পরে আমার বেশ পরিচয় হইয়াছে। দেখিয়াছি, তিনি খুব অমায়িক লোক। বাস্তবিকপক্ষে কোন ব্যবসায়ে যাঁহারা লিপ্ত নহেন, তাঁহারা যদি উপাধি প্রভৃতির জাঁক করেন অথবা যদি আত্মপ্রচারে ব্যগ্র হয়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহারা হয় ভিতরে ভিতরে অতি বিনয়ী অথবা হীনমন্যতা বা inferiority complex নামক মানসিক রোগে ভোগেন। এই বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি জাঁক করিয়া নিজের সংস্কৃতিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার নামোল্লেখ আর নাই করিলাম।

৩

আমার বার্ণার্ড শ' বিষয়ক গবেষণা-নিবন্ধ পরিশোধন ও পরিমার্জন করিয়া অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ছাপিতে দিই। থীসিস হিসাবে ইহার প্রথম খসড়া দেখিয়া দেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর উহার শেষ প্রুফ শুদ্ধ করিয়া দেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। মাঝখানে ইহা অনেকে দেখিয়াছিলেন—মায় বার্ণার্ড শ' নিজে। তিনি পেন্সিলে নানা মন্তব্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাহা বইয়ের সঙ্গে ছাপিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহারা শ'য়ের রচনা হইতে উদ্ধৃতির জন্য যে অনুমতি আনিয়াছিলেন, সেই অনুমতিবলে এই-সব লেখাও ছাপা যায় কিনা ইহা লইয়া সন্দেহ দেখা যায়। সেইজন্য ঐ অংশ ছাপা হইয়া গেলেও পরিত্যক্ত হয়।

এই বইটি বাহির হয় ১৯৩৬ সালের মধ্যভাগে। কিছুকালের মধ্যেই বিদেশী কাগজে ইহার রিভিয়ু আমাদের কাছে আসিতে থাকে। একবছর পরে ইহার বিক্রয়ের হিসাব পাইয়া আমি খুব কৃতার্থ হই এবং ইহার প্রচার দেখিয়া উপরি-উল্লেখিত শিক্ষকদ্বয় খুব পুলকিত হয়েন। ডক্টরেটের সংবাদ যখন বাহির হয় তখন আমি চাটগাঁয় ছিলাম। কি কারণে মনে নাই, তখন কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিবার দিনটা খুব মনে আছে। আমি অন্য-মনস্কভাবে চাটগাঁ মেল ধরিতে আসিয়া দেখি, স্যার গেটের কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন। প্রথমটা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারি নাই ; পরে বুঝিতে পারিলাম ইহা সাধারণ প্রত্যুদ্গমন নয় ; আমার সম্প্রতিলব্ধ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন। তিনি সেই প্রসঙ্গ তুলিলেন না, আমার তো তুলিবার কথাই উঠে না। তবে তাঁহার সেই দিনের শুভাগমনকে অকিঞ্চিৎকর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিলাম।

এই প্রসঙ্গে বিপরীত কোটির একটি অভিজ্ঞতা হয়, তাহাও প্রথমে তিক্ত-কষায় মনে হইত এবং পরে অবিমিশ্র মধুর রসে পরিণত হয়। আমি যখন ডক্টরেট পাই তখন অপূর্ব-কুমার চন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক। ইঁহার বিদ্যার পুঁজি যৎসামান্য, শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশী ডিগ্রিওয়ালাদের সম্পর্কে তিনি অনুকম্পা ও

অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্যের ভাব পোষণ করিতেন। অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষকে একটু খাতির করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যেও মুরুব্বিয়ানার স্পর্শ ছিল। শ্রীকুমারবাবু বোধ হয় ইঁহাকে আশানুরূপ সম্মান দেখান নাই। এইজন্য তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। শ্রীকুমারবাবুর ডক্টরেট পাওয়ায় একটু থমকিয়া গেলেও তিনি তেমন গ্রাহ্য করেন না, কারণ এদেশী ডিগ্রির উপর তাঁহার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ঐ থীসিস ছাপা হইলে পর টাইমস্ লিটেরেরি সাপ্লিমেন্ট (T.L.S.) ইহার বিরূপ সমালোচনা করে। সেই সময় চন্দসাহেবের কি উল্লাস! তখন মাইকের প্রচলন হয় নাই ; কাজেই চন্দসাহেব মুখে মুখে যতটা পারেন ইহাকে ফলাও করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। হারফোর্ড ও এলটন শ্রীকুমারবাবুর পরীক্ষক ছিলেন। আমাকে বলিলেন যে, হারফোর্ড ও এলটনের সাহিত্যবিচারের উপর তাঁহার কোন আস্থা নাই, যে ভঙ্গীতে এই মূল্যবান মন্তব্য করিলেন তাহাতে মনে হইল, হারফোর্ড ও এলটন চাকুরির প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাদের নাম সুপারিশ করিবেন না! সঙ্গে আর একটি মন্তব্যও জুড়িয়া দিলেন। সকলেই জানেন, সেই আমলে T.L.S.-এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কোন সমালোচকের নাম কখনও প্রকাশ করা হইত না। চন্দসাহেব বিজ্ঞের মত আমাকে বলিলেন যে T.L.S.-এ শ্রীকুমারবাবুর বইয়ের সমালোচনা করিয়াছেন ব্রেটস্মিথ। তিনি কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া এই গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, সেই প্রশ্ন অবান্তর। এই T.L.S, তখন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সমালোচনা-মাধ্যম এবং এই পত্রিকায় ও অন্যান্য অভিজাত গ্রন্থে বা বার্ষিকীতে—যখন আমার বইয়ের উচ্চ-প্রশংসা বাহির হইল, তখন এই মহাপুরুষ দমিয়া গেলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহভাজনের ভাষায় আমি তাঁহার সঙ্গে 'সমতা' রক্ষা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং তিনি পদাধিকার বলে আমাকে হেয় করিতে অনলস চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বিচিত্র সম্পর্কের কথা এই কাহিনীতে বারংবার উত্থাপিত হইবে। তাই এই অধ্যায়ে অধিক বলিব না।

১৯৩৭—৩৮ সালে আমার প্রথম ইংরেজি গ্রন্থের স্বীকৃতিতে আমি একটা নূতন আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইলাম। যতদূর মনে আছে, এই সময় আমি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে বই লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। সেই প্রসঙ্গে ইংরেজি নভেল-সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করিয়াছি এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের উন্নত মানের পড়াশোনার জন্য অধ্যাপককে প্রতিদিনই নিজ বিষয়ে প্রস্তুতিপর্বে অনেকটা সময় দিতে হয়। সুতরাং গবেষণার জন্য ইংরেজি চর্চা বিশেষ করি নাই। কিন্তু এই বইয়ের স্বীকৃতিতে নূতন আশ্বাস ও সাহসের সহিত আমার প্রথম গবেষণার বিষয় শেক্সপীয়রীয় কমেডি-সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করি। এই কাজটি সমাপ্ত করিতে আমার বেশ সময় লাগে। উপযুক্ত লোক পাইলে আমি সব সময়ই নিজের রচনা যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছি। আমার বার্ণার্ড শ'-সম্পর্কিত বইখানির তারকনাথ সেন প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে যে সমালোচনা করিয়াছিল, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের রচনা এবং ইহা পড়িয়া আমি চমৎকৃত হই। সেইজন্য তাহাকে উহা দেখিতে দিই। সে বেশ সময় চায় এবং খুব যত্নের সহিত এই কাজ সম্পাদন করে। হাতের কাছে তেমন কোন কাজ না থাকায় আমি এই সময় অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্যজিজ্ঞাসা পাঠ করি এবং হঠাৎ যেন নূতন জগতের সন্ধান পাই। আমার পরবর্তী সাহিত্যসাধনা বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের এবং সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা এখন হইতে নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

৪

চাটগাঁ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসি ১৯৩৫ সালে এবং ওখান হইতে ১৯৪২ সালে রাজশাহী বদলি হই। এই সময়ের মধ্যে পুরনো কলেজে অনেক নূতন সহকর্মীর সঙ্গে পরিচিত হই। দুই-একজন আগেই আসিয়া থাকিবেন। ইংরেজিবহির্ভূত বিষয়ে আসেন গণিতে জ্যোতির্ময় ঘোষ, রসায়নে কুদরত-ই-খোদা, অর্থনীতিতে যোগীশচন্দ্র সিংহ, ইতিহাসে সুশোভন সরকার। ইঁহারা সবাই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হয়েন। জ্যোতির্ময় ঘোষের সঙ্গে আমার পূর্বেই একটু যোগ ছিল ; এক সময়ে তিনি আমার সহাধ্যায়ী, বঙ্গের অন্যতম প্রধান ভূস্বামী হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর গৃহশিক্ষক ছিলেন। জ্যোতির্ময়বাবু আঙ্কিক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও সাহিত্যিক। গণিত ও হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার যোগ নাই, যদিও তিনি এক সময়ে আমাকেও তাঁহার রোগীদের গোষ্ঠীতে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। রসসাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তিনি স্মরণীয় এবং এই বিষয়ে তাঁহার রচনার আমি উৎসাহী পাঠক ও সহৃদয় সমালোচক ছিলাম। তাঁহার অনেক 'লেখা', যেমন 'বঙ্কিমের মৃত্যু' বঙ্গসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। আমার অর্থনীতি-বিষয়ের অজ্ঞতা গণিতের অজ্ঞতার মতই গভীর। সুতরাং যোগীশচন্দ্র সিংহের সঙ্গে আমার কখনও শাস্ত্রীয় আলাপ হয় নাই। অধ্যাপক কোয়াজি প্রেসিডেন্সী কলেজে অনেক খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াছেন ; সাধারণ্যে জনরব ছিল যে ঈশানস্কলার যোগীশচন্দ্র সিংহই তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন। যোগীশবাবুর সৌজন্য, সদালাপের মধুর স্মৃতি আজও জাগরূক আছে। কুদরত-ই-খোদা যখন কলেজে প্রবেশ করেন তখন বিজ্ঞানের ছাত্রেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিল এবং মনে হয় তিনি সেই প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে, অবস্থাবৈগুণ্যে এবং হয়ত কিছুটা স্বীয় প্রবর্তনায়, তিনি মুসলিম রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া যান ; তাহার ফলে কলেজের ক্ষতি হয় এবং তাঁহার নিজেরও যে লাভ হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। দেশবিভাগের পর দুই বঙ্গের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যে এপার হইতে ওপারের সংবাদ বড়-একটা পাওয়া যাইত না। তবে, মনে হয় যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মোহভঙ্গ হয় এবং তিনি পূর্ব-কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায় কিনা সেই সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এইসকল প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকদের মধ্যে সুশোভন সরকার সবচেয়ে বেশি স্মরণীয়। তিনি এক সময় এই কলেজের খুব প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার সেই প্রসিদ্ধি আরও বিস্তৃতিলাভ করে। এই শ্রেষ্ঠ কলেজের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকদের মধ্যে তিনি একজন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের ছাত্র না হইলেও ইতিহাসের প্রশ্ন লইয়া অনেক সময় ঐতিহাসিকদের দ্বারস্থ হইয়াছি। অধ্যাপক সরকারকে যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অবলীলাক্রমে তিনি সদুত্তর দিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রাবস্থায়ই হোম ও পরে স্টার্লিং অবসর গ্রহণ করেন। তখনই সাবেকী ধরনের লোকদের মুখে 'গেল' 'গেল' রব শোনা যাইতে লাগিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি পড়াইবার জন্য কোন সাহেব থাকিবে না—ইহা কি ভাবা যায়? অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অবসরের দিন যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই এই আক্ষেপ খুব সোচ্চার হইয়া পড়ে। শুধু যিনি কখনও এই কলেজে পড়েন নাই, তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার নাকি গভর্ণমেণ্ট ফাইলেই লিখিয়াছিলেন, 'But the man who is to be replaced is himself an Indian !' যাহা হউক বটমলি সাহেব বিলাত যাইয়া দুইজন 'সাহেব' নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন—বার্টলে ও পেরেরা। পেরেরা অবশ্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।

তবে তাঁহার খুব ভাল ডিগ্রি ছিল ; তিনি কেম্ব্রিজের দুই ভাগেই ফার্স্ট ক্লাস। আর ইঁহাদের আগে—অধ্যাপক ঘোষের কার্যকালের মধ্যেই—আসিয়াছিলেন হামফ্রি হাউস (Humphry House)। ইঁহারা কেহই এই কলেজে বেশিদিন ছিলেন না। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজি পড়াইতে ইংরেজনিয়োগের ব্যবস্থা রহিত হইল। সেইজন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলিতে চাই।

হাউস সাহেবের ডিগ্রি ছিল খুব ভাল। তিনি ক্লাসিক্সে অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস ; ইহাকে বলা হয় Greats এবং এইভাবেই বলা যায় ইহার মাহাত্ম্য স্বশব্দনিবেদিত। ইহা ছাড়া ইতিহাসেও তাঁহার ডিগ্রি ছিল। আমার শিক্ষক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত হাউস সাহেবেরও অক্সফোর্ডের ইংরেজি ডিগ্রির উপর খুব একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। স্যারের কাছে শুনিয়াছি, অধ্যাপক নিয়োগের একটা কমিটিতে হাউস নাকি বলিয়াছিলেন, 'The sooner the English School at Oxford is abolished, the better'. (অক্সফোর্ডে ইংরেজি পড়ান যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তত ভাল)। স্বদেশে যাইয়া কিন্তু তিনি ইংরেজি বিভাগেরই লেকচারার নিযুক্ত হয়েন এবং মৃত্যুর সময় ঐ বিভাগেই সিনিয়র লেকচারার ছিলেন। যে ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, হাউস তাঁহারই খুব বিরোধী ছিলেন। বোধ হয় স্বদেশে থাকিতে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্বরূপ তিনি আন্দাজ করিতে পারেন নাই। চাকুরি ত্যাগ করিতে হইলে ছয় মাসের নোটিশ দেওয়ার কথা, মাসখানেক কাজ করার পরই তিনি ছয়মাসের নোটিশ দিলেন এবং কর্মত্যাগ করিলেন। তারপর তিনি রিপন কলেজে স্বল্পবেতনে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়েও লেকচার দিতেন। তারপর দেশে যাইয়া অক্সফোর্ডে লেকচারার হয়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রণাঙ্গনেই আহত হইয়াছিলেন ; ঠিক সহজভাবে নাকি আর হাঁটিতে পারিতেন না। ইহা তেমন কিছু নয়। কিছুকাল পরে হঠাৎ (বোধ হয় হার্ট ফেল করিয়া) মারা যান। আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না জন্মিলেও আমি তাঁহার খুব কাছাকাছি আসিয়াছিলাম। লোকটি সব দিক দিয়া সজ্জন। চালচলনে কোথাও আত্মম্ভরিতা ছিল না। এদেশের সাহেব রাজপুরুষদের প্রতি তাঁহার বিরূপতা ছিল এবং পুলিশ তাঁহার পিছনে গোয়েন্দা লাগাইয়াছিল।

লেখাপড়ার দিক দিয়া হাউস যোগ্য লোক হইলেও তাঁহার বিদ্যাবত্তায় এবং বিদ্যাচর্চায় একটা ত্রুটি আমাকে পীড়া দিত। তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট ছিলেন। যখন অক্সফোর্ডের ডিগ্রি লইয়া এখানে-ওখানে কাজ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বছর তিরিশ। কিন্তু তখনই তাঁহার সঙ্গে লেখাপড়ার আলাপ-আলোচনায় মনে হইত, তাঁহার নূতন-কিছু জানিবার থাকিলেও, নূতন-কিছু বুঝিবার নাই। তাঁহার রুদ্ধদুয়ার মনের সংকীর্ণতার জন্য আমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় প্রলুব্ধ হইতাম না। এই প্রসঙ্গে আমার শিক্ষক জ্যাকেরিয়া সাহেবের কথাও মনে হইত। জ্যাকেরিয়া খুব সুন্দর পড়াইতেন ; কিন্তু তাঁহার নৈপুণ্য অধীতবিদ্যাকে সাজাইয়া গুছাইয়া পরিবেশনে সীমাবদ্ধ ছিল ; তাহা জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে না। আমি একবার সরকারের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট লিখিয়াছিলাম। আমার পূর্ববর্তী রিপোর্টের লেখক ছিলেন জ্যাকেরিয়া। সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সেই রিপোর্টটি অপূর্ব বস্তু ; তাহার প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফ অতিশয় সুলিখিত, কিন্তু সমস্ত রিপোর্টটির কোন উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেকটি প্যারায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতির কথা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয় তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কে কিছুই বলিবার নাই। ইহার কিছুকাল পূর্বে তিনি হুগলী কলেজের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

তাহা পড়িয়া আমাদের স্যারের একটি মন্তব্য মনে পড়িল। সিণ্ডিকেটের জনৈক প্রবীণ সদস্যের বক্তৃতা স্যার এইভাবে সংক্ষেপে করিতেন : 'To-day is Friday ; to-morrow will be Saturday, and the day after to-morrow, gentleman, I have no doubt will be Sunday.'

হাউসের প্রথম গ্রন্থ Notebooks of G. M. Hopkins ; ইহার একখণ্ড তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। ঠিক উপহার বলা যায় না, আমি তাঁহাকে মৎপ্রণীত The Art of Bernard Shaw একখানা দিয়াছিলাম, তাহারই প্রতিদান। আমি পড়িবার পূর্বেই ঐ মূল্যবান গ্রন্থ আমার বাড়ি হইতে উধাও হয়। যতদূর মনে আছে, হাউস উহার সংগ্রাহক ও সম্পাদক মাত্র। পরে হাউস চলিয়া গেলে তাঁহার দুইখানা বই আমি কিনিয়া পড়িয়াছি : The Dickens World আর Aristotle's Poetics। শেষোক্ত বইখানি অক্সফোর্ডের বক্তৃতা ; তাঁহার মৃত্যুর পর সহকর্মী কলিন স্টিল প্রকাশ করিয়াছেন। ডিকেন্স বড় ঔপন্যাসিক ; কেহ কেহ মনে করেন—প্রতিভার বিপুলতায় তিনি শেক্সপীয়রের সমগোত্রীয়। কিন্তু হাউসের বইতে ডিকেন্সের উপন্যাসের সামাজিক পটভূমিকা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সাহিত্য-বিচার নাই। ডিকেন্সকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এই জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ইহা ঠিক সাহিত্যবিচার নয়। এই দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার অ্যারিস্টটল-সম্পর্কিত গ্রন্থ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ে আমারও কৌতূহল আছে এবং নিজেও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ঠিক এই বিষয়ে একখানা গ্রন্থও লিখিয়াছি। হাউস গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে সুপণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞের দাবি লইয়াই তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইয়াছে, তাঁহার পাণ্ডিত্য কোন সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই জাতীয় বৈদগ্ধ্য দেখিয়া আমার ওমর-খৈয়ম-ফিটজেরাল্ডের একটি স্তবক মনে পড়ে :

> Myself when young did eagerly frequent
> Doctor and Saint and heard great argument
> About it and about, but came out,
> By the same door as in I went.
>
> (কতই না সে মাড়িয়ে আসা পণ্ডিতদের টোলের দোর
> বয়স তখন নেহাৎ কাঁচা—কাজটা শোনা তর্ক ঘোর ;
> বিচার-ঘটে বিশ্ব পোরা—মুণ্ডমাথা নাইক যার—
> তর্ক-ধাঁধার ফিরতি-দুয়ার ঠিক যেথা তার প্রবেশদ্বার॥—
>
> —কান্তি ঘোষ)

আমি অক্সফোর্ডে পড়ি নাই ; ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। আমার মতের কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না এবং দুই-একজনকে দেখিয়া কোন সাধারণ মন্তব্য করা উচিত হইবে না। তবু এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে হইয়াছে। দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার ('Space, Time and Deity'-র গ্রন্থকার) অক্সফোর্ডের গৌরব ; তিনিও গ্রেটসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষক এ. সি. ব্র্যাডলী অক্সফোর্ডের আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন : 'atmosphere of everything being known and nothing mattering'. আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

পরে যে আর দুইজন আসিয়াছিলেন—বার্টলে ও পেরেরা—তাঁহারা অনেক সাদামাটা ধরনের লোক। বার্টলে বোধ হয় বেলফাস্টের এম-এ এবং এক সময় এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে বোম্বাইতে ছিলেন। তাঁহার মোটামুটি বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কিন্তু এখানে যেন সুবিধা করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ নাগরিক হিসাবে তাঁহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, যুদ্ধশেষে তিনি আর ভারতে আসেন নাই ; স্বদেশ হইতেই এখানকার কাজে ইস্তফা দেন। পেরেরাও এখানকার অধ্যাপনাকার্যে খুব সুখী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ভারতবাসী ; তাঁহার পক্ষে চাকুরিতে স্থায়িত্বলাভই প্রধান কাম্য। তখন মুসলিম লীগের প্রাধান্য। যেখানে সব ছাত্রই মুসলমান, সেই ইস্লামিয়া কলেজে তিনি চলিয়া গেলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া গেলেন, না কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পাঠাইলেন বলিতে পারি না। কিন্তু ইঁহাদের নিয়োগ লইয়া প্রথমেই আইনসভায় কথা কাটাকাটি হইয়াছিল এবং পেরেরার সপক্ষে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান নেতা গিডনী পত্রিকায় চিঠি দিয়াছিলেন। এই পটভূমিকায় পেরেরা মনে করিয়া থাকিবেন যে ইস্লামিয়া কলেজে তিনি নিরুপদ্রবে কাজ করিতে পারিবেন। এইভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহেব আনিয়া ইংরেজি পড়াইবার অভিযানের গৌরবহীন পরিসমাপ্তি হইল।

ইহার অনেক পরে পেরেরাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান হইল। ঐ পদটি নাকি আইনত আমারই পাওনা ছিল এবং ইহা লইয়া অনেক জায়গায়ই অনেক আলোচনা হয়। কেহ কেহ আমাকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিতে বলিল, মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে তদ্বিরের পরামর্শও দিল ; আমার কোন কোন শুভানুধ্যায়ী ভয় পাইলেন —আমি রাগ করিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া না ফেলি। অবশ্য ঐরকম কোন চিন্তার বাষ্পও আমার মনে উদিত হয় নাই। ইহা বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য নহে, উপেক্ষা। উপরে যাঁহাদের কথা লিখিলাম, আমাদের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অধ্যাপক নিযুক্ত করাই বড় অবিচার বা অপরাধ। তাহার পর অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ একটা তুচ্ছ ব্যাপার, আবার এই আদেশ দিবেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—যাঁহার প্রতি আমার তিলমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

যাহা হউক, এই ব্যাপারটার একটা করুণ-মধুর দিক আছে যাহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব। পেরেরা খুব নিরীহ, সাদাসিধে লোক ছিলেন। প্রথমটা তিনি আমাকে একটু এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতায় তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ইহার মধ্যে একবার ক্যাশ হইতে টাকা অন্তর্ধান ধরা পড়িল, জনৈক বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত চলিল, লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত প্রফেসর তারকনাথ সেনের সঙ্গে তাঁহার ছোটখাট মসীযুদ্ধ আরম্ভ হইল ; আর যেখানে কলমই অস্ত্র, সেখানে তারকনাথ সেনের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা কঠিন। সাহেব প্রথমে আমার পরামর্শ লইলেন, তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রধান কাজ হইল সহি করা। ইহার পর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অল্প সময়ের জন্য একতলায় রসায়ন বিভাগের প্রধানের ঘরে বসিয়া কাগজপত্র সই করিয়া চলিয়া যাইতেন। পরে ইহাও সম্ভব হইল না ; ছুটিতে গেলেন এবং ছুটিতে থাকা অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁহার স্ত্রী আমার সঙ্গে বার-দুই দেখা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একখানা খাতা দেখান। শেষের দিকে পেরেরা সাহেবকে কথা বলিতে দেওয়া হইত না। ঐ খাতায় তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া দিতেন। তাঁহার শেষ লেখা শুধু S. C. Sengupta—। হয়ত আমার কাছে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আর লিখিতে পারেন নাই। সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শেষ নির্দেশ বা অনুরোধ আমি পাই নাই, কিন্তু এই আকুতি আমার মনে গাঁথা হইয়া আছে।

৫

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কেহ কেহ শুধু ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়া বিজ্ঞানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যেহেতু এই কলেজে টিউটোরিয়েলের ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেই কারণে আমি ইহাদের সংস্পর্শেও আসিয়াছি এবং আমার বুদ্ধি অনুসারে ইহাদের মেধারও বিচার করিতে পারিয়াছি, বিশেষ করিয়া ইহাদের সাহিত্যের উপর অধিকারের। এইরকম দুইটি ছেলের নাম মনে পড়িতেছে—হেমচন্দ্র দত্ত ও আশগর আলি। হেম হাকিমি চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন কি একটা ব্যাপারে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম সেই দীপ্ত আর নাই। আশগর আলি নাকি রসায়নবিদ্যায়ও খুব পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। যতদূর মনে আছে সে বর্ধমানের কোন গ্রামের স্কুল হইতে আসিয়াছিল ; তখন পর্যন্ত কোন সাহেব বা বিলাতফেরতের কাছে পড়ে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজিতে চারটি পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার আটজন পরীক্ষক। আটজনের কাছেই সে প্রথম হইয়াছিল।

আর একটি ছাত্র আমাকে বিস্মিত করিয়াছে অন্যভাবে। এই ছেলেটি ইংরেজিতে খুব ভাল ছিল। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তৃতীয় পত্রই হইবে—ইহার বিষয় ইংরেজি মৌলিক রচনা। প্রধান পরীক্ষক আমার শিক্ষক কুমুদবন্ধু রায়। কি কারণে একদিন তাঁহার কাছে গিয়াছি—বড় খাতায় নম্বর তোলা হইতেছে, তাহার মধ্যে রোল-নম্বরসহ নামও থাকে। সেই খাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের নাম ও নম্বর লিখিত আছে। আমার সুপরিচিত একটি ভাল ছেলের সাফল্যে খুব বেশি আনন্দিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, সে ইংরেজি অনার্স পড়িবে, কিন্তু তাহা পড়িল না। বেশ কিছুকাল পরে একদিন গড়ের মাঠে তাহার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন সে কি করিতেছে ; উত্তর পাইলাম, আর্ট শিখিতেছে। মনটা দমিয়া গেল ; এমন মেধাবী ছেলের এই দুর্মতি! ইহার নাম সত্যজিৎ রায়। বলিহারি আমার মাস্টারি বুদ্ধির!

প্রেসিডেন্সী কলেজের পড়াশোনা অনার্সভিত্তিক। আমরা যখন পড়িয়াছি তখন হিন্দু হস্টেলে এম-এ ক্লাসের বহু ছাত্র থাকিত এবং এম-এ ক্লাসেও সেমিনার টিউটোরিয়েল প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের কলেজের সঙ্গে খানিকটা যোগ থাকিত। কিন্তু আমি বলিতেছি তাহারও বছর-দশেক পরের কথা। তখন ক্রমশঃ এম-এ ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কাহারও কাহারও সঙ্গে যে সম্পর্ক রক্ষিত হইল তাহা অনেকটা আকস্মিক রকমের। আমার প্রথম দিকের দুইটি ছাত্রের কথা বলিব। প্রথমে বরেন্দ্রপ্রসাদ রায়। সে ১৯৩৪ সালে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে পাস করে এবং পরে সলিসিটর হিসাবে প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করে। যতদূর মনে আছে তাহার এম-এ পরীক্ষা লইয়াই একটা মজার ব্যাপার ঘটে। যদুনাথ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ; তিনি এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে রেকর্ড নম্বর পাইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ কথা পড়িয়াছি। ১৯২৬—২৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। সেই সময় জনৈক অধ্যাপক একটি পুস্তিকা লেখেন—Our Vice-Chancellor and The King's English। গ্রন্থকার যদুনাথ সরকারের গ্রন্থাবলী হইতে ইংরেজি ভুলের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিকৃত বুদ্ধির এই কেরামতি বিরোধী পক্ষে বেশ একটা উল্লাসের সঞ্চার করিল। এই অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে চাকুরি পাইলেন এবং এম-এ রচনাপত্রের পরীক্ষক হইলেন। আমি বোধ হয় তখন কোনক্রমে মাধ্যমিকের পরীক্ষক হইয়াছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। তবে ইহা সকলেই জানেন যে শেক্সপীয়র, মিল্টন, কীটস্

প্রভৃতি কবিদের অনেক কথা এত চালু হইয়া গিয়াছে যে, সব সময় লোকে সেইসব উদ্ধৃতিতে কোটেশন চিহ্ন দেয় না। ছেলেরা এই অপরাধ করিয়াছিল ; এই ভদ্রলোক ছেলেদের রচনায় যে-সব অশুদ্ধি দেখিলেন, তাহার জন্য শাস্তি দিলেন এবং শেক্সপীয়র, কীটস্ প্রভৃতির যে-সব উদ্ধৃতি ছিল তাহারও ব্যাকরণ ও ইডিয়মের ভুলও শোধিত হইল! অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা কেমন করিয়া ইঁহার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল বলিতে পারি না, তবে বরেন্দ্রপ্রসাদ যে রক্ষা পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উতরাইয়া গিয়াছিল ইহা মনে আছে। ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারবাহাদুর হঠাৎ একটা আইন দেখাইয়া আমার পেন্‌শন বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার বন্ধু করুণাকুমার হাজরা—সেও তখন অবসরপ্রাপ্ত—অনেক তদ্বির-তদারক করিল, কিন্তু অর্থদপ্তর নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু। তারপর বাধ্য হইয়া বরেন্দ্রপ্রসাদ ও তাহার সহাধ্যায়ী আমার শিক্ষক বিনয়কুমার সেনের পুত্র প্রাণবল্লভ ও অ্যাডভোকেট সোমেন বসু মহাশয়কে দিয়া ২২৬ ধারায় মামলা রুজু করিয়া দিলাম। হাইকোর্ট হইতে নোটিশ বাহির হইল। সাতদিনের মধ্যে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট 'থুড়ি' বলিয়া আপত্তি তুলিয়া লইলেন। বরেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রাণবল্লভকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লজ্জা দিই নাই। সোমেন বসু মহাশয়ের বদান্যতা উল্লেখ না করিলে পাপ হইবে। তাঁহার দক্ষিণা তিনি নিজেই স্থির করিয়া লইলেন—মৎপ্রণীত এবং আমার স্বাক্ষর-সম্বলিত একখণ্ড The Art of Bernard Shaw।

এই আমলের আর একটি ভাল ছাত্র অর্ধেন্দু বক্সী। সে বি-এ ক্লাসে ইংরেজি অনার্স পড়িত এবং তাহার মেধা ও অভিনিবেশে আমি প্রীত হইয়াছিলাম। আমি যখন চাটগাঁ চলিয়া যাই, তখন সে কলেজ পত্রিকার সম্পাদক হয় এবং আমি উহার প্রাক্তন সম্পাদক ও নিয়মিত লেখক। এই কারণে একটু যোগাযোগ ছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দেখি পরীক্ষাগৃহে—আমি নজরদার, আর সে পরীক্ষার্থী। সে অডিট সার্ভিস পাইয়া ধাপে ধাপে উন্নতিলাভ করে এবং পরে ঐ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়। তাহার পদের নামও গালভরা—The Comptroller and Auditor-General of India. ইহা বোধ হয় সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের সমপর্যায়ের চাকুরি। মানসিক সংযোগ থাকিলেও দেখা-শোনা বড় একটা হইত না। বুড়োকালে পেন্‌শন লইয়া নানা ঝামেলা পোহাইতে হইত। ব্যাংকের মারফত পেন্‌শন লই ; কিন্তু বাটীর সংলগ্ন ব্যাংকে যাইয়া আমি (এবং অন্যান্য পেন্‌শনভোগীরা) নির্দিষ্ট দিনে পেন্‌শন পাই না ; ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত পত্রবাহক কেবলই বলে—নির্দিষ্ট দিন পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাসের পেন্‌শন মাসে পাওয়াই মুশকিল। আমি অর্ধেন্দুকে সংক্ষেপে আমাদের দুর্দশার কথা লিখিয়া এই বলিয়া উপসংহার করি যে বড়সাহেব যদি এইভাবেই তাহার নিজের ডিপার্টমেন্ট 'কন্ট্রোল' করে, তাহা হইলে তাহার অন্ততঃ চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ার সুমতি হওয়া উচিত। ইহার ঠিক তিনদিন পরে কলিকাতার অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল আমাকে ফোন করিয়া বলিলেন যে আমার পেন্‌শন তো দেওয়া হইয়াছে! এইরূপ তাহাদের খাতায় লিখিত আছে। আমি সব কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কি ডবল খাতা রাখেন? তারপর বৈকালে তাঁহার অগমতা স্বীকার এবং সন্ধ্যায় তাঁহার সহকারীর আমার বাড়িতে আগমন ইত্যাদি। সবচেয়ে সুন্দর টিপ্পনী করিল ব্যাংকের কাগজপত্রের বাহক—ইহার ঠিক দুই দিন পরে। 'স্যার, আপনি একেবারে ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি দিয়াছিলেন! অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেলের অফিসে তো তোলপাড়!' জনান্তিকে একজন কর্মচারী আমাকে বলিলেন, 'অনাথের এখন ওখানে খুব খাতির ; গেলেই তাহাকে চেয়ার আগাইয়া দেয়।'

এইসব গল্প ছাড়িয়া দিয়া এখন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে-সকল ছাত্রের সঙ্গে আমার নিবিড় সংযোগ হয় তাহাদের সম্পর্কে দুই-চার কথা বলিব। চাটগাঁ হইতে আসার পর আমি

কাজে অধিক উৎসাহ বোধ করি এবং নিজের থীসিস ও প্রকাশিত গ্রন্থের সাফল্য আমার মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। প্রথমেই যাহার সঙ্গে নৈকট্য হয় তাহার ইতিহাসে একটু বৈচিত্র্য আছে। সে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া আই. সি. এস. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় এবং নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আবার শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যাপনায় চলিয়া আসিয়াছে। সে এক সময় আদমসুমারির সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিল ; তাহা হইতে বোধ হয় সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহার নাম অশোক মিত্র। স্যার এই সময় চাকুরিতে আছেন। তিনি পুনরায় আমাকে অনার্স টিউটোরিয়েলের ভার দেন এবং যাহারা টিউটোরিয়েল করিত না, তাহারাও লেখাপড়ার কাজে আমার সান্নিধ্যে আসিত, যেমন অলক গুপ্ত। সে এম-এ'তে যে গবেষণানিবন্ধ দাখিল করে তাহা লিখিবার পূর্বে আমার সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করিত। তাহার সহাধ্যায়ী সদানন্দ চক্রবর্তীও আমার নিকট-সংস্পর্শে আসে। রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে একজন যোগ্য ইংরেজির লেকচারারের নাম সুপারিশ করিতে বলেন। অলক থীসিস দিয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করিয়াছিল ; আর সদানন্দ প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছিল। অলক মেধাবী ও সাহিত্য-রসিক। আমি তাহাকে সদানন্দ অপেক্ষা ন্যূন মনে করিতাম না। সুতরাং আমি দুই জনের কথাই লিখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু অলক সরিয়া দাঁড়াইল ; সে বলিল যে প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণী যদি তুল্যমূল্যই হইবে, তবে এই শ্রেণীবিভাগ থাকিবে কেন? ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে সেই মহাপুরুষকে যিনি তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে 'graduate of great academic distinction' বলিয়া চালাইয়াছিলেন। অলকও আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরূপে অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু এখনও তাঁহার সাহিত্য-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও দেখা হইলে সে আমার কাছে এলিয়টের Four Quartets পড়িতে চায়, কিন্তু তাহার আগ্রহ থাকিলেও আমার এই বিষয়ে অধিকার নাই বলিয়া অগ্রসর হই নাই।

সদানন্দ রাজশাহীতে চাকুরি পাওয়ার কিছুকাল পর আমি ঐ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ হইয়া বদলি হই। ওখানে যে চারবছর ছিলাম, সদানন্দের তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধ ও ভাষাজ্ঞান আমার উপকারে আসিয়াছে। এই সময় আমি ইংরেজি যাহা-কিছু লিখিয়াছি সদানন্দ দেখিয়া দিয়াছে। তাহাকে বলিতাম, ছাত্রদের রচনা যেভাবে শুদ্ধ করে সে সেইভাবে আমার রচনা দেখিয়া দিবে। সে সবিনয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করিত এবং আমি তাহার অন্তর্দৃষ্টিতে বিস্মিত হইতাম। ইহার পর অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের কল্যাণে আমার ইংরেজি রচনা কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করে। তখন এত বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই। এত সেমিনার কনফারেন্স প্রভৃতির রেওয়াজ হয় নাই। তবু পরীক্ষণ, অধ্যাপক-নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে এখানে-ওখানে আমার ডাক পড়িত। এই সময়ই কলিকাতার প্রকাশক অমিয় মুখার্জি আমার তত্ত্বাবধানে শেক্সপীয়রের নাটকের সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বইগুলির ভূমিকায় আমি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতাম যে আমার নির্দেশনায় অন্য কোন শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞ এক-একটি বই সম্পাদনা করিয়াছে। এই গ্রন্থ-মালায় Macbeth সম্পাদনা করে সদানন্দ। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ছাত্রদের জন্যই এই বইগুলি লিখিত হইত, তবু কলিকাতার বাহিরেও ইহাদের অল্পাধিক প্রচলন ছিল। একাধিক জায়গায় এই Macbeth সম্পাদনার জন্য আমি অভিনন্দিত হইয়াছি এবং অন্ততঃ দুই জায়গায়—যতদূর মনে আছে, মাদ্রাজ ও নাগপুরে—যাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই যে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও

টিপ্পনী আমার রচনা নয়। বলা বাহুল্য, আমার উপরে এই ভ্রান্ত আস্থার মধ্য দিয়া আমি ছাত্রের মনীষার স্বীকৃতিতে গর্ববোধ করিয়াছি।

ইহাদের পরবর্তী আরও কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে সংস্পর্শ আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। শৈলেন সেন শেক্সপীয়র-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছে। তবে তাহার ও আমার গবেষণার বিষয় ভিন্ন। ইহাদের সঙ্গে আই-এ ও বি-এ অনার্সে প্রথম হইয়াছিল প্রভাতকুমার ঘোষ। সে এখন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মুদ্রক, Printer ; সে শুধু মুদ্রক নহে, সম্পাদকও বটে। তাহার প্রধান খদ্দের এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ও ক্ল্যারেন্ডন প্রেস। ঐ প্রেসের এক বিশেষজ্ঞ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে এই জাতীয় লোকের সঙ্গে দেখা হইবে তাহা তিনি পূর্বে আন্দাজ করিতে পারেন নাই। অক্সফোর্ড প্রেসের বই তো বটেই, আমার অন্য প্রকাশকের প্রকাশিত বইও এই প্রেসে ছাপা হইয়াছে। প্রভাত যখন এই কাজে হাত দেয় তখন আমার রচনার বাহুল্য, অসম্পূর্ণতা, বাগাড়ম্বর, পুনরুক্তি, অসঙ্গতি, ব্যাকরণ ও ইডিয়মে ত্রুটি, মায় কমা-সেমিকোলনের অপপ্রয়োগ সে এমন তন্ন-তন্ন করিয়া দেখে যে আমি উৎকণ্ঠায়, বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া থাকি। একদিন ছদ্ম-বিরক্তিতে বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার লেখা যেমন করিয়া তুলোধোনা কর, তাহাতে মনে হয় তোমার নাম পি. কে. ঘোষ না হইয়া পি. সি. ঘোষ হওয়া উচিত।' এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রভাতরাই স্যারের শেষ বৎসরের ছাত্র। প্রভাত আমার মন্তব্য শুনিয়া বলিল, ইহা সার্টিফিকেট আকারে লিখিয়া দিতে হইবে। ইহা লিখিয়াই তাহার প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

প্রভাতের সঙ্গে বি-এ'তে দ্বিতীয় হইয়াছিল অমল। ইহারা কেহই সময়মত এম-এ দেয় নাই ; আবার পরে দিয়াছিল এক বছরেই। এবার অমল ফার্স্ট হইয়াছিল। সে প্রবেশিকা বা মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ইংরেজিতে প্রথম হইয়াছিল। সে যখন বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয় তখন শিবপুরে সরকারী ডাক্তার পিতার কাছে থাকিত। কেন আমাকে বাছিয়া লইয়াছিল জানি না, ছুটির দিনে সে আমার কাছে রচনা দেখাইতে আসিত ; তারপর কলেজের টিউটোরিয়েল তো আমারই জিম্মায় ছিল। অমলের ইংরেজি ভাষার উপর অধিকার আমাদের অনেক শিক্ষককেই আকৃষ্ট করে। উহারা এম-এ পড়ার সময়, আমাদের সঙ্গে উহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। পরে জানিতে পারি ইহার মধ্যে সে মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং 'স্যাটারডে মেল' নামক কাগজে সে কিছুদিন সাংবাদিকতা করিয়াছে। দেশবিভাগের পর কিছুদিন আমার হাতে চাকুরির সুপারিশ করার ক্ষমতা আসে। সেই সূত্রে অমলকে আমি প্রথমে কৃষ্ণনগরে চাকুরি ঠিক করিয়া দিই। কিছুদিন পরেই সে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসে এবং সেইখানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করে। অবসর গ্রহণের বেশ কিছুকাল আগে অকালে যখন তাহার মৃত্যু হয়, সে তখন ঐ কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক। অমল আমার কাছে কিছু শিখিয়াছিল কিনা জানি না ; কিন্তু আমি তাহার নিকট হইতে অনেক-কিছু পাইয়াছি। আমি সাহিত্যের অধ্যাপক ও সমালোচক এবং সাহিত্যতত্ত্বে জিজ্ঞাসা আমার পঠনপাঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মার্কস্‌বাদ ও মার্কস্‌বাদীদের সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্ক অমলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে এই বিষয়ে পাঠ্য বইয়ের তালিকা করিয়া দেয় এবং তাহার নিজের সংগ্রহ হইতে অনেক বই পড়িতে দেয়। সেই বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখা যায় কিরূপ নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারে এই-সকল বই সে নিজে অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার বহু দাগ দেওয়া Das Kapital আমি শুধু পড়ি নাই, উহা হারাইয়াও ফেলিয়াছে। ইহার পর আমার উপর এম-এ ক্লাসে আধুনিক ইংরেজি কবিতা (হপকিন্স হইতে ডিলান টমাস) পড়াইবার ভার পড়ে। আমি আবার তাহার সাহায্য লই এবং যেখানেই

ব্যাখ্যা করিতে আটকাইয়া যাইতাম, সে অনায়াসে আমার অনুপপত্তির নিরসন করিয়া দিত।

মার্কসীয় দর্শন মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে যাইয়া শৃঙ্খলরচনার আদিম ইতিহাসে চলিয়া যায়। তাই সে অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তরালে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব প্রভৃতির রহস্য ভেদ করিতে চায়। এইজন্য মার্কসপন্থী হউন আর না হউন, আধুনিক কবিরা ফ্রেজার (Frazer) ও জেন হ্যারিসন প্রভৃতির গবেষণার মধ্যে প্রেরণা খোঁজেন। অমলের সেই ঝোঁক ছিল এবং তাহার পরিচালনায় আমিও এই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অবগাহন করিয়াছি। অমল তো ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে লাটিন আয়ত্ত করিয়া ফেলে এরং গ্রীক কিংবদন্তী ভাল করিয়া জানিবার জন্য মূল গ্রীক ভাষায় গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। অমলের কাছে আমার ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি, কিন্তু তবু বলিব তাহার পথ ও আমার পথ এক নহে। আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যের আস্বাদ অ-লৌকিক, তাহা বাস্তবকে আশ্রয় করে, বাস্তব আধারের উপর তাহার স্বরূপ নির্ভর করে, কিন্তু এই স্বরূপ আধারকে অতিক্রম করিয়াই নিজের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এইখানে এই বিতর্ক আর বাড়াইতে চাই না।

ইহাদের সমসাময়িক আর একটি ছাত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী ছেলেটিকে দেখিলে মনে হইত যে সে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। তাহাকে ছেলেরা বলিত মানু, কলেজের খাতায় তাহার নাম সিদ্ধার্থ এবং এখন শুনি সিদ্ধার্থশংকর রায়। দেশবন্ধুর দৌহিত্র বলিয়া তাহাকে সবাই চিনিত, কিন্তু কোনরূপ আভিজাত্যের সে ধার ধারিত না। পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না, কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিত। তাহাকে কলেজে অনেক সময় ফুটবল হাতে দেখিতাম, কিন্তু তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল ক্রিকেটে। এই সদাপ্রফুল্ল, দীপ্তচক্ষু ছেলেটির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয় এবং সেই মানসিক নৈকট্য এখনও আছে। আমার মনে হয়, কৈশোরের সরলতা ও চঞ্চলতা আজও তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

অনুমান করি সিদ্ধার্থশংকর রায় তাহার বিক্রমপুরের পিত্রালয় ও মাতুলালয় কোনদিন দেখে নাই। কিন্তু উভয় গ্রামই আমাদের দেশের বাড়ির কাছে এবং সেই হিসাবেও তাহাকে কাছের মানুষ বলিযা মনে হয়। ইহাদের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে গ্রামের সম্বন্ধসূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। তাহার নাম অমলেন্দু দাশগুপ্ত। তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় বেশ কিছুদিন পর। সুতরাং তাহার কথা এখানে আর তুলিব না। এই-সকল ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় ও নৈকট্যকে আমি সম্পদ বলিয়া মনে করি। সকলের কথা বলা সম্ভব নয়, কারণ অন্য দিকে দরিদ্র হইলেও এইখানে আমি পুঁজিপতি।

৬

এই সময়ে কয়েকটা ঘটনা ঘটে যাহা কৌতুককর ও অপ্রীতিকর। ১৯৩৫ সালে চাটগাঁ হইতে আসিয়া আমি যোগদান করার পরই স্যার আমাকে বলিলেন যে, আমাকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়াইতে হইবে। আমি বার্ণার্ড শ'-সম্পর্কে ডক্টরেট করিয়াছি, আমার সম্পর্কে তো প্রশ্নই উঠে না। তারাপদ মুখার্জি খুব কৃতী শিক্ষক ; তাঁহাকেও যুক্ত করার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবুকে তিনি বলিলেন। পরে একদিন তিনি বলিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে একটা অন্যায় কাজ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে আমাকে গ্রহণ না করিয়া তারকনাথ সেনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি বলিলাম, তারকনাথ সেনের যোগ্যতা সুবিদিত : সুতরাং ইহার মধ্যে আপত্তি করার কি

আছে? স্যার বলিলেন, 'কিন্তু তুমি তো সিনিয়র!' ইহার কিছুদিন পর স্যারই আবার বলিলেন, একটা জায়গা খালি আছে, সেইখানে আমাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ; তিনি এই প্রস্তাব দেওয়ায় শ্যামাপ্রসাদবাবু নাকি বলিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজে শীঘ্রই একজন সাহেব আসিবে ; তাহার জন্য এই পদ খালি রাখা হইবে। ইহার কিছুদিন পর স্যার আবার বলিলেন যে, আবার একটা সম্ভাবনা হইয়াছিল এবং তিনি আমার নাম করায় শ্যামাপ্রসাদবাবু উত্তর করিলেন, হুমায়ুন কবির ফিলজফি বিভাগের লোক হইলেও তিনি ইংরেজিও পড়াইতে পারেন ; সুতরাং বাহির হইতে আর পার্ট-টাইম লেকচারার নেওয়ার প্রয়োজন নাই। পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি, যেভাবে আশুতোষ এই ডিপার্টমেন্ট গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। যখন ওখানে লেকচার দিতে হইয়াছে, লেকচার দিয়াছি। কিন্তু ওখানে লেকচার দিতে আমন্ত্রণ না করিলে আমার মনে ক্ষোভ হওয়ার কোন কারণ নাই।

এই অবসরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করিব। শ্যামাপ্রসাদবাবু খুব অল্প বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও অস্থিরতা, চপলতার পরিচয় দেন নাই। তিনি সুকৌশলী, সুচতুর লোক ; কাহারও সঙ্গে কলহ করিয়া তিক্ততার সৃষ্টি করিতেন না এবং নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধি অপেক্ষা পরের উপকার করিতে ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার পিতা রবীন্দ্রনাথকে ঘাঁটাইয়া একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ সেই ক্ষতের উপর দুই হাতে প্রলেপ দিয়া যথাসম্ভব প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। জীবিত লেখকের কোন রচনা পাঠ্য করা হইবে না—এই যুক্তিতে আশুতোষ বাংলায় এম-এ হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেন কিন্তু নূতন জমানায় রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রবীন্দ্ররচনা পাঠ্য হইল। এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেই অধ্যাপক হইলেন। প্রধানতঃ কবিকে খুশি করার জন্যই বিধুশেখর শাস্ত্রীর জন্য যথাযোগ্য (অথবা যোগ্যতার অতিরিক্ত?) সম্মান, সাম্মানিক এবং উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। যখন দ্বিতীয় যুদ্ধের আরম্ভের কিছুকাল পরে কলিকাতা ত্যাগের হিড়িক লাগে, তখন কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্র কমিয়া যায়। আমি একটা বড় বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং সেই সূত্রে একাধিকবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছি। যে-সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা চাকুরি হারাইবেন, তাঁহাদের স্বার্থসম্পর্কে তাঁহাকে খুব সজাগ দেখিয়াছি এবং তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ক্ষিপ্র কর্মতৎপরতায় বিস্মিতবোধ করিয়াছি। তাঁহার পিতা যতই ক্ষমতাশালী হউন, তাঁহার অনেক বিরোধীও ছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদবাবু বিরোধী পক্ষকে করতলগত করিয়া ফেলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ভাইস-চ্যান্সেলর হাসান সুরাবর্দী বিলাতে যাইয়া পাকিস্তান-আন্দোলনে যোগদান করেন, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদবাবুর প্রতি সহোদরের মত ব্যবহার করিতেন।

আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না ; সম্প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী লিখিতে যাইয়া এই বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু চোখের সামনে যাহা ঘটিত অন্য পাঁচজনের মত তাহা দেখিয়াছি, এইটুকু মাত্র বলিতে পারি। হিন্দুমহাসভার রাজনীতি ভাল কি মন্দ, এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু হিন্দুমহাসভার নেতা হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ যে সৎসাহস ও রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা খুব বেশি দেখি নাই এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, যে তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি বড় চাকুরি ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসের প্রেরণায়ই তিনি আত্মাহুতি দিয়াছেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার যতই প্রশংসা করি না কেন, ইহাও বলিব যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনার পক্ষে তিনি তাঁহার পিতার মতই সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। শিক্ষাজগতের অধিকর্তা শিক্ষার মান উঁচু রাখিবেন ইহাই প্রত্যাশা করা উচিত। এইজন্য পরিচালকরা যোগ্য অধ্যাপক ও পরীক্ষক নিয়োগ করিবেন—ইহাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। তাঁহারা Safety Lamp বা ঐজাতীয় মৌলিক কিছু আবিষ্কার করিতে না পারেন, কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডেকে চিনিয়া লওয়ার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকা চাই। সেই ক্ষমতা বা সেই ইচ্ছা শ্যামাপ্রসাদবাবুর একেবারেই ছিল না। দুই-একটা গল্প বলিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একবার বিজ্ঞানের একটি চাকুরির জন্য দুইজন প্রার্থী হইলেন যাঁহাদের পরীক্ষাগত যোগ্যতা একই রকমের। ইঁহাদের মধ্যে একজন আমার বিশেষ পরিচিত। তিনিই পদটি পাইলেন। আমি জনরব শুনিয়াছি যে তিনি এক অব্যর্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। ইনি পরিবার পরিকল্পনা করেন নাই। গুটিকতক ছেলেমেয়ে লইয়া কর্তার কাছে উপস্থিত হইলেন অথবা অন্যভাবে নিজের পরিবারভারাক্রান্ত অবস্থার কথা জানাইয়া দিলেন। প্রতি-দ্বন্দ্বী তখনও অকৃতদার সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় অনিবার্য হইয়া পড়িল।

পরীক্ষক নির্বাচন বিষয়ে অনুরূপ কাহিনী আছে। কোন এক বৎসর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় লজিকের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন পি. কে. চক্রবর্তী। পরীক্ষার সময় তিনি গর-হাজির এবং তাঁহার কোন হদিশই পাওয়া গেল না। সুতরাং দর্শনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত করা হইল। পরীক্ষা চলিতেছে, পরীক্ষকদের সভায় প্রধান পরীক্ষককে প্রশ্নপত্র বিচার করিয়া নির্দেশ দিতে হইবে। খগেনবাবু উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহাকেই এই ভার দেওয়া হইল। কিন্তু খগেনবাবু বাংলারও প্রধান পরীক্ষক। ভাইস-চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদবাবু হুকুম দিলেন যে লজিকের সমস্যা তো সমাধান হউক। খগেনবাবুর জায়গায় বাংলায় আর একজন কাহাকেও দিলেই হইবে। একটু পরেই নাকি তিনি জানালা দিয়া প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীটের দিকে তাকাইতেছিলেন—পথ দিয়া বিহার-প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত এক উকিলবাবুকে দেখিতে পাইলেন। ইনি এম-এ, বি-এল এবং তখন পাকাপাকিভাবে কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন ; বোধ হয় কলিকাতায় আসিয়া শ্যামা-প্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। ইঁহার বাংলা ভাষায় অধিকার বা পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু কেহ জানিতে পারেন নাই। ইনি বেশ কয়েক বছর প্রধান পরীক্ষকের কাজ করিয়াছেন। কোথাও কোন গোলমাল হয় নাই। ইঁহার অধীনস্থ অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন আমার সহকর্মী ও সুহৃদ্ শশাঙ্কশেখর বাগচি। শশাঙ্কবাবু বলিয়াছেন যে প্রধান পরীক্ষক কখনও কখনও তাঁহার নিজের স্টাইল বা রচনাভঙ্গী নামক একটা বস্তুর কথা বলিতেন। কিন্তু যেহেতু এই ভদ্রলোকের কোন রচনাই কেহ দেখেন নাই, সুতরাং কথাটা আর অগ্রসর হইত না।

পরের যে কাহিনী বলিব তাহা একাধিক রসের আস্বাদ বহন করে। ১৯১৯/২০ সালে স্যার আই-এ পরীক্ষার ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। তখন তাঁহার অপেক্ষা বর্ষীয়ান্ এক ভদ্রলোক তাঁহার অধীনে পরীক্ষক ছিলেন। স্যারের ধারণা, এই লোকটি একেবারেই মূর্খ ; অবশ্য স্যারের নিক্তিতে ওজন করিলে আমরা অনেকেই এই শ্রেণীতে পড়ি। কাজেই আমরা এই মন্তব্যে কোনরূপ বিচলিত হই নাই। যখনকার কথা বলিতেছি—১৯৩৬-৩৮ সাল হইবে—তখন শ্যামাপ্রসাদবাবু ইঁহাকে প্রবেশিকা বা মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক করিয়া দিলেন। এই স্থবির ভদ্রলোক যদি-বা কিছু জানিতেন, তখন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষকদের মিটিং অল্পকিছুদূর অগ্রসর হইতেই অন্যতম পরীক্ষক তারকনাথ সেন মিটিং হইতে চলিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল যে, প্রধান পরীক্ষক

যে নির্দেশ দিতেছেন তাহা এত ভুলে ভরা যে আগামী বৎসরের পরীক্ষায় 'correction' বা 'অশুদ্ধি-শুদ্ধি' প্রশ্নে উহা দেওয়া যাইতে পারিবে। হঠাৎ স্যার আসিয়া উপস্থিত এবং তারকের মন্তব্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া ভাইস-চ্যান্সেলরকে তিরস্কার করিলেন। অবিচলিত শ্যামাপ্রসাদবাবু প্রধান পরীক্ষককে ডাকাইলেন, স্যারকে দিয়া নির্দেশাবলী লিখাইয়া লইলেন এবং অবিচলিত প্রধান পরীক্ষক মিটিং-এ প্রত্যাবর্তন করিয়া উপস্থিত পরীক্ষকদিগকে বলিলেন—'Gentlemen, these are my revised directions'!

ইহার পর কোন কারণে এই প্রধান পরীক্ষক ম্যাট্রিক ছাড়িয়া ইন্টারমিডিয়েটের প্রধান পরীক্ষক হইলেন—তৃতীয় পত্রে, অর্থাৎ যাহার বিষয় মৌলিক রচনা, ছন্দ ও অলংকার। মিটিং-এ যাইয়া দেখিলাম তিনি আমাকে চিনেন এবং আমাকে খুব খাতির করিলেন। কিভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে সেই বিষয়ে পরীক্ষকদের আলোচনা হইল এবং আমি যেরূপ সাব্যস্ত করিয়া দিলাম তিনি সেইরূপ নির্দেশ দিলেন। এই পত্রে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন হইল—অলংকার নির্ণয় ; উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে কোথায় কি অলংকার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বলা। তখনকার আমলে তিন-চারদিনের ব্যবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য একটা দ্বিতীয় মিটিং হইত। দ্বিতীয় মিটিং-এ আসিয়াই প্রধান পরীক্ষক আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আপনারা তো অলংকারগুলি একরকম নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু আমাদের পাড়ার ছেলেরা যে বলে তাহারা অন্যরকম লিখিয়াছে!' ইহা শুনিয়া সমবেত পরীক্ষকমণ্ডলী হতবাক্, কিন্তু মুখ খুলিলেন আমার বন্ধু যিনি আমার পাশেই বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঠিক কথা। প্রধান পরীক্ষকের পাড়ার পরীক্ষার্থীদের যুক্তি অবশ্যই সহানুভূতির সহিত বিচার করিতে হইবে।' ইহার পর যে অভিজ্ঞতা হইল তাহা আরও বিচিত্র। দিন-কয়েকের মধ্যে প্রথানুসারে পঞ্চাশখানা খাতা দেখিয়া প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। দুই-তিনদিনের মধ্যেই তিনি এক পোস্টকার্ড লিখিয়া জানাইলেন যে আমার পরীক্ষণ খুব কড়া, আরও উদারহস্তে নম্বর দিতে হইবে। আমি শুনিতাম আমি একটু দরাজ হাতেই নম্বর দিই। সুতরাং তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম : কোথায় কড়া হইয়াছি তাহা বুঝিয়া পরের খাতা দেখিব। দেখা হইতেই তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, তিনি আমার পরীক্ষিত খাতা খোলেন নাই, আমি কলিকাতা কেন্দ্রের খাতা দেখিতেছি। কলিকাতা কেন্দ্রের খাতায় তিনি আগে হাত দেন না, উহা করিলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে লজ্জিত হইতে হয় অর্থাৎ তাহাদের ছেলেমেয়েদের ফল আগেই পাঠাইয়া দিলে আর মেরামত করিতে পারা যায় না। দেখিলাম, সেই মেরামতিপর্বের প্রস্তুতি তখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের সহকারী একজন যুবককে দেখিলাম এবং প্রার্থী অভিভাবকও দুই-চারজন করিয়া আনাগোনা শুরু করিতেছে। প্রধান পরীক্ষক ঐ যুবকের কাছে রোল নম্বর রাখিয়া যাইতে বলিতেছেন এবং আট নম্বর বাড়াইয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস দিতেছেন। পূর্ব-আমলে এবং পরে যেরূপ পুকুরচুরির কথা শোনা গিয়াছে ইহা সেইরকম ব্যাপার নয়। তবে পরীক্ষা ব্যাপারটা প্রায় প্রহসনে পরিণত হইয়া গিয়াছে। প্রধান পরীক্ষক আমাকে যে আরও দাক্ষিণ্য দেখাইতে বলিয়াছিলেন তাহার কারণ, আমার কাছে পঞ্চাশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একুশজন পাস করিয়াছে। যে-সব পরীক্ষার্থী ফেল করিয়াছে তঁাহাদের যোগ্যতা বিচার করার কথা তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। তাহাদের মধ্যে আরও বেশ কয়েক জনকে পাস করাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে আর প্রধান পরীক্ষকের প্রয়োজন কি?

এই-সব লেখাপড়ার প্রশ্ন না তোলাই ভাল। তখনই শুনিয়াছিলাম যে এই স্থবির ভদ্রলোকের পুত্রের যক্ষ্মা হইয়াছে এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে মধুপুর না দেওঘরে রাখা

হইয়াছে। সেই খরচ সংকুলানে সাহায্য করার জন্যই ইঁহাকে প্রধান পরীক্ষক করা হইয়াছে। উপরে যে-সব উপাখ্যান বলিলাম তাহাদের অনেকগুলিই আমাদের প্রত্যক্ষ করা, আর ইহার মধ্যে কল্পিত যাহা-কিছু আছে তাহাও বাস্তবঘেঁষা। এই-সব কাহিনী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সদাশয়তার, কর্মকুশলতার (এবং রাজনীতিতে সৎসাহসের) প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্যামাপ্রসাদ : 'সর্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ...ন চ পুত্রাৎ'

১

শ্যামাপ্রসাদবাবু ১৯২৭ সালে ব্যারিস্টার হয়েন। যতদূর স্মরণ হয় তিনি ১৯২৮-২৯ সালে দেশে ফিরেন এবং সিনেটে সরকারবিরোধী পক্ষকে সংগঠিত করেন। ১৯৩১ সালে দুইপক্ষে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় রেজিস্ট্রার নিয়োগ লইয়া এবং সেইখানে শ্যামাপ্রসাদবাবুদের প্রার্থী যোগেশ চক্রবর্তীকে পরাস্ত করিয়া সরকারপক্ষের সমর্থিত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় জয়ী হইলেন। কিন্তু আদিত্যনাথ অভিজ্ঞ প্রফেসর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেও অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল ভাইস-চ্যান্সেলর হাসান সুরাবর্দী তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট নহেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু এই সমস্যার সহজ মীমাংসা করিয়া দিলেন। ১৯৩৩ সালে হীরালাল হালদার অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সেই জায়গায় আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় দর্শনের প্রফেসর হইলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুর আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। শূন্য রেজিস্ট্রারের পদে যোগেশবাবু বহাল হইলেন। ইহার কিছু পূর্বে বেশ বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদবাবুর প্রবল সমর্থনের জোরে হাসান সুরাবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র (ও ভাগ্নে) শাহেদ সুরাবর্দী আর্টের প্রফেসর হইলেন। সবই খুব সুবন্দোবস্তের ব্যাপার। শুধু আমাদের মত অনেকে বলাবলি করিল যে এবারও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতি অবিচার হইল এবং সেই হিসাবে পঠন-পাঠনের দিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইল। দার্শনিক বা দর্শনের ছাত্র হিসাবে ইহাদের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। এই-সব সমালোচকদের মধ্যে খুব সোচ্চার ছিলেন আমাদের স্যার। তাঁহার সরব আপত্তির জন্যই হউক অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, আদিত্যবাবুর কার্যকাল শেষ হইলে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় দুই বৎসরের জন্য এই পদ পাইয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর আর একটা সংঘর্ষ—ঠিক মুখোমুখি কিনা বলিতে পারি না—বাধে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণের সঙ্গে। বেঙ্কট রমণ নোবেল প্রাইজ পান ১৯৩০ সালে। আমি পদার্থবিদ্‌দের কাছে শুনিয়াছি এবং পত্রিকাদিতে পড়িয়াছি যে রমণ এফেক্টের উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁহার প্রাপ্য ; কিন্তু ইহার জন্য ল্যাবরেটরিতে বহু এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজন হয় এবং তাহা করিতেন কৃষ্ণাণ ; কৃষ্ণাণের সাহায্য রমণ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রধানতঃ এই বিরাট কাজে অংশ নেওয়ার জন্যই পরবর্তীকালে কৃষ্ণাণকে জাতীয় অধ্যাপক করা হয়। আমি ওয়াকেবহাল লোকের কাছে এমনও শুনিয়াছি যে যাহা রমণ এফেক্ট বলিয়া প্রচলিত, তাহার নাম হওয়া উচিত ছিল রমণ-কৃষ্ণাণ এফেক্ট। এই দাবি বাড়াবাড়ি হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাণের পরীক্ষানিরীক্ষা যে এই অবদানের মৌলিক অঙ্গ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা স্মরণীয় যে এই-সকল এক্সপেরিমেন্ট মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারস্থিত অ্যাসোসিয়েশনের ল্যাবরেটরিতেই করা হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণের সঙ্গে খুব একটা সৌহার্দ ছিল না। কিন্তু সি. ভি. রমণ চলিয়া যাওয়ার চার বছর পর মেঘনাদ সাহা পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যে চৌদ্দ বছর তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় তাঁহার প্রধান কাজ ছিল নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ইন্‌স্টিটিউট গড়িয়া তোলা। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে যে, যে বিরাট গবেষণাকেন্দ্র তিনি

তুলিলেন এবং যাহা তাঁহারই নামানুসারে সাহা ইন্‌স্টিটিউট নামে পরিচিত, ইহাকে তিনি পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খুব শিথিলভাবে সম্পর্কিত স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। যেদিক হইতেই দেখি, সেই পুরাতন প্রশ্নই জাগিয়া উঠে—১৯১৭ সালে যে কেন্দ্রীভূত পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় তাহার কি কোন প্রয়োজন ছিল ?

পুনরায় রমণের ইতিকথায় ফিরিয়া আসি। মনে হয় অবস্থার চাপে পড়িয়া এই গবেষণা-গতপ্রাণ বৈজ্ঞানিক পালিত প্রফেসরের পদ গ্রহণ করিলেও এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করিলেও সায়েন্স কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরই তিনি তাঁহার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ফেলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশের ভাষা এত অশালীন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তখন দেখা গেল যে বৌবাজারের ঐ বিজ্ঞান-সংস্থা রমণ একেবারে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছেন। ওখানে সবাই তাঁহার নিজের লোক , উহার সেক্রেটারি হইলেন তাঁহার স্ত্রী—যাঁহার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে যে, একই ব্যবসায়ে লিপ্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে মিলন হইতে পারে না। অপরের স্বৈরতন্ত্র ও স্বজনপোষণ শ্যামাপ্রসাদ সহ্য করিতে পারি-লেন না। আমার এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ, পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল না। তবে যেভাবে রমণ তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্মকেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইলেন তাহা দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর অন্যতম সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, তখন চারুবাবুর যে কর্মতৎপরতা দেখিয়াছি এবং সংবাদপত্রে যাহা পড়িয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই বিবরণ লিখিতেছি। বোধ হয় রাতারাতি মহেন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় অনেকগুলি বিজ্ঞানপ্রেমিক মোটা চাঁদা দিয়া আজীবন সদস্য হইলেন। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুরূপ বিষয়বুদ্ধি রমণের ছিল না। সুতরাং বার্ষিক সভায় তিনি অপদস্থ ও অ-পদস্থ হইলেন। ইহার কিছুদিন পরই রমণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া ব্যাঙ্গালোরে যান। যাহা পূর্বে বলিয়াছি তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিব যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমণ দিয়াছিলেন অনেক, পাইয়াছেন কম।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু নূতন কিছু করিবার চেষ্টা বড় একটা করিতেন না। হাতের কাছে যাঁহারা আছেন, যাঁহাদের প্রমোশন প্রত্যাশিত, তাঁহাদিগকেই সন্তুষ্ট রাখিতে চাহিতেন : যেমন, (মিন্টো) প্রমথ বাঁড়ুয্যের জায়গায় জিতেন নিয়োগী, ভাণ্ডারকরের জায়গায় হেম রায়চৌধুরী, রমণের জায়গায় দেবেন্দ্রমোহন বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসুর জায়গায় শিশির মিত্র, শিশির মিত্রের জায়গায় বিধুভূষণ রায়। হাতের কাছে যদি মেধাবী কোন লোক থাকে, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি বা পটুতা কোনটাই তাঁহার ছিল না। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া সেই আমলে একটি লোকের প্রতি দীর্ঘ অবহেলা এবং সেই দীর্ঘ অবহেলার অপ্রত্যাশিত অবসানের গল্প মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেই অবস্থাটা স্পষ্ট হইবে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন কেমিস্ট্রিতে কলিকাতা ও লণ্ডনের ডি. এস-সি.। শুনিয়াছি, তাঁহার গবেষণা খুব উঁচুদরের। লোকটি একেবারেই মিশুকে নন, তদ্বিরে অনভ্যস্ত, চিরকুমার, খুব আটপৌরে মেসে থাকিতেন এবং সায়েন্স কলেজে যাতায়াত

করিতেন। তিনি ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মাত্র দুইশত টাকা বেতনে পি. সি. রায় গবেষক হইয়া রহিলেন—বোধ হয় বার-দুই ভ্রমণ-বৃত্তি লইয়া বিদেশে গিয়া স্বীয় কাজের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বময় কর্তা শ্যামাপ্রসাদ-বাবুর কানে ইঁহার অসাধারণ যোগ্যতার কথা পঁহুছে নাই ; সেই কারণে ইনি লেকচারারের পদও পান নাই। এমন সময় ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের একটা বড় রকমের অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইল এবং সেখানে অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছিলাম যে বিদেশী কেমিস্টরা একজন বাঙ্গালীরই খোঁজ করিয়াছিলেন—তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, যাঁহার স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পদ বা পদবী নাই। ইহার ফলে অচিরেই তিনি লেকচারার হইলেন এবং বেশি দিন না যাইতেই প্রফেসর হইলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আশুতোষ-নন্দন ; কাজেই স্বকীয় প্রবর্তনায় মেধা আবিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি নিজে বাংলার এম-এ ; বাংলায় তিনি কিঞ্চিৎ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। যে প্রবল তাগিদ বা তাড়নায় আশুতোষ তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে graduate of great distinction বলিয়া চালাইয়াছিলেন, সেইরূপ চাপ তাঁহার উপর ছিল না। সুতরাং তিনি সেইরূপ সাংঘাতিক কিছু করেন নাই। ১৯২৯ সালে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং প্রথম পঁচিশ বছরে ৮৭২জন পাস করেন ; তন্মধ্যে ১৭২জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েন। সেই আমলে তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ পাস-করা ছাত্রেরা ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য থীসিস দিতে পারিতেন না। কিন্তু ১৯৪৪ সালে একজন তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ রামতনু লাহিড়ি গবেষক নির্বাচিত হয়েন এবং হয়ত পদাধিকার বলেই সহকারী লেকচারার নিযুক্ত হয়েন। যেখানে প্রথম শ্রেণীর এম-এ'র ছড়াছড়ি—আলোচ্য পঁচিশ বছরে ইঁহাদের সংখ্যা ছিল ১৫৭—সেইখানে একজন তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে নিযুক্ত করা শিক্ষাগত মানের প্রতি অমর্যাদা প্রমাণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কর্তৃত্বাধীনে একটা বড় ব্যাপার—ইংরেজির প্রধান অধ্যাপকের নিয়োগ। আমাদের আমলে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঋষি ও মনীষী হেনরি স্টিফেন। তাঁহার জায়গায় নিযুক্ত হইলেন জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খুব প্রবীণ অধ্যাপক ; প্রধানত অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় তিনি নিবিষ্ট থাকিতেন এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার বেশ নামডাকও ছিল। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া রোমান্টিক কাব্যের নানা বিষয়ের উপরে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা তাঁহার খুব ভক্ত না হইলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা স্বীকার করি এবং তাঁহার নিয়োগে সাধারণ্যে কোন অসন্তোষের আভাস দেখা যায় নাই। তাঁহার জায়গায় আসিলেন ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। হরেন্দ্রকুমার আশুতোষ-পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে আকাশ-আলোর মত তাঁহার উপস্থিতি সবাই মানিয়া লইত। ইহা লইয়া কেহ কোনও প্রশ্ন তোলেন নাই। হরেন্দ্রকুমার নিরুপদ্রব সজ্জন লোক। সুতরাং আশুতোষপন্থী আর দুই-চারজনের বিরুদ্ধে যেমন নানা কথা বলা হইত, কখনও কখনও অসাধুতা অথবা ক্বচিৎ কখনও আরও রহস্যময় ইঙ্গিত করা হইত, তিনি তাহার আওতায় পড়িতেন না। সতের বছর আগে কীথ সাহেবের পরীক্ষিত খাতা পুনরায় পরীক্ষা করার অপরাধের কথা লোকে একসময় বলাবলি করিত। কিন্তু ক্রমশঃ পরীক্ষার মান এত শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল যে উহা আর কেহ স্মরণ করিয়া রাখে নাই। আমি কিন্তু সাধারণের এই ঔদাসীন্যের অনুমোদন করি না। আমার মতে শ্যামাপ্রসাদবাবুর এই নিয়োগ তাঁহার নিজের অযোগ্যতাই প্রমাণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, হরেন মুখার্জির বি-এ পর্যন্ত রেকর্ড খুব সাধারণ অথবা সাধারণ

অপেক্ষা খারাপ। তিনি এম-এ'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েন। ইংরেজিতে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর কয়টি আছে জানি না। আমি যতদূর জানি—অবশ্য এই বিষয়ে অন্যরূপ সাক্ষ্যও উত্থাপিত হইতে পারে—সিটি কলেজ অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যাপনার তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। যাহা হউক, আশুতোষ তাঁহাকে ১৯১৪ সালে ইউনিভার্সিটির লেকচারার করিলেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হইলেন ; তিনি পোস্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস কাউন্সিলের সেক্রেটারি হইয়াছিলেন। কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসাবে তিনি যে ক্লাস নিতেন না এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পড়ান কাজটা নগণ্য হইয়া গেল। তাঁহার অপ্রকাশিত ডক্টরেট থীসিসকে আমি কোন মর্যাদা দিই না এবং তাহার কারণও আমি পূর্বে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছি। তিনি ১৯২০ সালে কলেজের ইন্‌স্‌পেক্টর হয়েন এবং দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর এই কাজে লিপ্ত থাকেন। পূর্বে তিনি বি-এ (পাসকোর্স ও অনার্স) এবং এম-এ প্রভৃতির পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন, এখন তাহাও ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া মনে হয়। এই চৌদ্দ বছর তিনি উচ্চতর লেখাপড়ার সঙ্গে এমন কি যোগাযোগ রক্ষা করিলেন যে, টপ করিয়া এম-এ পঠন-পাঠনের প্রধান হইয়া বসিতে পারেন? এই প্রশ্ন আমার মনে উঠিয়াছিল এবং আরও দুই-চারজনের মনেও উঠিয়া থাকিবে ; কিন্তু শ্যামাপ্রসাদবাবুর মনে নিশ্চয়ই উঠে নাই, কারণ পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে যে বিদ্যাচর্চা হয়, সেই সম্পর্কে তাঁহার ধারণা হয়ত অনেকটা আমার মতই! তিনিও আমার মতই মনে করিয়া থাকিবেন অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে সবাই সমান।

হরেনবাবু তো ছয় বৎসর ইংরেজির অধ্যাপনা করিয়া বৃহত্তর, উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্থলে কে অভিষিক্ত হইবেন ইহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইল। প্রথমে সবাই বলিল, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ আসন্ন—তিনিই এই পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং তিনি আসিলে কোন দিক হইতেই কোন আপত্তি হইবে না, সবাই খুশি হইবে। কিন্তু দেখা গেল, সবাই খুশি হইবে না এবং এই কারণে স্যার কিছুতেই রাজি হইলেন না। ডক্টর মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ইউনিভার্সিটির সাময়িক বা পার্টটাইম লেকচারার আছেন ১৯১৭ সাল বা তাহারও আগে হইতে, তিনি ল' কলেজেরও লেকচারার। তিনি বি-এ ও এম-এ পরীক্ষা প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছিলেন, স্পেন্সারের কাব্য-সম্পর্কে থীসিস দিয়া প্রথমে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং পরে ডক্টর হইয়াছেন! এই পদের জন্য তাঁহার যোগ্যতা বাড়াইতেই তিনি ইংল্যান্ড ও ইটালীতে গেলেন এবং দেশে ফিরিয়া ওখানে যে গবেষণা করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে শেক্সপীয়রের উপর একখানা বই লিখিলেন—'Courtesy in Shakespeare'। তিনি বহুদিন ইউনিভার্সিটির সেবা করিয়াছেন এবং তিনি কাছের লোক। তাঁহার প্রতি শ্যামাপ্রসাদবাবু অনুকূল এইরূপ অনুমান করা গেল। কিন্তু বাদ সাধিলেন স্যার ; তিনি এই নিয়োগকে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। একে তো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনায় খ্যাতির জন্য আমাদের দেশে তাঁহার অপরাজেয় প্রতিষ্ঠা, তারপর শ্যামাপ্রসাদবাবুর উপর তাঁহার প্রভাবও সুবিদিত। এই সময় ভিন গগনে আর একজন নামজাদা প্রার্থীর আবির্ভাব হইল। তিনি ডক্টর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক—আমি তাঁহার কাছেও পড়িয়াছি। তিনি অক্সফোর্ডে যাইয়া বি.লিট ও পরে ডি.ফিল হয়েন এবং ক্ল্যারেন্ডন প্রেস ইংরেজ নাট্যকারদের যে প্রামাণ্য সংস্করণ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই গ্রন্থমালায় তিনিই অটওয়ের গ্রন্থাবলীর সম্পাদন করেন। এই সময়ে অক্সফোর্ড ও লন্ডনে তিনি বিদ্যাচর্চা করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতেন। বিদগ্ধসমাজে তাঁহার এতটা প্রতিপত্তি হয় যে, যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে খসিয়া পড়িয়াছে তখনও এই প্রবাসী বিদেশীকে

ইংরেজ সরকার সাহিত্যিক পেনশন দেন এবং এই অনন্যসাধারণ ঘটনা সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়। অবশ্য তাহা অনেক পরের ব্যাপার।

জ্যোতিষবাবুর নামটা বোধ হয় সর্বপ্রথমে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ উত্থাপন করেন, কারণ তিরিশের দশকে তিনি অক্সফোর্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে খুব ঘোরাঘুরি করিতেন। জ্যোতিষবাবু এই পদ গ্রহণ করিতে রাজি আছেন শুনিয়া স্যার খুব উৎফুল্ল হইলেন এবং তিনি বিপুল উৎসাহে জ্যোতিষবাবুর পক্ষে এবং মোহিনীবাবুর বিপক্ষে আসরে নামিয়া গেলেন ; তাঁহার যখন মস্তিষ্কবিকৃতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখনও তিনি জ্যোতিষবাবুর এই পদপ্রাপ্তির কথা আমাকে বলিতেন। কে বা কাহারা শ্যামাপ্রসাদবাবুর মনে এই সন্দেহ জাগায় যে জ্যোতিষবাবু এদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বহুদিন সংস্রবশূন্য, এখানকার কাজ তাঁহার কাছে রুচিকর হইবে না। এইরূপ আজগুবি অপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া জ্যোতিষবাবু স্যারের কাছে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার বয়ান আজও আমার মনে আছে। দেখা গেল, জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ের বাহিরের নামডাক যত বেশিই হউক এবং স্যার যতই তাঁহার জন্য চেষ্টা করুন, কোন কারণে কর্তা শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁহার দিকে খুব অনুকূল নহেন।

মোহিনীমোহনবাবু মনে করিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা চিরকালই পরস্পরের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের একতাই ইঁহাদের প্রধান শক্তি। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিস্থানীয় দুইজন লেকচারার একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন। কিন্তু দেখা গেল, উঁহারা বাহির হইয়া যাওয়ার পর ঐ বাড়ির মোটর ভবানীপুরেরই বাসিন্দা অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে আনিয়া হাজির করিল। তবে কি এই সহকর্মীরা আসিয়া মোহিনীবাবুর প্রতি সমর্থন না জানাইয়া রবিবাবুর নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন? হইতেও-বা পারে, কারণ, ঠিক এইরকম সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লেকচারার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তাঁহারা ঘোষ ডাইনাস্টির পক্ষপাতী—প্রফুল্ল ঘোষ অথবা রবি ঘোষ অথবা জ্যোতিষ ঘোষ!' ইহা হইতেই তাঁহাদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবুর আলাপ-আলোচনার সারাংশ অনুমান করা যায়। এদিকে স্যার আমাদের কাছে বলিলেন, যে শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্তব্য করিয়াছেন—মোহিনীবাবুর নিয়োগ অনুচিত হইবে। স্যার অবশ্য আমাদের কাছে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বক্তব্য আরও কঠোরভাবে পেশ করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু কৌশলী রাজনীতিবিশারদ, সেইজন্য স্যার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া উপস্থাপিত করিলাম।

রবি ঘোষ-সম্পর্কে প্রস্তাবটা বেশিদূর অগ্রসর হইল না। শোনা গেল যে রবিবাবু রাজি হয়েন নাই, কারণ রিপন কলেজে তিনি আজীবন কাজ করিতে পারিবেন অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির মেয়াদ সংক্ষিপ্ত। রবিবাবু ও শ্যামাপ্রসাদবাবু কেহই প্রকাশ্যে কিছু বলেন নাই : এই ব্যাখ্যা আমরা যাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি তাঁহারা আবার শুনিয়াছিলেন রবিবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীনবাবুর কাছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হয় নাই। জানকীনাথ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল রবিবাবুকে প্রিন্সিপ্যাল না করিয়া নরেন্দ্রনাথ রায়কে আনা হয়। রবীন্দ্রনারায়ণ নিরীহ, অনেকটা নির্লোভ প্রকৃতির হইলেও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার একটা কারণ কলেজের কর্তৃপক্ষ এই শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বভাব লোকটির অনমনীয়তার কথা জানিতেন। আমাদের এম-এ পরীক্ষায় রচনার একটি সমগ্র পত্রের পরীক্ষক ছিলেন রবি ঘোষ মহাশয়। কেন জানি না, তিনি আমার খাতা দেখিয়া খুব খুশি হইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার প্রাক্কালে তিনি দয়া করিয়া আমার সহাধ্যায়ী ও তাঁহার সহকর্মী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে করিয়া নফর কুণ্ডু লেনে আমার তদানীন্তন বাসস্থানে আসিয়াছিলেন। যে কার্যোপলক্ষে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার

প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হওয়ার যোগ ছিল। প্রথমেই মনোরঞ্জন বলিয়া লইল যে রবীন্দ্রনারায়ণ স্পষ্ট করিয়া (সুরেন্দ্রনাথের পুত্র) ভবশংকরবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে এবার তাঁহাকে প্রিন্সিপ্যাল না করিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। ভবশংকরবাবু পিতার মত বাগ্মী বা নেতা না হইলেও খুব সেয়ানা লোক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তিকে ভয় করিতেন ; কিন্তু তিনি ইহাও দেখিলেন যে রবীন্দ্র-নারায়ণকে অধ্যক্ষ করিলে উপাধ্যক্ষ বা ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদ খালি হইবে এবং সেখানে তাঁহাদের আত্মীয় ডক্টর চক্রবর্তীকে বসান যাইবে। রবীন্দ্রনারায়ণের বিদায়ের পর সেই জায়গায় বিনা বাধায় জামাতা ডক্টর চক্রবর্তী বসিবেন। তখন বেসরকারিভাবে প্রিন্সিপ্যালদের বয়ঃসীমা পঁয়ষট্টিতে স্থির হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও ঐ বয়সেই অবসর গ্রহণ করিতেন। সুতরাং চাকুরির মেয়াদের যে অনিশ্চয়তার কথা রবিবাবুর অনুজ শৌরীনবাবু বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইলে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে এই বিষয়ে খটকা শ্যামাপ্রসাদবাবুই উত্থাপন করিয়া থাকিবেন, যাহাতে রবিবাবু নিজেই পিছাইয়া যান।

কাহার মারফতে জানি না, জ্যোতিষবাবুকে বলা হইল যে তাঁহাকে এই পদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রফেসরের গ্রেডের সর্বনিম্ন বেতন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে চাকুরি আরম্ভ করিতে হইবে। জ্যোতিষবাবু যখন বিলাত যান তখন তাঁহার বছর-দশেক চাকুরি হইয়াছে এবং বিলাতে তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছিলেন, ইহাও সুবিদিত। গ্রেডের শেষ প্রান্তিক বেতনে অধ্যাপক নিয়োগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়েই পাওয়া যাইবে। হঠাৎ জ্যোতিষবাবুর বেলায় গ্রেড শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করায় সকলেই ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত বিধানেব সমর্থন করিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। দর্শনের এই নামজাদা অধ্যাপকের টনটনে কাণ্ডজ্ঞান ছিল। বলা যাইতে পারে, হয়ত এইজন্যই তিনি বড় দার্শনিক হইতে পারেন নাই, কিন্তু সর্ব পল্লীতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। দার্শনিকের প্রজ্ঞা আর সাংসারিকের কাণ্ডজ্ঞান পৃথক বস্তু। তিনি অক্সফোর্ডে জ্যোতিষবাবুকে ভাল-ভাবে চিনিতেন এবং এই স্বদেশপ্রত্যাবর্তনেচ্ছু ভারতীয়ের উপকার করিবার জন্যই তিনি জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু যেই দেখিলেন যে কর্তার মতি অন্যরূপ, তখন তিনিও অন্য সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। স্যারকে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে জ্যোতিষবাবুর পক্ষে চাকুরি গ্রহণ করিবার পূর্বেই পূর্ণ বা শেষ প্রান্তিক বেতন দাবি করা অবিবেকিতা। প্রথমে নিম্নতম বেতনে চাকুরি গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষের বিচারবোধ ও বদান্যতার উপর নির্ভর করা উচিত। দর্শনপতির যুক্তিটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলে কি দাঁড়ায় ঠিক স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই ; তবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই শ্যামাপ্রসাদ-বাবুর সঙ্গে আলোচনার পর তিনি জ্যোতিষবাবুর জন্য আর ওকালতি করিলেন না : সাধু ভাষায় বলা যাইতে পারে—তাঁহার সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা কাজ ছিল ; তিনি স্থির করিয়া দিলেন অমুক দিন ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করার মিটিং আছে। সকালে আমরা যেন দারভাঙ্গা ভবনের বড় সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করি : মিটিং সারিয়া তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গন্তব্যস্থানে যাইবেন। আমরা তাহাই করিলাম এবং যথাসময়ে মিটিং শেষ করিয়া তাঁহার গাড়িতে উঠিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর পরিবারের সঙ্গে আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। কাজেই আমার বন্ধুর সদ্যসমাপ্ত মিটিং-সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে দ্বিধা হইল না। উত্তরে শ্যামাপ্রসাদবাবু মোহিনীবাবুর নির্বাচনের কথা বলিলেন এবং অগমতার সহিত যোগ করিলেন যে ইংরেজিতে ভাল লোক পাওয়া যায় না। মোহিনীবাবু ও জ্যোতিষবাবু উভয়েই আমার শিক্ষক, ইঁহাদের যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার করিবার অভিপ্রায় আমার মোটেই

নাই। সবাইকে টপকাইয়া, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মোহিনীবাবু যে এই পদ পাইলেন তাহা লইয়া সেই আমলে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইত। ইতিহাসের একজন ঠোঁটকাটা অধ্যাপক ছিলেন, তিনি একটি অনুবাদের মধ্য দিয়া এই রহস্যকে চাপা দিতেন। তিনি নামকরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ; তিনি বলিলেন, 'ইহা তো হইবেই ; প্রার্থী যে The Enchantress!' কিছু কিছু আজগুবি গল্পও রটিল, যেমন, একটা গুজব শোনা গেল রমাপ্রসাদবাবু টেগোর ল' প্রফেসর হইয়াছেন ; তাঁহার হাতে অনেক কাজ এবং সেইজনাই মোহিনীবাবু তাঁহার বক্তৃতার খসড়া লিখিয়া দিবেন। শুনিয়া ইংরেজির একজন লেকচারার—ইনিও আমার শিক্ষক—মন্তব্য করিলেন, 'মোহিনীবাবু এমন কি লিখিয়া দিবেন, যাহা আমরা অন্য পাঁচজন লিখিতে পারি না!' এই-সব গল্পের অলীকতাই প্রমাণ করে যে এই নিয়োগে তখন লোকে একটু বিভ্রান্ত হইয়াছিল।

তখনকার দিনের এই বিতর্কিত বিষয়টি সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইয়াছে এবং এখনও যাহা মনে হয় তাহা বলিব। ১৯২৬ সালের ৮ই আগস্ট যদুনাথ সরকার ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েন। ইহার পূর্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পরিচালনা এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্ট-মেন্টের শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কে খুব কঠোর সমালোচনা করিয়া একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনার অন্যতম বিষয় ছিল—একই লোকের একই সঙ্গে আইন ব্যবসায়, আইন কলেজের অধ্যাপনা এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের সবেতন অধ্যাপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজ খোলায় আশুতোষ যুক্তি দিয়াছিলেন, বেসরকারি আইন কলেজে পুরো এক ঘণ্টা ক্লাসই হয় না, এখানে পুরো এক ঘণ্টা ক্লাস তো হইবেই। তাহা ছাড়া মুট কোর্ট, টিউ-টোরিয়েল প্রভৃতি হইবে। সকালে বা সন্ধ্যায় আইন কলেজে এতটা সময় দিলে এবং দুপুরে কোর্টে থাকিলে ইঁহারা অভিনিবেশের সহিত এম-এ পড়াইতে পারিবেন না। হাইকোর্টের প্রবীণ বিচারপতি হিসাবে আশুতোষ দেখিয়াছেন তাঁহার জামাতা প্রমথনাথ ও পুত্র রমাপ্রসাদ-বাবু কোর্টে কতটা ব্যস্ত থাকেন। পত্রিকা খুলিলেই দেখা যাইত খুদা বক্‌শ সাহেব পুলিশ কোর্টের কত মামলা করেন। ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়া যদুনাথ সরকার ইঁহাদের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে সবেতন অধ্যাপনা বাতিল করিয়া দিতে ব্যস্ত হয়েন। ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না, সেই সময়, বোধ হয় প্রমথবাবু বিলাতে ছিলেন—অন্তত' তাঁহাকে লইয়া বিতর্ক হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, অগ্রসর হইয়াই যদুনাথকে ঢোক গিলিতে হইল। সিনেটের মুসলমান সদস্যদের সমর্থন তাঁহার প্রয়োজন। তাই খুদা বক্‌শকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রমাপ্রসাদবাবুকে লইয়া ভোট হইল আর সেই সঙ্গে ভোট হইল মোহিনী-বাবুকে লইয়া—তিনিও ব্যবহারাজীব, আইন কলেজের অধ্যাপক, আবার পোস্ট-গ্রাজুয়েটের লেকচারার। রমাপ্রসাদবাবু ভোটে জয়ী হইলেন কিন্তু মোহিনীবাবু হারিলেন অর্থাৎ তাঁহার পুনর্নিয়োগ সিনেট অনুমোদন করিল না। অবশ্য যতদূর স্মরণ হয় মোহিনীবাবুরও কোন ক্ষতি হইল না, কারণ ছাত্রেরা আন্দোলন করিতে লাগিল—'এই অন্যায় চল্‌বে না, চল্‌বে না, চল্‌বে না'। তবে ইহা ঠিক যে যদুনাথ সরকার মোহিনীবাবুকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিয়া যে প্রস্তাব পাস করিয়াছিলেন, তাহা আশুতোষ-প্রচলিত পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর অনাস্থাপ্রস্তাবের সামিল। যখনকার কথা বলিতেছি (১৯৩৯—৪০) তখন যদুনাথ সুস্থ-সবল গবেষণায় অভিনিবিষ্ট এবং কলিকাতার অধিবাসী। 'ফল অব্ দি মুঘল এম্পায়ার' লিখিয়া এই সময়ই তিনি তাঁহার বিরাট কাজ উদ্‌যাপিত করিতেছেন। তীক্ষ্ণধী হইলেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজে বিদ্যানুরাগী ছিলেন না এবং বোধ করি বিদ্যার মূল্য দিতেও জানিতেন না। পিতার নিকট হইতে প্রতিবিধিৎসা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। হরিনাথ আশুতোষের চরিত্র-সম্পর্কে এমন কুৎসা লেপন করিয়াছিলেন যে

অনেক কথা বলিয়াও ভয়ে দীনেশ সেন মহাশয় তাহা ছাপার অক্ষরে উল্লেখ করিতেই পারেন নাই। যদুনাথ সরকার সেই রকম কিছু করেন নাই এবং তাঁহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার মত সুযোগও শ্যামাপ্রসাদবাবুর হাতে ছিল না। তবে যে সুযোগটা আসিয়াছে তাহাই মন্দ কি? ইহা কি সম্ভব নয় যে শ্যামাপ্রসাদবাবু এই নিয়োগের দ্বারা প্রায় মুখোমুখি হইয়া দক্ষিণ কলিকাতাবাসী যদুনাথ সরকারকে বলিলেন, 'এক যুগ আগে যাঁহাকে তুমি পার্ট-টাইম লেকচারারের পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলে, চাহিয়া দেখ, আজ তাঁহাকেই আমি ঐ বিভাগের প্রধানরূপে বসাইলাম!'

৩

ইউনিভার্সিটির প্রধান অধ্যাপকের কথা বলিতে যাইয়া একটু বেশিদূর আগাইয়া আসিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনীতে ফিরিতে হইলে ৩/৪ বছর পিছাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের কলেজে ইংরেজিতে তখন সাতজন অধ্যাপক। আমরা ছয়জন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রফেসর এবং আমাদের পরে পরেশনাথ ঘোষ হইলেন লেকচারার। ১৯৩৭-৩৮ সালে পরেশনাথ ঘোষের ক্লাসে শ্যামাপ্রসাদবাবুর এক ভাগ্নে খুব দুর্বিনীত ব্যবহার করে এবং পরেশবাবু তাহার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ ভূপতিমোহন সেনের কাছে নালিশ করেন। তিনি নালিশ করার আগে আমরা কেহ কিছু জানিতাম না, কারণ, যে যাহার ক্লাস লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। সেইদিনই বা পরের দিন আমরা ইহা শুনিতে পাইলাম এবং ইহা লইয়া টিফিনের সময় প্রফেসরদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইল। পরেশবাবু বলিলেন, ছেলেটি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন ; হয়ত ইহাতে ইঁহাদের সায় ছিল। অপর দিকে কেহ কেহ বলিলেন যে এইরূপ দুর্বিনীত ব্যবহার করিয়া 'সরি স্যার' বলিয়া পার পাইলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও সাজা দেওয়া উচিত। সাজাটা কি হইতে পারে ইহা লইয়াও মতামত অভিব্যক্ত হইত। আমার বেশ মনে আছে যে আমি ও বাংলার অধ্যাপক শশাঙ্ক বাগচী এই শেষের দলে ছিলাম। তখনকার দিনে প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসরদের ঘরে বড়-একটা আসিতেন না এবং প্রয়োজন না হইলে আমরাও প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাইতাম না। আমাদের আলোচনায় এই দুর্বিনীত ছাত্রকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবও উঠিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পরেশবাবু তাঁহার মতে অটল ছিলেন ; ছাত্রের সঙ্গে তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ বা vindictive হইতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা শুনিতে পাইলাম যে অধ্যক্ষ ও অভিযুক্ত ছাত্রের পিতার মধ্যে পত্রালাপ হইতেছে এবং ছাত্রের পিতৃব্য অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। কিন্তু পরেশবাবুর আর ডাক হইল না এবং কয়েক দিন পর বিস্মিত হইয়া শুনিলাম যে অধ্যক্ষ ছাত্রের পিতার কাছে এক চিঠি লিখিয়াছেন যাহার বয়ান এইরূপ : এই পরিস্থিতিতে (In the circumstances) এই ছাত্রকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর নাই। সুতরাং আশুতোষ-দৌহিত্রকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কোন অধ্যাপকের এইরূপ অভিজাত পরিবারের ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করার অধিকার আছে কিনা, অধ্যক্ষের এই জাতীয় কড়া নির্দেশ দেওয়া উচিত হইয়াছিল কিনা, সেই-সকল প্রশ্ন লইয়া তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, সেই ছেলেটি পরেশবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসে নাই এবং তাহার খুল্লতাতের সঙ্গে কথা বলার পর প্রিন্সিপ্যালও পরেশবাবুকে ডাকিয়া পাঠান নাই। সুতরাং এই বিষয়ের

পরিসমাপ্তি-সম্পর্কে পরেশবাবুর সঙ্গে আমাদের যে মতপার্থক্য হইয়াছিল তাহা একেবারেই অবান্তর বলিয়া প্রমাণিত হইল।

৪

১৯৩৪ সালে শ্যামাপ্রসাদবাবু ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েন। তাহার পূর্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বিরোধী ছিলেন—যেমন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—একে একে তাঁহার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীকুমারবাবুর প্রতি আমার দ্বিধাহীন আনুগত্য ছিল। সেই বন্ধন শিথিল হইবার নয়। কিন্তু তিনি যেভাবে আগাইয়া যাইয়া মিত্রতা করিলেন তাহা আমার ভাল লাগে নাই, কারণ আমি বেশ ভাল করিয়া জানিতাম যে শ্যামাপ্রসাদবাবু ইঁহাদের পূর্বতন বৈরিতা ভোলেন নাই এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমি তাহা টের পাইলাম, যদিও সবটা আমিও প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। শ্যামাপ্রসাদবাবু যখন ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েন তখন প্রথম সিনেট-সভায় অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে শ্রীকুমারবাবুও তাঁহাকে অভিনন্দন জানান। হয়ত তিনি একটু দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্যামাপ্রসাদবাবু নাকি ইহাকে কপটতার অভিব্যক্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন, এই কথা স্যারের কাছে শুনিয়াছিলাম। স্যারের প্রতিবেদনে একটু অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ভিত্তিহীন নয়।

ইংরেজি কাব্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাস সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কৃতিত্ব আমাদের পুরাতন বন্ধু প্রভাসচন্দ্র ঘোষের। কিন্তু যখন ইহা 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশনের কথা উঠে, তখন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমি খুব ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছি এবং আমিই ইহার ব্যবস্থাদি করিব এইরূপ প্রত্যাশাই করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে রাজশাহী বদলি হইবার প্রাক্কালে তিনি শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিবে ও প্রকাশ করিবে। আমি ইহাতে একটু দমিয়া গেলাম, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বা অন্য কাহারও গ্রন্থকে মর্যাদা দান করে, ইহা আমি তখনও বিশ্বাস করি নাই, এখনও করি না। তারপর আমার আশংকা হইল যে শ্যামাপ্রসাদবাবু মুখে যাই বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় একবার শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবলে পাইলে সহজে ছাড়িবে না। আমার আশংকা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইল। শ্রীকুমারবাবু আমার উপর ভার দিয়া রাজশাহী চলিয়া গেলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া দেখি, ক্ষুদে কর্তারা পথ আগলাইয়া বসিয়া আছেন ; দুইজন তো পাণ্ডুলিপি শুদ্ধ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইলেন। আমি বড়-ছোট সকলের কাছে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলাম ; দুই-একবার শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছেও গিয়াছি। তিনি অবশ্য খুব সৌজন্য-সহকারে সবরকমের সাহায্য দিবেন বলিতেন, কিন্তু কাজ আরম্ভই হয় না, আর তাঁহার তল্পিবাহকদের গগনস্পর্শী মুরুব্বিয়ানায় আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। শ্রীকুমারবাবুকে আমি খুব চিঠি লিখিতাম এবং তিনিও প্রায়ই কলিকাতা আসিয়া শ্যামা-প্রসাদবাবুকে অনুরোধ-উপরোধ করিতেন। এই পর্ব কিছুকাল চলিল ; শ্যামাপ্রসাদবাবু যেখানে মুদ্রণ ও প্রকাশনের চূড়ান্ত অর্ডার দিয়াছেন সেইখানে এইসব প্রারম্ভিক প্রশ্ন তোলার অর্থ হয় না। কিছুদিন পর এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তারপর মুদ্রণ ; তখনও প্রতিপদে বাধা আসিতে লাগিল। সেই আমলে প্রেস ছিল দারভাঙ্গা বিল্ডিং ও সিনেট

হাউসের মধ্যবর্তী জায়গায় একতলা একটা বাড়িতে। আমি এ বাড়ির বাবুদের ধরাধরি করিয়া ওখানকার নগ্নগাত্র, ঘর্মাক্ত কম্পোজিটর, মেসিনম্যানকে পর্যন্ত তম্বির করিতাম। কিন্তু মনে হইত, ইহারা উপর হইতে তেমন তাগিদ পাইতেছে না। বেশ কিছুদিন এইভাবে গেল ; আমার নির্বন্ধাতিশয্যে শ্রীকুমারবাবু আবার শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে যাতায়াত শুরু করিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুর পিতার সম্পর্কে ভারত সরকারের সাহেবরা মন্তব্য করিতেন— তিনি উদ্ধত, ক্রোধী ও আত্মম্ভরি। শ্যামাপ্রসাদবাবু ইহাদের কোনটিই নহেন। অনুমান করি তিনি যখন বুঝিলেন যে শ্রীকুমারবাবুকে একটু সমঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি অসমাপ্ত মুদ্রণের কাজ শ্রীসরস্বতী প্রেসকে দিয়া দিলেন। আর কোন বাধা রহিল না ; আমার সঙ্গে শৈলেন গুহরায় ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের চল্লিশ বৎসরব্যাপী সহযোগিতা আরম্ভ হইল। যথাসময়ে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশিত হইল এবং ইহার কয়েক বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ি প্রফেসরের পদ খালি হইলে শ্রীকুমারবাবু সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এইভাবে অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া তিনি মুখোপাধ্যায় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন।

৫

আমাদের স্যারের অর্থাৎ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অবসর গ্রহণের কথা ছিল ৩রা মার্চ, ১৯৩৮ ; সরকার তাঁহার কার্যকাল একবছর বাড়াইয়া দেন এবং সেইজন্য তিনি ১৯৩৯ সালে পেন্‌শন নেন। ঠিক তারিখ মনে করিতে পারিতেছি না, ১৯৩৮ সালে আমি স্বনামে তাঁহার ছাত্রদের কাছে একটা আবেদনপত্র প্রচার করি, যে এইরূপ কীর্তিমান অধ্যাপককে যথাযোগ্য বিদায়-সংবর্ধনা জানান হউক এবং কলেজে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। পত্রের শেষে চাঁদার জন্য আবেদন ছিল, কারণ প্রথমে তো টাকারই প্রয়োজন! আমার বিশ্বাস ছিল আশুতোষের ছেলেরা একান্নবর্তী, সুসংহত পরিবার। সেইজন্য ঐ বাড়িতে শুধু জ্যেষ্ঠ রমাপ্রসাদবাবুর নামে একখানা চিঠি দিয়াছিলাম এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পঞ্চাশ টাকার এক চেক পাঠান। তখনকার দিনে এই টাকাটা মোটা টাকা এবং আমি খুব খুশি হইয়াছিলাম। বাস্তবিকপক্ষে ইহার অপেক্ষা বেশি চাঁদা দিয়াছিলেন শুধু পাঁচজন রাজকুমার। এই-সব কাজে আমার সহযোগী ছিল বন্ধুবর তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং আশুতোষ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার খুব আসা-যাওয়া ছিল। প্রধান যোগসূত্র আশুতোষের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমার এক ক্লাস উপরে পড়িতেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমারও বেশ মুখচেনা ছিল। তারাপদ মুখার্জির সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবুর ওখানে একদিন দেখা হওয়াতে তিনি স্যারের বিদায়-সংবর্ধনার উদ্যোগ-আয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি ইহাতে খুব উৎফুল্ল হইলাম এবং পরে দুইজনে একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম।

শ্যামাপ্রসাদবাবু সানন্দে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করিলেন এবং কিভাবে কি করিতে হইবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। এই বিষয়ে প্রতি স্তরে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একটু আগেই ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক নিয়োগের পর আমরা যে তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সেও এই অনুষ্ঠান-সম্পর্কেই এবং আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল স্যারের বাড়ি। কিছুকাল পরে স্যারের আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় : তখন তিনিই ইহার উদ্বোধন করেন। তৎপূর্বে ফিজিক্স থিয়েটারে যে অতুলনীয় সভা হয় সেখানে তিনিই প্রথম বক্তা ছিলেন। আর বক্তা ছিলেন আজিজুল হক, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, যদুনাথ সরকার,

হীরেন মুখার্জি, হুমায়ুন কবির। অনেকেই ভাল বলিয়াছিলেন ; তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ডিরেক্টর বটমলি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা—যাহার শেষের বাক্যটির উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না : 'I sat with Professor Ghosh at many selection committee meetings, and there as I noticed with fearful joy candidate after candidate quailing before the fire of his examination, I thanked God that I had never to appear before such an interviewer for any job in my life'.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাজশাহী (১৯৪২—৪৬)

১

১৯৪২ সালে আমাদের কয়েকজনকে চাকুরির প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। ইহার জন্য ইণ্টারভিউ ; পরীক্ষক—পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ব্ল্যাণ্ডি সাহেব, ডি. পি. আই. বট্‌মলি প্রমুখ। ব্ল্যাণ্ডি সাহেব তখন খুব অসুস্থ ; কিছুদিন পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষকদের মধ্যে প্রধান ডি. পি. আই. বট্‌মলি এবং ইংরেজি বিশেষজ্ঞ অপূর্বকুমার চন্দ ও পেরেরা সাহেব। চারজন নির্বাচিত হইলেন : (১) সোমনাথ মৈত্র (২) তারকনাথ সেন (৩) আমি এবং (৪) আবু হেনা। তারক আমার অপেক্ষা ৫/৬ বছরের ছোট ; আমি যখন কলেজে প্রফেসর, সে তখন ছাত্র। সিনিয়রিটি ভঙ্গ করিয়া যে তাহাকে আমার উপরে বসান হইল ইহা আমার প্রতি ঘোর অবিচার। তারক জীবিত থাকিতে এবং তাহার মৃত্যুর পর নানাভাবে নানা জায়গায় তারকের সম্বন্ধে আমি এত সুখ্যাতি করিয়াছি যে তাহার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা হিংসা থাকিতে পারে, ইহা কেহ বলিবে না। আমি শুধু আমাদের দুই বড়কর্তা-সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। আমাদের আমলের চিত্র দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। বট্‌মলি সাহেব ঢাকা কলেজের অংকের অধ্যাপক হইয়া এদেশে আসেন ; কিন্তু ঢাকা কলেজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল তখন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় এই গাণিতিককে গ্রহণ করিলেন না। তারকনাথ সেনের চাকুরির প্রথম দিকটা খুব বিপর্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছে ; তাহাকে একাধিকবার ইন্টারভিউ দিয়া চাকুরি রক্ষা করিতে হইয়াছে। সর্বদাই স্যার তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; বট্‌মলি তাঁহার কাছে তারকের কথা শুনিয়া থাকেন। অপূর্ব চন্দ একেবারেই অন্ধ ; তাঁহার কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমি পূর্বেই জানিতাম যে বিলাতী বিদগ্ধমহলে আমার শ' বিষয়ক গ্রন্থের প্রশস্তির জনশ্রুতিতে চন্দ সাহেবের অক্সফোর্ড আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং এই হীনমন্যতা (ইহারই প্রকৃত নাম ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স) হইতে তিনি আমার বৈরিতা করিতে শুরু করেন। এই যে পর্যায় ভঙ্গ করিয়া ইঁহারা তারককে আমার উপরে বসাইলেন পরবর্তীকালে দেখা যায় যে তাহা আইনবিরুদ্ধ, সুতরাং ইহা উল্টাইয়া আমাকে আমার ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া হয়। জোর করিয়া যে বৈষম্য ইঁহারা সৃষ্টি করিলেন, তারক তজ্জন্য খুব অস্বস্তিবোধ করিয়াছিল এবং ইহা রদ হইল জানিয়া সে আমার জানার আগেই শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে তাহা জানাইয়া দেয়। তারকের সঙ্গে আমার প্রীতির বন্ধন কখনই শিথিল হওয়ার নয় এবং তাহা আমার বক্তব্যও নয়। আমি বলিতে চাই, বট্‌মলি ও চন্দ শুধু যে যথাক্রমে গণিত ও ইংরেজি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তাহাই নহে, ইঁহারা উভয়েই বহুকাল শিক্ষাবিভাগের বড়সাহেব ছিলেন, কিন্তু সরকারি চাকুরির নিয়মাবলীও ইঁহারা জানিতেন না।

ঠিক এই সময় আমি শেক্সপীয়রের কমেডি-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া, টাইপ করাইয়া তারকনাথ সেনকে উহা পড়িয়া পরিশোধন ও পরিমার্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছি। এই সময়ই অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পড়িয়া আমি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে নূতন করিয়া উৎসাহিত হইয়াছি এবং আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত-সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, লাইব্রেরি ও সহকর্মীদিগকে

ছাড়িয়া যাইতে আমার একটুও ইচ্ছা হইতেছিল না। দিল্লী ও চাটগাঁয় বেশ সুখে ছিলাম এবং দিল্লীর চাকুরি ছাড়িয়া ভুল করিয়াছিলাম—ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য আমার মমতা এত প্রবল যে আবার অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিল না। যেহেতু আমি তৃতীয় ও হেনা সাহেব চতুর্থ এবং রাজশাহী কলেজ চাটগাঁ কলেজ হইতে বড়, শুনিলাম সেই কারণে আমার ভাগ্যে রাজশাহী আর হেনা সাহেবের ভাগ্যে চাটগাঁ—কর্তৃপক্ষ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি ডি. পি. আই.-কে এক চিঠি লিখিয়া দিলাম—যাহার মর্মার্থ এই যে আমি প্রমোশনের জন্য লালায়িত নহি, প্রমোশন লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে চাহি না। তাহা হইলে আমার রিসার্চের ক্ষতি হইবে।

একদিন অন্য একটা প্রয়োজনে রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয় দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। সেইখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে এক অফিসার প্রবেশ করিলেন—যাঁহার নাম মহাতব-উদ্দীন সরকার। বিনয় অর্থদপ্তরের সহ-সচিব, মহাতব শিক্ষাদপ্তরের। জীবনে এইরূপ পথিকবন্ধু আর মিলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আগন্তুক নিজেকে আমাদের সহপাঠী বলিয়া পরিচয় দিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে আপনার করিয়া লইল ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি 'আপনি' হইতে 'তুমি' হইলাম। সে বলিল, সে এম-এ ক্লাসে আমাদের সঙ্গেই পড়িয়াছে ; তবে ইংরেজি নয়, ফিলজফি। আমাকে সে বেশ চিনিত, তবে আমি নামজাদা ছাত্র বলিয়া সাহস করিয়া আলাপ করে নাই। ইহার পরেই বলিল, 'কিন্তু ভাই, তুমি এ কি করিয়াছ? প্রমোশন লইয়া রাজশাহী যাইতে অস্বীকার করিয়াছ! কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া বটমলি সাহেব যদি তোমাকে ঐখানেই horizontal transfer অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে বদলি করে, তখন কি করিবে? বদলি সরকারি চাকুরির অবশ্য পালনীয় নিয়মের অঙ্গ। হয় তোমাকে চাকুরি ছাড়িয়া দিতে হইবে ; নাহয় মাথা হেঁট করিয়া নীচু পদেই রাজশাহী যাইতে হইবে।' বিনয়ের সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল ; কিন্তু সে আমার এই প্রত্যাখ্যানপত্রের কথা জানিত না। সে একটু বিস্মিত হইল, আমাকে মৃদু তিরস্কার করিল এবং মহাতাবউদ্দীনকে বলিয়া দিল—সে যেন অবিলম্বে আমার ঐ চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে এবং রাজশাহীর বদলির অর্ডার বাহির করিয়া দেয়।

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৯৪২) আমি রাজশাহী কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগদান করি। আমার যোগদানের কিছুকাল পরেই জাপানী বোমার ভয়ে সেক্রেটারিয়েটের কোন কোন দপ্তর—ইহার মধ্যে শিক্ষাদপ্তর একটি—রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয় এবং রাজশাহী কলেজ-প্রাঙ্গণেই সেই-সব অফিস বসে। সেইখানে মহাতব-উদ্দীনের সঙ্গে আবার দেখা ; এবং বছর-দুই এক জায়গায়ই ছিলাম। সেই দিলখোলা হাসি, সেই সহজ, স্বচ্ছন্দ আলাপ। দেশবিভাগের ফলে আমরা পূর্ববঙ্গীয়েরা শুধু যে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া আসিলাম তাহা নহে, হিন্দুরা মুসলমান বন্ধুদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। চাটগাঁ-প্রসঙ্গে মাহ্‌মুদ সাহেবের কথা বলিয়াছি। মাহ্‌মুদ সাহেব পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই থাকিলেন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে। মাহ্‌মুদ সাহেব ও-পার বাংলার সংবাদাদি পাইতেন, কখনও কখনও যাতায়াত করিতে পারিতেন। তিনি আমার বন্ধুদের নাম জানিতেন এবং সংবাদও আনিতেন। একবার তাঁহার কাছেই সংবাদ পাইলাম মহাতব-উদ্দীন চাকুরিরত অবস্থায়ই মারা গিয়াছে।

২

রাজশাহীতে গিয়া আমার বহুদিনের সুহৃদ্ সরোজবন্ধু সান্যালের বাড়িতে অতিথি হইয়া কলেজের কাজে যোগদান করিলাম। কলেজের অধ্যক্ষ স্নেহময় দত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে

আমার সহকর্মী ছিলেন। আরও অনেক পুরাতন মুখের দেখা পাইলাম ; তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমার বন্ধু গোপীনাথ ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন ছাত্র সদানন্দ চক্রবর্তী। তাহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কলিকাতা হইতে আসার পূর্বে ওখানে জাপানী আক্রমণ, বিশেষ করিয়া সম্ভাব্য জাপানী বোমাবর্ষণের আতঙ্কে কলিকাতা-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। আমার পরিবারবর্গ—বাবা, মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাগ্নে-ভাগ্নী—ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেখানে আমার কাকা থাকিতেন এবং শ্বশুরমহাশয়ের বাড়ি ছিল। আমি রাজশাহী বদলি হওয়ার কিছুদিন পর ফরিদপুরের পাট উঠাইয়া দিয়া বাবা সবাইকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। বন্ধুবর সরোজ সান্যালের ব্যবস্থাপনায় আমার নূতন সংসারযাত্রা শুরু করিতে কোন অসুবিধা হইল না। কিন্তু আমি নিজে দুষ্ট (malignant) ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়ি। ইহাতে কিছুকাল খুব কাবু হইয়াছিলাম। কিন্তু এই অসুস্থতা বাদ দিলে আমি আর ভুগি নাই। আমার মাতৃহীনা ভাগ্নী—তাহার মার জীবিতা-বস্থায়ও আমাদের কাছেই থাকিত—মা হইতে আসিয়া দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিয়া নিজেই চলিয়া যায়। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার সন্তান দুইটিকেও হারাইয়া জামাতা আর বিবাহ করে নাই ; তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অটুট রহিয়াছে।

এই-সব বিপদের দিনে খুব বেশি সাহায্য পাই দুইটি বন্ধু-পরিবারের নিকট হইতে। আমি যে বৎসর (১৯২০) প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হই সেই বৎসরই শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। তিনিও হিন্দু হস্টেলে আমার সঙ্গে এক ওয়ার্ডেই থাকিতেন। আর তাঁহার বাড়ি ও স্কুল ইদিলপুরও ফরিদপুর জেলায়। সেইজন্য আমি পূর্বেই তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার নাম শুনিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, কয়েক মাসেব মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়। প্রথম যেবার ভারতবর্ষে আই. সি. এস. পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হয়েন। তারপর বিলাত হইতে দেশে ফিরিলে, তিনি এখানে ওখানে চাকুরি করিবার সময় কলিকাতা আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত। আমি রাজশাহী কলেজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরেই শৈলেনবাবু ওখানে জজ হইয়া আসিলেন এবং আমাদের পূর্বপরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর একটি পরিবার—মুন্সী পরিবার ; ইঁহারা মানিকগঞ্জ-টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোক ; কর্মব্যপদেশে রাজশাহীতে আসিয়া ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। ইঁহাদের সান্নিধ্য দেখিয়াই বন্ধুবর সরোজ সান্যাল আমার আস্তানা ঠিক করিযাছিলেন। মুন্সীরা যৌথ পরিবারের লোক। একটু ঘনিষ্ঠতা হইতেই, মনে হইল আমরা একটা বড় যৌথ পরিবারের বহিরঙ্গনে আশ্রয় লইয়াছি। খানিকটা আমাদের বানারির বাড়ির মত। আমি তিন কর্তাকে দেখিয়াছি—অভয় মুন্সী, নীরদ মুন্সী, শরৎ মুন্সী। নীরদ মুন্সী আমার বাবার বয়সী হইবেন। তাঁহার বড়ছেলে নীহার মুন্সী কলিকাতার প্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক ; আমরা একই বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিলাম। মুন্সী-পরিবার সম্পর্কে অনেক কথা বলার মত। তবে যে ছোট্ট আখ্যানটি আমার মনে বেশি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা বলিয়াই মূল কাহিনীতে ফিরিয়া যাইব। দিল্লী থাকাকালে বীরুবাবুর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী পরিচয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে বীরুবাবু নাকি রমেশ দত্তের জামাতা জে. এন. গুপ্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বীরুবাবু বালিকা কন্যা ফুলটুসী ও বালকপুত্র শীলটু এবং নিঃসম্বল স্ত্রীকে রাখিয়া মারা যান। বিধবা ও নাবালক কন্যা ও পুত্রের ভার গ্রহণ করেন ডাক্তার সুধীনবাবু। একদিন মুন্সীদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জানিলাম যে ফুলটুসী মুন্সী-পরিবারের উপার্জনশীল পাত্রের সঙ্গে বিবাহিত হইয়াছে। বীরুবাবুর মেয়ে এমন ঘরে বরে পাত্রস্থ হইয়াছে জানিয়া খুব খুশী হইলাম এবং কেমন করিয়া ইহা সংঘটিত হইল তাহা

জিজ্ঞাসা করিলাম। মুন্সীদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান সামান্য, কোন কৌতূহলও হয় নাই। সুধীনবাবুর মা তাঁহাদের (পিসতুত) দিদি ; তাঁহাকে তাঁহারা খুব মান্য করেন। দিদি যে পাত্রী ঠিক করিয়া দিয়াছেন তাহাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতেই হইবে। দিল্লীতে যে বদান্যতার সূত্রপাত দেখিয়াছিলাম, রাজশাহীতে তাহার পূর্ণ পরিণতির পরিচয় পাইলাম। শেক্সপীয়রের ভাষার দ্যোতনা সর্বব্যাপী ; বিপরীত প্রসঙ্গেও তাহার তাৎপর্য নষ্ট হয় না। এই স্নেহসিক্ত পরিণতিতে আমার মনে হইল, 'The wheel is come full circle.'

৩

চাটগাঁ একটা বন্দর শহর, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের শহর—বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থিত। আমি যখন ওখানে চাকুরি করিতে যাই, তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় সবটাই সাহেবদের হাতে : বাঙ্গালীরাও প্রধানতই সেই সূত্রে সাহেবদের সঙ্গে যুক্ত। অথচ বন্দী সূর্য সেনের ভয়ে সাহেবরা শহরের জীবনযাত্রা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন। ওখানকার নিজস্ব যে সংস্কৃতি ছিল তাহা বৈপ্লবিক এবং তাহা ফল্গুধারার মত সাধারণ জীবনযাত্রার অন্তরালে প্রবাহিত হইত। আমি দেখিতাম, যাহা-কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাহা সবই কলেজ-কেন্দ্রিক এবং তাহাও খুব সীমিত, কারণ পঁচিশ বছরের কম বয়সী প্রত্যেক হিন্দু ছেলেকেই পুলিশ হইতে দেওয়া কার্ড লইয়া ঘুরিতে হইত। রাজশাহী বরেন্দ্রভূমি, ভূ-স্বামিপ্রধান জায়গা। ইহার প্রাচীন ঐতিহ্য গর্বের বস্তু ; আমি যখন ওখানে যাই তখন অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রয়াত ; কিন্তু ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক অক্ষয় মৈত্র মহাশয়ের অমর কীর্তি 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' বর্তমান। উপাধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের হিসাবপত্র আমাকে দেখিতে হইত ; তখন অবাক হইয়া বেসরকারি বিশেষ করিয়া রাজা জমিদারদের—দীঘাপতিয়া, পুঁটিয়া, দুবলহাটির ভূ-স্বামীদের—দানের বহর লক্ষ্য করিতাম। আমাদের রাজা-জমিদারদের হয়ত অনেক দোষ ছিল, কিন্তু ইহাও সত্য—এবং এই সত্য জওহরলাল নেহেরুও স্বীকার করিয়াছেন যে—বাংলার জমিদাররা দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতিকল্পে শ্রম ও বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। যখন জমিদারি ব্যবস্থা প্রায় অন্তিম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই সময় আমি ওখানে যাই। কিন্তু তখনও দেখিতাম ঐখানে নানারকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লাগিয়াই আছে। কোন জমিদার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর জমান, কেহ-বা যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন এবং কলেজে, পাড়ার ক্লাবে অপেশাদার থিয়েটার, রবীন্দ্রজন্মোৎসব, সারস্বত সম্মিলন প্রভৃতি উৎসব লাগিয়াই আছে। আমার এইদিকে উৎসাহ, প্রবণতা বা দক্ষতা না থাকিলেও আমি ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িলাম। যেখানে বাঙ্গালী, সেইখানেই দলাদলি। একবার একটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াই দেখি, কাহাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আমি কলেজের কর্মচারী এবং সব পাড়ায়ই আমার ছাত্র ; সুতরাং সকলের দাবিই মানিতে হয়। রাগ করিত আমার কলেজ আমলের বন্ধু মন্মথ রায়। সে ওখানকার মুন্সেফ ; অপরাহ্ণে আমাদের একসঙ্গে ভ্রমণে বাধা পড়িত বলিয়া সে ঠাট্টা করিয়া বলিত যে সন্ধ্যাবেলা বক্তৃতা না করিতে পারিলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

শিক্ষাদপ্তর ওখানে স্থানান্তরিত হইলে কাজি আব্দুল ওদুদ ওখানে গেলেন। তিনি টেক্সট বুক কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। অফিসের কাজ তাঁহার ছিল খুব হাল্কা ধরনের। তিনি সুবক্তা এবং 'বুদ্ধির মুক্তি'তে বিশ্বাসী। মনে হয়, গোঁড়া মুসলমানরা তাঁহাকে তেমন পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সম্প্রদায়নির্বিশেষে যুবকসমাজে তাঁহার অনুগামীর অভাব ছিল না। তিনি এই সময় গ্যেটে-সম্পর্কে বই লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। আমাকে অনেক দিন

সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়িতে আহ্বান করিতেন। কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস হইতে আর একজন সাহিত্যিক বদলি হইয়াছিলেন—বরকত-উল্লাহ্। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ; কোন একটা দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। আর ছিলেন আমার সহকর্মী কাজি আক্রাম হুসেন। ইনি ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি-এ পাস করিয়াছিলেন ; তারপর বোধ হয় লেখাপড়া হইতে একটু বিচ্ছিন্ন বা অমনোযোগী হইয়া পড়ায় এম-এ'তে তেমন ভাল করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভাল ইংরেজি ও ভাল বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। একটু নিরিবিলি থাকিতে ভালবাসিতেন ; সেইজন্য যোগ্যতা-সত্ত্বেও চাকুরীতে উন্নতি করিতে পারেন নাই। বরং একবার অস্থায়ী উন্নতির আদেশ হইলে ঢাকা যাওয়ার হাঙ্গামা এড়াইতে আমার সাহায্যে সেই প্রমোশন খারিজ করাইয়া লইলেন। এই ভাল গদ্যলেখকের 'হবি' ছিল কবিতা লেখা এবং তিনি ফার্সী ছন্দের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া শাহ্‌নামার অনুবাদ করিতেন। এমন করিয়া আমরা অন্ততঃ তিনজন বৈকুণ্ঠ একত্র হইলাম—আমি আর দুই কাজি সাহেব। প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া খাতা। অবশ্য আমি খাতা শুনাইতাম না ; সভায় বক্তৃতা করিতাম।

যে-সকল সাংস্কৃতিক সম্মিলন বা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কথা বলিলাম, তাহার উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা সবই হিন্দু। মুসলমানদেরও পৃথক্ সম্মিলন ছিল। মুস্লিম হস্টেলে আমি প্রধান অতিথি হইয়া বক্তৃতা করিয়াছি। কলেজের মুস্লিম ছাত্রদের আহূত বিরাট ধর্ম-সম্মিলনের বিতর্কসভায় মধ্যস্থ হওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আমি অনধিকারী বলিয়া সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি ; তাহা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা এই অনধি-কারকেই মধ্যস্থতার অনুকূল বলিয়া জোর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আহূত কবি ইকবাল জয়ন্তীতে আমি (ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে) ইকবালের কাব্য-সম্পর্কে যে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা সম্মিলিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি চিরকালই অগোছাল লোক ; সেই লেখাটা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

৪

উপরে যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলিলাম তাহার অন্তরালে তিক্ততা ও বৈরিতার একটা আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হইতেছিল ; একদিন তাহা হইতে অগ্নিধারা নির্গত হইয়া আমাকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন অবিচলিতভাবে আমি সেই অগ্নিস্রাবের সম্মুখীন হইয়াছি। এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়াছে, এখন পরিস্থিতি নূতন করিয়া তুলিয়া লাভ আছে কিনা জানি না। বিশেষতঃ রাজশাহী এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং সেইজন্য সেই আমলের সাম্প্রদায়িক কলহের কাহিনীকে বিস্মৃতির আঁধার হইতে দিবালোকে আনা উচিত হইবে কিনা জানি না। কিন্তু অতীত অপসৃত হইলেও লুপ্ত হয় না এবং সেই দিনের কাহিনী আজও হয়ত একেবারে অর্থহীন হইয়া যায় নাই।

আমি পূর্ববাংলার লোক এবং এমন গ্রামের লোক যেখানে তখনও মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও ইহাদের আমি জানিতাম ; ইহাদের দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ আমি দেখিয়াছি! একটি পরিবারকে প্রতিনিধি হিসাবে ধরিয়া আমার বক্তব্য বলিব। আমাদের বাড়ির অদূরে থাকিত আলিমুদ্দীন, তমিজুদ্দীন, তাহাদের দুই ছোটভাই ও বিধবা মা। বিধবা মা বয়সে আমার নিঃসন্তান বড়মার চেয়ে ছোট হইবে না। তবু সে বড়মাকে মা ডাকিয়া আমাদের আপন করিয়া লইল। এই সম্পর্ক পাতাইবার আর্থিক লক্ষ্য ছিল আমাদের দুইখানি ক্ষেত—যাহা উপযুক্ত খাজনা দিয়া তাহারা চাষ করিতে চাহিত। সব সময়

যে তাহারা এই সুবিধা পাইত তাহা নহে। কখনও কখনও অন্য লোককেও ইহা ইজারা দেওয়া হইত। যাহা হউক, ইহাদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয় এবং দ্বিতীয় ভাই তমিজুদ্দীন অনেক সময় আমাদের বাড়িতেই থাকিত। এই মুসলমান পরিবারের সততা, পরিশ্রমশীলতা এবং দারিদ্র্য আমি বেশ ছোটকালে খুব নিকট হইতে দেখিয়াছি। ইহারা পাটচাষী ; পরে দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, আমাদের গ্রামেরই মুসলমান ব্যাপারী পাটের কারবার করিয়া মোটামুটি সচ্ছল, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি নদীবন্দরের পাটের সাহেবরা এবং কলিকাতা ও চট্টগ্রামের বড় সাহেবরা প্রায় কিছু না করিয়া হাজার হাজার টাকা লুটিতেছে, এবং বড়বাবুরা শতাধিক টাকা রোজগার করিতেছে, তদূর্ধ্বে ডাণ্ডির ব্যবসায়ীরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্ত' যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিতে সচকিত হইয়া ইংরেজ রামা কৈবর্ত্তকে ছাড়িয়া দিয়া হাশিম শেখের মুরুব্বি হইল। সে দেখিল, হাশিম শেখদিগকে মুনাফার বড় ভাগ দিতে হয় না, আর রামা কৈবর্ত্ত হাশিম শেখের মতই নীরব ও নিষ্ক্রিয় হইলেও তাহার জাতভাইদের মধ্যে যাহারা উচ্চশ্রেণীর তাহারাই চেঁচামেচি করিয়া, বোমাপিস্তল ব্যবহার করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিব্রত করিতেছে। সুতরাং বোবা হাশিম শেখদিগকে বাদ দিয়া তাহাদের কয়েকজন সরব পৃষ্ঠপোষককে খাড়া করিতে চেষ্টা করিল। কাউন্সিলার, মন্ত্রী, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি হইতে আরম্ভ করিয়া অফিসের কেরানী—এই-সব চাকুরীর লোভ দেখাইয়া একদল রাজভক্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে হইবে আর চাকুরী লইয়া হিন্দু-মুসলমানরা কাড়াকাড়ি করিলে ইংরেজ প্রভুরা একটু নিরুপদ্রবে শাসন ও শোষণ করিতে পারিবেন। এই খেলা মিন্টোর সাহায্যে মর্লি আরম্ভ করিয়াছিলেন ; ইহাকে লিনলিথগোর সাহায্যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড পূর্ণরূপ দিলেন। উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান গ্রাজুয়েট তৈরী করিবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উপযুক্ত কারখানাও প্রস্তুত হইল। একটা মুশকিল দেখা দিল যখন এই ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগে প্রবর্তিত হইল। কেরানীই বলুন আর হাকিমই বলুন, তাঁহারা নিজেদের ঘরে বসিয়া কাজ করেন এবং তাঁহাদের ভুলত্রুটিতে যদি দেশের কোন ক্ষতি হয়, ইংরেজের কোন অসুবিধা নাই, কারণ কল্যাণরাষ্ট্র স্থাপন করা ইংরেজ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য নয়। শিক্ষাবিভাগে প্রথম যখন স্কুলে মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হইল তখন আমাদের পাঠ্যাবস্থায়ই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। আগে সরকারি স্কুল অর্থাৎ জেলা-স্কুল বা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনার উঁচু মান রক্ষিত হইত এবং সেখানেই ভাল ছেলেরা ভিড় করিত। ক্রমে সরকারি স্কুলের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল এবং ভাল বেসরকারি স্কুলের প্রতিপত্তি বাড়িল।

সরকারি স্কুলের এই অধোগতি অনেকটা অলক্ষিতে হইল এবং পরে লোকের নজরে আসিলেও তেমন সোরগোল হইল না, কারণ সব শহরেই চলনসই বেসরকারি স্কুল ছিল। কিন্তু কলিকাতা ও ঢাকা ছাড়া কলেজ তো শহরে একটাই : সুতরাং সেখানে হঠাৎ পঠন-পাঠনের মান নামিয়া গেলে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের বন্ধুবান্ধব যাঁহারা অন্যান্য বিভাগে কাজ করেন, তাঁহারা মনে করেন যে ক্লাসে ডিসিপ্লিন রক্ষা করা অতি সহজ ব্যাপার : কয়েকটা নিরস্ত্র চেনা-জানা যুবককে চুপ করাইয়া রাখা এমন একটা কি কাজ! তাঁহারা নিজেদের ছাত্রজীবনের পরিস্থিতি, ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষককে ক্লাসকে শান্ত সংযত রাখিতে হয় প্রধানতঃ বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা। চাটগাঁ কলেজে গিয়াছিলাম ১৯৩৩ সালে ; তখন—জহরলাল নেহেরু যাই বলিয়া থাকুন—আমি সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি দেখি নাই। ইহার পর ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে নূতন আইন হইয়াছে, নির্বাচন হইয়াছে এবং লাহোরে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান দাবি করিয়া মুস্লীম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। দশ বছরে বঙ্গদেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯৪২ সালে রাজশাহী কলেজে যোগদান করিয়াছিলাম। তখনও ওখানে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ঐতিহ্য ছিল। আমি নিজের চোখে দেখি নাই,—আমি যাওয়ার কিছুকাল আগে লারকিন নামে ওখানে এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ; তিনি নাকি গভর্নমেন্টের কাছে এক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন যে অন্যান্য জেলায় সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয় অন্যত্র এবং পরে তাহা কলেজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। রাজশাহীতে ঠিক বিপরীত ; এখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্ম হয় কলেজে এবং পরে তাহা বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। কলেজ যে সাম্প্রদায়িক কলহের পীঠস্থান তাহা ওখানে যোগদান করিয়াই টের পাইয়াছিলাম। দুই-তিন বৎসরে দেখিলাম, সেই আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার লক্ষ্য আমি।

কলেজের অধ্যক্ষ স্নেহময় দত্ত ; উপাধ্যক্ষ আমি। দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম দিকে আমার একটু মতান্তর হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আমার মত যাহাই হউক, প্রশাসনিক ব্যাপারে আপনার ও আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে পার্থক্য হইলে আপনার মতই আমার মত। আমি যদি তাহা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে প্রশাসন অচল হইয়া যাইবে ; আর যদি পার্থক্য এত গুরুতর হয় যে আমার পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়, সেই দিন আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব।' এই স্পষ্টোক্তির জন্যই কিনা জানি না, ইহার পর তাঁহার সঙ্গে আমার আর কোন বিরোধ হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর আমাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্নেহময় দত্ত মহাশয়ের মধ্যে আমি একটা গুণ লক্ষ্য করিয়াছি যাহা কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক সময়ই দেখা যায় না—ইহা তাঁহার সত্যবাদিতা। রাজশাহীতে আমরা অনেক ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া গিয়াছি। অনেক সময় মনে হইয়াছে যে তিনি কথার একটু অদল-বদল করিয়া বলিলে সহজেই ঝামেলা এড়াইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। একবার একটা ক্লাসে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে মুসলমান ছেলেরা অশালীন ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া মেয়েদের নেত্রী প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল কি বলিয়াছেন তাহা আমরা আর কেহ জানি না। কিন্তু লড়াকু মেয়েটি হৈচৈ করিয়া বেশ একটা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। সামনেই ছিল একটা মিলনোৎসব—যেখানে বাহির হইতে অতিথি আসিবেন। সুবিধা পাইয়া হিন্দু ছাত্রেরা এই উৎসব বয়কট করিল। আমরা অতি কষ্টে নিয়ম রক্ষা করিলাম। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভবিতব্য-সম্পর্কে অর্থাৎ কি হইলে আর কি হইতে পারে এইজাতীয় প্রত্যুক্তি। মহাজন বিসমার্ক প্রভৃতির মত একটু কমা, সেমিকোলনের এদিক ওদিক করিলেই হয়ত এই অসম্মান হইত না, ঝামেলা বাঁচিয়া যাইত। তিনি সেই পথে গেলেন না : মেয়েটি তাঁহার উক্তি যেভাবে পেশ করিয়াছে, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন—ইহা মেয়েদের পক্ষে আপত্তিজনক নয়। এই সৎসাহস অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না।

এই সময়ে আমাদের পক্ষে প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি করিলেন ইংরেজ সরকার। কোন্ পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ইহা স্থির করার জন্য নিযুক্ত হইলেন একজন সাহেব অফিসার। সেই-সব পদে শুধু মুসলমানরাই আসিতে পারিবেন এবং ইহার জন্য সর্বনিম্ন (মিনিমাম) যোগ্যতা থাকিলেই চলিবে। আর বাকি পদগুলিতে সবাই দরখাস্ত করিবেন। ইহা হইল প্রথম নিয়োগের সম্পর্কে প্রযোজ্য, কিন্তু চাকুরীতে একবার প্রবেশ করিলে মুসলমানদের এই সুবিধা থাকিবে না ; অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়াই প্রমোশন পাইতে হইবে। ইহা squaring the circle বা বৃত্তকে চতুষ্কোণ করার

মত। একই সময়ে সাধারণ অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য চিহ্নিত নয় এমন পদে প্রথম শ্রেণীর এম-এ এবং সংরক্ষিত পদে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিচুস্তরের মুসলমান প্রার্থী লেকচারার নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের যোগ্যতা কি একরকমের হইতে পারে? কিন্তু চাকুরীতে প্রবেশ করিলে প্রমোশনের প্রার্থনা সবাই করিবে ইহাই স্বাভাবিক। চাকুরীরত প্রার্থীদের যোগ্যতা-বিচারের প্রাথমিক মাপকাঠি হইল অধ্যক্ষের দেওয়া বাৎসরিক গোপনীয় রিপোর্ট। সেক্রেটারিয়েটে সর্বত্র তখন মুসলমানদের প্রাধান্য। সুতরাং কোন রিপোর্টই গোপন থাকে না। অল্পবয়সী মুসলমান অধ্যাপকেরা মনে করিতে লাগিলেন যে প্রিন্সিপ্যালকে তাঁহারা বশে আনিতে পারিতেন কিন্তু আমি কঠোর প্রকৃতির লোক এবং প্রিন্সিপ্যাল একেবারে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং আমি থাকিলে তাঁহাদের সম্পর্কে প্রিন্সিপ্যাল অনুকূল রিপোর্ট দিবেন না।

এই সময় আমার আর একটা অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই সময় নূতন যে-সকল লোকের আমদানী হইল, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রমোশন পাইলেন তাঁহারা আরও প্রমোশন চান এবং তাড়াতাড়ি চান ; অন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও বিলম্বের জন্য প্রস্তুত নহেন। একজন আমাকে ধরিলেন দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে তিনি প্রতিদিন আমার কাছে আসিবেন এবং আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাজ করিবেন—যাহাতে তিনি শীঘ্রই ডক্টরেট পাইতে পারেন। ডক্টরেট এখন যতটা সহজ হইয়াছে তখন তাহা হয় নাই ; কারণ তখন দুই শ্রেণীর ডক্টরেট হয় নাই। এখনও তিন মাসে ডক্টরেটের থীসিস রচনা করিতে কাহাকেও দেখি নাই। এই সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিলাম তাঁহার প্রস্তাব খুব সরল। তিনি রোজ আমার কাছে আসিবেন, আমার সাহায্যে থীসিস লিখিবেন অর্থাৎ আমি বলিয়া যাইব তিনি লিখিয়া যাইবেন। আমি ব্যাসদেবও থামিব না, তিনি গণেশও অনবরত কলম চালাইয়া যাইবেন। বাড়ি যাইয়া তিনি খসড়াকে ঠিকঠাক করিয়া ফেলিবেন, আমি কোনও বই-এর উল্লেখ করিলে তাহা দেখিয়া লইবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর কলেজ খুলিলে একেবারে পাকা করিবেন। আমার পাণ্ডিত্যের উপর তাঁহার এত আস্থা আছে যে তিনি মনে করিতেন, যে আমি ইচ্ছা করিলেই এই অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তিনমাসের জায়গায় আরও একটু বেশি সময় লাগিতে পারে এই পর্যন্ত। তারপর ইঁহারা সবাই জানিয়া ফেলিলেন যে গোপীনাথ ভট্টাচার্য ও সদানন্দ চক্রবর্তীকে এক-জাতীয় রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে আর সকলেই ইঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট রিপোর্ট পাইয়াছেন। যাঁহার যোগ্যতা যত কম তাঁহার রোষ তত বেশি। আমি চাটগাঁ কলেজে বি-এ ক্লাসে ঐচ্ছিক বাংলা পড়াইয়াছি ; এখানেও পড়াইতাম। বাংলার একজন অধ্যাপককে লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়া গেল। ইনি কলিকাতার আশুতোষ-মার্কা এম-এ ; সুতরাং বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমী প্রভাব-সম্পর্কে সচেতন। একদিন তিনি ক্লাসে বলিলেন, 'As Tennyson says in *Lycidas*,....., আর অমনি এক ছাত্র উঠিয়া বলিল, 'Sorry Sir, *Lycidas* was written not by Tennyson but by Matthew Arnold'. অধ্যাপকমহাশয় সরল-প্রাণে তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'Yes ; as Matthew Arnold says in *Lycidas*...' —ইহার পরবর্তী অংশ আর শেষ হইল না।

ইহার কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটিল যাহা শুধু কৌতুককর নয়, আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিতবহ। এই অধ্যাপকই একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্লাস ছাড়িয়া দুষ্টু ছেলের পালের গোদা জিতেনের নামে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে লইয়া বসিলেন, সঙ্গে ফরিয়াদী অধ্যাপক। আসামী জিতেন আসিয়া একেবারে সুর উল্টাইয়া দিল। সে বলিল, সে অতিশয় নিরীহ বিদ্যার্থী হিসাবে পাঠ্যবই হইতে 'খড়ম-পূজা'—

এই শব্দসমষ্টির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অধ্যাপক ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারিতেছিলেন না, সুতরাং জিনিসটা বুঝিয়া লইবার জন্য সে যখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতেছিল, পিছনে কতকগুলি ছেলে গোলমাল ও পাল্টা গোলমাল করায় সেও অসুবিধায় পড়িয়াছিল। অধ্যাপকও স্বীকার করিলেন যে জিতেন নিজে গোলমাল করে নাই। তাহা হইলে দেখা গেল, দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পড়িয়া এম-এ পাস করিলেও অধ্যাপক বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নহেন এবং রাম ও ভরতের কাহিনী তিনি জানেন না। আগে জানা থাকুক আর না থাকুক, তিনি ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়া যান নাই। ব্যাপারটা বেশ বোঝা গেল। জিতেন ও তাহার সঙ্গীরা পরামর্শ করিয়াই এই কাজ করিয়াছে। তাহারা অধ্যাপকের বিদ্যার দৌড় জানিয়াই ঠিক করিয়া আসিয়াছিল —জিতেন ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করিতে থাকিবে, আর পিছন হইতে বন্ধুরা হৈচৈ করিতে থাকিবে। আর একটা আশঙ্কাজনক পরিণতির আভাসও পাওয়া গেল। জিতেনের সঙ্গীরা গোলমাল করিতে আরম্ভ করিলে মুসলমান ছাত্রেরা তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে যাইয়া পালটা গোলমাল করিয়াছিল এবং সেইজন্যই অধ্যাপক মহাশয় শুধুমাত্র একজনের নামে নালিশ করিয়াছিলেন।

এই নূতন সম্ভাবনার আভাস অধ্যক্ষ দত্ত তাঁহার বাড়িতে বসিয়াই পাইলেন। তাঁহার বড়ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পড়িত। এই ঘটনার কয়েকদিন পর হইতেই তিনি ছেলের কাছে শুনিতে পাইলেন যে এই অধ্যাপকের ক্লাসে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ছাত্র বেশি ; সেখানে গোলমাল আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে প্রথম যে শলাপরামর্শ হয়, সেখানে আমি প্রস্তাব করি—আগে তো বাংলা বিভাগ সংস্কৃতের অধীন ছিল, সংস্কৃতের অধ্যাপকদের কাজ কম, উঁহারা কেহ ইন্টারমিডিয়েটের বাংলা পাঠনের অংশ গ্রহণ করুন ; বাংলার বিশেষজ্ঞ সেই অধ্যাপক উঁচু ক্লাসে স্পেশাল বাংলা পড়াইবেন। প্রশ্ন উঠিল যে, রাজশাহী কলেজের ঐ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে মুসলমান অধ্যাপকের জায়গায় সংস্কৃতের তথা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুপ্রবেশ হইলে ইহা লইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উঠিবে। সুতরাং অধ্যক্ষ প্রস্তাব করিলেন যে বাংলা সাহিত্যে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনার জন্য আমি সুপরিচিত, আব পদাধিকার বলেই অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে বিভাগীয় অধ্যাপকদের সামিল করা যায় না। তাঁহারা হইলেন প্রশাসনিক অফিসার। সেই ব্যবস্থাই হইল। আমি কিছুদিন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের বাংলা পড়াইয়া দিলাম। বাংলার অধ্যাপককে অন্য একটা কলেজে বদলি করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সরকারে পাঠান হইল এবং গৃহীতও হইল। বছর তিন-চারেক ডি. পি. আই. অফিস রাজশাহীতে কলেজের আঙ্গিনায় ছিল, সহকারী ডিরেক্টর আব্দার রহমন খাঁ ওখানেই অফিস করিতেন ; একাধিকবার তিনিই আমাকে বলিয়াছেন যে রাজশাহীর মত বড় কলেজে উল্লিখিত অধ্যাপক আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। উঁহাকে কোন ছোট কলেজে পাঠান সঙ্গত হইবে। তাহাই করা হইল। এইরূপ বদলি সচরাচর হইয়া থাকিত এমন কথা বলিতেছি না ; তবে একেবারে বিরল নয়। আমরা একটা ক্লাসে গোলমাল করিয়াছিলাম বলিয়া জরিমানা দিয়াছিলাম কিন্তু সেই অযোগ্য অধ্যাপকও কৃষ্ণনগরে বদলি হইলেন। বোধ হয় ১৯২৮ সালে প্রথম সব কলেজে একজন করিয়া বাংলার লেকচারার নিয়োগ করা হয় এবং জনৈক নিরীহ প্রবীণ ভদ্রলোককে এই তালিকায় শীর্ষে রাখা হয়। শোনা যায়, পাঁচটা কলেজের গভর্নিং বডিই ইঁহার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই কারণে তাঁহাকেই প্রেসিডেন্সী কলেজে নিযুক্ত করা হয় ; কিন্তু ছেলেদের সামলাইতে পারিলেন না বলিয়া কিছুদিন না যাইতেই তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইল। আমি যখন চাটগাঁ কলেজে ছিলাম,

তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে একটা পদ খালি হইলে অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ একজনের নাম সুপারিশ করিলেন এবং তাঁহাকে কি পড়াইতে হইবে স্যার তাহা পর্যন্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অর্ডার আসিল ঐ কলেজের অন্য একজন লেকচারারের অনুকূলে। শুনিলাম যে স্যারেরই বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেনের প্রভাবে এই পরিবর্তন হইয়াছে এবং কিছুদিন পরে আমি নিজেই প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইয়া দেখি, গিরিশবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার ক্লাসে তুলকালাম কাণ্ড। সুতরাং তাঁহাকেও কৃষ্ণনগর যাইতে হইল।

রাজশাহীতে সকল মুসলমান প্রফেসর নিকৃষ্ট মানের ছিল এমন কথা বলিব না। শ্রদ্ধেয় আক্রাম হুসেনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমি যোগদান করিয়া যে তরুণদের দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দর্শনের লেকচারার ফজলুর রহমান। নিরীহ, বিদ্যার্থী যুবক ; খুব যে মেধাবী তাহা নহে কিন্তু তাহার মধ্যে দর্শন-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখিতে পাইয়া আকৃষ্ট হই। ইহার নিকট হইতে এগারশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্যাল্ট লিখিত 'Kant's Metaphysic of Experience' ধার করিয়া আনিয়া আমি পড়ি এবং আকৃষ্ট হইয়া এই—একাধিক অর্থে—মূল্যবান গ্রন্থখানি কিনি। আমার অধিকাংশ বই হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই দুই ভল্যুম যথাস্থানে আছে। একটা কারণ হয়ত এই, যে কান্টদর্শন এমন ভয়াবহ বস্তু, যে চোরেরাও এই বই চুরি করিতে সাহস পায় না। আর একজন ছিলেন সুলতান-উল-ইস্‌লাম—ইকনমিক্সের লেকচারার। খানদানী ঘরের ছেলে ; বেশ ভাল বলিতে পারিতেন। মনে হইত লেখাপড়া গভীরভাবে করেন না, কিন্তু খুব চটপটে—প্রমোশন পাইলে খুশি হইতেন, কিন্তু তাহার জন্য তদ্বির, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নোংরা ব্যাপারের মধ্যে যাওয়ার লোক নহেন। ঢাকা হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি যুবক আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—মীর্জা নুরুল হুদা (ইকনমিক্স) ও আজিজুর রহমান মল্লিক (ইতিহাস)। হুদা ইকনমিক্সের ভাল ছেলে, অল্পদিনের মধ্যেই সুশিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইলেন। তিনি বোধ হয় মনে মনে জানিতেন যে তিনি স্বীয় ধীশক্তিবলেই উপরে উঠিবেন ; সুতরাং ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। আজিজুর রহমান মল্লিক আসিয়াছিলেন আমার রাজশাহী ত্যাগের কিছুদিন পূর্বে। তবে তিনি আমার পাড়ায় থাকিতেন এবং আমাদের মধ্যে বেশ যাতায়াত ছিল—সদালাপী : কালচার্ড লোক বলিয়া মনে হইত। যতদূর মনে আছে, তিনিও সুশিক্ষক বলিয়া ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

৫

কবে কখন আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধিতেছিল তাহা আমি টের পাই নাই, কিন্তু যেভাবে বিস্ফোরণ হইল, তাহা হইতে মনে হয় ইহা খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়। হয়ত সেইজন্যই ফাঁসিয়া গেল। তবে ইহার নায়ক যে ডক্টরেট-অভিলাষী হাতুড়ে, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ দেখি নাই এবং সেই আমলের পত্র-পত্রিকার মন্তব্যেও ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য আজ ইঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে আমার নালিশ নাই। ইংরেজ সরকার যে শাসনযন্ত্র স্থাপন করিলেন এবং তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের ব্যক্তিগত লালসা এমনভাবে জাগ্রত হইল যে এইরূপ ঘটনাকে উপেক্ষা করাই উচিত। কিন্তু ছোট হইলেও ইহার মধ্য দিয়া সেই আমলের ইতিহাস প্রতিভাত হইবে ; আর ছোট-বড় সকল ঘটনাই মনুষ্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে শেক্সপীয়রের 'মারচেন্ট অব ভেনিস' নাটক পড়াইতে যাইয়া কেবল আসন গ্রহণ করিয়াছি, নাম ডাকিয়াছি কিনা মনে নাই, এমন সময় ফজলুর রহমান, মোকলাশ আলি মণ্ডল ও আব্দার রহমান এই তিনটি ছেলে—ফজলুরই প্রধান— উঠিয়া বলিল যে আমি মুসলমান জাতি সম্পর্কে খুব অপমানজনক উক্তি করিয়াছি এবং ইহার প্রতিবাদে তাহারা অর্থাৎ মুসলমান ছাত্রেরা আমার ক্লাস করিবে না। আমি কোথায় কি উক্তি করিয়াছি তাহা না বলিয়া তাহারা নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল এবং অন্যান্য ক্লাসে ঢুকিয়া মুসলমান ছাত্রদের বাহির করিতে লাগিল। আমি যখন আমার ঘরে আসি তখন দোরগোড়ায় অধ্যক্ষ স্নেহময় দত্তের সঙ্গে দেখা। তাঁহার আশেপাশে আরও লোক। তিনি ঈষৎ ক্ষোভের সহিত বলিলেন, 'আপনার এক অসতর্ক উক্তিতে এখন আমরা সবাই কি মুশকিলে পড়িয়াছি।' আমি উত্তর করিলাম, 'কবে কাহার কাছে কি বলিয়াছি?' আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়াই ডক্টর দত্ত বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাপারটা কল্পিত, কারণ ইহা অপেক্ষা গর্হিত কল্পিত অভিযোগ তাঁহার পরিবারের বিরুদ্ধেও প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই দিন হইতে এই বিপদের মধ্যে তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থন আমি পাইয়াছিলাম, আজ সেই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আমার আর একজন এই জাতীয় সমর্থক ছিল—আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু মকবুল আহাম্মদ (মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল)। সে অবিচলিতকণ্ঠে মুস্লিমসমাজে বলিয়াছে, সুবোধ এই-জাতীয় কোন কথা বলিতে পারে না।

যাহা হউক, সেই দিনই কলেজ হইতে মিছিল বাহির হইল এবং যদিও আমার শোনা কথা, একটা শ্লোগান নাকি ছিল 'রক্ত চাই'। হইতেও বা পারে, কারণ দুই-চারদিন পরেই কে বা কাহারা আমার পক্ষ হইতে সরকারকে বলিলে, রাত্রিতে শাদা পোশাকে পুলিশ আমার বাড়ি পাহারা দিত। আমার সেই বাড়িটা ছিল মুসলমান পাড়ায়। সেইদিন হইতে শুরু করিয়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিভাকান্ত মৈত্র প্রভৃতি হিন্দু ছাত্রেরা এই কাজ করিয়াছিল। শুধু প্রতিভাকান্তের নাম করিতেছি এইজন্য যে, এই প্রসঙ্গে তাহার নাম আবার করিতে হইবে। আমার আরও অনেকের নাম মনে আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে আমি সব-কিছু জানি না, কে কতটা করিয়াছিল এখন নির্ধারণ করিবার উপায়ও নাই। সমগ্র হিন্দু ছাত্রসমাজ সেই সময় আমার পিছনে ছিল এবং মুসলমানরাও যে উহা মিথ্যা বলিয়া জানিত তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ আমার হাতে ছিল। সেই দিনই নাকি সাহেব বাজার মসজিদে একটা সভা হইয়াছিল; তাহার বিষয়বস্তু আমার জানার কথা নয়। তবে পরের দিন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আলমসাহেব যে কলেজের সন্নিকটবর্তী মাঠে হাত-পা নাড়িয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিলেন তাহা আমি দূর হইতে দেখিলাম।

কি বলিয়াছিলাম তাহা সেই দিনই বা তাহার পরদিন শুনিয়াছিলাম। আমি নাকি বলিয়াছিলাম, 'মুসলমানরা ছোটলোক, চাষাভূষার ছেলে।' কিন্তু কোথায়, কি প্রসঙ্গে, কাহার কাছে? গভর্নিং বডির মেম্বর হামিদুজ্জামান দুই-তিনদিন পর বলিলেন, 'অভিযোগ যে, আমি ঐকথা আমার চেম্বারে বলিয়াছিলাম। হামিদুজ্জামান সাহেব উকিল; তাঁহাদের ও ডাক্তারদের চেম্বার থাকে। আমার আবার চেম্বার কি? পরে একটি মুসলমান ছেলেই আমাকে রহস্যটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। আমার বাড়ির বৈঠকখানা বাড়ির অন্যান্য অংশ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন ছিল। উহার দুইদিকেই রাস্তা এবং হিন্দু থাকিলেও পাড়াটা মুসলমানপ্রধান। আমি সেই ঘরে এই উক্তি করিয়াছিলাম: আন্দোলনকারীরা কেহ কেহ ঐদিক দিয়া যাইতেছিল এবং আকস্মিকভাবে শুনিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে এইরূপ ঠিক

ছিল। কিন্তু এই আড়িপাতার সাক্ষ্য জোগাড় করা কঠিন হইবে এইরূপ আশংকা হইল। কাজেই স্থান বদল হইল—আমার বাড়ির বসিবার ঘরের জায়গায় কলেজের উপাধ্যক্ষের ঘর নির্দিষ্ট হইল। জামান অতশত বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া 'চেম্বার' বলিয়াছিলেন। অবশ্য এই ছেলেটির কাছে প্রকৃত তথ্য যখন শুনিলাম, তখন উহাদের অভিযোগ হস্তগত হইয়াছে। স্থান আমার অফিস ঘর, সময় দুইটা ক্লাসের অন্তবর্তীকাল এবং বলিয়াছিলাম ছাত্র প্রতিভাকান্ত মৈত্রকে।

ইহার একটু ছোট্ট ইতিহাস ছিল। সেই বৎসর কলিকাতায় একটা কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি স্থাপিত হয় ; ইহার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং প্রধান কর্মকর্তা—সচিব বা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আনন্দবাজারের সুরেশ মজুমদার। রাজশাহীর কমিটিতে সর্বজনপূজ্য বৃদ্ধ নেতা কিশোরী চৌধুরী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে ছিলেন ; তবে কাজ করিতাম আমি, আমার ছাত্র নবনিযুক্ত প্রবেশনার সিভিলিয়ান মনীষীমোহন সেন এবং আমার আজ্ঞাবহ বহু ছাত্র, যাহাদের পুরোভাগে প্রতিভাকান্ত মৈত্র। আমাদের ফাংশন, টাকা পাঠান প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলেও ইহার হিসাব দাখিল প্রভৃতির জের চলিতেছিল। কি একটা বিষয়ে কেন্দ্রীয় অফিস হইতে একটা তাগাদা আসিয়াছিল এবং প্রতিভাকান্তকে না পাইলে আমি উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। একজন অধ্যাপক ঐ ক্লাসে যাইতেছিলেন ; তাঁহাকে আমি বলিয়া দিলাম যে তিনি যেন প্রতিভাকান্তকে ক্লাসের পরে আমার সঙ্গে সত্বর দেখা করিতে বলেন। এই জরুরী আহ্বান ঐ ক্লাসের ছাত্র উল্লিখিত ফজলুর রহমান প্রভৃতি শুনিয়াছিল। তাহারা এইরূপ অভিযোগ করিল যে হিন্দু ছাত্রদের নেতাকে যখন মুসলমানবিরোধী উপাধ্যক্ষ ডাকাইলেন, তখন তাহাদের সন্দেহ হয় এবং তাহারা পিছু পিছু আসিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিয়া ঘরের ভিতরের বাক্যালাপ শোনে। প্রতিভাকান্ত নাকি মুসলমান ছাত্রদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে থাকে এবং আমি নাকি তদুত্তরে বলি যে ইহারা ছোটলোক, চাষাভূষার ছেলে, ইহাদের কথায় কান দিতে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সব অফিস রাইটার্স বিল্ডিংসে ফিরিয়া গিয়াছে। জেনকিন্স অন্য পদে বদলি হইয়াছেন। ডি. পি. আই. জ্যাকেরিয়া, অ্যাডিশনাল ডি. পি. আই. অপূর্ব-কুমার চন্দ—দুই অক্সফোর্ড সাহেব একঘরেই পাশাপাশি বসিতেন। খাঁ-বাহাদুর আব্দার রহমান সহকারী ডি. পি. আই.। রাজশাহীর ঘটনা ইঁহাদের দরবারে পেশ হইল, অধ্যক্ষ দত্ত রিপোর্ট দিলেন ; সংবাদপত্রে বিবরণ বাহির হইল এবং যাঁহারা আন্দোলন চালাইয়া-ছিলেন তাঁহারা কলিকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়া চলিলেন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিতাম, কলিকাতায় কি হইতেছে বা না হইতেছে তাহা ইঁহারাই আগে জানিতে পারিতেন এবং পরে তাহা প্রিন্সিপ্যালের কাছে আসিত অথবা লোকপরম্পরায় আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিত।

প্রথমে শুনিলাম ডি. পি. আই. তদন্ত করিবেন। মনে হইল ইহা সঙ্গতও বটে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, জ্যাকেরিয়া সাহেব ক্রিশ্চিয়ান—তিনি ইহার পক্ষে উপযুক্ত লোক। পরে প্রতিপক্ষ হইতেই সংবাদ ভাসিয়া আসিল যে এই ব্যাপারটি জ্যাকেরিয়া নিজ হাতে না রাখিয়া সহযোগী চন্দ সাহেবকে দিয়াছেন এবং চন্দ সাহেবের নির্দেশে আব্দার রহমান সাহেব সরেজমিনে তদন্ত করিতে রাজশাহী আসিতেছেন। ইহাতে আমার বন্ধুরা

একটু নিরুৎসাহ হইলেন, কারণ সেই পাকিস্তান-জিগিরের দিনে কোন মুসলমান কর্মচারীর পক্ষেই প্রকাশ্যে মুস্লিম স্বার্থবিরোধী কাজ করা সম্ভব হইবে না, ইহাই সকলে মনে করিত। তখনও আমার মধ্যে ন্যায়বিচারে আস্থা ছিল। খাঁ-বাহাদুর আসিবেন শুনিয়া আমার বন্ধু ডক্টর স্নেহময় দত্ত ও মকবুল আহাম্মদও একটু ভড়কাইয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়েই দেখিতে পাইলেন যে খাঁ-বাহাদুরকে আন্দোলনকারীদের সমর্থকরাই ঘিরিয়া থাকে। আমি শুধু একটি কাজ করিলাম। যে ক্লাসের ঠিক পূর্বে আমার সঙ্গে প্রতিভাকান্তের কথা হইয়াছিল, তাহা কলেজের বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের দক্ষিণপ্রান্তে আর আমার অফিসঘর উত্তরপ্রান্তে। ঘণ্টা বাজিবার প্রাক্কালে কেহ আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকিতে পারে না। রেজেস্ট্রি (হাজিরার বই) আনাইয়া দেখিলাম যে ঐ পরের ক্লাসে ফজলুর রহমান, মোকলাপ আলি ও আব্দার রহমান উপস্থিত আছে, কিন্তু প্রতিভাকান্ত অনুপস্থিত। পরে ইহাদের এই চৈতন্য হইবে এবং তখন রেজেস্ট্রি সরাইয়া ফেলিবে। হেডক্লার্ক গিরিশবাবু খুব বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ লোক ; তাঁহাকে সব কথাটা বলিলাম এবং নির্দেশ দিলাম—তিনি প্রতিদিন বাড়ি যাওয়ার আগে উহা তাঁহার আলমারিতে রাখিয়া যাইবেন এবং সকালে আসিয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন ; ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে অন্তবর্তীকালে কোন কারচুপির চেষ্টা হয় কিনা। আব্দার রহমান সাহেবের আসার দিন আমি সংশ্লিষ্ট অধ্যাপককে ডাকিলাম। তিনি একটু তেজস্বী হিন্দুমহাসভা-ভাবাপন্ন লোকের মত কথাবার্তা বলেন ; কয়েকটি মুসলমান ছাত্রের অভিযোগে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের মত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আসামীর সামিল করিয়া এই-জাতীয় প্রকাশ্য তদন্ত তাঁহারা পছন্দ করেন না। সেই কথা এড়াইয়া তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধারণতঃ অধ্যাপকরা ক্লাসে আসিয়াই নাম ডাকেন, আবার পুণ্যশ্লোক হেরম্ব মৈত্রের মত দুই-চারজন লোক কাজ শেষ করিয়া তারপর নাম ডাকেন। তিনি কি করেন? উত্তর পাইলাম, চাকুরীর প্রথম কাজ নামডাকা বা রোল কল ; first things first। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এমনও তো হয়—রোল কল হওয়ার পর লেকচারের মধ্যেই কোন ছাত্র আসিয়া ঢুকিল, এমতাবস্থায় কি তাহাদের পরে 'উপস্থিত' বলিয়া দেখান? তিনি উত্তর করিলেন, 'নেভার ; কখনই নয়'। বাস্তবিকপক্ষে সেইদিনকার 'উপস্থিত-অনুপস্থিত' লেখায় কোথাও কাঁটা-ছেঁড়া নাই ; সেই তিনটি ছেলেকে স্পষ্ট করিয়া 'p' এবং প্রতিভাকান্ত মৈত্রকে তেমনি স্পষ্ট করিয়া 'a' দেখান হইয়াছে। ইহা আমি ডক্টর দত্তকেও দেখাইলাম। আমরা মনে করিলাম—এই সাক্ষ্য অকাট্য।

যাহা হউক, যতদূর স্মরণ হয়, দুইদিন ধরিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। আমাকে ডাকা হয় সব-শেষে। ডক্টর দত্ত আগাগোড়াই আব্দার রহমান সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, রহমান সাহেবের প্রশ্ন করার ভঙ্গী এবং মুখের ভাব তাঁহার ভাল লাগিল না। আমি যেন এইরূপভাবে জবাব দিই যে এই তদন্ত আমি শেষ পর্যন্ত মানিয়া নাও লইতে পারি। যাহা হউক, আমি প্রতিভাকান্ত মৈত্রকে কেন ডাকাইয়াছিলাম এবং সে কাগজপত্র দিতে বিলম্ব করায় আমার যে অসুবিধা হইতেছে ইহা বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বা রাজশাহী কলেজের কোন প্রসঙ্গই উঠে নাই। সবই বঙ্গীয় রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষা কমিটির ব্যাপার। আমাদের প্রধান কাজ ছিল 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় এবং প্রতিভাকান্ত ছিল প্রধান অভিনেতা ও প্রযোজক। সেইজন্যই তাহার সঙ্গে নানা কাজের যোগ। এই তদন্ত-পর্ব শেষ হইলে ডক্টর দত্ত আমাকে কয়েকটি কথা বলিলেন : (১) আব্দার রহমান সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল স্বীয় নির্দোষতা প্রমাণ করিয়াছেন ; অভিযোগ সবই উদ্ভাবিত ; (২) তবে

মুসলমান-সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি খুব রুষ্ট ; (৩) সদানন্দ চক্রবর্তীর সাক্ষ্য খুব সুন্দর হইয়াছিল, যেমন ইংরেজির মুন্সিয়ানা, তেমন তীক্ষ্ম যুক্তির সমাবেশ ; (৪) সেই সযত্নে রক্ষিত রেজিস্ট্রিগুলি কোন কাজে আসে নাই ; কারণ উল্লিখিত অধ্যাপক সাক্ষ্যে বলিলেন যে তিনি সাধারণতঃ ক্লাসে ঢুকিয়া নাম ডাকিলেও কোন কোন দিন ক্লাসের শেষেও ডাকেন। ইনি নিজেই বুঝিতে পারিয়া এবং আব্দার রহমানের রিপোর্টের কথা জানিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলি নাই বলিয়া তিনি স্পষ্ট সন্দেহাতীত সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই। আমি বুঝিলাম যে, সাক্ষ্য দিতে যাইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দুমুখো কথা বলাই তাঁহার পক্ষে নিরাপদ হইবে। আমাদের জয়চাঁদ-মীরজাফরের দেশ। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ডক্টর স্নেহময় দত্ত ছাত্রদের তিন জঙ্গী নেতার expulsion বা বহিষ্কার দাবি করিয়া ডি. পি. আই.-কে পর পর একাধিক চিঠি লিখেন। কিন্তু ওখান হইতে কোন জবাব আসে না। এই পালার যিনি মূল গায়েন ছিলেন তাঁহার বদলি-সম্পর্কেও কোন সূত্র হইতে প্রস্তাব উঠিয়া থাকিবে। কারণ মুসলমানের স্বার্থসংরক্ষণকারী কোন পত্রিকায় (বোধ হয় আক্রাম খাঁর 'আজাদ'-এ ?) ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পড়িয়াছিলাম। ডক্টর স্নেহময় দত্ত নিজে এই সময় সেক্রেটারিয়েটে অন্য এক দপ্তরে বদলি হইয়া গেলেন! তিনি রাজশাহী থাকিতে কোন চিঠিরই উত্তর পান নাই।

৭

খেলার বল এখন কলিকাতায়। আব্দার রহমান সাহেব তদন্ত করিয়া চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাই যে হেয়ার স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহার সঙ্গে চন্দ সাহেবের দেখা হইয়াছিল ; সেইখানে চন্দ সাহেব বলিলেন যে তিনি আমাকে শীঘ্রই প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি করাইয়া আনিবেন। এই সংবাদ ক্ষুদে পাকিস্তানীরা পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা খুব বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মামলা খারিজ হইয়াছে আর আমাকে যদি প্রেসিডেন্সী কলেজেই বদলি করা হয় তবে আমি তো খুশিই হইব। কি একটা উপলক্ষ্যে আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। চন্দ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইতে আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি কবে করা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণ আমার সাংসারিক ব্যবস্থাদির কথা ভাবিতে হইবে। তিনি অমনি জবাব দিলেন, আমাকে রাজশাহী হইতে মুক্ত করিবেন বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্সীতে আনিতে পারিবেন না—অন্যত্র। আমি ইহার কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে দোষী ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার কি হইল ? 'কপালকুণ্ডলা'-য় যে বৃদ্ধ নবকুমারকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার মত সাহস দেখাইয়া তিনি উত্তর করিলেন, শাস্তি দেওয়া প্রিন্সিপ্যালের এক্তিয়ার। স্নেহময় দত্ত ভীরু ; সে নিজে যাহা পারিত তাহা না করিয়া উপরওয়ালার কাছে পাঠাইয়াছে এবং এইরূপ চূড়ান্ত শাস্তি তখনই দিয়াছে যখন সে তাহার কলিকাতার চাকুরী-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, ওখানে থাকিয়া ইহার জের পোহাইতে হইবে না। আমি বলিলাম, ছাত্রদের সাজা দেওয়া যে তাঁহারই এক্তিয়ার, এই কথা তিনি চলিয়া আসার আগেই তো জানাইয়া কাগজপত্র তাঁহার কাছে ফেরত দিতে পারিতেন। তখন আবার তিনি চক্রাকারে আগের কথায় ফিরিয়া আসিলেন। স্নেহময় দত্ত ওখানে আর প্রিন্সিপ্যাল থাকিবেন না

ইহা নিশ্চিতভাবে জানার পরই এই কড়া শাস্তির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন অর্থাৎ ইহা তাঁহার এক্তিয়ার হইলেও এই দায়িত্ব তাঁহার উপরে ন্যস্ত করা যায় না।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া 'অন্যত্র' বদলির সম্ভাবনায় বিব্রত হইলাম না, কারণ চাটগাঁ ছাড়া অন্য কোন জায়গায় প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ নাই। ওখানে আছেন আবু হেনা এবং তিনি তখন ওখানকার অধ্যক্ষ। চন্দ সাহেবরা যে প্রথম শ্রেণীর প্রমোশনের তালিকা করিয়াছিলেন, সেই তালিকায় আমি ছিলাম তৃতীয় এবং হেনা সাহেব চতুর্থ। সুতরাং মুসলমানদিগকে খুশি করিতে যাইয়া এক মুসলমানের পদাবনতি ঘটাইতে হয় এবং তাঁহার উপরে আমাকে বসাইতে হয়। ইহা তিনি পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রই দেখাইয়া গিয়াছেন যে এই-সব মুচিরাম গুড়েরা শুধু লেখাপড়ায় মুর্খ নহেন, প্রশাসনিক নিয়মকানুনও জানেন না।

যাহা হউক, রাজশাহী ফিরিয়া আমি যখন দেখিলাম ব্যাপারটা একেবারেই চাপা পড়িয়াছে, তখন দিন নির্ধারণ করিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া এই বিষয়ে ডি. পি. আই. জ্যাকেরিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেখানে দেখি, জ্যাকেরিয়া ও চন্দ পাশাপাশি বসিয়া কাজ করিতেছেন। প্রশ্নটার আলোচনা একটু অগ্রসর হইতেই চন্দ বলিলেন, এতদিন পরে (এই বিলম্ব অবশ্য তাঁহারই ইচ্ছাকৃত) যদি ছাত্রদের সাজা দেওয়া হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রতিহিংসাপরায়ণতা হইবে না ('Will it not be 'vindictive'...)? আমি উত্তরে জ্যাকেরিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ছাত্রদের বিরুদ্ধে আমার জিঘাংসু মনোবৃত্তি নাই ; তাহাদের কোন ক্ষতি হউক আমি ইহাও চাহি না, বিশেষতঃ আমি জানি তাহারা অপরের ক্রীড়ণক মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখিতে হইবে। তাহারা আমার নামে মিথ্যা অপবাদ আনিয়াছিল ; তদন্তকারী উচ্চ রাজকর্মচারী—তিনি নিজে মুসলমান—এই অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া রায় দিয়াছেন। এখন যদি তাহাদের কিছুমাত্র সাজা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান হওয়াই স্বাভাবিক যে তাহাদের একটা মোটামুটি কেস (case) ছিল ; শুধু তাহারা তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারে নাই। আর যত লঘুই হউক, শাস্তি দিলে ইহা প্রমাণিত হইবে যে তাহারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছিল এবং এইভাবেই আমার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রহিবে। চন্দ সাহেব মুখ খুলিতেই জ্যাকেরিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'No, Apurva, the boys must be given some punishment'—ছেলেদিগকে কিছু সাজা দিতেই হইবে। কাগজপত্র গভর্নিং বডির কাছে গেল, সেইখানে ঐ মিথ্যা অভিযোগকারী তিনটি ছেলেকে জরিমানা করা হইল। আমার আর কোন ক্ষোভ রহিল না।

৮

রাজশাহীতে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল অধ্যাপকের নিরিবিলি জীবনে তাহা অনন্য। হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়াছে এবং পাশাপাশি বাস করিলে সংঘর্ষ ও মিলন দুই-ই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন ইংরেজ ইহাদের বৈষম্য ও সংঘর্ষকে ভিত্তি করিয়া নিজের রাজত্ব কায়েম করিতে প্রয়াস পাইল, তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য হিন্দুরা কেবলই বক্তিয়ার অর্থাৎ যাহারা বক্‌বক্‌ করে সেই-জাতীয় মুসলমানদের সঙ্গে আপোস করিতে আরম্ভ করিল। এই আপোসের মনোবৃত্তি যেমন নীতিবিরুদ্ধ, তেমনই আত্মঘাতী। এই বিষয়ে আমি 'India Wrests Freedom' গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিয়াছি। মাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা এই আপোসরফার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি

সুভাষচন্দ্র বসু এবং তিনি মুসলমানদের যেমন সর্বব্যাপী অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া আর কোন হিন্দু নেতা তাহা পান নাই।

শিক্ষাজগতে, বিশেষ করিয়া সরকারি শিক্ষাদপ্তরে এই আপোসমুখী আচরণ যুবক-সম্প্রদায়কে অধিক পরিমাণে পীড়া দিত, কারণ তাহারা স্বভাবতঃ একরোখা ও আদর্শবাদী এবং তাহারা ইহার মধ্যে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হীন প্রচেষ্টা বুঝিতে পারিত। আমি একে পাকাবুদ্ধির লোক নয়, দ্বিতীয়তঃ আমার মধ্যে লোভের অভাব না থাকিলেও চাকুরী রক্ষা বা চাকুরীতে উন্নতির জন্য আমি উল্লিখিত অধ্যাপকের মত সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। অথবা দোষী মুস্লিম ছাত্রদের প্রতি ঔদার্যে গদ্‌গদ হইয়া অ্যাডিশনাল ডি. পি. আই. 'vindictiveness'-এর যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা-বোধ করি নাই। এই কারণে রাজশাহীর হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া উঠে—যাহা সাধারণ ছাত্রপ্রীতি অপেক্ষা অন্য রকমের নৈকট্য। আজও তাহাদের নিকট হইতে যে উপকার গ্রহণ করি এবং আমার কোন কাজে শিথিলতা দেখাইলে তাহা-দিগকে যে যে তিরস্কার করি, তাহা বাকী আটত্রিশ বছরের অধ্যাপক-জীবনের গুরুশিষ্য-সম্পর্ক হইতে পৃথক্। অবশ্য ইহা অবিমিশ্র আনন্দ বা গৌরবের বস্তু নয়, কারণ এই সম্পর্ক পুরোপুরি গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়। ইহা একটা অস্বাভাবিক অবস্থার অস্বাভাবিক পরিণতি।

ইহা রাজশাহী থাকিতেই আমি বেশ অনুভব করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে রাজশাহী কলেজের মুসলমান ছাত্রদেরও খুব প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র অল্প সময়ের মধ্যে পাকাইয়া উঠিল, তাহার জন্মস্থান বাহিরে হইলেও মুস্লিম হস্টেলেই তাহা পরিপুষ্ট হয়—ইহা আমি ঐ হস্টেলের জনৈক ছাত্রের কাছে শুনিয়া-ছিলাম এবং ইহাই সম্ভব বলিয়াও মনে হয়। হয়ত ইহারা অনেকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারাও আমাকে একটু এড়াইয়া চলিত। যে হিন্দু ছাত্রসম্প্রদায় আমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিল ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের কাহারও নাম করি নাই, যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকেরই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু একটি মুসলমান ছাত্রের কথা না বলিলে এই আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

মহম্মদ ইব্রাহিম রাজশাহীর বেশ একটু ভাল ছেলে ছিল। যতদূর মনে আছে সে জলপাইগুড়ির লোক। তাহার পিতা জীবিত ছিলেন না ; জননীই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। ইহাও মনে হইত সে মোটামুটি সম্পন্ন-ঘরের ছেলে। ইব্রাহিমের একটা গুণ ছিল—সে অল্পবয়সেই ইংরেজি ও বাংলা বেশ ভাল লিখিতে পারিত। আমার বিরুদ্ধে যখন এমন মারাত্মক অভিযান আরম্ভ হয়, তখন কেমন করিয়া আমাদের মনে হইল যে ইব্রাহিম এই আন্দোলনে যুক্ত আছে। বিশেষতঃ ইহারা ইংরেজি বা বাংলায় যে-সব প্রচারপত্র বা অভিযোগ লিখিত, তাহা ইব্রাহিমই লিখিতে পারে এইরূপ সন্দেহ ইব্রাহিমের প্রতি অনুকূল শিক্ষক সদানন্দ চক্রবর্তীর মনেও জাগ্রত হইয়াছিল। যে ইব্রাহিম আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, এইভাবে তাহার ও আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। সেও ইহা বুঝিতে পারিল এবং আমাকে এড়াইয়া চলিত। ইহার পর তাহার সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হয়। প্রথমবারের সাক্ষাতের স্মৃতি একটু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কারণ তখনও তাহার প্রতি আমার সন্দেহের নিরসন হয় নাই এবং তজ্জনিত তিক্ততাও অপসৃত হয় নাই। যখন রাজশাহী হইতে চলিয়া আসি, তখন সে যেন একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া গেল যে আমরা যে তাহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতাম, তাহা অমূলক।

দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকার মর্মস্পর্শী ও অবিস্মরণীয়। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে

অবসর নেই ১৯৫৮ সালে এবং তাহার পরও দুই বৎসর কাজ করিয়া ঐ কলেজ হইতে বিদায় লই। অধ্যক্ষ যেই থাকুন, প্রশাসনিক ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিতে হইত। সেই-সব বিষয়ের ফাইল বা কাগজপত্র বড়বাবু আমার ঘরে পাঠাইয়া দিতেন। আমি ক্লাসের কাজ সারিয়া চারটার পর তাহা দেখিতাম। তখন পূর্বপ্রান্তে অফিসের লোক আর অপরপ্রান্তে আমার ঘরে আমি একা। একদিন হঠাৎ আমার কাছে সংবাদ আসিল—পাকিস্তান দূতাবাস হইতে আমার খোঁজে ফোন আসিয়াছে। হন্তদন্ত হইয়া অফিসে যাইয়া ফোন তুলিতেই অপরপ্রান্ত হইতে উত্তর হইল, 'স্যার, আমি ইব্রাহিম।' সে কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, পথে ওখানকার দূতাবাসে কয়েক ঘণ্টা আছে। হাতে সময় অল্প ; আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে চলিয়া আসিল। আমি এইরূপ সম্ভাষণে ও সাক্ষাৎকারে এতটা হতচকিত হইয়া গিয়াছিলাম যে ভাল করিয়া দীর্ঘ আলাপ করিতে পারিলাম না। তাহার মা, বোন, জলপাইগুড়ির বাড়ি এই-সকল সম্পর্কে কোন কথা হইল না। জানিলাম সে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের (Foreign Service)-এর লোক। তখনও অ্যাম্বেসেডার (ambassador) হয় নাই। তুর্কী দূতাবাসে থাকাকালে পাকিস্তান সরকারের অনুমতি লইয়া এক তুর্কী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। যাওয়ার সময় বলিয়া গেল, লেখাপড়ার আস্বাদ আমাদের সংস্পর্শেই পাইয়াছিল। এখন সে চাকুরীজীবী মাত্র। সে এখন কোথায় আছে, কি করিতেছে কিছুই বলিতে পারি না। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয়ই আমাদের অনধিগম্য। তবে তাহার ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা সে ঘুচাইয়া দিয়া গিয়াছে।

৯

অধ্যাপকের যাহা কাজ, বিদ্যা অভ্যাস করা, বিদ্যা দান করা, সর্বোপরি বিদ্যাচর্চার পরিবেশ রচনা করা, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই রাজশাহীতে গিয়াছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে তাহা পিছনে পড়িয়া গেল। কলেজে পড়াশোনার যাহা কিছু চেষ্টা ওখানে হইয়াছিল বা যে-সব ছাত্রছাত্রী বিদ্যালাভের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাদের কথা আর বলিলাম না। মফঃস্বল কলেজের মধ্যে রাজশাহীতে বিজ্ঞানচর্চার বেশ একটা পরিবেশ ছিল। ওখানকার পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা খুব ভাল হইত বলিয়া আমার ধারণা এবং কেমিস্ট্রিতে নূতন অধ্যাপক হইয়া যান ডক্টর প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া আমি তাঁহাকে আগে জানিতাম না। ক্রমশঃ তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল এবং ক্রমে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইলাম। আমার ধারণা, আমাদের পরের যুগে যে-সমস্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইলেন পদার্থবিদ্যায় সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও রসায়নশাস্ত্রে প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত। সমর ঘোষাল রাজশাহীতে কখনও যান নাই, আর প্রতুল রক্ষিতও বেশিদিন ছিলেন না। আর্টস বিভাগে আমার সহাধ্যায়ী গোপীনাথ ভট্টাচার্য ও ছাত্র সদানন্দ চক্রবর্তী পড়াশোনার মান উন্নীত করিতে পারিতেন, কিন্তু সেই পরিবেশ কোথায়? সেইজন্য সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনই করিলাম না।

সহকর্মীদের মধ্যে নৈতিকচরিত্রগুণে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার কথা আমি 'Portraits and Memories' গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিয়াছি। তবে তাঁহার নৈতিক মান এত উঁচু এবং আমরা এত আটপৌরে যে তাঁহার সঙ্গে কখনও নৈকট্য বোধ করি নাই। আর একজন যিনি আমার মনে রেখাপাত করিয়াছিলেন, তিনি আবার একেবারেই সাধারণ লোক—তিনি ফিজিক্স বিভাগের ডেমনস্ট্রেটর নগেন্দ্রনাথ দাশ। বাল্যকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, তখন হইতেই ডানপিটে ; কলিকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি,

উপকণ্ঠের ফলের বাগান—সব তাঁহার নখাগ্রে। নগেনবাবু আমারই বয়সী, বেশ বুদ্ধিমান ; বোধ হয় ডানপিটে ভবঘুরে জীবনে আমাদের মত পড়া মুখস্থ করিয়া ভাল পাস করিবার সময় পান নাই। কিন্তু দুরূহ বিষয়ে তাঁহার অবাধ প্রবেশ ছিল। আমি রাজশাহী ও কলিকাতায় উভয় স্থানে দেখিয়াছি, ছাত্রেরা তাঁহার পড়া ভালবাসে ; তাহাদের কথা হইতে মনে হইত, দুরূহতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট এবং প্র্যাকটিক্যালে তাঁহার হাত নিপুণ।

প্রথম পরিচয়েই দেখি নগেনবাবু 'ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে' অথচ আমি ভোজনে অপটু, অনাসক্ত। সহজেই লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নগেনবাবু ভোজন করা অপেক্ষা অপরকে ভোজন করাইতে বেশি আনন্দ পান। পরে বুঝিয়াছি ইহাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ; ইহাই এই অতি সাধারণ লোকটিকে অসাধারণত্ব দান করিয়াছে। পরের দুঃখে সহানুভূতি দেখান অপেক্ষা পরের সৌভাগ্যে আনন্দ পাওয়া কঠিন কাজ। অথচ এই-জাতীয় আনন্দ সম্ভোগই নগেনবাবুর চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। মানুষ পরনির্ভরশীল জীব ; সুতরাং তাহাকে পরের উপকার করিতেই হইবে, কারণ পরের উপকার গ্রহণ করা ছাড়া সে বাঁচিতে পারে না। কিন্তু আমরা পরোপকার করি কর্তব্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া। নগেনবাবুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল অপরের উপকার করিয়া শান্তি ও আনন্দ পাওয়া। সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট রাজশাহীতে কৃষ্ণধনবাবু বা নগেনবাবুকে সাম্প্রদায়িকতা স্পর্শ করিতে পারিত না। নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুসলমানরা অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখিত ; আর নগেনবাবু তো হিন্দু-মুসলমান উভয় শিবিরেই অবলীলাক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; সবাই জানিত, নগেনবাবুর পক্ষে অপরের ক্ষতি করা অসম্ভব।

আর একজন লোকের কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব ; তিনিও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতেন ; কিন্তু তাহা অন্য কারণে। রাজশাহী কলেজের অন্তর্ভূত একটা সংস্কৃত কলেজ বা টোল ছিল—'মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ'। ইহার অধ্যাপক ছিলেন তিনজন—কাব্যের জন্য রমণীমোহন সিদ্ধান্তভূষণ, স্মৃতির জন্য ভূপেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, এর প্রধান পণ্ডিত হইলেন রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ। ইহা কলেজের অধীন ছিল এইজন্য যে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার সমানভাবে বহন করিতেন পুঁটিয়ার মহারাণীর বংশধরগণ আর বঙ্গীয় সরকার। আমি যখন রাজশাহী বদলি হই তখন অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পড়িয়া আমি সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বা ইস্‌থেটিক পড়িতে খুব ব্যগ্র হই। তারাপদ মুখার্জি আমাকে রমেশ পণ্ডিতমহাশয়ের খ্যাতির কথা বলে এবং তাঁহার কাছে পড়িবার জন্য আমি খুব আগ্রহান্বিত হই।

রাজশাহীতে কাজে যোগদান করিয়াই আমি পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি এবং পড়িবার প্রস্তাব করি। পণ্ডিতমহাশয় আমাকে জানিতেন না এবং কলেজে একজন নূতন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আসিয়াছেন বা আসিবেন সেই সম্পর্কে তাঁহার কোন কৌতূহলও ছিল না। আর সংস্কৃতের দুর্দিন তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; টোলের অধ্যাপক পাওয়া গেলেও ছাত্র দুর্ঘট হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলেন ; পরে স্থির হইল, তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে আমার অফিসঘরে যাইবেন এবং তখন তাঁহার কাছে আমি ধ্বন্যালোক-লোচন পড়িব। পণ্ডিতমহাশয় বড় নৈয়ায়িক ; কাব্য ও সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁহার বেশ একটা তাচ্ছিল্য ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্। তস্য চ টীকা সাপি কিং পাঠ্যা ?' তিনি নিজে অলংকারশাস্ত্র পড়েন নাই ; বঙ্গদেশে অলংকারশাস্ত্র পাঠের দুরবস্থা অনেক দিন আগেই আরম্ভ হইয়াছে—এই কথা আমি অন্যত্র লিখিয়াছি। কিন্তু ধ্বন্যালোক ও লোচনের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব-পরিচয় না থাকিলেও তিনি অতি সহজেই ইহার রহস্যে প্রবেশ করিলেন এবং কেবলই আমাকে নব্যন্যায় পড়িতে আকৃষ্ট করিতে চাহিতেন।

ধ্বন্যালোক ও লোচন যে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় নয় এবং আমাদের দেশের কাব্য ও অলংকার পড়ুয়ারা যে ইহার পঠন-পাঠনে অযোগ্য, তাহা এই তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত অল্পদিনেই বুঝিয়া ফেলিলেন। তখন আমি এই শাস্ত্রে নিমগ্ন থাকিতাম এবং আমার নিজের অধিকার সীমিত বলিয়া যাঁহাকে হাতের কাছে পাইতাম তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতাম। একদিন (সাহিত্যের অধ্যাপক) রমণী পণ্ডিত মহাশয়কে পাইয়া তাঁহাকে দিয়া কোন একটা উদ্ধৃত শ্লোকের অন্বয় ঠিক করিয়া লইতেছিলাম। আমার পণ্ডিতমহাশয় উহা দূর হইতে দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার রমণী পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি ব্যঙ্গ করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, এই গ্রন্থ তর্ক ও বিচারভিত্তিক ; যাহারা দুই পাতা সাহিত্যদর্পণ পড়িয়া আলংকারিক হয়, এই গ্রন্থ-সম্পর্কে তাহারা কি বুলিবে? ধ্বন্যালোক পড়া হইয়া গেলে পর তাঁহার কাছে আমি ব্যক্তিবিবেক পড়ি। তিনি মহিম ভট্টের রসোপলব্ধির অভাব দেখিয়া বিরক্তিবোধ করেন। ইহা ধ্বনিবাদের কোন প্রতিবাদই নয়। ইহার পরে রসগঙ্গাধর পড়িতে চেষ্টা করি। পণ্ডিত মহাশয় নিজে নব্যন্যায়ের বিশেষজ্ঞ ; আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি আনন্দ পাইবেন। কিন্তু মোটেই নয়। কিছুদিন পড়াইয়া বলিলেন, এই লোকটির চিন্তার বা রসোপলব্ধির মৌলিকতা নাই ; শুধু কূট নৈয়ায়িক পরিভাষা দিয়া বিষয়টিকে জটিল করিবার চেষ্টা। তিনি এই শাস্ত্র-সম্পর্কে বিশেষ কিছু পড়াশোনা করেন নাই ; এই বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন কৌতূহল বা উৎসাহও নাই। কিন্তু ভাসা-ভাসা ভাবে তিনি যে-সকল মন্তব্য করিয়া যাইতেন তাহা তীক্ষ্ণধীর পরিচয় দেয় বলিয়া এত কথা লিখিলাম।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মানুষ হিসাবে খুব অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁহার বৃত্তি ছিল এত সামান্য যে সেই অংকটা লিখিতেও লজ্জা করে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে আমি কোন অসন্তোষ দেখি নাই। তিনি নিজেকে প্রথিতযশা পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থের সমকক্ষ মনে করিতেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিতে পারিলেন না বলিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন না, এইজন্য একটু ক্ষুব্ধ ছিলেন। ইহা বাদ দিলে এই আত্মস্থ লোকটি অন্য সমস্ত বিষয় ও লোকের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন। আমাকে পড়াইবার অন্য কোন সুবিধাজনক জায়গা ছিল না, এইজন্যই তিনি আমার অফিসঘরে আসিতেন। তাঁহাদের টোলবিভাগের জন্য একটা জায়গা ছিল বটে, কিন্তু আমাকে পড়াইতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ডি. পি. আই. অফিস তাহা দখল করিয়া নেয়। তিনি যে আমাকে পড়াইতেন ইহাতে ওখানে তাঁহার ও আমার উভয়েরই প্রোপাগাণ্ডা হইত। ইহা ছাড়া তিনিও কাহারও খোঁজ করিতেন না, অপর কেহও তাঁহার বড় একটা সংবাদ রাখিত না। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া তাঁহাকে অনেক দিন বেলপাতা হাতে যাইতে দেখিয়াছি অথবা আমার বাবা খুব বিবুধজনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়াই কেমন করিয়া জানি না, বাবার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ১৯৪৪।৪৫ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান ; এবং সেইদিন টেলিগ্রাফ হাতেই নাকি আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন। আমি কলেজের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই ; কলেজের চাপরাসী আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। চটের পরদা সরাইয়া একতলা আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখি এক মহিলা—ইনি তাঁহার ব্রাহ্মণী—কুপি বা ডিবার আলোতে বাসন মাজিতেছেন, আর বেশ কাছেই বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় পাণ্ডিত্যের সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়া মহানন্দে নির্লিপ্ত-সন্তোষে তামাক সেবন করিতেছেন। অনন্যসাধারণ সম্মান আর দীন পরিবেশ—ইহার অসামঞ্জস্য তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে নাই। পরে আমি তাঁহার অকিঞ্চিৎকর বৃত্তিকে একটু বাড়াইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের চাকুরির যে শর্তাবলী

ছিল তাহা পড়িয়া মনে হইল, এই কাজে তাঁহার একটু সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার আত্মসম্মানবোধ এত তীক্ষ্ণ যে নিজের জন্য কোন প্রকার তদ্বিরে যোগ দিতে তাঁহাকে কিছুতেই রাজি করাইতে পারি নাই। অথচ তাঁহার প্রশান্ত পরিতোষ কখনও বিচলিত হয় নাই।

ইহার পর একবার সংস্কৃত কলেজে কোন একটা পদে লেকচারার নিয়োগের জন্য যে কমিটি বসে তাঁহাকে উহার সদস্য করা হয়। অপর বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'যে চেয়ারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বসিতেন সেই চেয়ারে এখন কি-সব লোক বসেন? প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করেন, অমুক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কিনা, প্রার্থী কোন্ সংস্করণ ব্যবহার করেন ইত্যাদি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি নিজে কিভাবে প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করিলেন। উত্তর করিলেন, 'আমি প্রথম প্রার্থীকে "কুসুমাঞ্জলি"র পঙ্ক্তি লাগাইয়া ব্যাখ্যা ও বিচার করিতে বলিলাম এবং এইভাবেই অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম।' শুনিয়াছি ন্যায়শাস্ত্র তো বটেই, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়েও মহামহোপাধ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ বিষয়েই পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। আমি এই-সব বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ এবং যে রসতত্ত্ব তাঁহার কাছে আমি পড়িয়াছিলাম সেই বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না! সুতরাং আমাদের মধ্যে যে গুরুশিষ্য-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর জোর দিতে গেলে মিথ্যা বড়াই করা হইবে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রবল আমার মনে গভীর দাগ কাটিয়াছিল। আমি যখনই নিজের মধ্যে অর্থগৃধ্নুতার আভাস পাইয়াছি, যখনই তদ্বির করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি, তখনই এই স্বল্পে সন্তুষ্ট উন্নতশীর্ষ, আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কথা মনে হইয়াছে এবং আত্মসংবরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'রোদনভরা এ বসন্ত'

১

আমি ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পুনরায়—এবার শেষবারের মত বদলি হইয়া আসি। ইহার আগে জিন্নার আহবানে মুস্লিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়, সেই আহবানের ফলে ১৬ই আগস্ট কলিকাতায় এক নরমেধ যজ্ঞ শুরু হয় এবং তাহা আয়ত্তে আনিতে বেশ কিছুদিন যায়। বাস্তবিকপক্ষে একবছর পর ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পূর্বেও শান্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত কে তাহা লইয়া খুব বেশি মতবিরোধ নাই। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতার ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় ইংরেজ রাজত্বের প্রধান স্তম্ভ এবং ইংরেজ আমলাতন্ত্র ও পুলিশবাহিনী এই সম্প্রদায়েরই অনুগামী। ইহারা ভারতত্যাগের পূর্বে বিপ্লবী বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে একটু বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গেল। অপর দিকে ইহাও জানা কথা যে শহীদ সুরাবর্দী ব্যবস্থাপক সভায় মুস্লিম লীগ পার্টির প্রধান হিসাবে বঙ্গের প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী হইলেও এই অতি উচ্চাভিলাষী দাম্ভিক নেতা জিন্নার একচ্ছত্র প্রভুত্ব মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়াছিলেন সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ; সম্ভবতঃ সুরাবর্দী দেখাইতে চাহিলেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উপযোগী বাহিনী একমাত্র তাঁহারই আছে। এই দুই শ্রেণীর ঋত্বিকের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডে কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কেহই অগ্রণী নহেন, আবার কেহই লাভবান হইলেন না। বড়লাট ওয়াভেলের ইচ্ছা ছিল সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরাইয়া আনার পর ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিবে। কিন্তু প্রারম্ভেই যে নমুনা দেখা গেল, তাহার ফলে ইংরেজের ভারত ত্যাগের তারিখ আরও আগাইয়া আসিল। জিন্না মনে করিয়াছিলেন, তিনি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পাকিস্তান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং তিনি কিছুতেই বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করিতে দিবেন না, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ-বাবু, মাস্টার তারাসিং প্রভৃতি যে অল্পায়াসে দুই প্রান্তের পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিলেন, ইহারই তাৎক্ষণিক কারণ কলিকাতার নরমেধ-লীলা। এই লীলায় সুরাবর্দী মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জয় খুবই ক্ষণস্থায়ী হইল। যখন পূর্বপাকিস্তানের নেতানির্বাচনের প্রশ্ন উঠিল, তখন মুসলমানরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নাজিমুদ্দীনকে নির্বাচন করিলেন। দেখা গেল, সুরাবর্দী সাহেবকে কেহই বিশ্বাস করেন না।

আমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ যেভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা আমি সবিস্তারে 'India Wrests Freedom'-গ্রন্থে লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং বড় বড় কথা ছাড়িয়া আমাদের নিজেদের ব্যাপারে চলিয়া আসিব। শুধু প্রেক্ষাপটটা স্মরণে না রাখিলে আমাদের কাহিনীও স্পষ্ট হইবে না বলিয়া নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া লইলাম।

২

প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া তো প্রথমে হতচকিত হইয়া গেলাম। সাড়ে-চার বছর আগে যে কলেজ হইতে রাজশাহী বদলি হইয়া গিয়াছিলাম, সেই কলেজ আর এই কলেজে কত তফাৎ। অনেক মুসলমান অধ্যাপক, কেরানী ও চাপরাসীর অভ্যাগম হইয়াছে। তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কলেজের সেই লেখাপড়ার পরিবেশ কোথায় গেল! প্রফেসরদের ঘরে দু-চারজন করিয়া এখানে ওখানে জটলা করিতেছে, ফিসফিস করিতেছে, বৃহত্তর রাজনীতির আলোচনা করিতেছে, আর সবাই যেন একটা আসন্ন পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছে। মুসলমানরা তো 'লড়কে লেঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজ'-ভাবে উদ্বুদ্ধ ; দুই-চারজন হিন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে তাল দিতেছেন। ইঁহারা হয়ত মনে করিতেছেন—শেষ পর্যন্ত যদি বঙ্গবিভাগ না হয় অথবা হইলেও কলিকাতাই যদি পাকিস্তানে চলিয়া যায়! এই শেষের আশংকা যে একেবারে অমূলক নয় তাহা বুঝিলাম কিছুদিন পরে। মুসলমানরা শাসন ও শোষণের শিকার হইলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্যাগ ও নির্যাতনের সামান্য অংশই তাঁহাদের ছিল ; জিন্না তো কিছুই করেন নাই, এবং সব সময়ই নিজের কোলে ঝোল টানিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের ধূর্ততা এবং হিন্দু নেতাদের আপোসমুখিতার জন্য লীগনেতারা বেশ বুঝিলেন যে একটু জোর করিয়া চাহিলেই কাম্যবস্তু হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া যায়। সুতরাং ইঁহারা ধরিয়া লইলেন—সমগ্র বঙ্গের উপর তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, আর যখন বাংলা ভাগ হইবে বলিয়া আন্দোলন শুরু হইল তখন তাঁহারা দাবি করিলেন, কলিকাতা তাঁহাদের থাকিবে এবং সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজও।

রাজশাহী হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া মনে হইল প্রফেসরদের বসিবার ঘরগুলি যেন লীগের মজলিস। আগে ওখানে অধ্যাপকেরা গল্পগুজব করিতেন বটে, তবে একটু চাপা গলায় ; অনেকে লেখাপড়া করিতেন এবং যে আলাপ-আলোচনা হইত তাহাও প্রধানতঃ শিক্ষা, বিশেষ করিয়া কলেজের পড়াশোনা-সম্পর্কে। কিন্তু এখন হৈহল্লা এবং আসন্ন রাজ-নৈতিক পরিবর্তনই প্রধান বা একমাত্র বিষয় হইল। ইহার মধ্যে একজন লোককে খুব মোড়লি করিতে দেখিতাম। তিনি নবাগত এবং হঠাৎ প্রধান হইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক দুই-তিনটি বাক্যের পরই 'শহীদ' শব্দটি উচ্চারণ করিতেন ; ইহার দ্বারা তিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতে চাহিতেন। ইঁহার নাম আহম্মদ আলি। মহাতবুদ্দীনের পরামর্শানুসারে প্রথম শ্রেণীতে তিন নম্বর পদ গ্রহণ করিয়া অস্থায়ী চাকুরীতে রাজশাহী আসিলাম। হঠাৎ দেখিলাম যে একটি পাকা পদের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। আবার ঔদাসীন্য দেখাইলে কি ক্ষতি হইবে জানি না ; তাই আমি একটি দরখাস্ত দিলাম। চাটগাঁ হইতে আবু হেনা সাহেবও ছিলেন। তারকনাথ সেনও দিয়াছিলেন, কিন্তু অপূর্বকুমার চন্দ—বোধ হয় তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—উহা ফেরৎ দেন। চন্দ সাহেবের যুক্তি—ইহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ; ইহা পরে সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই পদে যিনি নিযুক্ত হইবেন তিনি আমাদের সিনিয়রিটি ব্যাহত করিতে পারিবেন না। এই চিঠি আমি দেখিয়াছি এবং তারক বলিয়াছিল যে এই চিঠি দেখিয়াই সোমনাথবাবু আর দরখাস্ত দিলেন না। যথারীতি ইন্টারভিউ হইল ; নির্বাচক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য তিনজন—একজন চন্দ সাহেবের বন্ধু এবং শহীদ সুরাবর্দীর দাদা—শাহেদ সুরাবর্দী এবং তিনজন মেম্বারের সঙ্গে ডি. পি. আই. জেনকিন্স সাহেব যিনি এককালে ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলেন এবং ইংরেজ বলিয়াই ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞ। হায় রে, কবে কেটে গেছে পি. কে. রায়ের কাল!

এই নির্বাচন ও নিয়োগ-সম্পর্কে দুই-চার কথা বলার আছে যাহা তখনকার শিক্ষা-জগতের হালচালের পরিচয় দিবে। নির্বাচিত হইলেন তিনজন। পয়লা নম্বর হইলেন আহম্মদ আলি। তিনি অচিরেই নিযুক্ত হইলেন এবং বায়না ধরিলেন, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া কোথাও কাজ করিবেন না। সেইজন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনটি প্রথম শ্রেণীর জায়গায় সাময়িকভাবে চারটি পদ সৃষ্ট হইল। দ্বিতীয় মনোনীত ব্যক্তিকে কিছুদিন পরই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রফেসরিতে বহাল করা হইল। শুনিলাম যে ইঁহার শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিয়োগের জন্যও পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য লাটসাহেবের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল ; কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা গভর্নরের ছিল, গভর্নমেন্টের নয়। হইতেও পাবে। তখন আমরা রাজশাহীতে। খাঁ-বাহাদুর আব্দার রহমান আর আমি একসঙ্গে বাড়ি ফিরিতেছিলাম। এই প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি শুধু এই ভাগ্যবান ভদ্রলোকের নাম করিয়া বলিলেন : 'There is a tide in the affairs of men/which, taken at the flood, leads on to fortune.' দেখিলাম, গণিতের প্রথম শ্রেণীর এম-এ হইলেও খাঁ-বাহাদুর সাহিত্যরসিকও বটে। ইহার পরে প্রশ্ন উঠিল, ইংরেজি বিভাগের প্রধান কে হইবেন—প্রবীণ সোমনাথ মৈত্র, না নবাগত আহম্মদ আলি? সরকারের কাছে এই বিষয়ে চিঠি লেখা হইলে ঝটিতি উত্তর আসিল—ইহা লইয়া কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ আলি সাহেব পাকা চাকুরে, সোমনাথবাবু সহ আমরা সবাই অস্থায়ী। এই উত্তরে আমি দোষাবহ কিছু দেখি না। আসল প্রশ্ন হইল—চন্দ সাহেব যে তারকনাথ সেনকে (এবং সোমনাথবাবুকে) এই পদের জন্য দরখাস্ত করিতে দেন নাই, তাহা আহম্মদ আলির পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য? সেই আমলে অনেক ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটা পাল্টাইয়া বলিতে হইত,—হিন্দুকে হিন্দু ছাড়া ডুবাইবে কে? একদিন 'বিচিত্রা' ভবনে একটা মজলিশে চন্দ সাহেব আমার কাছে আহাম্মদ আলির বিদ্যাবত্তার সুখ্যাতি করিলেন এবং শুনিয়াছিলাম যে, যে নির্বাচনের কথা উপরে লিখিলাম তাহার সঙ্গে তিনিও যুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এই সুযোগে দ্বিতীয় নম্বর প্রার্থীর জন্যও জায়গা করা যাইবে। যিনি প্রথম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থী, লাটসাহেব তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিয়োগের ব্যাপারে কখনই আপত্তি করিবেন না।

যে ইন্টারভিউতে আমি দ্বিতীয়বার তৃতীয় স্থান পাইলাম এবং হেনা সাহেব আদৌ মনোনীত হইলেন না, তাহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার মনে আছে। কমিশনের সদস্য শাহেদ সুরাবর্দী ও অপূর্বকুমার চন্দ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, ইঁহারা একসঙ্গে বহুদিন অক্সফোর্ডে বিদ্যাচর্চা করিয়াছেন। আমার শাহেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইয়াছে চন্দ সাহেবের বাড়িতেই। আমরা উভয়েই ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষক ছিলাম আর চন্দ ছিলেন প্রধান পরীক্ষক। একই ইংরেজি পরীক্ষায় যুক্ত ছিলাম বলিয়া শাহেদ সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান-সম্পর্কে বেশ ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় যাহা আমাদের মনে বিস্ময় ও কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা আহাম্মদ আলির ইন্টারভিউ। আমরা যাহারা প্রার্থী হইয়াছিলাম এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য আহূত হইয়াছিলাম, তাহারা সবাই প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে আসন গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পর পর আমাদের ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু সেইখানে আহাম্মদ আলি আসেনও নাই এবং কমিশনের সচিব যে প্রার্থীদের তালিকা হইতে আমা-দিগকে ডাকিয়া ইন্টারভিউয়ের জন্য সভাগৃহে পাঠাইতেন, সেই তালিকায়ও তাঁহার নাম ছিল না। তবে কি যে ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে আহাম্মদ আলি নিযুক্ত হইলেন, সেই ইন্টারভিউতে তিনি উপস্থিতই হয়েন নাই? র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে যে নূতন অভিজাত-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল হেনা সাহেব তাহার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারই ক্ষোভ

বেশি। তিনি ভিতর হইতে সংবাদ আনিয়া বলিলেন যে আমাদের ইন্টারভিউ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে আলি সাহেব শাহেদ সুরাবর্দীর সঙ্গেই আসিয়াছিলেন ; সুরাবর্দী সাহেব তাঁহাকে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন এবং তিনি সুরাবর্দীর গাড়িতেই ফিরিয়া যান। এই বিবরণ সত্য কিনা জানি না। তবে ইহা ঠিক, আমরা কেহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখি নাই।

আলি সাহেবের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় আমাদের মধ্যে কেহ পাইয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তিনি 'Twilight at Delhi' নামে একখানা উপন্যাস লিখিয়াছিলেন ; ইহা সত্য। তাহা পড়িতে আকৃষ্ট হই নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরিতে একবার যেন টি. এস. ইলিয়টের উপর একটা পুস্তিকা দেখিয়াছিলাম এবং চুটকি-জাতীয় রচনা বলিয়াই মোটা-মুটি একটা ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম। আমি ও আলি সাহেব একসঙ্গে বেশিদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করি নাই। যে অল্পকাল ছিলাম, তাঁহার মৌলিকতার দিকে প্রথমে তারকনাথ সেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সে আমার আগে এই বড়সাহেবকে দেখিয়াছে, এবং আমিও এই মৌলিকতা লক্ষ্য করিয়াছি। সাহেব ইংরেজি বিভাগের কাজ-সম্পর্কে প্রায়ই নোটিশ দিতেন এবং সেইখানেই ব্যাকরণের, বিশেষ করিয়া বানানের মৌলিকতার পরিচয় দিতেন। তারক তো তাঁহার মৌলিক বর্ণবিন্যাসের একটা ফিরিস্তি রাখিয়াছিল। তারকের একটা সুবিধা ছিল, কারণ অনেক নোটিশ ছাত্রদের উদ্দেশ্যেও প্রচারিত হইত এবং তাহা লাইব্রেরিতেও টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। তখন হইতেই তারকের আস্তানা ছিল লাইব্রেরিতে এবং সে এই মৌলিকতার বেশি পরিচয় পাইয়াছে।

আহম্মদ আলি সাহেবের যোগ্যতা-সম্পর্কে আমার যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে তাহার অন্য একটা কারণ আছে। আলি সাহেবের নিয়োগের কিছুদিন আগেকার কথা। চন্দ সাহেবের সুপারিশক্রমে আব্দুল হাই নামে ইংরেজির একজন লেকচারার নেওয়া হইয়াছিল—যিনি নাকি অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ পদে আমাদের একজন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছাত্র অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছিল, চন্দ সাহেব আমার কাছে তাঁহাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিলেন। তারপর সেই মূর্তিমান ব্যোমের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম—তাঁহার ভাষায় আমরা যখন 'more clarified' হইলাম– তখন নানা কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিল। অনেক বৎসর পর (পাকিস্তান) রাওয়ালপিণ্ডির মিশনারি কলেজের অধ্যক্ষ পাদ্রী সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এই মর্মে এক চিঠি লিখেন—আব্দুল হাই নামে জনৈক ভদ্রলোক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন জানিয়া তাঁহাকে ঐ মিশনারী কলেজে চাকুরী দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া ইঁহারা জানিয়াছেন ইনি তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ। কেমন করিয়া এই জাতীয় লোক এত নামী কলেজে চাকুরী পাইলেন এবং আদৌ তাঁহার এই দাবি সত্য কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশবিভাগের কিছু আগে আহম্মদ আলি সাহেব কি একটা স্বল্প-কালীন আমন্ত্রণে চীন দেশে গিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগ স্থিরীকৃত হইলে তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট জানিতে চাহিলেন—তিনি কোন্ বঙ্গে কাজ করিতে ইচ্ছুক। শিক্ষাবিভাগের সমস্ত কর্মচারীর নিকট হইতে উত্তর পাওয়া গেল, তবে একজন বাদে—তিনি আহম্মদ আলি। তিনি ঠিক ঠিকানা দিয়াছিলেন কিনা, চিঠি তাঁহার কাছে পঁহুছাইয়া-ছিল কিনা—কিছুই বলিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ আহম্মদ আলি সাহেবকে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, আর পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পর ঐ দেশে বহু ওলট-পালট হইয়াছে এবং জমানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাগ্যপরিবর্তন হইয়াছে। পাকিস্তানের সংবাদ

আমরা খুব বেশি পাই না। তবে যতদূর স্মরণ হয়, একবার খবরের কাগজে অযোগ্যতার দরুন কতকগুলি কর্মচারীর বরখাস্ত হওয়ার সংবাদ পড়িয়াছিলাম, এবং সেই তালিকায় একটি নাম ছিল—প্রফেসর আহম্মদ আলি। আমার ঠিক মনে আছে কিনা এবং ইনিই আমাদের সেই আহম্মদ আলি কিনা বলিতে পারি না।

৩

এই সময়কার আর একজন মুসলমান অধ্যাপকের কথা বলিব, যিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লোক। ইনি হইলেন কুদরত-ই খুদা। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন ; এম. এস-সি'তে রসায়নশাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়া সরকারি বৃত্তি লইয়া লণ্ডন হইতে ডি. এস-সি. হইয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। অধ্যাপনা ও গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আমরা একসঙ্গে না পড়িলেও একই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিয়াছি। কলেজে তিনি আমার দু'বছর উঁচুতে ছিলেন, আবার প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন আমার দু'বছর পরে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গ্রামে তাঁহার প্রতিবেশীর মুখে শুনিয়াছি, ইঁহাদের পরিবার অনেকটা সুফী ভাবাপন্ন ; পারিবারিক প্রভাবেই হউক অথবা শিক্ষাগুণেই হউক ছাত্রজীবনে এবং অধ্যাপনার প্রথম দিকে ইঁহার মধ্যে কেহ সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ দেখিতে পায় নাই। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় তেমন ছিল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমি তাঁহার কথা যতটা জানিতাম, আমার সম্পর্কে তিনি ততটা না জানিলেও আমার বিষয় কিছুই জানিতেন না এমন মনে করি না এবং একই কলেজে কাজ করিতাম বলিয়া এখানে-ওখানে দেখাও হইয়াছে। রাজশাহী হইতে যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন খুদা সাহেবকে অন্য মূর্তিতে দেখিলাম। তখন বোধ হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ অধ্যক্ষ। তিনি খুব অল্প সময়ের জন্য অধ্যক্ষের অফিসে আসিতেন এবং শুধু জরুরী কাগজপত্র দেখিতেন। কলেজের প্রশাসনিক ভার ছিল উপাধ্যক্ষ খুদা সাহেবের উপর। আমি প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। রাজশাহীর জনৈক মুসলমান সহকর্মীর ছেলে আগে রাজশাহীতে আমার কাছে পড়িয়াছে এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইয়াছে—আমার বদলির কিছু আগে। তাহার কি-একটা সামান্য তদ্বিরে আমি খুদা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তখন আমার সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করিলেন। আমি তো কোনমতে বাহির হইয়া আসিলাম। পরে শুনিতে পাইলাম, শিক্ষাবিভাগে তিনিই মুস্লিম লীগের পরিচালক।

কিছুদিন পরে তাঁহার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত পরিচয় পাইলাম। এখন যাহা লিখিতেছি তাহা আর লিখিত বা মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয় ; তবে যাহা নির্ভরযোগ্য তাহাই লিখিতেছি। খুদা সাহেবই নাকি মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া লীগের নির্দেশ মানিতে বাধ্য করেন। তখন, কলিকাতার নরমেধ যজ্ঞের পর, হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারীরা যে যাঁহার পাড়ায় যূথবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অফিসে-কলেজে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় অন্তরঙ্গতা থাকিত না। পূর্বেই বলিয়াছি যখন বঙ্গ বিভাগের স্থিরসিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, তখন একটা Separation (পৃথগীকরণ) Council সৃষ্ট হইল ; পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হইলেন নলিনীরঞ্জন সরকার ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি। স্থির হইল যে প্রত্যেক কর্মচারীকেই লিখিয়া দিতে হইবে তিনি কোন্ বঙ্গে কাজ করিতে (প্রকারান্তরে, নাগরিক হইতে) ইচ্ছুক। তখন লীগ জিগির তুলিয়াছে —কলিকাতা পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়িবে। সেই সুরে সুর বাঁধিয়া অনেক মুসলমান কর্মচারী

লিখিলেন, তাঁহারা 'পূর্ববঙ্গস্থিত কলিকাতায়' (Calcutta in East Bengal) কাজ করিতে চান। আমরা তো দেখিয়া অবাক। মুসলমান কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ববঙ্গের লোক, তাঁহাদের বোধ হয় বলা হয় যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ হইতেছে ; সুতরাং পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানদের পূর্ববঙ্গে থাকিতেই হইবে। এই শেষের বুলি কে বা কাহারা কি উদ্দেশ্যে রটনা করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। ইহা শুনিয়াছি আমার বন্ধু মকবুল আহম্মদের কাছে। তখন এমন একটা ত্রাসের আবহাওয়া চলিতেছিল, প্রতিদিনই এত আজগুবি জনরব শোনা যাইত, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিত এবং মাউন্টব্যাটেনের দম-দেওয়া ইঞ্জিন এত দ্রুততালে চলিতে আরম্ভ করিল যে বিভ্রান্ত করা ও বিভ্রান্ত হওয়া উভয়ই খুব সহজ, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি নিজে 'দেশবিভাজন' ব্যাপারের সংগে যুক্ত ছিলাম। যে ছাপান ফর্ম রাইটার্স বিল্ডিংস হইতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে শুধু লেখা ছিল 'East Bengal/West Bengal' এবং আমাদের উপরে নির্দেশ ছিল—আমরা শুধু অনীপ্সিত অংশটি কাটিয়া দিব। কিন্তু এমন অনেক ফর্ম আমরা হাতে পাইলাম, যেখানে প্রেরক লিখিতেছিল 'Calcutta in East Bengal'। সেপারেশন কাউন্সিল স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন—শুধু East Bengal (পূর্ববঙ্গ) বা West Bengal (পশ্চিমবঙ্গ) গ্রাহ্য ; কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিয়া কোন কথা যোগ-বিয়োগ করিলে তাহা গ্রাহ্য করা হইবে না। ইহা প্রচারিত হইয়া পড়িলে অনেক মুসলমান কর্মচারী—পরিচিত ও অপরিচিত—আমার সংগে দেখা করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় জানাইতে বা পূর্বে অভিব্যক্ত অভিপ্রায় পরিবর্তন করিতে চাহেন। কিন্তু আমাদের সেপারেশন কাউন্সিল তাহাও নাকচ করিয়া দিলেন।

যে-সকল মুসলমান পশ্চিমবঙ্গেই থাকিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইস্‌মাইল সাহেব। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের লোক ; তবে রাজশাহী যাওয়ার পূর্বে ইঁহাকে আমি জানিতাম না। একদিন ট্রামে দেখা। তিনি বলিলেন যে খুদা সাহেবই মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করিয়া, পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করিয়া সবাইকে পূর্ববঙ্গে যাইতে বাধ্য করেন এবং 'Calcutta in East Bengal' প্রভৃতি লিখাইয়া সব ফর্ম সংগ্রহ করেন। ইস্‌মাইল ও তাঁহার সঙ্গী দুই-চারজন খুদা সাহেবকে জানান যে তাঁহারা তো আগেই ফর্ম পাঠাইয়া দিয়াছেন, একসঙ্গে জমা দিতে হইবে ইহা জানিতেন না। যখন তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া যাইবে, তখন তো তাঁহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক! ইহার পর আর একটা মজার ব্যাপার দেখা গেল। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হইয়া নির্দেশ দিলেন যে, কর্মচারীদের সম্পর্কে যে বার্ষিক গোপন রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে যে-সব বিরূপ মন্তব্য তথ্যাভিত্তিক, তাহা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। আমি তখনও রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজ করি। শুনিলাম, খুদা সাহেব একজন বাদে প্রত্যেক হিন্দুকেই খারাপ রিপোর্ট দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার বন্ধু, প্রতিবেশী, আজ্ঞাবহ, কেহই বাদ যায় নাই। সকলের কাছেই এই বিরূপ রিপোর্টের অংশবিশেষ আসিল। ব্যতিক্রম দুইজন—প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ও আমি। প্রতুল রক্ষিত যখন রাজশাহী কলেজের লেকচারার হয়েন, তখন নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য খুদা তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই প্রমোশন পাইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন। আবার এখানে আসিয়াও অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের জন্য খুব প্রতিপত্তিলাভ করেন। বিশেষতঃ শুনিয়াছি, তিনি জৈব ও ভৌত রসায়ন—দুই শাখায়ই সমান পারদর্শী। কয়েক দিনের মধ্যেই সুপণ্ডিত হইলেও খুদা সাহেব নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন, এবং তিনি যে একটু ক্ষুব্ধ হইবেন ইহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। উভয়ের সহকর্মী অজৈব রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর নির্মলেন্দু রায়

আমার কাছে মন্তব্য করিয়াছিলেন : এ যেন আমার জ্বর ৯৯° আর আমার ঝিয়ের জ্বর ১০৫°! আমার প্রতি মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আমি রাজশাহীতে উঠ্‌তি মুসলমানদের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তাহাও অংশতঃ এই বার্ষিক রিপোর্টের মারফতেই—এইরূপ জনরব খুব প্রচলিত ছিল অথচ আমার কোন সাজা হয় নাই। সেই মহৎ কাজ খুদা সাহেব নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। আমার ও প্রতুল রক্ষিতের সম্পর্কে তিনি নাকি এত ভুল তথ্য ও অসম্ভব অপবাদ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা একেবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। উহা আমাদের কাছে না আসিয়া ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় পাইল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

সবই শোনা কথা। কিন্তু ইহা মনে করিবার কারণ আছে যে খুদা সাহেব পূর্ববঙ্গে যাইয়া সুখী হয়েন নাই। নূতন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, যিনি নিজে এক সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ আরম্ভ করার প্রাক্কালে তিনি জানাইলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজকে তিনি উন্নত মানের শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহেন এবং কেমিস্ট্রি দিয়াই তিনি তাঁহার পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে শুরু করিবেন। ইহা রাজনৈতিক মঞ্চ হইতে বক্তৃতাও নয়, বৈঠকী গল্পও নয়। এইভাবে প্ল্যান করিতে বসিয়াই আমাকে ও প্রাক্তন শিক্ষাসচিব কান্তিচন্দ্র বসাককে ইহা বলিয়াছিলেন। তারপর বোধ হয় খানিকটা অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কাজ আরম্ভ করার কয়েক মাস পরেই তিনি গদিচ্যুত হয়েন। ডক্টর ঘোষের প্ল্যানের প্রথম কথাই হইল উপযুক্ত বেতনাদি দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির প্রফেসর যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধনকে প্রেসিডেন্সী কলেজে নিযুক্ত করা। ব্যাপারটা তিনি ডক্টর বর্ধনের সঙ্গেও আলাপ করিয়া থাকিবেন। কিছুদিন পর শুনিলাম যে ডক্টর বর্ধনের স্থানে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া খুদা সাহেব ঢাকা হইতে টোপ ফেলিয়াছেন। এই জাতীয় প্রস্তাবের দেয়া-নেয়া তখন দুই বাংলার মধ্যে চালু ছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্তকে ঢাকায় বাংলার প্রফেসর করা যায় কিনা এই বিষয়ে এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাহমুদ হাসান ও আমার মধ্যে অনেক পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল। ডক্টর বর্ধনের সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা ছিল। তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত আছেন, খুদা সাহেব সেই পদ-সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই জৈব রসায়নের ছাত্র ও অধ্যাপক; সেই সূত্রে এক সময় ইঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তখন ঢাকা সেক্রেটারিয়েটে অ-বাঙ্গালী মুসলমান সিভি-লিয়ানদের খুব দাপট। যতদূর জানি অবিভক্ত বঙ্গে দুইজন প্রবীণ বাঙ্গালী সিভিলিয়ান ছিলেন—নূরন্নবী চৌধুরী আর গোলাম মোরশেদ। ঢাকার নবাব-বাড়ির জামাতা মোরশেদ দুই নৌকায় পা দেওয়ায় ভারত বা পাকিস্তান কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, আর চৌধুরী সাহেবকে একটু দূরে সরাইয়া রাখা হইল। এই অবাঙ্গালী মুসলমান সিভি-লিয়ানরা পূর্ববঙ্গকে উপনিবেশ বলিয়া মনে করিতেন। সেইখানে ডি. পি. আই. খুদা সাহেবের মত সুপণ্ডিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ লোক মাথা হেঁট করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দুইদিনেই অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। অপর পক্ষ দলে ভারি এবং পদমর্যাদায় কুলীন! কিছুদিন পরেই দেখা গেল, অন্য একজন ডি. পি. আই. নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং উত্তরকালে খুদা সাহেব করাচী ও ঢাকায় নানা পদে কাজ করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার পদে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

৪

কলিকাতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার পর আসিল নোয়াখালির ধর্ষণ ও নির্যাতন পর্ব। ইহার মধ্যে আমরা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিলাম : স্বাধীনতার সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিল বিভক্ত পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে পশ্চিম-পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে পূর্ব-পাঞ্জাবে নিষ্ক্রমণ এবং পথিমধ্যে বাস্তুহারা উভয় সম্প্রদায়ের হত্যা, ধর্ষণ, সম্পত্তিলুণ্ঠন। সেই মর্মান্তিক কাহিনী এইখানে বলিয়া লাভ নাই। কলিকাতায় ইহার জের তখনও অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের জুলাই—আগস্ট পর্যন্ত চলিতেছিল, আমি তাহার কিছু কিছু দেখিয়াছি। তবে হয়ত মহাত্মাজির নোয়াখালি ও কলিকাতা আসায় এবং শহীদ সুরাবর্দী সাহেব মহাত্মাজির শরণ নেওয়ায় বঙ্গদেশে, অন্ততঃ শহরে হিন্দুদের মধ্যে আসন্ন ত্রাসের ভাবটা কমিয়া আসিয়াছিল। আমার কলিকাতার বাড়ি ভাড়াটের দখলে ছিল ; আমি এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, নিজে কলিকাতায় শ্বশুর-মহাশয়ের বাড়িতে থাকিব এবং ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমার পরিবারবর্গ রাজশাহী থাকিবে ; ছেলেমেয়েদের বার্ষিক পরীক্ষা হইলে পর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে রাজশাহীর পাট উঠাইয়া দিয়া সবাই কলিকাতা আসিবে। কিন্তু নানা কারণে আমার রাজশাহীর বন্ধুরা ইহা যুক্তিযুক্ত হইবে না মনে করিলেন। নগেনবাবু সবাইকে লইয়া কলিকাতায় আসিলে পর ছাত্র সদানন্দ চক্রবর্তী তাহার চুঁচুড়ার ভাড়াবাড়ি ছাড়িয়া দিয়া মেসে আশ্রয় লইল। পূর্ব-বঙ্গের মামলা-মোকদ্দমার উপর যাঁহারা নির্ভর করিতেন কলিকাতা হাইকোর্টের সেইসব উকিলরা তো অনেকে ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে এক পা আগাইয়াছিলেন। আশংকায় ভারাক্রান্ত মনেই আমরা 'মা যা হইবেন' তাঁহাকে বলিলাম—বন্দে মাতরম্।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাকে সম্পন্ন করিবার জন্য যে সেপারেশন কাউন্সিল নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহার আসল নিয়োগ-কর্তা হইলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তাহা তখনও জন্ম নেয় নাই এবং তাহার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ। সেপারেশন কাউন্সিলের অধীনে কতকগুলি কমিটি হইল ; তাহাদিগকে বলা হইত পার্টিশন কমিটি। শিক্ষাবিষয়ক কমিটির মেম্বর—প্রাক্তন শিক্ষাসচিব কান্তিচন্দ্র বসাক ও আমি ; যদিও সেক্রেটারিয়েটে বেশি দিন ছিলাম না, তবু ইহার রহস্য বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। তখন বঙ্গরাজ্য বিলীয়মান ; মন্ত্রীদের মধ্যে এক তারক মুখুজ্জে ছাড়া আর কাহাকেও দেখি নাই এবং তাঁহাকে দেখিয়াও শ্মশানযাত্রীর জীবনতৃষ্ণার কথা মনে হইত। বঙ্গের দুই বিবদমান উত্তরাধিকারী ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া বিব্রত। আমাদের কাছে যে-সমস্ত সমস্যা আসিত তাহা পূর্বে কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। একবার বঙ্গবিভাগ হইয়া-ছিল বটে ; কিন্তু অঙ্গরাজ্য দুইটিই ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশ। এবার তাহা নহে ; এবার যে ভাগ হইবে তাহা আর কোনদিন জোড়া লাগিবে না, এবং উপরওয়ালা ইংরেজও চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই কমিটিগুলির সব সদস্যই প্রশাসনিক অফিসার জজ ম্যাজিস্ট্রেট, আর জজ হইতে ম্যাজিস্ট্রেট বেশি। বাহিরের লোক, যতদূর মনে আছে, মাত্র দুইজন—আমি আর ডাক্তার অমূল্য উকিল। অমূল্য উকিলও খুব একটা আসিতেন না, কাজেই আমি একা। আমি এই-সব জাঁদরেল অফিসারদের অপটুতা দেখিয়া মনে মনে হাসিতাম। ইঁহারা সহি করিতে করিতে অথবা নীচের কর্মচারী যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহার উপরে খুশিমত মন্তব্য করিয়া নিজেদের কর্মদক্ষতায় গর্বিত বোধ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে

কেরানী, বড়বাবু, সহ-সচিব, উপসচিব নাই এবং প্রশ্নগুলিও নূতন। সেই-সব প্রশ্নের ইঁহারা সম্মুখীন হইবেন কি করিয়া?

জিন্না ও মুসলিম লীগ জানিয়া লইয়াছে যে জোর করিয়া চাহিলেই পাওয়া যায়। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে পূর্ব-পাঞ্জাব ও দিল্লীর হন্যমান মুসলমানদের প্রাণরক্ষা অপেক্ষা হিন্দুদের নিকট হইতে একটা বেশি টাইপরাইটার বা টাইপরাইটারের রিবন কাড়িয়া নেওয়াকে জিন্না বেশি জরুরি বলিয়া মনে করিতেন। এখানেও তাঁহারা সেই মনোভাব লইয়াই অগ্রসর হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট পর্যন্ত কোন্ সংস্থায় সবকার কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা হিসাব করিয়া সেই টাকার প্রাপ্য অংশ পূর্ব-পাকিস্তান বা পূর্ব-বাংলাকে দিতে হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসময় একজন খুব প্রত্যুৎপন্নমতি, ক্ষুরধারবুদ্ধি, ওয়াকেবহাল এবং দুর্মুখ অফিসারের দেখা পাইলাম—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এক কথায় তর্ক থামাইয়া দিলেন এবং যুযুধান দাবিদারকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, দুই সরকারের প্রতিনিধিরা বসিয়াছেন সরকারি সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে। অনেক বেসরকারি সম্পত্তি সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানতঃ সরকারি অনুদানে—যেমন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট—কিন্তু ইহাদের মালিক সেই-সব প্রতিষ্ঠান—সরকার নহেন। সুতরাং এই আলোচনা কমিটির এক্তিয়ারের বাহিরে ; পূর্ব-বঙ্গ সরকার ইচ্ছা করিলে এই-সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা আনিতে পারেন। প্রতিদিন আমরা অপর পক্ষের সঙ্গে মিলিত হইতাম। তর্কাতর্কি শেষ করিয়া ফলাফল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসিতে হইত। সেইখানে রুক্ষ মেজাজী সুশীল মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের বড় সাহেবদের একদফা মগজধোলাই হইত। ইহা শেষ হইলে অথবা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে কর্তারা আড়ালে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু ইহা পরবর্তী গলাগালি খাওয়ার প্রস্তুতি মাত্র। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে মাত্র আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। উপরিতলায় ঠিক হয়—উভয় বঙ্গে যেখানে যে সম্পত্তি আছে, তাহা সেখানে যেমন আছে তেমন থাকিবে। শুধু যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠান থাকে যাহা অনন্য অর্থাৎ যাহার প্রতিরূপ অন্য বঙ্গে নাই, তাহা হইলে তাহার অর্ধেক অপর বঙ্গ পাইবে। পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা দাবি করিলেন যে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের প্রতিনিধিরা তাহা মানিয়া লইলেন। ইহার অর্থ দাঁড়াইল—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের যন্ত্রপাতি, আসবাব-পত্র, এক্স-রে প্লেট, সঞ্চিত ওষুধ—সব-কিছু দ্বিখণ্ডিত হইয়া ঢাকা যাইবে। ঢাকায় সেই-সব জিনিস কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, কলিকতা মেডিক্যাল কলেজ অচল হইয়া যাইবে। সুশীলবাবু তো অগ্নিমূর্তি ধারণ করিলেন এবং শেষে যেভাবেই হউক, তিনি আর নলিনী-রঞ্জন সরকার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজকে রক্ষা করিলেন।

এই সময় আর একজন লোক আমার মনের উপর রেখাপাত করেন যাঁহার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি—তিনি নলিনীরঞ্জন সরকার। ইহার আগে ও পরে তাঁহার কথা শুনিয়াছি অনেক, কিন্তু এই সময়েই তাঁহার কাছে আসিয়াছিলাম, যদিও তাহা খুব বেশি কাছে নয়। তবু ইঁহার সম্পর্কে আমার খুব উচ্চধারণা হয়। তাঁহার প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরি-সম্পর্কে উক্তির উল্লেখ করিয়াছি ; ইহা হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সেপারেশন কাউন্সিলের কাজে যাহা আমি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করিতাম তাহা তাঁহার আত্মস্থতা। আমার বক্তব্য একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। তিনি সমস্ত বিষয়টি এমন ভালভাবে অধীত করিয়াছেন যে ইহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ নিজের সীমিত

অধিকার-সম্পর্কে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। তিনি সব সময়েই মনে করিতেন যে তিনি শুধু একটা বিশেষ কাজের অর্থাৎ ভাগ-বাঁটোয়ারার জনই আসিয়াছেন ; গভর্নমেন্টের পলিসি বা সামগ্রিক উদ্দেশ্যের প্রশ্ন উঠিলেই তিনি বলিতেন, উহা প্রফুল্লবাবুর অর্থাৎ ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাইতে হইবে। তাঁহার দক্ষতার আর একটা পরিচয় পাই বছর খানেক পরে। নলিনী সরকার মহাশয় নানা পদ অধিকার করিয়াছেন, নানা দুরূহ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সরকারি, বেসরকারি, ইংরেজ, ভারতবাসী, হিন্দু, মুসলমান —সব মহলে তাঁহার বক্তব্য ও মন্তব্য শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। এইরূপ একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনিতাম যে এই লোকটি বি-এ পাস করেন নাই এবং লেখাপড়া জানেন না। ইঁহার একদল যোগ্য সেক্রেটারি আছেন ; তাঁহাদের কাজ নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। বঙ্গসরকারে ইঁহার প্রধান সহকারী ছিল আমার বন্ধু বিনয় দাশগুপ্ত। বিনয় কিন্তু এই মতকে খণ্ডন করিত, যদিও এই প্রতিবাদের দ্বারা সে নিজেকেই ছোট করিত। বিনয়ের বক্তব্য এই : সেক্রেটারি বা সহকারীরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চাভিলাষী। তাঁহারা নিজেদের প্রবর্তনায় লিখিতে পারেন এবং অনেকে লিখিয়া থাকেন। তাহা বিশেষ মর্যাদা পায় না। কিন্তু ইঁহাদের রচনাই যখন নলিনীবাবুর নামে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা সমাদৃত হয়। ইহা হইতেই বোঝা যায় আইডিয়া, পরিকল্পনা ও যুক্তি নলিনীবাবুর ; সেক্রেটারিরা—সে নিজেও একজন—রাজমিস্ত্রী মাত্র। যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমাকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রসারের পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন রচনার ভার দেওয়া হয়। প্রথমেই প্রাথমিক বা প্রাইমারি শিক্ষার কথা লিখিতে হয়। বিনয়ই একদিন বলিল, ফজলুল হক সাহেবের আমলে নলিনীবাবু এই বিষয়ে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সেক্রে-টারিয়েট লাইব্রেরিতে আছে। আমি উহা আনাইয়া পড়ি এবং চমৎকৃত হই। ঐ বিষয়ে এইরূপ তথ্যপূর্ণ, সাজান-গোছান যুক্তিসমৃদ্ধ বই আমি পড়ি নাই। আমার বিশ্বাস, যদিও ভারতের বঙ্গদেশ নামে প্রদেশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ বই প্রকাশনের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হইয়াছে, তবু উহার উপযোগিতা এখনও চলিয়া যায় নাই।

যিনি সকলের উপরে ছিলেন অর্থাৎ ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ—তিনিও আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি আমাকে ও কান্তি বসাককে তাঁহার সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য বঙ্গসরকারের শিক্ষা-সচিব রাজনও উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর ঘোষ শিক্ষাব্যবস্থাদি-সম্পর্কে দুই-একটা প্রশ্ন করিলেই বসাক মহাশয় বলিলেন, আমরা পার্টিশন কমিটির লোক, ভাগ-বাঁটোয়ারা আমাদের বিষয় ইত্যাদি ইত্যাদি। অমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, পার্টিশন কমিটিতে তাঁহার কোন উৎসাহ নাই। তিনি টাকা-পয়সার হিসাবপত্র বোঝেন না, নলিনীবাবু বোঝেন এবং সেইজন্য তাঁহার উপর সেই ভার দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ডাকাইয়াছেন, কারণ তিনি জানেন আমরা শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাকে যথাযোগ্য পরামর্শ দিতে পারিব। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভবিষ্যৎ কাঠামো রচনা লইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, এই উন্নতমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে কেমন করিয়া তিনি আরও উন্নত করিবেন। রাজনকে তৎকালীন শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ফিরিস্তি দিতে বলিলেন। প্রথমেই দেখা গেল একজন শিক্ষক বি-এ এবং এম-এ দুই পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস। শুনিয়াই তো কর্তা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। আমি বলিলাম, ইঁহাকে তো পাবলিক সারভিস কমিশন উন্নততর পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। অমনি উত্তর আসিল—'সেইজনাই তো এই পাব্লিক সারভিস কমিশনকে আমি বরবাদ করিয়া দিব।' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জজ সুকুমার সেনকে চেয়ারম্যান করিয়া কমিশন গঠন করিলে কমিশন কেমন হইবে?' কান্তি

বসাকও সিভিলিয়ান, কিন্তু এইরূপ আদর্শদীপ্ত উক্তি শোনার পর বসাক সাহেবের সিভি-লিয়ানী আভিজাত্য চলিয়া গেল। তাঁহার মধ্য হইতে বিশ বছর আগেকার প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ও কেম্ব্রিজের তরুণ র‍্যাংলার যুবক বাহির হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, 'স্যার, প্রথম পাব্লিক সারভিস কমিশনের চেয়ারম্যান করুন আচার্য যদুনাথ সরকারকে। তাহা হইলে গভর্নমেন্টের চাকুরীর উপর লোকের আস্থা ফিরিয়া আসিবে।' কথাটা ঐখানেই থামিল। রাজন আবার তালিকা হইতে নাম ও কোয়ালিফিকেশন পড়িতে লাগিলেন। দেখা গেল, এক ভদ্রলোক আছেন যিনি বি-এ'তে পাস-কোর্সে এবং এম-এ'তে দ্বিতীয় শ্রেণী। ডক্টর ঘোষ তো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা (এবং রাজনও) বলিলাম, ইনি কিন্তু মুসলমান। তৎক্ষণাৎ জবাব আসিল, 'সেই প্রশ্ন রাজনৈতিক ; তাহার সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক নাই।' তখনই তিনি বলিতে লাগিলেন যে প্রথম শ্রেণীর এম-এ ছাড়া কেহ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবে না। আমি বলিলাম যে অনার্স আর এম-এ একই রকমের পরীক্ষা। ইহা দেখা যায় যে অনেক ভাল ছেলে বি-এ'তে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়া এম-এ'তে প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে : আবার অনেক ভাল ছেলে বি-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাইয়া এম-এ'তে পা পিছলাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করে। ডক্টর ঘোষ আমার বক্তব্য শুনিয়া রাজনকে অর্ডার দিলেন, কলেজে অধ্যাপনা করিতে হইলে বি-এ/এম-এ একটাতে ফার্স্ট ক্লাস থাকিতে হইবে। নচেৎ ডক্টরেট থাকিতে হইবে (মনে রাখিতে হইবে তখনও ডক্টরেটের অবমূল্যায়ন হয় নাই)। আর বর্তমান চাকুরেদের মধ্যে এইজাতীয় যোগ্যতা নাই, এমন লোক প্রেসিডেন্সী কলেজে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।

এই সময়ে অনেক মুসলমান কর্মচারী পূর্ববঙ্গে চলিয়া যাওয়ায় পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিতেছিলেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা করিয়াও কিছু কিছু পদ খালি হইতেছিল এবং আমার সুপারিশক্রমে ডক্টর ঘোষ কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু কিছু নূতন লেকচারারও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হইতেছিলেন। একদিন অমলেশ ত্রিপাঠি উপস্থিত। সে বিলাত যাওয়ার স্টেট স্কলারশিপের জন্য মনোনীত হইয়া বসিয়া আছে ; তাহার সেই স্কলারশিপ যাহাতে মঞ্জুর হয় সেই উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে। আমি বলিলাম, এখনকার যে আবহাওয়া তাহা এ প্রস্তাবের অনুকূল নয় ; কর্তৃপক্ষ বলিবেন ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের—ইতিহাসের গবেষণা করিতে বিদেশীরা এই দেশে আসে, এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। তারপর বলিলাম, আমার হাতে চাকুরী আছে। তাহাকে চাকুরী দিতে পারি। অমলেশ রাজি হইল ; সে বলিল, তিন বৎসর পর বিলাতী ডিগ্রি লইয়া আসিয়া তো চাকুরীই খুঁজিতে হইবে। এখন হইতে চাকুরী করিলেই ভাল। পরের দিন সে লেকচারারের পদের জন্য দরখাস্ত দিয়া চলিয়া গেল। প্রথমত, আমি নিয়োগ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা ডিলিং এ্যাসিস্ট্যান্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। তাঁহার নাম ও চেহারা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু হাতে দরখাস্ত পাইয়া সেই তরুণ কর্মচারী যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা অবিস্মরণীয় : 'এই আমলেও যদি অমলেশ ত্রিপাঠির মত ছাত্র লেকচারার হইয়া প্রবেশ করে তাহা হইলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি?' আমি একটু ইতস্ততঃ করায় তিনি সাহস দিয়া বলিলেন যে আমি যদি চেষ্টা করি তাহা হইলে অমলেশ উচ্চতর গ্রেডে—এখনকার পরিভাষায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে নিযুক্ত হইবে। বাস্তবিক, অমলেশ শুধু তাঁহার উচ্চাঙ্গের যোগ্যতার জন্যই সোজা প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে চাকুরী পাইল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহার স্ত্রী দীপ্তি ত্রিপাঠিও বেথুন কলেজে মেয়েদের প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে চাকুরী পায়। ইহার কিছুদিন পর তারাপদ মুখার্জি অমল ভট্টাচার্যকে রাস্তা

হইতে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিল। তখন আমি কলেজে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেক্রেটারিয়েটে নূতন জমানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কান্তি বসাক ফুড কমিশনার হইয়াছেন। শুধু পার্টিশন কমিটির অবশিষ্ট কাজের জন্য আমি মাঝে মাঝে সেক্রেটারিয়েটে যাই। (বোধ হয় কৃষ্ণনগর কলেজে) ইংরেজির লেকচারশিপ খালি ছিল, সেই উদ্দেশ্যে অমলের দরখাস্ত পেশ করিলাম। ডক্টর ঘোষ কিছুতেই রাজি হন না ; তাঁহার যুক্তি খুব অদ্ভুত : এত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে যদি সামান্য লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে আখেরে ফল খারাপ হইবে। ভাল ভাল ছাত্রেরা অন্য লাইনে চলিয়া যাইবে ; শিক্ষাবিভাগে কেহ আসিতে চাহিবে না। আমি বলিলাম, আমাদের শাস্ত্রে আছে যে মূল্যের দ্বারা দ্রব্যের শোধন হয়। কিছু বেশি বেতন দিলেই শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মর্যাদা দেওয়া হইবে। নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া অমলকে বেশি বেতনে লেকচারার করা হইল।

অন্য কোন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি কেহ এইরূপ কথা শুনিয়াছেন? আমার মনে হয়, এমন কোন বাতুল কোথাও ছিল না যে বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষার উচ্চমানের কথা উত্থাপন করিবার কথা ভাবিয়াছে। আমি সিদ্ধার্থশংকরকে কখনও কখনও উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক নিয়োগের কথা বলিয়াছি। কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি যে সে আমার পরামর্শ মানিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং যখন আমার কথা রাখিতে পারে নাই তখনও নতশিরে আমার তিরস্কার গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার, ভবতোষ দত্ত ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকে সঙ্গে করিয়া শিক্ষাগত মানের কথা বলিতেই একবার জ্যোতি বসুর কাছে গিয়াছিলাম। অপরাজেয় সৌজন্যের সহিত সে যাহা বলিল তাহার ভাবার্থ এই : আমাদের বক্তব্য—সে নিজেও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র —সে উপলব্ধি করে, কিন্তু পার্টি ডেমোক্রাসির শৃঙ্খলে তাহার হাত-পা বাঁধা।

১৯৪৮ সালের মে মাসে আমি নিজ বাড়ির দখল পাইয়া সেইখানে প্রবেশ করি এবং প্রায় এই সময়ই ডক্টর ঘোষও মুখ্যমন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার সুরেন ঠাকুরের ভাড়া বাড়িতে চলিয়া আসেন। ডক্টর ঘোষ মিশুকে লোক নহেন ; আমাদের মধ্যে পেশাগত ও আদর্শগত কোন মিল নাই এবং বয়সের পার্থক্য অনেক। সুতরাং প্রতিবেশী হইলেও আমাদের যে খুব দেখাশোনা হইত তাহা নহে ; তবু আমাদের মধ্যে আন্তরিক টান ছিল। আমি তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতাম এবং তাঁহারও আমার প্রতি আস্থা ছিল। যখনকার কথা বলিতেছি তখন তিনি কংগ্রেসে আছেন। নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিলের খসড়া এসেমব্লীতে পেশ করিলেন এবং তাহার আলোচনার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি করিলেন, ডক্টর ঘোষকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করার সুযোগ আমার হইয়াছিল। এখন ভুলিয়া গিয়াছি—কি সূত্রে সরকারি কলেজের কোন্ সমিতি বা সংস্থায় ইহার আলোচনা হইয়াছিল ; সেখানে বিতর্কের প্রধান অংশীদার ছিলাম সুশোভন সরকার ও আমি। শ্রীকুমারবাবু তখন পোস্ট-গ্রাজুয়েট (আর্টস) বিভাগের সভাপতি। আলোচনার জন্য ডক্টর রায় তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলেন ; এই আলোচনার প্রস্তুতি-পর্বে শ্রীকুমারবাবু আমার সঙ্গে একদিন বিলটির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

ডক্টর ঘোষ আমার প্রতিবেশী। তিনি একদিন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করিলেন—রাত্রি দশটা। আমি রাজি হইলাম, বিস্মিতও হইলাম—অত রাত্রিতে আলোচনা আরম্ভ করিয়া কখন শেষ করিব। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আরও বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি আমাদের অপেক্ষা পৃথক ধাঁচের লোক। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত ; সুতরাং আমাদের ঠুলি-পরা চোখ,

সবই সংকীর্ণদৃষ্টিতে দেখি। ইনি সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত ; কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হইয়া তাঁহার কাছে দেখা দিয়াছে। আগে সিনেটে অনেক সংস্থার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইতেছিল ; তিনি এত বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সংস্থান—তাঁহার কথায় scheduled caste representations—কাটিয়া দেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে অধ্যাপকদের ও শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়ার কথা তিনি প্রস্তাব করেন এবং ইহা দেওয়া হইবে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে। কিন্তু সিন্ডিকেটে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব তিনি সংকুচিত করিতে চাহেন। তাঁহার যুক্তিটি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তিনি কাহারও নাম করিলেন না, তবে কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে শিক্ষকদের মারফতে। যাঁহারা নিজেদের স্বার্থে ইউনিভার্সিটিকে চালাইয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, ট্যাবুলেটর, স্পেশাল রীডার ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষকদের প্রলুব্ধ করিয়া দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়িয়াছেন। সুতরাং সিন্ডিকেট বা কর্মসমিতির অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ অশিক্ষক সদস্য থাকিবে। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এই-সব আলোচনার বিবরণ দিলাম। বিবরণটা আনুপূর্বিক হইল কিনা বলিতে পারি না ; বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা কখন হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে ইহা ঠিক, প্রথম অ্যাক্টের যে-সকল ধারার কথা লিখিলাম, তাহা ডক্টর ঘোষের অবদান। পরবর্তীকালে কি হইয়াছিল বলিতে পারি না। ইহাও ঠিক, প্রথমবার যে এক-তৃতীয়াংশ অ-শিক্ষক সিন্ডিক নির্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্ততঃ দুইজন—গোপাল হালদার ও মোহিত মৈত্র—যাঁহাদের সঙ্গে ডক্টর ঘোষের কোন মিল ছিল না, এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নৈতিক পাহারাওয়ালার কাজ করিতেন এবং সেই কারণেই ভাইস-চ্যান্সেলর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইঁহাদিগকে সমীহ করিতেন।

এক সময় ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। আমার বন্ধু বিনয় দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষ নলিনী-বিধানের অনুগামী। কিন্তু সেও ডক্টর ঘোষের আদর্শবাদকে স্বীকার করিত। ডাক্তার বিধান রায় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে করিতেই সংকটের আভাস পাওয়া গেল। তখন বিনয় আমাকে বলিয়াছিল, 'ইঁহারা যাইবার জন্য আসেন নাই, ঠিক ম্যানেজ করিয়া লইবেন ; ইঁহারা প্রফুল্ল ঘোষ নহেন যে বিনা বাক্যব্যয়ে মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া যাইবেন।' কংগ্রেস ছাড়িয়া ডক্টর ঘোষ যখন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হইলেন, তখন আমরা খুব মর্মাহত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে মনে হইয়াছে, কংগ্রেসের সঙ্গে তো তাঁহার আদর্শগত এমন কি প্রোগ্রাম লইয়াও কোন বিরোধ ছিল না! তবে দল ছাড়িলেন কেন? পরে তিনি দেখিয়া থাকিবেন যে ক্ষমতার লোভ সর্বত্রই আছে ; কংগ্রেসের পট্টভি সীতা-রামাইয়া এবং তাঁহার নূতন দলের তথাকথিত 'strong man' থানু পিল্লাই উভয়েই লাটগিরি পাইলে খুশি। পরে ডক্টর ঘোষ আইনসভায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা সেই বিষয়ে তিনি নিভৃতে আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। আমি মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের পক্ষেই মত দিয়াছিলাম। আমার যুক্তি ছিল, দেশের প্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা ; তাঁহার মত সর্বজনের আস্থাভাজন লোকের হাতে এই দপ্তর থাকা উচিত ; তবে তিনি যেন সঙ্গে কৃষিদপ্তরের ভারও দাবি করেন। তাঁহার একটা ক্ষোভ অস্পষ্ট রহিল না : তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তিনিই নেতা নির্বাচিত হইবেন। পরে তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হইলেন অথবা বলা যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্যই তিনি কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিলেন, কারণ এই প্রত্যাবর্তনের অন্য কোন সঙ্গত কারণ তিনি বলেন নাই। এই সময় তাঁহার বাড়িতে একদিন নৈশভোজে আমি আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু

যাই নাই। পরে তাঁহার মন্ত্রিত্ব চলিয়া গেলে একদিন করুণাকুমার হাজরা ও আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তাঁহার পদত্যাগের কারণ বিশদভাবে বলিলেন। আইনসভার জনৈক প্রভাবশালী সদস্য যাঁহার সততা সন্দেহাতীত নয়, তাঁহাকে তিনি মন্ত্রী করিতে রাজি হইলেন না, ইহার জন্যই তাঁহাকে যাইতে হইল। কিন্তু কে না জানিত যে এই লোকটিই তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন? তিনি সেই সমর্থনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? পরবর্তীকালে এই প্রবীণ নেতার বাস্তব রাজনৈতিক অপরিপক্কতার আর একটা পরিচয় পাই। বোধ হয়, তিনি ঝাড়গ্রাম হইতে শেষবারের মত আইনসভায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নির্বাচনের জন্য দাঁড়াইয়াছেন কিন্তু নির্বাচন তখনও হয় নাই। এইরূপ সময়ে একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইতে আমরা একই গাড়িতে ফিরিতেছিলাম। আসন্ন ইলেকশন ও তাঁহার জয়-পরাজয়ের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি বলিলাম, একটা বড় রাজনৈতিক দলের—কংগ্রেস না কমিউনিস্ট মনে নাই—প্রতিনিধি আছেন এবং তিনিই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন। ডক্টর ঘোষ একেবারে অন্য কথা বলিলেন। তাঁহার মতে ঐ রাজনৈতিক দলভুক্ত প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে। কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে একজন স্থানীয় প্রার্থীর সঙ্গে, কারণ ঐ-সব গ্রামীণ সমাজ জাতিভিত্তিক এবং এই প্রার্থীর জাতভাইয়েরা কেহ কেহ তাঁহাকে ভোট দিবেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইলেকশন হইল এবং ফল বাহির হইল—ঐ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি জিতিয়াছেন, ডক্টর ঘোষ দ্বিতীয় এবং তিনি যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশংকা করিয়াছিলেন তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে! যিনি বহুদিন পার্লামেন্টারি রাজনীতি করিলেন, তাঁহার নিজের কেন্দ্র-সম্পর্কে এইরূপ অজ্ঞতা শুধু বেমানান নয়, অমার্জনীয় অপটুতা।

বাংলায় মহাত্মা গান্ধীর উপর বই লিখিয়া ডক্টর ঘোষ পবিত্রকুমার বসুর মাধ্যমে ঐ বই ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি কোন পারিশ্রমিক লইব না এই শর্তে এই কাজ গ্রহণ করি। কোন বই অনুবাদ করিতে হইলে তাহা তন্নতন্ন করিয়া পড়িতে হয়। আমি গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না ; কিন্তু যে-কোন পাঠক দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকার জোর দিয়াছেন গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর। এই কর্মসূচীকে রূপায়িত করিতে তিনি বাড়বাসুদেবপুর গ্রামে 'লোকভারতী' শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন ও সার্বিক গ্রামোন্নয়ন অভিযানে ব্রতী হয়েন। সেই প্রতিষ্ঠান দেখিবার জন্য আমাকে একাধিকবার আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, কস্তুরবা স্মারকনিধি এবং অন্যান্য সংস্থা হইতে তাঁহাকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি সরকারি অনুদান গ্রহণ করিবেন না। প্রশ্ন এই : তিনি এই বিরাট কর্মযজ্ঞ হইতে সরিয়া আসিয়া বারংবার পার্লামেন্টারি রাজনীতির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিলেন কেন? ক্ষমতার মোহ ও আদর্শবাদের অবক্ষয় স্বাধীন ভারতের একটা বড় ট্র্যাজেডি। ডক্টর ঘোষের কাহিনী এই ট্র্যাজেডির সাক্ষ্য দেয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মোহভঙ্গ

১

১৯৪৮ সালে বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী হইলেন। জমানা বদল হইল। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের একান্ত-সচিব করুণাকুমার হাজরা এবং তাঁহার আমলের শিক্ষাসচিব শৈবালকুমার গুপ্তকে সরিতে হইল ; মুখ্যসচিব সুকুমার সেনকে তো রাজ্যছাড়া হইয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইতে হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাক্তার রায় বহুদিন সংযুক্ত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর উহার Board of Accounts বা আয়ব্যয়ের বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে উহার ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে অপব্যবস্থা ও স্বজন-পোষণকে শিক্ষাপরিচালন বলিয়া চালাইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের একটু ভাসা-ভাসা রকমের সংযোগ ছিল ; কারণ তাঁহার মত কর্মব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে এই ব্যাপারের গভীরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ এই ঘুনেধরা সংস্থার তিনি সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। আর তাঁহার ধ্বজাধারী ওখানে ছিলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ—যিনি সমস্ত উন্নতির প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। বন্ধুবর বিনয় দাশগুপ্ত ডাক্তার রায়ের খুব অনুগত ছিল এবং ডাক্তার রায় বিনয়ের উপর অকাতরে করুণা বর্ষণ করিয়াছিলেন। বিনয় তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিত, অনেক সময় সেই প্রশংসা স্তাবকতার পর্যায়ে পড়িত। কিন্তু সেই বিনয়ই আমাকে বলিয়াছে যে, প্রেসিডেন্সী কলেজ যে বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজ প্রভৃতি হইতে একেবারে ভিন্নগোত্রীয় কলেজ, তাহা তিনি জানিতেন না। আজ প্রেসিডেন্সী কলেজকে যে বাস্তবিকই অন্য-সকল কলেজের সঙ্গে একেবারে সমান করিয়া ফেলার চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আশুতোষ-বিধানচন্দ্র-সতীশচন্দ্র প্রভৃতির অপকর্মের শেষ ফল।

২

বিধানবাবু ও সতীশবাবুর মধ্যে বেশ একটা সবজান্তা ভাব ছিল ; সকল বিষয়েই ইঁহারা খুব মুরুব্বির মত কথা বলিতেন। যাঁহারা শিক্ষা পরিচালনা করেন, তাঁহারা যে খুব বড় পণ্ডিত হইবেন ইহা প্রত্যাশা করা উচিত হইবে না, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিকে চিনিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকা চাই। ইঁহারা একটু বাড়াবাড়ি করিতেন বলিয়াই ইঁহাদের রেকর্ডটার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে চাই। আমি এইসব রেকর্ডকে খুব মূল্য দিই না ; তবু জানা থাকা ভাল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইলেও আমি বিধান রায়ের চিকিৎসার হাতযশ বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইব। এখানে শুধু অ্যাকাডেমিক রেকর্ডের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৯৯ সালে পাটনা কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ পাস করিয়াছিলেন এবং ১৯০১ সালে বি-এ'তে গণিতে অনার্স পরীক্ষায় সর্বনিম্ন স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিশ্চয়ই খুব ভাল ছাত্র ছিলেন, কিন্তু সেই সময় যে-সকল পদক বা পুরস্কার চালু ছিল তাহার একটিও পান নাই। সেই আমলে এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম গুণানুসারে ছাপা হইত। ১৯০৯ সালে দুইজন ছাত্র এম-ডি পাস

করেন ; ডাক্তার রায় দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে যতই সাফল্য-লাভ করুন না কেন, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন এমন কথা শুনি নাই। সতীশবাবু গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছিলেন, তৎপর এম-এ'তে মিশ্র বা ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পড়াইতেন বিশুদ্ধ গণিত যাহাকে আশুতোষ অবশ্য উচ্চতর গণিত বলিতেন, কিন্তু অন্য সবাই নিম্নতর গণিত মনে করিত। তিনি শিক্ষণ-ব্যাপারে কতটা দক্ষ ছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে তাঁহার অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় পাইতাম। আমরা যখন পঞ্চম বার্ষিক—এখন বলা হয় এম-এ প্রথম বার্ষিক—শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন দারভাঙ্গা ভবনের তিন তলায় ইংরেজি ও গণিতের ক্লাস পূর্বদিকে কাছাকাছি ঘরে হইত—আমাদের ক্লাসের সম্মুখ ভাগের অর্থাৎ পূর্বদিকের বারান্দা দিয়া গণিতের অধ্যাপকদিগকে ক্লাসে যাইতে দেখিতাম। সতীশ-বাবুকে একখন্ড চককে ক্রিকেট বলের মত দুই হাতে লোফালোফি করিতে করিতে যাইতে দেখিতাম। তিনি এই ক্লাসে যতটা সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইতেই তাঁহার অতন্দ্র নিষ্ঠার পরিচয় পাইতাম। তিনি বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ গণিত কোন বিষয়েই কোন গবেষণা করেন নাই, কিন্তু ডক্টরেট থীসিসের পরীক্ষক হইয়াছিলেন। আমার উপর তাঁহার বিরূপ মনোভাবের কথা আমি জানিতাম, সুতরাং ইউনিভার্সিটির কাজে কখনও কখনও কাছা-কাছি আসিলেও মুখোমুখি হইতাম না। একবার তাঁহারই—রেজিস্ট্রার/ট্রেজারারের—ঘরে কি একটা প্রসঙ্গে বাংলা পাঠ্যক্রমের আলোচনা হইতেছিল। আমার বহুদিনের পোষিত মত আমি ব্যক্ত করিলাম যে বাংলা সিলেবাসে সমালোচনা-সাহিত্য বা সমালোচনা-তত্ত্বের যথা-যোগ্য স্থান করিয়া দেওয়া উচিত। অমনি সতীশবাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, 'All criticism is foolish.' ইহার পর অথবা ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাইটার্স বিল্ডিংসে বিধানবাবু আর বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীশবাবু—এই বিধান-সতীশ অ্যাক্সিস বা অক্ষশক্তির একটা মূলমন্ত্র ছিল : আশুতোষের ছত্রচ্ছায়ায় বসিয়া আমরা যে ইউনিভার্সিটি গড়িয়াছি তাহার অনাচার প্রভৃতি সবই আমরা জানি, কিন্তু ইহার কাঠামো বদলান যাইবে না। এখানে-ওখানে স্কুল-কলেজ কর, বাড়িঘর কর—কন্ট্রাকটাররা টাকা পাইবে, সেই টাকার কিছু কিছু অংশ অন্যের পকেটেও যাইতে পারে। ভাল কথা। কিন্তু সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন নৈব নৈব চ। ইঁহারা যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার সবচেয়ে বড় স্তম্ভ কেন্দ্রীয় পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা। যে অক্ষশক্তির কথা বলিয়াছি তাহার প্রধান লক্ষ্য ইহাকে অটুট রাখা। অথচ ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা অধিকাংশ লোকেই বুঝিয়া গিয়াছেন যে, যে-সকল বড় বড় নীতিকথা তখন কপচান হইয়াছিল তাহা ভুয়া। ইহার দ্বারা শিক্ষার উন্নতি হয় নাই। বিধানবাবু ইহা বুঝিতেন ; এই সমালোচনকে ইনি স্বীকৃতিও দিলেন, কিন্তু বিরোধী আন্দোলনকে ফাঁকি দিতেও তিনি বদ্ধপরিকর। তাই তিনি একটি আইন পাস করিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুইরকম কলেজ থাকিবে : (১) অনুমোদিত বা affiliated কলেজ আর (২) মৌলিক বা constituent কলেজ। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে মৌলিক বা constituent কলেজ এম-এ পর্যন্ত পড়াইবে, আর অনুমোদিত কলেজ যথারীতি আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট পড়াইবে। আর দুইটি অনেকটা নাম-কো-ওয়াস্তে মৌলিক কলেজ থাকিলেও ইউনিভার্সিটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল প্রেসিডেন্সী কলেজ। অক্ষশক্তির ইচ্ছা নয় যে এই পরিবর্তন সংসাধিত হয়। কাজেই প্রথমে বলা হইল—এই তিনটি সংস্থাকে আপাতত 'মৌলিক' কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইল শুধু ইলেকশন বা নির্বাচনের জন্য। পড়াশোনার ব্যাপারে পরে স্থির হইবে। তৎপূর্বেই বিধান রায় আর একটি কাজ করিয়া রাখিলেন।

সিলেক্ট কমিটিতে আইন যখন পাস হয় তখন ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ পঠন-পাঠনের বিষয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকা চাই—এই প্রস্তাব করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। আইন পাস হইলে দেখা যায় যে কলেজ হইতে মুষ্টিমেয় লোক অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আসিবেন আর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক অধ্যাপকই পদাধিকার বলে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হইবেন। ইহার উদ্দেশ্য—যদি প্রয়োজন হয় ইঁহারাই রুখিয়া দাঁড়াইবেন এবং সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিবেন।

১৯৫১ সালে অ্যাক্ট পাস হয় এবং, যেহেতু প্রেসিডেন্সী কলেজই প্রধান 'মৌলিক' বা constituent কলেজ এবং তাহার অধ্যাপকরাই এই কেন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলী, ইঁহারা ঠিক করিলেন যে সুশোভন সরকার ও আমিই তাঁহাদের প্রধান প্রতিনিধি হইব। সুশোভনবাবু সিনেটে ও আমি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে। এক কিস্তি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে কাজ করিয়া বীতশ্রদ্ধ হইলাম। দেখিলাম, এখানে বাগ্মিতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করিবার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যূথবদ্ধ প্রফেসররা তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা করিতেই ব্যস্ত। এদিকে আমাদের উপরিতলায় ফাইলযুদ্ধ চলিতেছিল। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'মৌলিক' কলেজ চালু করিতে চাহেন। তিনি মন্ত্রী বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা খুবই সীমিত, প্রায় শূন্য। সব কথা মনে নাই ; একবার যেন তিনি ক্ষোভে মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। যখনকার কথা বলিতেছি তখন তিনি অনেক লেখালেখি করিলেন, এমন কি আইনজ্ঞের মত নিলেন। আইনজ্ঞ মত দিলেন যে সরকার ইচ্ছা করিলে প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজে এম-এ ক্লাসে ছাত্র ভর্তি করিতে পারেন ; একজন প্রিন্সিপ্যাল সেই চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্থিতাবস্থার পরিবর্তন হইল না। ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; 'মৌলিক' (constituent) কলেজের পরিবর্তে নূতন নাম ও পরিকল্পনা আসিয়াছে। কিন্তু যে যেখানে ছিল সেখানেই রহিল। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারেও সেই একই কথা। রূপেন মিত্তির কমিটি বসিল, সুশীল মুখোপাধ্যায় আসিলেন, গেলেন ; কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমির আরও গাঢ় হইল মাত্র। ইহার কারণ মানুষের অথবা প্রাণের ধর্মই এই, যে সে এক জয়গায় স্থির থাকিতে পারে না। অগ্রসর না হইলে পিছু হটিতে হইবেই। সুতরাং এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে অবস্থায় পঁহুছিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে শীঘ্রই ইহার ডিগ্রির আর কোন মূল্য থাকিবে না।

আমার নিজের কথাতে ফিরিয়া আসি। এক কিস্তি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, তাহার উপসমিতি, ফ্যাকাল্টি ও বোর্ডের মেম্বর থাকিয়া, আমি স্থির করিলাম, সময়ের এই অপচয় বন্ধ করিবই। প্রথমবারও সহকর্মীরা যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আমি ছুটিতে ছিলাম। আমি স্থির করিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনা বেতনে অধ্যাপনা ও সবেতনে পরীক্ষা করা ছাড়া আর কোন কাজ করিব না এবং এই-সকল কমিটি ও কাউন্সিলে আর যাইব না। তারকনাথ সেন শুধু ইংরেজি বোর্ডে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, কারণ বোর্ডই ইংরেজি বই পাঠ্য করে এবং পরীক্ষকের নাম সুপারিশ করে। আমি তারককে বলিলাম, 'আমার মন এই-সব ব্যাপার হইতে সরিয়া গিয়াছে ; তোমরা যতই অনুরোধ কর না কেন, আমি আর থাকিব না।' এইবার যখন প্রফেসরদের ঘরে এই ব্যাপার লইয়া প্রফেসরদের সভা বসিল, আমি দৃঢ়কণ্ঠে আমার অনিচ্ছার কথা বলিলাম। অনেকেই এই অনিচ্ছার কথা জানিত, কিন্তু কেমিস্ট্রির জনৈক তরুণ অধ্যাপক বলিলেন, আমার মত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ লোকের প্রতিনিধি থাকা উচিত ; অন্যান্য খালি জায়গায় নূতন লোক নির্বাচন করা যাইতে পারে। আমি আমার অনমনীয় মনোভাব পুনরায় ব্যক্ত করিলাম। এইখানেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইল।

একটা প্রবাদ আছে—ভগবানের চক্র খুব ধীরে ধীরে ঘোরে, কিন্তু তাঁহার কাজ খুব সূক্ষ্ম ও একেবারে অভ্রান্ত। ইহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গের ছেদ টানিব। আশুতোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি। সাকরেদ বিধানচন্দ্র এই সংস্থার প্রত্যেক প্রফেসরকে পদাধিকার বলে সিনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য করিলেন। ই'হাদেরও চাহিদা বাড়িয়া গেল। ই'হারা বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তো তাঁহাদেরই। আশুতোষ-নন্দন রমাপ্রসাদবাবু এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুও কোন দিন মনে করেন নাই যে তাঁহাদের পারিবারিক গোমস্তারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল। নীহাররঞ্জন রায় আমার সহাধ্যায়ী। তিনি বি-এ'তে ইতিহাসে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পান, তারপর এম-এ'তে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ললিতকলা গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েন এবং ১৯২৮ সালে আমরা এক সঙ্গেই পি. আর. এস. হই। মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জেদের পৃষ্ঠপোষকতা বা বদান্যতা যাঁহারা কামনা করিতেন বা তাহা ভোগ করিয়াছেন, নীহাররঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম। খুশি হইয়া শ্যামা-প্রসাদবাবু ই'হাকে বৃত্তি দেন ; উদ্দেশ্য, তিনি বিদেশ হইতে গ্রন্থাগার পরিচালনবিদ্যা শিখিয়া আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হইবেন। তৎপূর্বে নীহাররঞ্জন ডক্টরেটের জন্য থীসিস দিয়া গিয়াছিলেন ; তাহা পরীক্ষকেরা একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করেন। যথাসময়ে নীহাররঞ্জন গ্রন্থাগার পরিচালনার ডিপ্লোমা ও হল্যান্ড হইতে ডক্টরেট লইয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি নূতন কোন থীসিস লিখিয়াছিলেন, না, কলিকাতায় যে থীসিস বাতিল হইল, তাহাই ওখানে দাখিল করিয়াছিলেন জানি না। তিনি কিছুকাল গ্রন্থাগারাধ্যক্ষের কাজ করার পর ১৯৪৬ সালে শ্যামাপ্রসাদবাবু তাঁহাকে ললিতকলার প্রফেসর করিলেন। তাঁহার এই কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা আছে কিনা, ইহা কি শ্যামা-প্রসাদবাবু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন? তাঁহার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ই যে তাঁহার থীসিস প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহা কি শ্যামাপ্রসাদবাবু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন? নীহাররঞ্জনকে এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি আশ্রিতবাৎসল্যের পরিচয় দিলেন এবং নিজেদের পারিবারিক সুবিধাও করিয়া লইলেন, কারণ নীহাররঞ্জন রায়ের জায়গায় ভগিনীপতি প্রমথনাথের অনুজ বিশ্বনাথ লাইব্রেরির অধ্যক্ষ হইলেন। মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যেরা 'relation and retainer'—আখ্যাটা শত্রুপক্ষীয় ইস্পাহানীর—উভয়ের পদোন্নতিতে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু সবার সেরা রসিক বিশ্বনিয়ন্তা হাসিলেন।

১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাহার পরই আশুতোষের পরিবারের মধ্যে বহু ফাটল দেখা যায়। সেই-সব কেচ্ছা সংবাদপত্রে, কোর্ট-কাছারির বিবরণে দেখা গিয়াছিল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ দেখিতাম, ভগিনীপতি প্রমথনাথ ও শ্যালক রমাপ্রসাদ—এই দুই ধুরন্ধর যে-যাঁহার কক্ষপথে আবর্তিত হইতেন। নূতন অ্যাক্টে পাঁচটি—কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, কমার্স-ফ্যাকাল্টীর প্রধান বা ডীনদের খুব মর্যাদা দেওয়া হয়। ই'হারা পদাধিকার বলে সিন্ডিকেটের মেম্বর হইবেন, ডি. ফিল কমিটিতে থাকিবেন, ঐ-সব ফ্যাকাল্টীতে কোন নিয়োগ হইলে ডীন সেই কমিটিতে থাকিবেন। প্রমথবাবু আইন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, রমাপ্রসাদবাবু তো হাইকোর্টের জজ। উভয়েরই আইন-ফ্যাকাল্টিতে ডীন হওয়ার ইচ্ছা। কিছুকাল পরে যখন শ্যালক ও ভগিনীপতিতে তেমন সদ্ভাব রহিল না, তখন রমাপ্রসাদবাবু দেখিলেন যে আইন-ফ্যাকাল্টিতে প্রমথবাবুর পাল্লা ভারি। ই'হাদের পারিবারিক কলহে আমার উৎসাহ নাই এবং এই যে প্রতিযোগিতার কথা লিখিতেছি, তাহারও যথেষ্ট বর্ণনা দিলাম কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে ইহা অবিসংবাদিত যে রমাপ্রসাদবাবু আর্টস-ফ্যাকাল্টির ডীন হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আশুতোষ ও তাঁহার

উত্তরসূরিগণ ফ্র্যাংকেনস্টাইনের অনুকরণে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট নামে যে অতিকায় দানবকে লালন করিয়াছিলেন, তাহাকে রোধিবে কে? প্রফেসররা দাবি করিলেন যে, সব ফ্যাকাল্টিরই ডীন হইবেন পোস্ট-গ্রাজুয়েটের প্রফেসর। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে এইরূপ দাবি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তবুও তাঁহারা এইরূপ নজির বা কনভেনশন সৃষ্টি করিলেন ; পরে ইহা কাগজপত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার শিকার হইলেন আশুতোষের জ্যেষ্ঠতনয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন প্রফেসরদের মধ্যে যিনি সিনিয়র—নীহাররঞ্জন রায়। এইখানেই আশুতোষের পুত্রপৌত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপত্তির অবসান। ঠিক বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি যে প্রাণিতত্ত্ববিভাগের প্রফেসরের পদ খালি হইলে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায় একটু উঁকিঝুঁকি দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-মহলে কোন সাড়া পান নাই। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীই গ্রহণ করিয়াছেন—তবে কলিকাতায় নয়, দিল্লীতে।

৩

শ্যামাপ্রসাদবাবু নিজে খুব সৎলোক ছিলেন, তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি বিদ্বান ছিলেন না, বিদ্যাবত্তার প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাও ছিল না। স্যারের প্রতি অনুরাগ কেন ছিল তাহা জানি না ; তবে পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার সঙ্গে মোহিনীবাবুর প্রতি আনুকূল্যের সামঞ্জস্য করা যায় না। যাহা হউক, এই কৌশলী, ধীমান লোকটি দুইটি কাঁচা কাজ করিয়া খাল কাটিয়া কুমির আনিলেন। পিতা-পুত্রে এতকাল শুধু স্বজনপোষণ করিয়া আসিয়াছেন। তাহা বেশ নিরাপদ ব্যাপার। আর তল্পিবাহক বা retainer-বাহিনীর দ্বারাই relations বা আত্মীয়দের স্বার্থও রক্ষা করা যায়। কিন্তু তিরিশের দশকে শ্যামাপ্রসাদবাবু রাজনীতিতে প্রবেশ করিলেন এবং বোধ হয়, যুব-জনতাকে দলে টানিবার জন্য তিনি কিছু কিছু বিপ্লবীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী দিলেন। ইহারা হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি বা বিরাজমোহন মজুমদারের মত পোষ মানিল না। এই কথা অবিদিত নয় যে আমার সঙ্গে অনেক বিপ্লবীর পরিচয় ছিল। শ্যামাপ্রসাদবাবু যাহাদের চাকুরী দিলেন তাহাদের মধ্যে শুধু দুইজনের কথা এখানে বলিব। একজন ধীরেন্দ্রনাথ সেন ওরফে লালু—সে আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, আর একজন আমার ছাত্র—সে চট্টগ্রাম বিপ্লব-অভিযানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ইহারা বিভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু উভয়েই আদর্শবাদী। অন্যান্য রোগের মত আদর্শবাদও ছোঁয়াচে। আর ধীরেন (লালু) ছিল খুব ঠোঁটকাটা ও বেপরোয়া। যেখানে আচার্যদেবরা নীরব সাক্ষীর ভূমিকা পালন করিয়াছেন, সেখানে সামান্য কেরানী হইয়া সে দারভাঙ্গা হলের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনাচার এবং তথাকথিত অফিসার, প্রফেসর, সিণ্ডিক প্রভৃতির সেই অনাচারের সমর্থনের ব্যঙ্গ করিত। ইহার একটা ফল হইল এই যে সাধারণ কর্মচারীদেরও সাহস বাড়িয়া গেল। যে কথা এস্‌প্ল্যানেডে দাঁড়াইয়া একমাত্র হরিনাথ দে প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য তাঁহাকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছিল, তাহা কন্ট্রোলার অফিসের কর্মচারীরা ন্যাক নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে বলিতে আরম্ভ করিল, কারণ সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের একজনের ভাগ্নে ইঁহাদের বড়বাবু ছিলেন। ধাপে ধাপে কোন একটা ব্যাপার গড়িয়া তোলার ধৈর্য বা কৌশল লালুর ছিল না, কিন্তু তাহা অন্য বিপ্লবীর ছিল আর ছিল সেই-সব করণিকদের, যাঁহারা এতকাল এই-সব ব্যাপারের নীরব দর্শক ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আরও একটি কাঁচা কাজ করিলেন। আগে পরীক্ষকের সংখ্যা ছিল কম ; তাহার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুই-চারজন নামজাদা হেডমাস্টার পরীক্ষক হইতেন। ক্রমশঃ স্কুলমাস্টার পরীক্ষকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং একটা দাবি উঠিল যে ইংরেজির প্রধান পরীক্ষকদের মধ্যে অন্ততঃ একজন স্কুলের শিক্ষক হইবেন। আমি কমিটি প্রভৃতির মেম্বর হওয়ার আগেই খানিকটা প্রভাবশালী হইয়াছিলাম। স্যারের সঙ্গে অনেক সময়ই আমি থাকিতাম এবং তাঁহার কান ভারি করিতে পারিতাম ; আর শ্রীকুমারবাবু আমার কথা শুনিতেন। তিনি যে সংস্থায়ই থাকিতেন কুশলী তার্কিক বলিয়া সেইখানেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হইত। আমি এইরূপ একটা প্রোপাগাণ্ডা করিতে লাগিলাম যে শিক্ষকদের এই যুক্তিসঙ্গত দাবি পূরণ করিতে হইলে প্রথমে সুশীলকুমার মজুমদারকে এই পদ দেওয়া উচিত। তিনি প্রবীণ হেডমাস্টার অথচ প্রাচীন নহেন। তিনি বি-এ'তে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন, তৎপূর্বে ইন্টারমিডিয়েটে ইংরেজিতে প্রথম হইয়াছিলেন ; কোন কারণে এম-এ পরীক্ষাই দেন নাই। আবার কেহ কেহ বলিলেন, এ. বি. টি. এ. (All Bengal Teachers' Association) এই আন্দোলন করিতেছে ; তাহারা খুব প্রভাবশালী। এই সংস্থার সেক্রেটারি মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে এই মর্যাদা ও আনুষঙ্গিক দক্ষিণা দেওয়া উচিত হইবে। শ্যামাপ্রসাদবাবু মাস্টার মহাশয়দের এই যুক্তি মানিয়া লইলেন, কিন্তু তিনি যাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন তিনি শুধু প্রবীণ নহেন, প্রাচীন ; তাঁহাদেরই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক।

ইঁনি প্রবীণ, প্রাচীন এবং স্থবিরও বটে। বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে পাস-কোর্সে বি-এ পাস করিয়াছিলেন ; তাঁহার পক্ষে ত্রিশ হাজার পরীক্ষার্থীর খাতাপত্র সামলান এবং একপাল পরীক্ষকের উপর খবরদারি করা অসম্ভব ব্যাপার। শুনিয়াছি, ইঁহার নিয়োগ সিণ্ডিকেট হইতে পাস করাইয়াই শ্যামাপ্রসাদবাবু ইঁহাকে সাহায্য করার জন্য ইঁহার কন্যাকে পরীক্ষক করিলেন। কন্যার বিষয়ে কিছুই জানি না। কিন্তু আসল প্রধান-পরীক্ষক হইলেন ঐ বিদ্যালয়ের একজন চটপটে শিক্ষক। তাঁহার ভাবখানা শেক্সপীয়রের ভাষায় বলা যাইতে পারে : হ্যারি (Prince Harry) রাজা...the laws of England (অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন) are at my commandment ! তিনি ইচ্ছামত নম্বর বাড়াইতে পারিতেন এবং কমাইতেও পারিতেন। একবার নিজেদের স্কুলের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য তিনি শুধু নিজেদের ছাত্রদের নম্বর বাড়াইলেন না, সেই-সব ছাত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নম্বরও কমাইলেন। এই জাতীয় কুকর্মে সাক্ষী রহিল সেই-সব আদর্শবাদী যুবক—যাহাদের মুখপাত্র ধীরেন ওরফে লালু। ইঁহারা সেইবারই এই অনাচারের ছবি তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল শুধু আলোকচিত্র বা ফটোস্টাটের দ্বারা সব কথা বোঝান যাইবে না। অথচ ইঁহারা নিজেরা সামনে আসিতে পারেন না। ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্যের বংশধর এই মাস্টারমহাশয়ের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে ; অন্যান্য প্রধান পরীক্ষকদেরও আত্মীয়-স্বজন থাকে, ইঁনি তাঁহাদেরও উপকার করিতে পারেন ; এবং তাঁহারাও দেখিলেন যে রাজবাড়িতে অন্দরমহলেও ইঁহার যাতায়াত আছে, সুতরাং ইঁহার অনুরোধ আর রাজবাড়ির আদেশ একই ব্যাপার। শুধু এই ভদ্রলোক জানিতেন না যে একদল শ্যেনদৃষ্টি যুবক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। প্রমথনন্দন দিব্যেন্দুকুমার পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার জন্য রাতকে দিন করিতে হইবে। এই মাস্টারমহাশয় যখন যাহা বলিলেন প্রধান-পরীক্ষকরা তাহাই মানিয়া লইলেন। শুধু দুইজন এই চক্রের বাহিরে রহিলেন—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন। সুনীতিবাবুর একটা মস্ত গুণ ছিল সরলতা। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে তদ্বিরকারক যখন তাঁহার বাড়িতে হানা দেন,

তখন বেশ কয়েকদিনের জন্য তিনি কলিকাতার বাহিরে ছিলেন ; কাজেই তাঁহার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। সেই কৃতিত্ব শুধু প্রিয়রঞ্জন সেন দাবি করিতে পারেন।

দিব্যেন্দুকুমারকে আকাশে তুলিবার চেষ্টা এবং তাহার গভীর গর্তে পতন—এই নোংরা ইতিহাস সবাই জানেন। এই-সব কেলেংকারিতে কোন হাইকোর্টের জজ-জাতীয় লোক লিপ্ত ছিলেন না ; সুতরাং ইহার তদন্তের জন্য যে কমিটি বসে তাহার রিপোর্ট সকলেই দেখিয়াছেন। সেইজন্য নোংরা ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। তবে এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আশুতোষের পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকালের জন্য কলঙ্কলিপ্ত হইয়া গেল। হৃতমান কিন্তু নিরুপায় প্রমথনাথ অনেকটা জীবন্মৃতের মত আইন কলেজের অধ্যক্ষের পদটি শেষপর্যন্ত আঁকড়াইয়া রহিলেন—সেই দৃশ্য একাধারে করুণ ও হাস্যকর। তবে সবার সেরা রসিক বিশ্বনিয়ন্তা এখানেও বৈপরীত্যের সমন্বয় করিলেন। যাঁহারা এই নাটকে সবচেয়ে কদর্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম হইলেন শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি বাংলার প্রধান-পরীক্ষক ছিলেন। যে পাতায় দিব্যেন্দুকুমারের নম্বর ছিল সেই পাতার ফটো কাগজে বাহির হইয়াছিল,—দেখা গেল পঁচিশটি ছেলের মধ্যে এগার জনের নম্বরই বাড়ান হইয়াছে। প্রধান-পরীক্ষকের শতকরা মাত্র ৫খানা খাতা দেখিতে হয়। দিব্যেন্দুকুমারের নম্বর শৈলেনবাবু এখানে তো অনেক বাড়াইয়াছেন, কিন্তু দেখা গেল ট্যাবুলেটরের পাকা খাতায় তাহার চেয়েও বেশি নম্বর তোলা হইয়াছে। প্রশ্নের উত্তরে ট্যাবুলেটর প্রধান-পরীক্ষকের লিখিত নির্দেশ দাখিল করিলেন। এবার শৈলেনবাবু এক আজগুবি গল্প বলিলেন : তিনি যে-সকল ভাল ভাল খাতা দেখেন তাহাদের সম্পর্কে মনে মনে একটা ডায়েরি রাখেন। পরীক্ষান্তে যদি মনে করেন কাহারও প্রতি অবিচার হইয়াছে, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি ট্যাবুলেটরকে জানাইয়া দেন। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি ; একটু-আধটু ভুল থাকিলেও মোটামুটি ঠিকই লিখিতেছি বলিয়া ভরসা করি। এই কাহিনী কেহ বিশ্বাস করিবে তাহা শৈলেনবাবুও মনে করেন নাই। তিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি। সেই কাজটি ছাড়িতে হইল। ইহার পর তাঁহাকে আর দেখি নাই ; কিছুদিন পর শুনিলাম তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে।

শৈলেন মিত্র শ্যামাপ্রসাদবাবুর একান্ত অনুগামীদের অন্যতম। তিনি শ্যামাপ্রসাদ-বাবুর শিক্ষকও ; তাঁহার সঙ্গে গবেষণা করিয়াই শ্যামাপ্রসাদবাবু এম-এ পরীক্ষায় গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক-সম্পর্কে নিবন্ধ দেন এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু এই অন্তরঙ্গ শিক্ষক ও বন্ধুকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সেক্রেটারি করেন। ইনি আবার হরিনাথ দের নিকটতম আত্মীয়—হরিনাথ ইঁহার পিসতুত ভাই। ইঁহাদের কর্মধারা বিপরীতমুখী, কিন্তু আখেরে একই পরিণতি ইঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। হরিনাথ আশুতোষের বৈরিতা করিয়া তাঁহার রোষভাজন হইয়া যে ফল ভোগ করিলেন, তাঁহার মাতুলপুত্র অক্লান্ত সেবার দ্বারাও সেই ফলই লাভ করেন। তবু তফাৎ আছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া হরিনাথ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আবার ভাস্বর হইয়াছে, কিন্তু শৈলেন্দ্রনাথের কলঙ্ক অনপনেয়।

৪

এই সময় (১৯৪৬-৪৭) শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার শেষবারের মত যোগাযোগ হয়। সেই যোগাযোগেও ইঁহাদের কার্যকলাপের যে পরিচয় পাই তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। আমার স্যারের জন্য একটা দুর্বলতা সব সময়ই ছিল, এখনও আছে। প্রিয় ছাত্র শ্যামা-

প্রসাদবাবু যখন ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েন, তখন স্যার তাঁহার হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দেন প্রাচ্য ভাষার ক্লাসিকের বাংলা অনুবাদের জন্য এবং তিনি আরও বেশি টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুরা লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়া অপেক্ষা চাকুরী দিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং এই-জাতীয় কাজে তাঁহার মন ছিল না। অনুরূপ প্রেরণার ফলে আমি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হই এবং যদিও সংস্কৃতে আমার ব্যুৎপত্তি খুব সীমিত, তবু ধ্বন্যালোক ও লোচন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করি। আমার রাজশাহীর সহকর্মী কালীপদ ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকটি ছাত্রের অনুবাদ দেখিয়া দেন এবং ভুলত্রুটি শুদ্ধ করিয়া দেন। ইঁহাকে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা বলিয়া কালীপদবাবুকে আমার সহযোগী গ্রন্থকার বলিয়া গ্রহণ করি। প্রায় বার বছরে স্যারের দানের যখন কিছুই হইল না, তখন আমি শ্যামাপ্রসাদ-বাবুকে বলি যে তিনি আমার অনুবাদ ঈশান অনুবাদমালার গ্রন্থ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাপুন ; আমি ইহার জন্য কোন অর্থ চাই না। যদিও স্যারের তখন আর চৈতন্য নাই, তাহা হইলেও আমাদের একটা গুরুকৃত্য সম্পন্ন হইবে। শ্যামাপ্রসাদবাবু খুব আনন্দ-প্রকাশ করিলেন এবং আমার প্রতি এতটা আস্থা প্রকাশ করিলেন যে তিনি অন্য কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়া যাচাই না করিয়াই ইহা ঈশান অনুবাদমালার প্রথম গ্রন্থ হিসাবে ছাপিবার অর্ডার দিয়া দিবেন বলিয়া পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিলেন। ইউনিভার্সিটিতে আসিয়া কেরানী, অ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার সকলের কাছেই উমেদারি করিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। শুধু এক ঘর হইতে আর-এক ঘর, এক তলা হইতে আর এক তলা পরিক্রমাই সার হইল। এই সময় টেক্সটবুক বিভাগের এক ভদ্রলোক—ইঁহারা সকলেই ভায়া লালুর ছোঁয়াচ পাইয়াছেন—আমাকে বলিলেন যে ইউনিভার্সিটিতে যেখানে টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেইখানে কোন কাজ হয় না। তিনি বলিলেন, এক ধনী লোক পার্সিভেল সাহেবের সম্পাদিত দুইখানি শেক্সপীয়র নাটকের কপিরাইট বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের সাহায্যার্থে দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। কিন্তু কেহ এই বিষয়ে কিছু করিতেছেন না।

কৌতূহলী হইয়া আমি পাণ্ডুলিপিগুলি দেখিলাম—একখানা জুলিয়াস সীজার আর একখানা অ্যান্টনি ও ক্লিওপ্যাট্রা। অ্যান্টনি ও ক্লিওপ্যাট্রা দেখিয়া আমি খুব উৎফুল্ল হইলাম, কারণ ইহা শেক্সপীয়রের একটা শ্রেষ্ঠ নাটক ; আবার কঠিন নাটকও। পার্সি-ভেলের বৈশিষ্ট্যই হইল গূঢ় অর্থের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়। শ্রীকুমারবাবু তখন ইংরেজি বোর্ডের চেয়ারম্যান ; তাঁহাকে আমি বলিলাম যে অ্যান্টনি ও ক্লিওপ্যাট্রার পাণ্ডুলিপি আমি সম্পাদন করিয়া, প্রুফ দেখিয়া ছাপাইয়া দিব এবং ইহার জন্য আমি কোন পারিশ্রমিক চাই না। শ্রীকুমারবাবু বোর্ডে এই প্রস্তাব পাস করাইয়া দিলেন ; কিন্তু পার্সিভেলের দুই ছাত্র —আমার শিক্ষক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এবং শিক্ষকোপম প্রফুল্লকুমার গুহ—আমার সহযোগী হইলেন। পার্সিভেল বহুদিন আগে লিখিয়াছেন, পাণ্ডুলিপি একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার তদ্বিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস বেশ তাড়াতাড়ি পাণ্ডুলিপি টাইপ করাইয়া দিল এবং যে ইউনিভার্সিটি প্রেস দীর্ঘসূত্রিতার জন্য কুখ্যাত তাহাও বেশ চটপট করিয়া মুদ্রণ-কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। আমার যাহা-কিছু অসুবিধা হইল তাহা ঐ দুই সহযোগীকে লইয়া। তাঁহারা আমার মান্য ব্যক্তি ; তাঁহাদের সম্মতি ছাড়া আমি কিছু করিতে পারি না। ইঁহাদিগকে একত্র করাই আমার প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তারপর, স্কুলে, কলেজে পড়ার সময়, এমন কি স্টেজে অভিনয় করার সময় আমরা মোটা-মুটিভাবে আধুনিক কালে প্রচলিত (যেমন গ্লোব) সংস্করণের অংক ও দৃশ্যবিভাগ গ্রহণ করি এবং এই-সকল সংস্করণের অনুসরণ করিয়া পঙ্‌ক্তি সাজাই। কিন্তু পার্সিভেল

ছিলেন অনন্যসাধারণ পণ্ডিত এবং এই-সব বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মৌলিক ধারণাও ছিল। তিনি তদনুসারে দৃশ্য ভাগ করিয়াছেন ও পঙ্‌ক্তি সাজাইয়াছেন। অথচ তিনি তো মূল শেক্সপীয়রের নাটক অর্থাৎ পরিভাষানুসারে যাহাকে text বলা যাইতে পারে, তাহা পাঠান নাই! ইহা ঠিক করিতে এবং আমার দুই সহযোগীর অনুমোদন সংগ্রহ করিতে খানিকটা হয়রান হইতে হয়। মোহিনীমোহনবাবু আবার অনেক সময় কলিকাতায় থাকিতেন না ; এই কার্যে আমার যদি কোন অবদান থাকে, প্রফুল্লবাবু তাহা বুঝিতেন এবং বইখানি প্রকাশিত হইলে তিনি আমার কাছে লিখিত একখানা চিঠিতে মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরের লোক বিশেষ করিয়া ইউনিভার্সিটির লোকেরা দেখিলেন যে আমি শুধু প্রুফ দেখিতেছি। প্রেসের তদানীন্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন আমার প্রতিবেশী। তাঁহাকে মাঝে মাঝে একটু বলিয়া দিতাম ; প্রেস হুহু করিয়া ছাপিয়া কাজ শেষ করিয়া দিল। আমি যে জুলিয়াস সীজার গ্রন্থটি আরম্ভই করিলাম না, তাহার কারণ প্রেসের কোন গাফিলতি নয়, আমি আর মান্য সহযোগীদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইতে চাহিলাম না।

'ধ্বন্যালোক-লোচন' গ্রন্থটি অন্য রকমের। ইহার অনুবাদক আমি, ভূমিকা লিখিয়াছি আমি, ইহার কৃতিত্ব আমারই। কালীপদবাবুকে কেহ দেখে নাই, তাঁহার হাতের লেখা কোথাও নাই ; তাঁহার নাম যে যুক্ত হইয়াছে তাহা যেন আমার বদান্যতায়। যদিও এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত হইবে না, কিন্তু যে দুই-চারজন লোক কালীপদবাবুর নাম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপই মনে করিতেন। যাহা হউক আমি পাঁচ-ছয় বছর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছি, আমি ইহা ছাপিতে যাইয়া থামিবার পাত্র নহি। কিন্তু দেখিলাম, শ্যামাপ্রসাদবাবুর আশ্বাস এবং আদেশ সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটা প্রেস পর্যন্তই গেল না। টেক্সটবুক বিভাগের যে কেরানী ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় Learning-এর স্থলে Earning-এর জায়গা এবং আমি টাকা না চাহিয়াই ভুল করিয়াছি, তাঁহার ব্যঙ্গোক্তি যেন আমাকে হুঁশিয়ার করিয়া দিল ; বিশেষতঃ তিনি তদানীন্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের ভাই, যে অ্যাসিস্টেন্ট রেজিস্ট্রারের কাছে আমি প্রায় নিত্যই একবার ধরনা দিতাম। শ্যামাপ্রসাদবাবু নিজে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনন্যোপায় হইয়া আমি আমার পাণ্ডুলিপি ফেরত লইয়া আসিলাম এবং অন্য প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশনের কাজ সমাপ্ত হইল। আমার কাজ সম্পূর্ণ হইল, কিন্তু স্যারের প্রবর্তিত ঈশান অনুবাদমালা আজও অনাবদ্ধ রহিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অথ বিধান-চরিত

১

বিধানচন্দ্র রায় বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন ইহা মানিয়া লইতে পারি, যদিও আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সমর্থন মিলে না। নব্যবঙ্গের রূপকার হওয়ার আগেই তিনি কর্মব্যস্ত চিকিৎসক হইলেও নানা ভূমিকায় লোকচক্ষুর সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার একটু ফিরিস্তি দিতে পারি। আশুতোষের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১৬ সালে তিনি সিনেটের সভ্য হয়েন এবং ক্রমান্বয়ে সিণ্ডিকেটের সদস্য, বোর্ড অব অ্যাকাউন্টসের প্রেসিডেন্ট, মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডীন, ভাইস-চ্যান্সেলর প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদ যাহা করিতেন তাহাতে সায় দেওয়া ছাড়া বিধান রায়ের আর কোন ভূমিকা ছিল বলিয়া শুনি নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সহযোগিতার প্রবক্তা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি ক্ষীয়মাণ আর দেশবন্ধুর প্রভাব তুঙ্গে। বিধানচন্দ্রের হৃদয়ে তখন স্বদেশসেবার আদর্শ জাগ্রত হইল। দেশবন্ধুর পক্ষপুটে থাকিয়া বিধানচন্দ্র ভোটযুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথকে পরাস্ত করিয়া আইনসভায় প্রবেশ করিলেন এবং এক দিনেই রাজনৈতিক নেতা হইলেন। আশুতোষের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালে আর দেশবন্ধুও চলিয়া যান ঠিক এক বছর পরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যদুনাথ সরকার আসিয়া নানা ঝামেলার সৃষ্টি করেন ; কাজেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখিলেও বিধানচন্দ্র ঐদিকে ততটা নজর দিলেন না। তিনি দেখিয়া থাকিবেন যে কংগ্রেসেই দেশসেবার বৃহত্তর সুযোগ পাওয়া যায় ; তিনিও দেশকে সেবা করিতে পারিবেন এবং সুযোগমত দেশের সেবাও পাইবেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে দুই দলের উদ্ভব হয়। যতদূর মনে আছে, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে ইহা সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলাদলির বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গের সশস্ত্র বিপ্লবীরা কংগ্রেসে না আসিলেও পিছন হইতে কংগ্রেসকে চালিত করিতে চাহিতেন এবং তাঁহাদের দলাদলিই কংগ্রেসে প্রতিফলিত হয়। যাহা হউক, একদল বিপ্লবী-সমর্থিত কংগ্রেসীরা যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্ব স্বীকার করিলেন, আর এক দলের নেতা হইলেন সুভাষচন্দ্র। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন খুব শ্রদ্ধেয় দেশসেবী, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাকে তুলনা করিলে তিনিই প্রথম আপত্তি তুলিতেন। তিনি বিরোধিতা করিতেন সুভাষচন্দ্রের অনুগামী পঞ্চ উপনেতাকে, যাঁহাদিগকে বলা হইত বিগ ফাইভ। ইঁহাদের মধ্যে আবার প্রধান হইলেন শরৎ বসু ও বিধান রায়। এই প্রধানদের ভাগ্যেও বৈচিত্র্য আছে—শরৎচন্দ্র অন্তরীণ বা ডেটিনিউ হইলেন, আর বিধানচন্দ্র বেশ তাড়াতাড়ি—১৯৩১ সালে কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইলেন। দেশ তাঁহাকে সেবা করার সুবিধা পাইল এবং তিনিও দেশের সেবা করিবার সুযোগ পান। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁহাকে মাস-ছয়েকের জন্য কারা-বরণ করিতে হয়। এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমার ভাই মণীন্দ্রশংকর আলিপুর জেলে তাঁহার সান্নিধ্যে ছিল। মণির কাছে শুনিয়াছি, জেলে বিধানচন্দ্রের অভ্যস্ত জীবন-

যাত্রায় কোন ব্যাঘাত হয় নাই এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ন্যূনতা লক্ষিত হইত না। অবশ্য একটা বিষয়ে অনটন ছিল ; তিনি প্র্যাকটিস করিতে পারিতেন না।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র একটা বড় ক্ষমতার পরিচয় দেন—তাহা হইল, যে ঘোড়া জিতিবে তাহার উপর বাজি রাখার। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিপক্ষে যে চিত্তরঞ্জনের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় লইলেন, ইহার মধ্যে বিপ্লবী মতবাদের কোন সম্পর্ক নাই। বামপন্থী মনোভাব তখন কংগ্রেসে প্রবল হইতেছে, সুতরাং মডারেট সুরেন্দ্রনাথের বিরোধিতাই লাভজনক হইবে। যতীন্দ্রমোহনকে ছাড়িয়া তিনি যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভিড়িলেন তাহাও এই কারণে। সেই আমলে সুভাষচন্দ্রের অনেক জায়গায় অনেক সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু জনমত ও লোকবল উভয় দিক দিয়াই যে সুভাষচন্দ্র যতীন্দ্রমোহন অপেক্ষা শক্তিশালী, তাহা চক্ষুষ্মান্ বিধানচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সংসক্তির মধ্যে যে কোন বিপ্লবী আদর্শবাদ ছিল না, তাহা কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা গেল। ১৯৩৯ সালে যখন সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াইলেন, তখন বিধানচন্দ্র ভোট কাহাকে দিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মনটা কোন্ দিকে ছিল পরবর্তী ঘটনায় তাহা স্পষ্ট হইল। ১৯৩৯ সালেই যখন সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়িতে হইল, তখন কংগ্রেসনেতাদের স্বরূপ স্ফুট হইল এবং এই যে আবরণ-উন্মোচন, ইহা হইতে মহাত্মাজিও বাদ গেলেন না। যিনি সমস্ত জীবন সত্যের অনুসন্ধানকে জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, তিনি এবার সেই পথে অবিচল থাকিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি কংগ্রেসের সভ্য নহেন, কিন্তু তিনিই পট্টভী সীতারামাইয়াকে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাইলেন। ইহা লইয়া লুকোচুরির কোন অবকাশ নাই, কারণ সত্যসন্ধানী নিজেই নির্বাচনের ফল দেখিয়া বলিলেন, 'এই পরাজয় আমারই।' একজন বাহিরের লোক হইয়া তিনি কেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই প্রশ্ন চাপা দেওয়া যায় না। গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রকাশ্য কংগ্রেসে এক প্রস্তাব আনিলেন যে গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুভাষকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে ; পরে মহাত্মাজি সেই পরামর্শ দিতে অস্বীকার করিলেন, কারণ তাঁহার মতে ওয়ার্কিং কমিটি একই গোষ্ঠীর লোক হওয়া উচিত। তাহা হইলে পন্থজি যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মহাত্মাজি আপত্তি করেন নাই কেন? এই-সব প্রশ্নের আলোচনা আমি অন্যত্র করিয়াছি।* গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের অসহযোগিতার জন্য জনগণের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইল। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল তাহার মধ্যে পুরানো মহারথীরা সবাই আসিলেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে জহরলাল নেহেরু অল্পদিনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইলেন ; ত্যাগবীর বিধানচন্দ্র অতি সহজেই চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া এই কমিটিতে আসিলেন।

ইহার পর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিধানচন্দ্রের কখনও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি ইহা জানি যে এই গোষ্ঠীর অন্যতর প্রধান সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিধানচন্দ্রের একটা পাকাপাকি বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সুচতুর বিধানচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের পথ বিপদ্‌সংকুল বিপ্লবের পথ। আর কংগ্রেসের পুরাতনপন্থীরা —নেহেরু, প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি—প্রভৃতি বিপ্লবের বুলি আওড়াইলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষমতালোলুপ ও আপোসপন্থী। ইংরেজ সরকার যদি আপোস করেন তবে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গেই করিবেন। কাজেই সুভাষের সঙ্গে না যাইয়া তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদের

* India Wrests Freedom দ্রষ্টব্য।

ওয়ার্কিং কমিটিতেই প্রবেশ করিলেন ;—দেশসেবার নাম করিয়া যদি দেশের সেবা পাইতে হয় তবে ইহাই প্রশস্ত পথ। ইহাতে তখনকার ছেলেরা বোধ হয় একটু হামলা করিল এবং তাঁহার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ির কাচ ভাঙ্গিল, কিন্তু ইহা সাময়িক উপদ্রব মাত্র। তিনি জানিতেন, নেহেরু যিনি অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে ফিরিয়া আসিলেন—প্যাটেল, রাজাজি সবাই আপোসপন্থী এবং ইংরেজ সরকার রফা করিলে অহিংস গান্ধী-বাদীদের সঙ্গেই করিবেন। কংগ্রেসের অতন্দ্র পুরাতন প্রহরীরাও দেখিলেন যে বিধান-চন্দ্রকে যদি দলে আনা যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ শরৎ বসু দুর্বল হইবেন। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লড়িবেন মহাত্মাজি ও বড়লাট।

২

এই পটভূমিকায় স্বাধীন ভারতে বিধানচন্দ্রের কর্মধারার বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে। ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন বোধ হয় বিধানচন্দ্র বিদেশে ছিলেন। সুতরাং নেহেরু ও প্যাটেল তাঁহাকে ইউ পি'র গভর্ণর করিলেন। আচার্য কৃপালনীর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পাইলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। দেশসেবায় আগ্রহী বিধানচন্দ্র কর্মহীন লাটসাহেবীতে তুষ্ট হইতে পারেন না ; তিনি ইউ পি'র গভর্ণরের পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্যরা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলেন ; প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করিলেন এবং সেই জায়গায় বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হইয়া নব্যবঙ্গের রূপকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কয়েকটি ছোট ছোট কাজ করিলেন যাহা এই মহান্ নেতার জীবনীকারেরা বাদ দিয়া যান, কিন্তু আমি সেগুলিকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করি। নেতাজির অন্তর্ধান-রহস্য আজও নিরাকৃত হয় নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুগামীরা নেতাজির আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এইজন্য তাঁহারা বিমলচন্দ্র সিংহদের একটা বাড়িতে একটা ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে ইহা সুভাষচন্দ্রের নামাঙ্কিত কলেজে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হইলেন শরৎচন্দ্র বসু। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন গোহাটি কটন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং পরে আসিলেন আমাদের পুরানো শিক্ষক দুর্গাগতি চট্টোরাজ। আসল কর্ণধার হইল বিপ্লবী এবং আমার অনুজপ্রতিম বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত। বিধান রায় মহাশয় ছোট-বড় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, তিনি এমন কলেজকেও বাড়ি তৈরি করার জন্য সরকারের টাকা দিয়াছেন যে কলেজ বাড়ির মালিকই নয়। নেতাজি সুভাষ কলেজকে বিমলচন্দ্র সিংহের বাড়ি ছাড়িয়া ভাড়া বাড়িতে যাইতে হয়। শরৎ বসু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন ও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় কলেজটি খুব আর্থিক অনটনে পড়ে এবং দেনাগ্রস্ত হয়। কে বা কাহারা ইহা বিধান রায়কে জানান। দানবীর হাত বাড়াইয়াই ছিলেন ; তিনি শিক্ষকদের বকেয়া বেতন, বাড়িভাড়া সবই দিতে রাজি হইলেন—এক শর্তে। কলেজটিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তাহাই হইল। ইহার একটি ফল হইল যে সুভাষপন্থীদের প্রধান আস্তানা উঠিয়া গেল।

এইরকম আর একটি ছোট্ট ঘটনাও স্মরণীয়। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে প্রথম পাব্লিক সারভিস কমিশন নিযুক্ত করেন, তাহার সেক্রেটারি হয়েন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার কয়েক ক্লাস নীচে পড়িতেন। নামকরা ছাত্র ছিলেন, সেইজন্য এবং অন্যান্য সূত্রেও তাঁহাকে চিনিতাম। এই কমিশনের মেয়াদ ছিল তিন বৎসর। মেম্বরদের মেয়াদ শেষ হইলে বিধানচন্দ্র রায়

কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে সেক্রেটারিও বদল করিলেন অর্থাৎ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মচ্যুত হইলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার-পদের জন্য প্রার্থী হইলেন এবং নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাকেই যোগ্যতম প্রার্থী বলিয়া সুপারিশ করিয়াছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তাঁহার এই চাকুরীও হইল না। হয়ত বিদেশে বড় চাকুরীর লোভে বিনয় আফ্রিকায় চলিয়া যান অথবা দেশে তাঁহার কোন চাকুরীর আর সম্ভাবনা নাই, তিনি ইহা মনে করিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহাকে এই প্রশ্ন করি নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম বিশ্বস্ত সচিব আমার কাছে বলিয়াছে, বিনয় শরৎ বসুর ঘনিষ্ঠ লোক, এই জনশ্রুতিই তাঁহার অপরাধ।

বিধানচন্দ্র অন্য দিকেও অগ্রসর হইলেন। সুভাষচন্দ্রের যাঁহারা অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ঘোষ অবশ্য ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, আর ঐ শ্রেণীর লোক স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনাপতি হইতে পারেন, কিন্তু স্বাধীনতার ফল ভোগ করিবার লিপ্সা বা ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। বাহিরের দিক হইতে কিরণশংকর রায়কে সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে দেখা যাইত। অনেকে ইহা লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—তিনি সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধি জোগান। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কিরণশংকর ছিলেন কংগ্রেসের কাজে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী, বিপ্লবের কাজে নয়। সরকারও ইহা বুঝিতেন এবং সেইজন্য সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতেন, কিন্তু কিরণশংকরকে করিতেন না। শরৎ চ্যাটার্জি ঠাট্টা করিয়া আমাকে বলিয়া-ছিলেন, 'দেখেছ কিরণের বুদ্ধি! সুভাষকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তখন সে বেশ গা-ঢাকা দিতে পারে।' যাহা হউক, দেশবিভাগের পর কলিকাতার অধিবাসী হইয়াও পাকিস্তান এসেম্বলীর সদস্য কিরণশংকর একটু মুশকিলে পড়িলেন। বিধান রায় তাঁহাকে সোজা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করিয়া শরৎ বসু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে বাকি রহিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। তাঁহার সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় ছিল। তাহা হইলেও খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া আমি প্রশ্ন করি নাই। বিনয় সেনগুপ্তের কাছে শুনিয়া-ছিলাম বিধান রায় তাঁহার কাছেও মন্ত্রিত্বের টোপ ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু বক্সীমহাশয় তাহা গিলিলেন না। তিনি বরং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের মতবাদের ভিত্তিতে নূতন সর্বভারতীয় দল—Party of National Synthesis—গড়িতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ইহার পর সুভাষপন্থীদের আর তোয়াক্কা করার প্রয়োজন রহিল না। বিপ্লবীদের মধ্য হইতে বিধানচন্দ্র ভূপতি মজুমদারকে মন্ত্রিত্ব দিলেন এবং শুনিয়াছি, ভূপতিবাবু কখনও কখনও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন; আর বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্ত, ইঁহারা প্রকাশ্য রণাঙ্গনের কৌশল জানেন না। নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্য দিয়াই ভূপতিবাবু রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইলেন। বিধানবাবু প্রফুল্ল সেনকে খাদ্য দপ্তরটি ছাড়িয়া দিলেন—ইহার মধ্যে তিনি নাক গলাইতেন না। ইহার যাহা-কিছু রস আছে তাহা প্রফুল্লবাবু ও তাঁহার বন্ধুরা পান করুন, আপত্তি নাই। খাদ্যসমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া বেহাল হইয়া প্রফুল্লবাবু 'দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী' হিসাবে পরিচিত হইলেন এবং নির্বাচনে পরাজিত হইলেন। ইহার পর তিনিও চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া বিধানবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় মন্ত্রিত্ব রক্ষা করিলেন; কিন্তু তিনি আর মাথা উঁচু করিতে পারিবেন না, ইহা ধরিয়াই লওয়া যায়।

৩

১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৬২ সালে মৃত্যু পর্যন্ত বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহার কর্মশক্তি এত বিপুল এবং কর্মধারা এত বিচিত্র যে তাঁহাকে

নব্যবঙ্গের রূপকার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে এই বিরাট নির্মাণকার্য সমাধান করিতে পারিলেন, তাহার আর একটা কারণ কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। নেহেরু তাঁহার অনুজতুল্য আর প্যাটেল তাঁহার বন্ধু। তারপর তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামজাদা চিকিৎসক : ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না এমন লোক কে আছে?

বিধানচন্দ্রের সৃষ্ট নব্যবঙ্গে আমরা বাস করিতেছি। আমি এই-সব দেশ গড়ার ব্যাপারে কখনও প্রবেশ করি নাই এবং এই-সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও কেতাবী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা আমার নাই। তবে দুঃখের বিষয় ইহা বিধানচন্দ্রেরও ছিল না। জহরলাল ও বিধানচন্দ্র—ইঁহাদের মধ্যে একটা সামান্য লক্ষণ ছিল অজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের অপূর্ব সমন্বয়। নেহেরু কেম্ব্রিজে বোটানি, জিওলজি ও কেমিস্ট্রি পড়িয়াছিলেন। জিন্না অর্থনীতির কিছুই জানিতেন না—ইহা নেহেরু একাধিকবার বলিয়াছেন। ইহার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট—জিন্না দেশশাসনের পক্ষে অযোগ্য। তিনি নিজে কোথায় কি ইকনমিক্স শিখিয়াছেন তাহা জানি না। একবার বলিয়াছেন যে মার্কসবাদ তিনি চর্চা করিয়াছেন, কিন্তু মার্কসের Theory of Value তিনি বোঝেন না। ইহা কি ইকনমিক্স-বোধের পরিচায়ক? বিধানচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন যে বি-এ পাস করিয়া তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজ উভয়ত্র ভর্তির দরখাস্ত দিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার অংকে অনার্স ছিল তিনি ইঞ্জিনিয়ার হইতেই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনুমতিপত্র পাইয়া তিনি সেখানেই ভর্তি হইয়া গেলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চিঠি বেশ দেরিতে আসে : তাই তাঁহার আর ইঞ্জিনিয়ার হওয়া হইল না। স্বাধীনতা পাওয়ার পর ব্যর্থ ব্যারিস্টার জহরলাল নেহেরুর অন্তঃস্থিত অর্থনীতিবিদ্‌ প্রায় সীমাহীন ক্ষেত্রে স্বীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাইল। মহাত্মাজি এই অনুগামীর গুণগান করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং দেশের লোক বিনা দ্বিধায় তাঁহাকে গ্রহণ করিল। নেহেরু নিজেকে সোস্যালিস্ট বলিয়া পরিচয় দিতেন : অথচ ইহার দ্বারা তিনি কি বুঝিতেন, তাহা অন্য কেহ বুঝিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হইতে ব্যগ্র হইয়া জহরলাল বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ইকনমিক পলিসি কার্যে পরিণত করার জন্যই তিনি দেশবিভাগে রাজি হইয়াছিলেন। এই পলিসির ফলে দেশে ধনীদরিদ্রের পার্থক্য বাড়িয়া গিয়াছে, কালোটাকা অতিকায় রূপ ধারণ করিয়াছে এবং চীনদেশের সঙ্গে যুদ্ধ এই সর্বাধিনায়কের অদূরদর্শিতার উপর অনপনেয় কলঙ্কের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা ছিল এবং তাঁহার দুষ্কৃতির পরিধিও সেই তুলনায় সংকীর্ণ, কিন্তু আনুপাতিক হিসাবে তাহার ব্যাপ্তি কম নহে। যাঁহারা বিধান-চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, তাঁহারা বলিতেন যে তাঁহাকে অনেক সময়ই আঁক কষিতে দেখা যাইত। ইহা সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা মেঘনাদ সাহার আঁক কষা নয়। ইহা সেই গাণিতিকের হিসাব-লিখন, যাঁহার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখন জাগ্রত হইয়াছে এবং কিছু জানেন না বলিয়াই তিনি একাধারে বাস্তুকার, যন্ত্ররাজ ও বিদ্যুৎ-নির্মাতা অর্থাৎ সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধিপতি হইলেন। শেষেরটিই ধরা যাক। আমরা কলিকাতায় যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক আউট, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি। কিন্তু লোড-শেডিং অতি আধুনিক ব্যাপার ; ইহার জনক বিধানচন্দ্র। সত্য বটে যে ইহা শুরু হইয়াছে তাঁহার অন্তর্ধানের পরে, কিন্তু ইহা যে সেই পরিকল্পনাবিশারদেরই অবদান সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার প্রধান বক্তব্য এই যে ইহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এতকাল কলিকাতাকে বিদ্যুৎ দিয়া আসিতেছিল। যখন নানা কারণে

বিদ্যুতের চাহিদা বাড়িতে লাগিল, তখন এই সংস্থা নূতন জমি কিনিয়া বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সরকার হইতে তাহাদের অনুমতি দেওয়া হইল না। এখন বিদ্যুৎ-সংকট অনেকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে ; বরং যদি কোন দিন—ইহা খুব ক্বচিৎ ঘটে—চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তবে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু প্রথম যখন লোড-শেডিং নিয়মিতভাবে শুরু হয়, তখন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ক্রমাগত মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্রের সাহায্যে জানাইয়া দেয়, তাহারা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নহে ; তাহারা এই পরিস্থিতি এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু অনুমতি পায় নাই। ইহার কারণ কি ? বিধানচন্দ্রের অন্তরাত্মায় যে প্রযুক্তিবিদের ভ্রূণ ছিল, গৌরী সেনের টাকার স্পর্শে তাহা ভূমিষ্ঠ হইয়াই অহিরাবণের মত সেনাপতির পদ গ্রহণ করিল, আর যে গাণিতিক এতদিন সুপ্ত ছিল সেও জাগ্রত হইল। আমি প্রযুক্তিবিদ্ও নহি, গাণিতিকও নহি, কিন্তু সেই আমলে সেক্রেটারিয়েটে ছোট-বড় চাকুরীতে আমার জানাশোনা লোক অনেক ছিল। যতদূর মনে আছে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেই বিধানচন্দ্র স্বজনসহ আমেরিকায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে T.V.A. (টেনেসি ভ্যালি অথরিটি) পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই দেশে তিনি জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ একটা কথা তখন চালু করিলেন—গ্রিড অর্থাৎ বিদ্যুৎবাহী তারের জাল। বিষয়টা বোধ হয় এইরকম : দুর্গাপুরে শিল্পনগরী, T.V.A.-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত ডি.ভি.সি., ব্যাণ্ডেলে ও সাঁওতালডিহির তাপবিদ্যুৎসংস্থা—সবাই মিলিয়া বিরাট গ্রিড সৃষ্টি হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুতের বাহুল্যে হাবুডুবু খাইবে। পূর্বতন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনকে শুধু ছিঁটে-ফোঁটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভার দিলেই চলিবে। এখন বিদ্যুতের প্রাচুর্যে হাবুডুবু না খাইয়া বিদ্যুতের অভাবে হাঁসফাঁস করিতেছি বলিয়া এই বিষয়ে বাধ্য হইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে হইয়াছে। দেখিতেছি, (১) বিলাতী কোম্পানীর প্রতিনিধি প্রতিদিন প্রায় একরকমই বিদ্যুৎ দিয়া থাকে। বেশি না হউক, তাহাদের কাজে সমতা আছে। (২) বিধানচন্দ্রের দুই মানসপুত্র—ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডিহি—জন্মাবধিই এত বেপরোয়া যে সরকার এখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইহাদের কীর্তিকলাপের ফিরিস্তি দিতেই সাহস পান না। বিধানচন্দ্রের স্তাবকরা বলিবেন পরিকল্পনা ঠিকই ছিল, যাঁহারা সেই পরিকল্পনা কাজে লাগাইতেছেন তাঁহাদের প্রয়োগেই গলদ। এই পরবর্তীরা উল্টো কথা বলেন। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞরা বলেন, উৎপাদনের আধার হইতে বিদ্যুৎবাহী তারে বিদ্যুৎ চালনা করার ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল বলিয়াই প্রত্যাশানুরূপ বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। (৩) দুর্গাপুরের ব্যাপারটা অস্পষ্ট ; তবে ইহা স্পষ্ট—সরকার যে ভরসা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হয় নাই। (৪) দামোদর ভ্যালীর ব্যাপারটা আরও বিচিত্র। আমাদের সরকার বলেন, এই সংস্থা শর্তানুযায়ী বিদ্যুৎ দেয় না, আর এই সংস্থা বলে, ইহা সেইরূপ কোন শর্তে বাধ্য নয় : অন্য-সমস্ত দাবি পূরণ করিয়া যাহা বাড়তি থাকে তাহা তাহারা দিয়া থাকে। ডি.ভি.সি. তিনটি সরকারের সংস্থা : কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহার সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিধানচন্দ্রের অসীম প্রভাব ছিল ইহা সুবিদিত ; বিহারের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনি সর্বময় কর্তা। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষা করিয়া তিনি শর্তাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন নাই বলিয়াই এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে।

আমি আবার বলিব—যার কাজ তাকে সাজে। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ দিয়া আসিতেছিল ; তাহারা বিলাতী কোম্পানী হইলেও এই দেশের অধীনে আসিয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন-বন্টন-ব্যাপারে তাহারা অভিজ্ঞ। এই-সব আবুহোসেনী কাণ্ড-

কারখানা না করিয়া সোজাসুজি তাহাদের উপরে ভার দিলে আমরা যথারীতি বিদ্যুৎ পাইতাম এবং আমাদের স্বাধীনতায় কোন হীনতা হইত না।

দামোদর ভ্যালী করপোরেশন যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নানা পুস্তিকায় ইহার বিবিধ উপযোগিতা প্রচারিত হয়। যতদূর মনে আছে, ইহা দামোদরের বন্যা প্রতিরোধ করিবে ; ইহা সেচের জল জোগাইয়া কৃষির প্রভূত উন্নতি করিবে এবং প্রচুর বিদ্যুৎ দিবে। আরও কিছু কিছু প্রত্যাশার কথা থাকিতে পারে, ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না। যে তিনটি প্রধান উপযোগিতার কথা বলিতেছি তাহা এই সংস্থা একেবারেই সম্পন্ন করে নাই এমন কথা বলিব না, তবে প্রত্যাশানুরূপ যে হয় নাই তাহাও অনস্বীকার্য। আমাদের পরিবারের কোন জমিজমা ছিল না এবং আমরা দামোদর উপত্যকার লোক নই। সুতরাং আমার মন্তব্য খুবই হালকা রকমের হইবে। তবে বিদ্যুতের কথা বাদ দিলেও এখনও এই উপত্যকায় যতটা বন্যা হয়, তাহা দেখিয়া এই ব্যয়বহুল সংস্থার সার্থকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অনেক সময় তো মনে হয় ইহার জলাধার হইতে প্রচুর জল নিষ্কাশনের জন্য বন্যার সমস্যা বাড়িয়া গিয়াছে : আর এই অভিযোগও শুনি যে এই সংস্থায় কৃষকরা তেমন লাভবান হয় নাই। সেচের সুবিধার জন্য অনেক বৎসর পূর্বে দামোদর ক্যানেল সংস্থার প্রবর্তন হয় এবং ইহাতে চাষের উন্নতিও হয়—যদিও ইহার জন্য যে কর দিতে হইত তাহা লইয়া বিবাদবিতর্ক হইত। দামোদর ভ্যালী করপোরেশনে অনেকগুণ বেশি ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে সেচের তথা কৃষির উন্নতি হইয়াছে কি? দামোদর উপত্যকা সংস্থা যে ভূমিখণ্ডে জলসেচন করে তাহা পশ্চিমবঙ্গের কৃষিযোগ্য ভূমির অংশ মাত্র। তবু প্রশ্ন জাগে, এইরূপ কোন 'রূপকার' না থাকিলেও পূর্ব পাঞ্জাব (বর্তমান হরিয়ানা ও পাঞ্জাব) কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে এত পিছনে ফেলিয়া রাখিল কি করিয়া? যেহেতু এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী, তাই যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিব : এই কাজ সমাপন করার আগে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মত গ্রহণ করা হয়। যখন পরিকল্পনা অর্থাৎ প্ল্যান প্রকল্প বা প্রজেক্টে রূপায়িত হয় তখনই নাকি বিশেষজ্ঞদের রচিত নির্দেশে অনেক কাটছাঁট করা হয়। আবার যখন তাহা কার্যে পরিণত হয়, তখন আর একবার অদলবদল হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলেই ডি.ভি.সি. সংস্থা প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারে নাই। জনৈক বিদেশী বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নাকি এইরূপ আশাভঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই অঙ্গচ্ছেদের দায়িত্ব কাহার?

৪

পূর্ব-পাঞ্জাবের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় আর একটি বিষয়ের দিকে নজর গেল। স্বাধীন ভারতে একটা প্রধান সমস্যা হইল উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সমস্যা কেন্দ্রের ও রাজ্যের, এবং সরকারের ও দেশবাসীর। পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরা যে এই সমস্যা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা ভালভাবে সমাধান করিয়াছে ইহা সর্বজনস্বীকৃত। নব্যবাঙ্গালার রূপকার এই সমস্যা সমাধানে কিভাবে অগ্রসর হইলেন দেখা যাইতে পারে। বোধ হয় তিনি দেখিয়া থাকিবেন যে পূর্ববঙ্গের সব লোক কলিকাতায় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিতেছে। এত লোকের ঠাঁই হইবে কোথায়? ইহার নানা উপায় নানাজনে ভাবিয়া দেখিলেন—আন্দামান, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি জায়গায় নানা উদ্বাস্তুশিবির স্থাপিত হইল। ইহার জন্য কাহার কতটা কৃতিত্ব বা দায়িত্ব তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই না। কিন্তু একটি অবদানের কৃতিত্ব একা বিধানচন্দ্রের প্রাপ্য। তাহা হইল তাঁহার মানসীকন্যা কল্যাণী নগরী। বিরিঞ্চি যেমন সরস্বতীকে সৃষ্টি

করিয়াছিলেন, দেবরাজ জুপিটারের শির ভেদ করিয়া যেমন মিনার্ভা বহির্গতা হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই এই মানসকন্যা আবির্ভূতা হইল। বিধানচন্দ্র ইহাকে কলিকাতার সঙ্গে সমগোত্রীয়া করিতে চাহিলেন ; এইজন্য কলিকাতা ছাড়া ইহাই বঙ্গদেশের একমাত্র নগরী যেখানে নিষ্কাশনের জন্য ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী আছে। ইহা ওখানকার বাস্তুকারেরা গর্ব করিয়া বলিতেন। বিধান রায়ের কল্পনা বিরাট, দেশের লোক দরিদ্র হইলেও যে সরকার শাসন ও শোষণ করেন, তাঁহার অফুরন্ত টাকা। বাস্তুনগর তো নির্মিত হইল ; কিন্তু বাস করিবে কে? অল্পদিনেই দেখা গেল, ইহাও এক আবুহোসেনী কান্ড। পশ্চিমবঙ্গ জনারণ্য, কিন্তু কল্যাণী আজও জনবিরল নগরী। বিধানচন্দ্র ভাবিয়া দেখেন নাই, কল্যাণীতে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা আহার জুটাইবেন কি করিয়া। সুতরাং শিল্পপতিদের ডাকা হইল এবং বলা হইল তাঁহারা অবিলম্বে কল্যাণীতে বৃহৎ শিল্প স্থাপন করুন। আহূতদের মধ্যে ছিলেন চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ও সম্পাদকেরা। একজন সম্পাদকের কাছে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা লিখিতেছি। সকল চেম্বারই নাকি বলিল যে তাহাদের কারখানায় প্রস্তুত মাল কলিকাতা বন্দর দিয়া পাঠাইতে হয় এবং কাঁচা মালও ঐ পথেই আসে। কল্যাণী তো বন্দর শহর নহে। সুতরাং কলিকাতা হইতে কল্যাণী এবং কল্যাণী হইতে কলিকাতা —মাল চলাচলের এই পাথেয় সরকার দিলে তাঁহারা এই প্রস্তাব বিবেচনা করিতে পারেন। এই সভা এখানেই থামিল।

বিধানচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া কবি কোলরিজের সুপরিচিত কবিতার উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছা করে—Water, Water, everywhere/Not a drop to drink. পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত, কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নাই ; আর অপরদিকে কল্যাণী প্রশস্ত আধুনিক নগরী, অথচ সেখানে জনমানব দেখা যায় না। বিধানচন্দ্রকে এই নগরীর population বা জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম এশিয়ার এক নবনিযুক্ত রাজা বলিয়াছিলেন যে, তিনি—পূর্বে তিনি কর্ণেল ছিলেন—যৌবনে তাঁহার দেশকে সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী দিয়াছিলেন এবং পরিণতবয়সে তিনি সেই লোকবিরল মরুদেশের population সমস্যার সমাধান করিয়া যাইতেছেন। তিনি পর পর বিবাহ করিয়া ১২০টি সন্তানের জনক হইলেন! এই কথা বোধ হয় জন গান্থারের Inside Asia গ্রন্থে পড়িয়াছি। বিধানচন্দ্র অন্যপথে কল্যাণী নগরীকে জনবহুল করিলেন। তিনি ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন—ইহা প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন সঙ্গতভাবেই বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয় নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নামটি আর একদিক দিয়াও সার্থক। প্রধানতঃ কৃষিজমি অধিগ্রহণ বা অপ-ব্যবহারের দ্বারাই যে নগরী নির্মিত হইয়াছিল, সেই নগরীতে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাকে বিধানচন্দ্র কৃষি ইউনিভার্সিটি বলাই সঙ্গত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর আমার এক দাদা শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি কর্মনিয়োগে দুই-এক সময় আমার পরামর্শ চাহিতেন। আমি যখন জব্বলপুরে কাজ করি তখন ওখানকার এক তরুণ যুবক বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। বয়সে নবীন হইলেও এই কর্মচারী দক্ষতার জন্য ওখানে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমার অনুরোধে শচীনদা' তাহাকে চাকুরী দিলেন ; সেও সানন্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। কয়েক দিন পরেই আবার দেখি, সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে শহরের ভয়ংকর নির্জনতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শূন্যতার জনাই কল্যাণী তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর প্রশ্নপত্রের মডারেটর হিসাবে এবং ইংরেজির অধ্যাপক নিয়োগসংক্রান্ত কমিটির মেম্বর হিসাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

আমার কিছু কিছু সংযোগ হইয়াছে। ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট বহু লোকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও হইয়াছে। কল্যাণীতে লোকবসতি স্থাপন করা ছাড়া এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা আর কোন উপযোগিতা সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উত্তর-কালে মধ্যবিত্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ অর্থে নির্মিত এই নগরীতে সুবিধাজনক বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া নির্জনতা দূর করিয়াছেন। কিন্তু যে-সকল উদ্বাস্তুরা শিয়ালদহ স্টেশনে পার্থিব নরক সৃষ্টি করিয়াছিল, বঙ্গাধিপ কি কখনও তাহাদের কথা ভাবিয়াছিলেন?*

বঙ্গদেশের যিনি নূতন রূপ দিয়াছেন তাঁহার বিচিত্র কৃতিত্বের সকল সংবাদ আমি রাখি না এবং অনেক বিষয়ে কোন কিছু বলিবার অধিকারও আমার নাই। তবে সাধারণ নাগরিক হিসাবে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার ভিত্তিতে দুই-চারটি মন্তব্য করিতে পারি। কলিকাতায় যখন প্রথম আসি (১৯২০) তখন যাত্রীবাহী মোটরবাস দেখি নাই। ইহার ছয়-সাত বৎসর পর বাস চালু হইয়া থাকিবে। তারপর একতলা, দোতলা বাসে রাজ-পথ সরগরম হইয়া উঠে। ১৯৪৮ সালে বিধানচন্দ্র যখন মুখ্যমন্ত্রী হইয়া আসিলেন, তিনি দেশসেবার এবং স্বীয় ক্ষমতাপ্রয়োগের একটা বিরাট ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলেন। তিনি একটা চোখধাঁধান পরিকল্পনা করিলেন যে তিনি কলিকাতায় প্রাইভেট অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাস আর রাখিবেন না। এই বিরাট শহরে নূতন—অধিকাংশ দোতলা বাস আমদানী করিবেন এবং এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম গ্যারেজ ও মেরামতি কারখানা স্থাপন করিবেন। হৈ-হৈ পড়িয়া গেল—এসা কাম সত্য ত্রেতা দ্বাপর মে কই নেহি কিয়া! কিন্তু আজ স্টেট বাসের চেহারা দেখিলে ভয় হয়—এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কখন কোথায় বিকল হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে কেহ বলিতে পারে না; যত সংখ্যক বাস আছে, সেই তুলনায় বাস বাহির হয় কম; প্রত্যেক বাসেই প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের বেশ একটা অংশ অনুপস্থিত থাকে। কয়েকদিন আগে (জুন ১৯৮২) রেডিওতে কলিকাতার যান-বাহনসমস্যা-সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের তুলনামূলক প্রতিবেদন শুনিতে-ছিলাম। শুনিয়া একটা পুরানো প্রবচনের বিপরীত একটি প্রবচন রচনা করিতে ইচ্ছা করিল। (অন্য গাভীর তুলনায়) ব্রাহ্মণের গরু খাইবে কম, দুধ দিবে বেশি। বিধানচন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্ম। প্রথমাবধি তাঁহার এই বাসে আয় কম, কিন্তু ব্যয় বেশি। তিনি উত্তর-সূরীদের উপর এই যে জগদ্দল বোঝা চাপাইয়া গেলেন তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সরকার যতই বেশি টাকা ব্যয় করিতেছেন, ততই যাত্রীসাধারণের দুর্ভোগ বাড়িতেছে। এই সংস্থা ব্রাহ্ম ডাক্তারের গরু, খায় বেশি, দুধ দেয় কম।

ইহার এই দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে প্রথম দিন হইতেই। যে মন্ত্রীর অধীন হউক, অর্থদপ্তরের একটা নিজস্ব বিবেক আছে যাহা অপব্যয় ও অপচয়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া

* কলিকাতার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 'লবণ-হ্রদ' ভরাট করিয়া এক অতি রমণীয় আবাসন-নগর স্থাপন করা হইয়াছে, যাহার অন্যতম আকর্ষণ 'বিধান শিশু-উদ্যান।' এই জায়গাটা এক সময়ে মৎস্যজীবীদের বাসস্থান ছিল এবং অনুমান করিতে পারি এই জলা হইতে কলিকাতার বাজারে মাছ সরবরাহ করা হইত। সেই-সকল মৎস্যজীবীরা গৃহহীন হইয়া কোথায় গেলেন? সেই-সকল দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের কি হইল? তাঁহাদের জায়গায় যে-সকল উচ্চমধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা এখন স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের একজনকে—ইঁনি অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার—এই-সকল উৎসাদিত শ্রম-জীবীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সলজ্জ হাস্যে উত্তর দিলেন, সে খবর কে রাখে? 'বিধানচন্দ্র রায় স্মৃতি'-যজ্ঞের প্রধান হোতা, একদা 'বঙ্গেশ্বর বলিয়া পরিচিত—অতুল্য ঘোষ মহাশয় কি কিছু বলিতে পারেন?

দাঁড়ায়। আমার বিবরণ অর্থদপ্তরের লোকদের নিকট হইতে সংগৃহীত। বিধানচন্দ্র মুখ্যমন্ত্রী হইয়া প্রফুল্ল সেন অ্যান্ড কোং-কে খাদ্য দপ্তর ছাড়িয়া দিয়া বাকি সব দপ্তর নিজের অধীনেই রাখিলেন। অবশ্য অনেকগুলি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী রহিলেন—যাঁহাদের প্রধান কাজ সেক্রেটারিয়েটে ঘোরাফেরা করা। তাঁহারা সবাই শুনিলেন যে এক বিরাট—এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম—গ্যারেজ ও মেরামতি কারখানা চালু হইবে এবং সেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হইবে। কর্তার নিজেরও অনেক অনুগত আশ্রিত লোক ছিলেন ; তাঁহাদের জন্য তিনি ভাল ভাল গেজেটেড পদের সংস্থান করিতে চান। এই জাতীয় চাকুরীর জন্য সাধারণতঃ যে ন্যূনতম যোগ্যতা আবহমান কাল হইতে নির্ধারিত আছে তাহা হইল তাহাকে গ্রাজুয়েট হইতে হইবে। কর্তা ডাক্তারিতে পসার করিলেও নূতন কিছু উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে তিনি নূতন একটি phrase বা পদ-সমুচ্চয় দান করিলেন ; 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট' কাটিয়া দিয়া 'good general education' অর্থাৎ 'ভাল সাধারণ শিক্ষা' কথাটা বসাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে আমাদের আড্ডায় নন্‌ম্যাট্রিক অর্থাৎ কোন কিছু পাশ নয় এমন লোকের বর্ণনা দিতে হইলেই আমরা বলিতাম man of good general education। এই-জাতীয়—নিকট অথবা দূর—আত্মীয়-স্বজন সকলেরই থাকে, মন্ত্রীদেরও ছিল। এই সময় তাঁহারা ইহাদিগকে সহজে চাকুরী দিতে পারিলেন। আমার জনৈক নিকট-বন্ধু দাদার সংসার লইয়া ভারাক্রান্ত ছিল। দাদা বেকার, ভাইপোরা কয়েক ক্লাস পড়িয়া স্কুল পালাইয়াছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৌদির জ্ঞাতি ভ্রাতা—দুই ভাইপোর জন্যই এই নূতন সংস্থায় কর্মসংস্থান হইল।

ইহা অবশ্য তেমন কিছু নয়। যে কারণে এই সংস্থা প্রথম হইতেই দৈবাহত হইল তাহা অন্য রকমের। এই সংস্থার যখন পরিকল্পনা করা হয় তখন বাস প্রতি কতজন লোক লাগিবে, তাহার একটা ছক কাটা হইল এবং কতকগুলি বাস বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইল। মন্ত্রীরা ধরিয়া পড়িলেন কর্মীদের তখনই নিয়োগ করা হউক ; এবং ইহাদের ও অন্যান্য উমেদারের তদ্বিরের ফলে তাহাই করা হইল। যতদিন বাস না আসে তত দিন তাহাদের কিভাবে বেতন দেওয়া হইল বলিতে পারি না। কোন কোন অর্ডার বাতিল হইলে সেই জায়গায় নূতন বাসের অর্ডার দেওয়া হইল এবং অমনি পূর্ব বাসের জন্য নিযুক্ত লোকদের কথা ভুলিয়া গিয়া কর্তৃপক্ষ এই নূতন বাসের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, প্রথম হইতেই এই সংস্থা বেশ একটি কর্মিবাহিনীর বোঝা বহন করিতে লাগিল—যাঁহারা বেতন পান কিন্তু তাঁহাদের কাজের দায়িত্ব নাই। এই কারণেই ধাপে ধাপে এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে—যাহার উন্নতি-সাধন দেবতারও অসাধ্য। পত্রিকায় দেখিতেছি (১৯৮২), অন্ততঃ পাঁচ হাজার কর্মী ছাঁটাই না করিলে এই সংস্থায় কাজের উন্নতি হইবে না—বিশ্বব্যাঙ্ক এই তিক্তকষায় মন্তব্য করিয়াছেন। একটা ছোট্ট ঘটনা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। অনেক দিন পরের কথা। আমরা সবাই বহুদিন অবসর গ্রহণ করিয়াছি। কোন-একটা উপলক্ষে আমরা অনেকে তখনকার এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আমার প্রাক্তন ছাত্রের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। নানা গল্প হইতেছিল। বোধ হয় বছরের সেটা বোনাস দেওয়ার সময়। মালিক-শ্রমিকের বিরোধ-সম্পর্কে নানা গল্প উঠিল ; কথা-প্রসঙ্গে স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট সংস্থার চেয়ারম্যান বলিলেন, তাঁহার ওখানে এই-সব গোলমাল নাই। আমার পাশেই একজন প্রাক্তন অর্থসচিব বসিয়াছিলেন ; তিনি ফিস্‌ফিস্ করিয়া আমাকে বলিলেন, গোলমাল থাকিবে কি করিয়া? ওঁকে তো শুধু বিলটা দাতার কাছে পাঠাইয়া দিতে হয়। অপর কোন্ ম্যানেজার বা মালিকের এমন গৌরী সেনের টাকা ব্যয় করিবার সুযোগ আছে?

৫

বিধানচন্দ্র বঙ্গদেশের তথা ভারতের প্রধান চিকিৎসক। আশা করা যাইতে পারিত তাঁহার পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা-ব্যবস্থার খুব উন্নতি হইবে। কিন্তু সেইখানেও ফল হইয়াছে বিপরীত। ভারতবর্ষ 'গ্রামে গাঁথা' দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্বাধিনায়ক জহরলাল আর পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র—ইঁহাদের সঙ্গে গ্রামের বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমরা গ্রামের লোক ; সেখানকার হালচাল জানিতাম ; অন্ততঃ বিধানচন্দ্রের আমলের গ্রামের অবস্থার বেশ সংবাদ রাখিতাম। গ্রামে একশ্রেণীর ভাল কবিরাজ ছিলেন, অনেক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু ভাল কবিরাজদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্থান অপূর্ণ রহিয়া যাইতে লাগিল। প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও এবং এখানে ওখানে দুই-চারজন ভাল হোমিওপ্যাথ থাকিলেও—ইংরেজ আমলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ধীরে ধীরে বিলোপের পথে অগ্রসর হইতেছিল এবং হোমিওপ্যাথী জাঁকাইয়া বসিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলিতে বুঝাইত অ্যালোপ্যাথী এবং তাহার ছিল চার স্তর : (১) বিলাতী ডিগ্রিধারী ডাক্তার, (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, (৩) স্কুলের পাশ নেটিভ ডাক্তার, আর (৪) পরশুরাম যাঁহাদের আখ্যা দিয়াছেন হ্যামার-ব্র্যান্ড বা হাতুড়ে অর্থাৎ কোন অননুমোদিত স্কুলের পাশ ডাক্তার। গ্রামে গঞ্জে এই চতুর্থ শ্রেণীর ডাক্তারেরই প্রাধান্য ছিল ; তবে তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ পাশ-করা নেটিভ ডাক্তারও ছিলেন—বিশেষ করিয়া জেলাবোর্ড পরিচালিত ডাক্তারখানায়। বলা বাহুল্য, সাধারণতঃ চতুর্থ শ্রেণীর তুলনায় ইঁহাদের মর্যাদা বেশি ছিল এবং যোগ্যতাও। গ্রামের চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই এই তৃতীয় শ্রেণীর ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়ান উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বেশি করিয়া এই ধরনের স্কুল স্থাপন করিলে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র করিয়া ইঁহাদের হাতে সেইসকল কেন্দ্রের ভার দিলে গ্রামীণ চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি হইত। বিধানচন্দ্র নিজে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সভাপতি ছিলেন। মেডিকেল স্কুলের দোষ-ত্রুটি তিনি জানিতেন, তিনিই ইহাদের গুণগত কিছু কিছু উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া কাজ করা এবং ছোট জিনিস করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি কলমের এক খোঁচায় চালু মেডিকেল স্কুলগুলিকে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর এক খোঁচায় কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলকে (নীলরতন সরকার) মেডিকেল কলেজে পরিণত করিলেন এবং ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটও পূর্ণাঙ্গ অনুমোদিত কলেজের মর্যাদা পাইল। এদিকে পল্লীগ্রামে বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল, কিন্তু সেই-সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ডাক্তার পাওয়া গেল না। এই সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয় নাই ; তবে স্মরণ রাখিতে হইবে ইহার স্রষ্টা কর্মবীর বিধানচন্দ্র রায়।

কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি বহুপথে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা কোথাও শুধু ধ্বংস করিয়াই খুশি, কিন্তু আবার কোথাও ভাঙিয়া নূতন রূপ দিতে চায় ; নূতন সৃষ্টিও সোজা বাঁকা নানা পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। মেডিকেল স্কুলগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়া বিধানচন্দ্র গ্রামীণ চিকিৎসাব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করিলেন আর বিনা প্রয়োজনে প্রাচীন মেডিকেল কলেজের কাঠামো পরিবর্তন করিয়া নিজের শিক্ষকজীবনের অতৃপ্ত অভীপ্সা পূর্ণ করিলেন ; ফাউ হিসাবে উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষাকে বানচাল করিবার পথও দেখাইয়া গেলেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে যতই পসার লাভ করুন, মেডিকেল শিক্ষার জগতে তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাতার বড় মেডিকেল কলেজে স্থান করিতে পারেন নাই ; ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল মেডিকেল কলেজেই ইঁহাদের উচ্চাভিলাষ সীমাবদ্ধ ছিল। বিধানচন্দ্র

প্রেসিডেন্সী ও বিদ্যাসাগর কলেজের পার্থক্য বুঝিতেন না, কিন্তু ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের পার্থক্য সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। সুতরাং তিনি সাহেবী গীর্জাকে তছনছ করিয়া সেখানে স্বনির্বাচিত কারমাইকেলী আচার্য আমদানী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঠিক করিলেন, এখানে নূতন ডিরেক্টর-প্রফেসর বসিবেন ; ইঁহারাই প্রধান হইবেন এবং ইঁহারা মোটা বেতন পাইবেন, কিন্তু প্র্যাকটিশ করিতে পারিবেন না, করিলেও রোগীদের নিকট হইতে লব্ধ অর্থের এক-তৃতীয়াংশ সরকারকে দিবেন। কারমাইকেলের সবচেয়ে নামজাদা চিকিৎসক ছিলেন ললিত বাঁড়ুজ্যে ; অগ্রজোপম এই বৃদ্ধ সার্জনকে আর চাকুরীর কথা বলা যায় না। সুতরাং কারমাইকেল হইতে তিনি হরিহর গাঙ্গুলি ও সুবোধ দত্তকে যথাক্রমে মেডিসিন ও সার্জারির প্রধান করিতে চাহিলেন। বাদ সাধিল পাব্লিক সারভিস কমিশন ; তাঁহারা এই দুই পদের জন্য নির্বাচন করিলেন যথাক্রমে যোগেশ ব্যানার্জি ও পঞ্চানন চ্যাটার্জিকে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানচন্দ্র এই সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দিলেন, কিন্তু কমিশন পক্ষকাল বিবেচনার পর পূর্ব সিদ্ধান্তেই অটল রহিলেন। তখন ব্যাপারটা পূর্ণ ক্যাবিনেটে গেল ; বিধানচন্দ্রের বৃন্দাবনে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং সেইখানে কমিশনের সুপারিশ বাতিল হইল ও হরিহর গাঙ্গুলি ও সুবোধ দত্ত পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নিযুক্ত হইলেন ; ততদিনে প্রাইভেট প্র্যাকটিশের তৃতীয়াংশ দশমাংশে পরিণত হইয়াছে ; যতদূর জানি ইঁহারা টালবাহানা করিয়া সেই দশমাংশও সরকারকে দেন নাই। বিধান রায়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, কিন্তু মেডিকেল কলেজের বহুকালের ডিসিপ্লিন যে বিরাট ধাক্কা খাইবে তাহা প্রথম দিনেই বোঝা গেল। পঞ্চাননবাবু ওখানে ভিজিটিং সার্জন ছিলেন, এবং প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন চার্জ বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইয়া যান, তখন ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররা তাঁহাকে নীরবে সাশ্রুনেত্রে বিদায়-অভিনন্দন জানাইলেন।

ব্রাহ্ম হইলেও বিধান রায় কাশীবিশ্বনাথকে মিত্র করিতে চাহিলেন। স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য একটি ডেপুটি ডিরেক্টরপদে ইঁহাকে বসাইবেন। কিন্তু ইনি অ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার নহেন। তারপর প্রফেসর-ডিরেক্টর নিয়োগ করিতে যাইয়া এই পুরুষসিংহ দেখিয়াছেন যে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। প্রথমে তো পাব্লিক সারভিস কমিশন বারংবার বাধা দান করিবেন ; তারপর আইনসভায় এই বিধিবহির্ভূত নিয়োগ-সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইতে পারে। রায়-মহাশয় অবশ্য সিংহবিক্রমে জবাব দিয়াছিলেন যে ইহা ঠিক এই ব্যাপারে পাব্লিক সারভিস কমিশনকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে এবং ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার নিজের , এই স্পর্ধিত উক্তির ব্যঞ্জনা স্পষ্ট—চিকিৎসকনিয়োগ-ব্যাপারে ডাক্তার বিধান রায়ের বিধানের উপর কথা বলা ধৃষ্টতা। কিন্তু এই এককথা বারংবার বলা যায় না। সুতরাং বারাণসীশংকরের মিত্রতা-লাভ করিতে অগ্রসর হওয়ায় সময় তিনি নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। নিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে যেসকল আইন আছে, তাহাদের এক উপধারায় বলা হইয়াছে যে কোন টেক্‌নিকেল অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োগবিদ্যার আবশ্যক হয় এমন কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে পাব্লিক সারভিস কমিশনের জায়গায় বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিটি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বাস্থ্যবিভাগের হিসাবপত্র নিশ্চয়ই খুব জটিল ও দুরূহ ব্যাপার ; এই পদের নিয়োগ পাব্লিক সারভিস কমিশনের এক্তিয়ারবহির্ভূত করিয়া এক কমিটির হাতে দেওয়া হইল। এই কমিটিতে রহিলেন—বিধানসুহৃদ্‌ প্রবীণতম শল্যচিকিৎসক ললিত ব্যানার্জি, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল দীনেশ চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব। ইন্টারভিউ'র স্থান হইল—অর্থসচিবের অফিসঘর—কর্তার চোখের সামনে। যথারীতি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল এবং সেই বিজ্ঞাপনে হিসাবরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যোগ্যতার ফিরিস্তি দেওয়া

হইল। এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া উদ্দিষ্ট প্রার্থী শংকর বিচলিত হইলেন। কালিদাসের কাব্যে দেখি ব্রাহ্মণবেশী কৈলাসনাথ শংকর নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন—দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু অর্থাৎ যিনি দিগম্বর তাঁহার আবার সম্পদ কোথায়? আমাদের শংকরও নিজের দিগম্বরত্ব-সম্পর্কে সচেতন ; শংকিত হইয়া তিনি কর্তাকে ধরিলেন। কর্তা ফতোয়া দিলেন, স্বাস্থ্যবিভাগের উপসচিব পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের সংশোধনী ছাপিবার ব্যবস্থা করুক : পদ-প্রার্থীদের দশ বৎসরের হাসপাতালের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ব্রহ্মদেশ না আর কোথাও প্রার্থী কাশীবিশ্বেশ্বর দশ বছর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁহারা স্বাস্থ্যবিভাগের ভিতরকার খবর রাখেন তাঁহারা কেহই আবেদন করিলেন না। কিন্তু তবু তেরখানি দরখাস্ত পড়িল। ইন্টারভিউ-এর দিন নির্দিষ্ট সময়ের অব্যবহিত পূর্বে স্বাস্থ্যদপ্তরের উপসচিব অর্থসচিবকে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দিলেন এবং কোন্ সাদা কাগজখানিতে ইন্টারভিউ-এর ফলাফল লিখিতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দিলেন। শেষ কথা বলিলেন, মিটিং-এর পর তিনি উহা লইয়া যাইবেন। অর্থসচিব নাকি শীতল উদাসকণ্ঠে উত্তর দিয়াছিলেন, 'ফলাফল এখনই লিখিয়া দেওয়া যায়!' যাহা হউক, ইন্টারভিউ-এর পর যখন বিবরণী উপ-সচিবের হাতে আসিল, তখন দেখা গেল তাহাতে লিখিত আছে, 'বিজ্ঞাপিত যোগ্যতা কাশীবাবু ছাড়া আর কাহারও নাই। সুতরাং তাঁহাকেই স্বাস্থ্যদপ্তরের "মিত্র" করা হউক।' ইহার পর বিধানচন্দ্র green coconut দ্বারা সার্ভিস কমিশন ভরতি করিয়া ফেলিলেন ; কাজেই বিধান-তন্ত্র পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

৬

বুঝি না বুঝি, আমি শিক্ষাজগতেরই লোক ; ইহার সঙ্গেই যুক্ত আছি। এই ক্ষেত্রে বিধানচন্দ্রের অবদানের কথা অবশ্যই বলিতে হইবে ; ইহাই আমি বেশি করিয়া দেখিয়াছি। বাংলার অংশতঃ ভারতবর্ষেরও—শিক্ষাজগতের সবচেয়ে বড় অভিশাপ আশুতোষের অভ্যাগম। তাঁহার প্রধান অপকীর্তি—পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট স্থাপন ; এই ডিপার্টমেন্টের স্বার্থে স্কুল ও কলেজে অশাসন ও শোষণ পাকা হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থে পরীক্ষায় দুর্নীতির অবতারণা করা হয় এবং বাংলায় এম-এ নামক এক কিম্ভূতকিমাকার বস্তুর উদ্ভাবন হয়। যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে আশুতোষের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হইলেন রাইটার্স বিল্ডিংসে বিধানচন্দ্র ও সিনেট হাউসে সতীশচন্দ্র ঘোষ। বিধানচন্দ্র আবার সরকারেরও মালিক, সুতরাং সেই দিক হইতে তাঁহার ক্ষমতার পরিধি আরও বিস্তীর্ণ।

আশুতোষের পাণ্ডিত্য লইয়া স্তাবকেরা একটু বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু ইহা অবশ্য-স্বীকার্য যে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই, তিনি বহুশ্রুত লোক : তাঁহার বিরাট লাইব্রেরি তাঁহার বিদ্যানুরাগের সাক্ষ্য দেয়। বিধানচন্দ্র ডাক্তারি পরীক্ষা অনেক পাশ করিয়াছেন : সেইজন্য নিশ্চয়ই তাঁহাকে অনেক বই পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে কেহ বই পড়িতে দেখিয়াছেন, এমন কথা শুনি নাই। 'বিগ ফাইভ'-এর দুইজন—নলিনী-বিধান সেক্রেটারিয়েটে অনেককাল কাটাইয়াছেন। নলিনী সরকারের মুখে অনেকেই বইয়ের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার বাড়িতে গেলে ইকনমিক্সের সদ্যঃপ্রকাশিত একাধিক গ্রন্থ নাকি সব সময়েই দেখা যাইত। এইজাতীয় অপবাদ বিধান-বাবুর বিরুদ্ধে কেহ দেয় নাই এবং মেডিকেল জার্নাল ছাড়া আর কোন মুদ্রিত গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকার সংবাদ তিনি রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না।

মসনদে বসিয়া বিধানচন্দ্র এক সরীসৃপকে বাহন করিয়া আনিলেন। সরীসৃপ বলিতেছি

এইজন্য যে, এই জাতীয় জীবের অন্য বর্ণনা সম্ভব নয়।* আর মনে হয়, ইচ্ছা করিয়াই বিধানচন্দ্র ই'হার পূর্ণতর পরিচয় প্রদানের পথ রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের হরিপদ দা' খেয়ালী লোক; কেমিস্ট্রিতে এম.এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া গবেষণা শুরু করিবেন বা করিয়াছেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক আসিল এবং তিনি অভয় আশ্রমের সদস্য হইলেন। এই সত্যসন্ধ লোকটি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি আইনসভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন এই আমদানী-করা শিক্ষাবিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা—অর্থাৎ তিনি প্রবেশিকা হইতে শেষ পর্যন্ত কোন্ পরীক্ষা কোন্ বৎসর কোন্ বিভাগে পাশ করিয়াছেন—তাহা জানান হউক। কোন সরকারি গোপনীয় তথ্য সদস্যবা জানিতে চাহিলে এবং সেই তথ্য যদি প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উত্তর দেওয়ার রীতি হইল : in the public interest অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই-সকল কথা প্রকাশ করা যায় না। কোন শিক্ষা-উপদেষ্টার শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় জানাইলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা স্বয়ং ভগবানও বলিতে পারিবেন না। তবু এই বিষয়ে বিধানসভায় বিধানচন্দ্র জনস্বার্থের দোহাই দিয়া উত্তর না দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন।

তবু এই সরীসৃপের বিদ্যাবুদ্ধির যে কিছু কিছু পরিচয় না পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়। কোন কারণে কনস্টিটুয়েন্ট কলেজের নিয়মাবলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার—এই-সব বিষয়ের কাগজপত্র আমার পড়িবার সুযোগ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অর্থদপ্তর, আইনমন্ত্রক ও সংশিলষ্ট নানা সংস্থার নানা উ'চু-নীচু কর্মচারীর মন্তব্য বা নোটিং আছে। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ই'হার : D. S./Please speak/হয় শুধু সই, অথবা এই এক গৎ। জনৈক উপসচিবকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, ঐ নির্দেশ এক-দিকে মারাত্মক আর একদিকে একেবারে নিরুপদ্রব। এই সরীসৃপের কোন বিষয়-সম্পর্কে কোন ধারণা নাই, আবোল তাবোল খানিকটা শুনিতে হয়। তারপর কর্মচারীর যাহা ইচ্ছা লিখিয়া দিলেই হইল। কোন ক্ষতি হয় নাই। শিক্ষাবিভাগে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছু করা হউক, ইহা কর্তার ইচ্ছা নয়। একমাত্র লক্ষ্য বাড়ি-ঘর তৈরি করা, চাকুরী ও অনুদান দেওয়া বা না দেওয়া। ইহার অধিক কিছু ছিল না। মুশকিল হইত একটা সময়। যতই কাজ না করিয়া, মোড়লি করিয়া চাকুরী করা যাক; মাঝে মাঝে দুই-চারখানা ব্যক্তিগত D.O. চিঠি লিখিতে হইত; তখন তো স্টেনোগ্রাফার আর সাহেবে ধস্তাধস্তি। চার লাইন ইংরেজি চিঠির বয়ান ঠিক করিতে বক্তার সমস্ত শরীর কম্পিত হইত, সব মাংসপেশী কুঞ্চিত হইত; মনে হইত পৃথিবীর সমস্ত ছারপোকা চেয়ারে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়া কেবলই উশখুশ করিতে হইত। আর স্টেনোগ্রাফার বেচারিকে নীরব গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে হইত। হরিপদদা'র প্রশ্নের দিনই হউক বা অন্য দিনই হউক এই সরীসৃপের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে এবং সেই আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি তখন আইনসভার সদস্য—যোগ দিয়া আমদানী-করা কাচখণ্ডের উপর কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। বিতর্কে অংশগ্রহণ করিয়া স্বাধীন ভারতের মুখ্যমন্ত্রী এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর বিধানচন্দ্র উঠিয়া বলিলেন তিনি যোগ্যতার প্রশ্নে শুধু এই বলিতে চাহেন শ্রীকুমারবাবু কলিকাতার পি-এচ.ডি., আর তাঁহার বাহন বিলাতের পি-এচ.ডি.। অমনি 'হাসিয়া উঠিল [স্তাবকের] দল', কারণ এমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এমন বিতর্কনৈপুণ্যে নাকি আর কোথাও দেখা যায় নাই। সবচেয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছিল

* তারকনাথ সেন ইহার নাম দিয়াছিল : 'Devil's Man-Servant'.

জনৈকা কন্যাকুমারী। তাঁহার পিতা রাজনৈতিক মহলে হাফপ্যান্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন, আর তিনি নিজে বোধ হয় বাংলায় এম-এ। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি বিংশ শতাব্দীর বয়স হইয়াছে বিরাশি বৎসর—ইহার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯০১ সালে বিধানচন্দ্র বি-এ'তে গণিতের অনার্সে লাস্ট হইয়াছিলেন আর শ্রীকুমারবাবু একমাত্র গ্রাজুয়েট—যিনি ইংরেজিতে ঈশানবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিধানচন্দ্রের সরীসৃপ বাহন কোথা হইতে বি-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং আদৌ বি-এ পাশ করিয়াছিলেন কিনা সেই তথ্য আমরা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি, তিনি পশ্চিম ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বি-এ পাশের কোন হদিশ আছে কি? ইঁহার বিলাতী ডক্টরেট নিশ্চয়ই খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু থীসিস ছাপা হয় নাই, উহা কেহ দেখিয়াছে বলিয়া শুনি নাই, এমন কি উহার বিষয়বস্তু লইয়াও নানা বিতর্ক আছে। ইঁহার মুখনিঃসৃত ইংরেজির পরিচয় পরোক্ষভাবে শুনিয়াছিলাম। তাহার নমুনা দিতেছি। একসময়ে আমাকে বছরে অন্ততঃ একবার গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে হইত এবং কয়েক-দিন থাকিতে হইত। একটা সর্বভারতীয় ভাষা কমিশন বসে, তাহার অন্যতম সদস্য ছিল আমার প্রাক্তন ছাত্র বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া। কমিশন কলিকাতায় সাক্ষ্য গ্রহণ করে। বঙ্গ দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চতম অথরিটি সাক্ষ্যদান কালে বলেন, 'The wearer knows where the shoe *bites.*' জনৈক সদস্য মন্তব্য করিলেন, Does the shoe bite?' সাক্ষীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, অন্য একজন সদস্য বলিলেন, '...he means pinches.' তখনও সাক্ষীকে নির্বাক দেখিয়া সদস্যরা মৃদু হাসি বিনিময় করিলেন। আর একটা কথা শুনিয়াছি করুণাকুমার হাজরার কাছে। নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতার জন্য তাঁহার বেশ একটা সুনাম হইয়াছিল এবং সরকারের যে-কোন দপ্তরে কোন কূট প্রশ্ন উঠিলে তাহার মতামত চাওয়া হইত। দুই-একটা বিষয়ে আমিও তাহার মন্তব্য দেখিয়াছি —সহজ, সরল বক্তব্য; আইনসচিবের মন্তব্য হইলেও আইনের কূটতর্কের দ্বারা কণ্টকিত নয়। সরীসৃপ পরের ক্ষতি ও নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন দিকে মন দিতে পারিতেন না। তবু কাগজপত্রে L. R.-এর দীর্ঘ মতামতের উপর নজর পড়ায় তিনি করুণাকুমার হাজরাকে একদিন সৌজন্যের আতিশয্যে বলিয়া ফেলিলেন, 'আপনি আমাদের জন্য এত করেন ... You owe our best thanks!' হতবাক করুণাকে আমি বলিলাম, 'তুমি আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম হইলেও, ইংরেজির তত্ত্ব জান না। 'owe' শব্দের প্রাথমিক অর্থ ছিল 'own'।' করুণাকুমার ইংরেজি-সম্পর্কে নূতন জ্ঞান লাভ করিল।

বিধানবাবু শুধু সরীসৃপকে আনিয়া তৃপ্ত হইলেন না, অবসরপ্রাপ্ত অপূর্বকুমার চন্দকেও পুনরায় নিযুক্ত করিলেন; সুতরাং শিক্ষাবিভাগে সোনায় সোহাগা হইল। চন্দ-সাহেব সেক্রেটারিয়েটে বেশিদিন থাকিলেন না। নূতন সেকেন্ডারি বোর্ড হইলে তাঁহাকে উহার সভাপতি করা হইল। কোন এক সময়ে বন্ধুবর তারাপদ মুখোপাধ্যায় ইহার সদস্য মনোনীত হইয়াছিল। তাহার কাছে শুনিয়াছি বোর্ডের বাস্তবিক কোন ক্ষমতাই ছিল না। তবু কতকগুলি নির্বাচিত সদস্য থাকে; তাহারা চেঁচামেচি করে। সুতরাং তাহাদিগকে থামাইবার জন্যই নির্বাচিত সদস্যসম্বলিত বোর্ড বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ইহাই রীতি; 'Freedom fiirst, freedom second' প্রভৃতি বুলির ইহাই অর্থ। খাস শিক্ষাদপ্তরেও তাহাই দেখিলাম। আমরা যখন প্রথম চাকুরীতে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখিয়াছি যে, যেহেতু ডিরেক্টর প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ এবং রাজ্যের অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাই তাঁহার মত শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনা করা হইত।

স্বাধীন ভারতে বিধানচন্দ্রের আমলে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম প্রশাসনিক পরিবর্তন হইল ডি. পি. আই.-পদের অবমূল্যায়ন ; এক সময় তো এই পদ তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম ডি. পি. আই. স্নেহময় দত্ত বোধ হয় একটু-আধটু প্রাচীন পথে চলিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য সরীসৃপ তাঁহার পিছু লইল। তখনই শোনা যাইত, হয়ত কিছু সত্যতাও আছে, যে সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় স্নেহময় দত্ত একটু বেশি ধনী ছিলেন। তাঁহার অর্থাগমের ভিত্তি হইল শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ এবং দক্ষিণ কলিকাতায় অল্পদামে জমি কেনা। ইহার মধ্যে কোন গোপনতা নাই, অসততার নামগন্ধ নাই। কিন্তু আমার বন্ধুস্থানীয় ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার মনীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একদিন কৌতুকমিশ্রিত ঘৃণার সহিত একটি চিঠির কথা বলিলেন। তিনি ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার হইতে আরম্ভ করিয়া কমিশনার হইয়া চাকুরীর শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়াছেন। একে অপরের বিরুদ্ধে স্বনামে এবং প্রধানতঃ বেনামে অভিযোগ জানাইয়া চিঠি অনেকেই লিখে। কিন্তু এই একটি চিঠি অনন্য। আমাদের সরীসৃপ স্বনামে কমিশনারকে চিঠি লিখিয়াছে, ডি. পি. আই. স্নেহময় দত্তের শেয়ার হইতে অনেক টাকা আয় হয়। কোন্ শেয়ার এবং তাহার ট্যাক্স আগে কাটা হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন তথ্য নাই। ডক্টর দত্ত যাহাতে কর ফাঁকি না দেন সেইদিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়।

৭

আবার শিক্ষাজগতের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। আশুতোষের আমলে স্কুলের অনুমোদনের মালিক বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিদর্শনের কর্তা সরকারি ইন্‌স্পেক্টরেটের টানা-পোড়েনের ফলে বারংবার স্কুলের মান খুব নামিয়া গিয়াছিল। যেহেতু ইন্‌স্পেক্টরদের রিপোর্টের বিশেষ মর্যাদা ছিল না, অযোগ্য মুসলমানের আমদানীতে এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ নীচু হইতে আরও নীচু হইতেছিল। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ছিল দেশের স্কুলের ইন্‌স্পেকশন বা পরিদর্শনের উপর। কিন্তু বিধানচন্দ্রেব দৃষ্টি সেই দিকে গেল না। যাঁহারা রাজনীতি করেন, পার্টি সংগঠন করেন, ভোট সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের প্রধান ঘাঁটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। গ্রামে গঞ্জে ক্ষমতা ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এই-সমস্ত স্কুলের সরকারি অনুদান বিবেচনা করিয়া দিতে হয়। এই বিবেচনার জন্য ডাক্তার রায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার চীফ ইন্‌স্পেক্টরের পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের অফিস একেবারে রাইটার্স বিল্ডিংসে কর্তাদের চোখের সামনে বসাইলেন। জেলা, মহকুমা প্রভৃতিতে যে-সকল নিম্নপদস্থ ইন্‌স্‌-পেক্টর রহিলেন, তাঁহাদের মর্যাদা, ক্ষমতা প্রায় কিছুই রহিল না। এইভাবে দলগত স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষার নির্লজ্জ পরিচালনার সূত্রপাত হইল। লেখাপড়ার মান দেখিবার প্রয়োজন আর রহিল না ; প্রধান লক্ষ্য হইল আশ্রিতপোষণ।

উচ্চতর শিক্ষায় বিধানচন্দ্রের বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু অন্য কোন পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার আয়ত্তে ছিল না ; শুধু তাই নয়, ইহার প্রতি তাঁহার কোন শ্রদ্ধাও ছিল না। তিনি দুই-একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেন। আশুতোষ স্বর্গত হইয়াছেন। তিনি নিজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের সহযোগী ছিলেন ; সুতরাং বাসুকী যেমন ধরণী ধারণ করিয়া আছেন, তিনি তেমনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করিবেন। অর্থাৎ ইহার কোন পরিবর্তন হইবে না। সরকারি-বেসরকারি কলেজ যেমন ছিল তেমনি চলিবে। সরকারি কলেজ এবং সরকারের

অন্যান্য বিভাগে—যাহাতে অনভিপ্রেত লোক প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য পাব্লিক সারভিস কমিশনকে ঢালিয়া সাজাইলেন। ইন্টারভিউ লইতে ওখানে মাঝে মাঝে গিয়াছি। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত দুই-চারজন ভাল লোক যে দেখি নাই তাহা নহে। তবে দিন দিন উহার অধোগতিই দেখিয়াছি। যিনি ওখানে সবচেয়ে বেশি আসর জমাইয়াছিলেন তিনি ঢাকার লোক ; আমি নিজেও শহুরে মানুষ না হইলেও ঐ জেলারই অধিবাসী। ঢাকায় ইনি বেশ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ইহাকে বলা হইত (বাংলায়)– green coconut ; ইঁহার সঙ্গে দুই-একবার ইন্টারভিউ লইতে যাইয়া এই নামকরণের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছি।

বিধানচন্দ্র নূতনের রূপকার। সুতরাং পুরাতন প্রতিষ্ঠানের দিকে তাঁহার নজর যাইত না। কিন্তু সেই দিকে দৃষ্টি দিলে দেশের উপকার হইত। যেমন বলা যাইতে পারে, তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম.ডি পাশ করিয়াছিলেন, কারমাইকেল (আর. জি. কর) কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক এবং অধ্যাপক ছিলেন— এই দুই কলেজের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে তাঁহার অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রতিভার আহার জুটিবে কি করিয়া? তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি জমকালো নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে লাগিলেন—নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েক ডজন স্পনসর্ড কলেজ। ইহাতে তাঁহার নিজের স্থপতির প্রতিভা স্ফুরিত হইল, বহু আশ্রিত লোক ঠিকাদারি করিয়া অর্থবান হইলেন, চাকুরী-প্রত্যাশী উমেদার— ইহাদের মধ্যে একাধিক আই. সি. এস. আছেন—চাকুরী পাইলেন। সর্বোপরি, সরীসৃপের— ইঁহার অসীম প্রভাবের রহস্য নিহিতং গুহায়াম্—ক্ষমতালিপ্সার আহার্য প্রয়োজন। স্পনসর্ড কলেজের বহু অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন—ইহার সম্পূর্ণ মালিকানা আসিল এই জীবটীর হাতে, যাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা আমাদের জানার অধিকার নাই। আর বিধান-চন্দ্র যে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তাহার তুলনামূলক বিচার করিলে একটা কৌতুককর সত্য উদ্ভাসিত হইবে। আশুতোষ Freedom fiirst, freedom second বলিতেন, সেইজন্য তিনি কতকগুলি কমিটির মাধ্যমে কাজ করিতেন—যাহাদের সভ্যদিগকে যদুনাথ সরকার পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের খোজা প্রহরীদের (eunuchs of Byzantine Caesars) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিধানচন্দ্র সর্বপ্রথমে স্থাপন করিলেন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়, তিনি নিজেই যাহার প্রেসিডেন্ট বা কর্মসমিতির সভাপতি হইলেন ; কিন্তু ইহা জাতীয় শিক্ষাপর্ষদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেইজন্য তাহাকে ছিটেফোঁটা দিতে হইল। ইহার পর বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রভারতী—এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ একটি লোকের আজ্ঞা বহন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্ত শিক্ষা-সচিব হইয়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির—একজিকিউটিভ কাউন্সিলের—সভায় উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স তখন বছর সাতেক। সভার কাজ আরম্ভ হইতেই ভবতোষ রেজিস্ট্রারকে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পড়িতে অনুরোধ করিল, কারণ সেই বিবরণী অনুমোদন করা যে-কোন সভার প্রথম কাজ। রেজিস্ট্রার অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির প্রথম সভা! ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আর একটা কথার উল্লেখ না করিলে নব্যবঙ্গের এই রূপকারের চরিত-বর্ণনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কবি বলিয়াছেন, আমি যাহা হইতে পারি নাই, আমার মধ্যে লোকে যাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে সেইখানেই আমার প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে। এই উক্তি বিধানচন্দ্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন—শিল্পনগর সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জলাভূমি সংস্কার, সেচব্যবস্থা, যানবাহনের উন্নতিসাধন—আরও কত কি! তাঁহার

অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রদেশপ্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর রাজ্য বিহারের অঙ্গীভূত করিতে চাহিয়াছিল। ডক্টর জনসন মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'Patriotism is the last refuge of Scoundrels' অর্থাৎ যাহাকে আমরা দেশপ্রেম বলি তাহা নচ্ছারদের শেষ অবলম্বন। মহামানব বিধানচন্দ্র-সম্পর্কে কেহ এই অপবাদ দিতে পারিবে না। কিন্তু বঙ্গদেশের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গকে বিহারের অঙ্গীভূত করার এই পরিকল্পনাকে পণ্ড করিয়া দিল ; বিধানচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে কেহ ইহার উল্লেখও করিলেন না। আশা করি ঐতিহাসিকরা স্মরণ রাখিবেন যে 'নব্যবঙ্গের রূপকার' বঙ্গদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেন্সী কলেজে—শেষ পর্যায়

১

আমার আমলের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন চৌধুরীকে বিধানবাবু খাতির করিতেন, কিন্তু শাসনব্যাপারে ইঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন না। বোধ হয় ইহার জন্যই চৌধুরীমহাশয় গোঁসা করিয়া কিছুদিন ক্যাবিনেটের বাহিরে থাকিলেন। এবার বিধান রায় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। এইসব আমার শোনা কথা। তিনি ক্যাবিনেটে ফিরিয়া আসিয়া যে কাজ করিলেন এবং তাহার যে পরিণতি হইল, তাহা আমার মনে যুগপৎ কৌতুক ও আনন্দ সঞ্চার করিল। আমার অবসর গ্রহণের এক বছরেরও বেশি বাকি, কিন্তু বন্ধুবর তারাপদ মুখার্জির অবসর গ্রহণের সময় প্রায় আসিয়া গিয়াছে। আমরা—অর্থাৎ প্রস্তাব আমার, সই অধ্যক্ষ পেরেরাসাহেবের—বলিলাম, অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জিকে এক বৎসরের জন্য পুনর্নিযুক্ত করা হউক। কিছুদিন পর অর্ডার আসিল যে আমাকে ও তারাপদ মুখার্জিকে অবসর গ্রহণের পর পাঁচ বৎসর পুনরায় নিযুক্ত করা হইল। তবে প্রথম কিস্তিতে তিন বৎসর, তারপর দুই বৎসর। ইহাতে আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম, কিন্তু শিক্ষাদপ্তরের কর্মীরা অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক প্রবীণ কর্মচারী আমাকে বলিলেন, তাঁহারা শিক্ষাদপ্তর হইতে একটানা পাঁচ বৎসরের জন্য লিখিয়াছিলেন, ইহা যে প্রথম দফায় তিন বৎসর করা হইল, ইহা আমার বন্ধু বিনয় দাশগুপ্তের শঠতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থসচিবের উপর সবাই অখুশি থাকে।

ব্যাপারটা যা হইয়াছিল তাহা পরে আমার অনুধাবনের সুযোগ হয়। হরেনবাবু মন্ত্রী হইয়া সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন; তিনি এমন একটা-কিছু করিতে চাহেন যাহা তাঁহার অভিপ্রেত, অথচ সরীসৃপের অনভিপ্রেত। সেইজন্যই আমি না চাহিতেই তিনি আমার কার্যকাল পাঁচ বছর বাড়াইতে চাহিলেন; সঙ্গে জনপ্রিয় শিক্ষক তারাপদ মুখার্জি রহিলেন। সরীসৃপদের আত্মরক্ষার ইনস্টিংক্ট খুব প্রবল। আমাদের সরীসৃপ এবার শিক্ষামন্ত্রীকে সোজা বাধা দিলেন না, কিন্তু বড়কর্তার কাছে তাঁহার আবদার কখনও বিফল হয় না এবং বড়কর্তা শুধু মুখ্যমন্ত্রী নহেন, অর্থমন্ত্রীও বটে। কাজেই আমি সহজেই ব্যাপারটা আঁচ করিতে পারিলাম: সরীসৃপ অর্থমন্ত্রীকে দিয়া পাঁচকে প্রথম দফায় তিন করাইল এবং সেই প্রস্তাবই গৃহীত হইল। সরীসৃপের বিসর্পিত গতি বুঝিতে আমার কিছু অসুবিধা হয় নাই; তবে এইজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে লড়িতে গেলে জয়ে গৌরব নাই এবং হারজিত যাহাই হউক, সময়ের প্রচুর অপচয়। সেইজন্য আমি মুখ বুজিয়া রহিলাম। তবে হিসাব করিয়া দেখিলাম যে শেষের দুই বছরের অন্ততঃ এক বছর আমাকে চাকুরী করিতেই হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই সরীসৃপের কর্মতৎপরতার পরিচয় পাইলাম। আমার ছাত্র ও সহকর্মী অমল ভট্টাচার্যকে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করা হইল। সরকারী চাকুরীর নিয়মের প্রত্যাশিত ও অলঙ্ঘনীয় শর্ত—স্থানান্তরে বদলি হওয়া। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু কোন কোন সরীসৃপের শক্তি লেজে। এই অর্ডারের সঙ্গে সরকারি মন্তব্য যোগ করিয়া দেওয়া হইল যে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি বিভাগে প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হইলে অমলকে পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আনা

হইবে। সরকারি হুকুমনামায় এইরূপ মল্লিনাথী সংযোজন আর কোথাও আমি দেখি নাই। যাহা হউক, আমি যাহা পাইয়াছিলাম তাহাই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। তিন বৎসর পর যে যাইতে হইবে তাহা আমি ধরিয়াই লইয়াছিলাম ; সুতরাং এই নজিরহীন শঙ্খধ্বনির কোন প্রয়োজন ছিল না ; তবে ইহার তাৎপর্য আমি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ চার বৎসর কাজ করিতে পারিলে আমার সাংসারিক সমস্যার সুরাহা হইতে পারে। ততদিনে আমার দুই বড় ছেলে—জিওলজিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার—দাঁড়াইয়া যাইবে। পুরো তিন বৎসরও করিতে হইল না। দুই বৎসর পার না হইতেই একদিন হঠাৎ নবপ্রতিষ্ঠিত জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট হইতে চিঠি পাইলাম, তাঁহারা পাঁচ বৎসরের কন্ট্রাক্টে আমাকে ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরেজির প্রধান হইতে আমন্ত্রণ জানাইতেছেন। কথাটা গোপন রাখিলাম। শুধু করুণাকুমার হাজরার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পদত্যাগপত্রের খসড়া তাহাকে দেখাইলাম। সে সেই খসড়া অনুমোদন করিল না ; বলিল পদত্যাগপত্র দিলেই তাহা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কাজ ছাড়ায় বাধা আসিতে পারে। সে বলিল, আমি এখন তিন বৎসর মেয়াদী ঠিকে চাকুরে। আমাকে কোন মাসের ১লা তারিখ ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হইবে এবং তাহাতে লিখিতে হইবে যে আমি অমুক তারিখ হইতে কলেজে আর আসিব না। আমাকে বেকার করিতে না পারিয়া সরীসৃপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ; তবে তাহাকে আমার মাধ্যমে আর একবার আশাভঙ্গের দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। সেকথা পরে বলিব।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম ১৯২০ সালে এবং অধ্যাপক হিসাবে ইহা ছাড়িয়া বাহির হইলাম ১৯৬০ সালে। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বছর সাতেক দিল্লী, চাটগাঁ ও রাজশাহীতে কাটাইয়াছি। কিন্তু তখনও নিজেকে এই কলেজেরই অঙ্গ বলিয়া মনে করিতাম—যেন ছুটিতে প্রবাসে গিয়াছি, ছুটি ফুরাইলেই যথাস্থানে ফিরিয়া আসিব। এইবার যে ছাড়িলাম, তাহা স্থায়ী বিচ্ছেদ—ফিরিবার পথ নাই। এই কলেজে আমি দিয়াছি সামান্যই কিন্তু পাইয়াছি অনেক। আমার অবসরগ্রহণের সময় যে বিদায়ের আয়োজন হইয়াছিল তাহার বিপুলতার মধ্যেও এই প্রাচুর্যের স্বাক্ষর ছিল। আমার প্রাক্তন ছাত্রেরা লাইব্রেরি হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিল—খাওয়া-দাওয়া বক্তৃতা ইত্যাদি। আমার সমসাময়িক ছাত্র-বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম যে শ্রীকুমারবাবু আমাদের সকলের শিক্ষক, তিনিই সভাপতি হইবেন। কিন্তু প্রাক্তন ছাত্রদের সংস্থার সভাপতি অতুলবাবু হাজির—উদ্যোক্তা হিসাবে, আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নয়। তিনি কাহার কাছে জানিতে পারিয়াছিলেন একটা যজ্ঞ আসন্ন, আর অমনি দক্ষিণা (নিশ্চয়ই বড়রকমের) দিয়া যজমানের দলে ভিড়িয়া গেলেন। খুব গুরুগম্ভীর ধরনের লোক হইলেও প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যাপারে তিনি সব সময়ই ওল্ড বয় হইয়া যাইতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে অপর কেহ আর সভাপতি হইতে পারেন না : সুতরাং শ্রীকুমারবাবু হইলেন প্রথম বক্তা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার বাহুল্যে থাকায় বক্তৃতার সংখ্যা খুব সীমিত হইয়াছিল। আমাদের হরিপদ'দা, শ্রীকুমারবাবুর সহাধ্যায়ী মুকুন্দকিশোর চক্রবর্তী সোৎসাহে বক্তৃতা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য সভাপতি জায়গা করিতে পারিলেন না।

বক্তৃতার প্রচুর ব্যবস্থা হইল তদানীন্তন ছাত্রদের সভায় ফিজিক্স থিয়েটারে। কলেজের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা—যাঁহাদিগকে সেই আমলে ministerial ও menial কর্মচারী বলা হইত—তাঁহারাও সংক্ষিপ্ত আকারে পৃথক্-পৃথক্-ভাবে আমাকে বিদায় জানাইয়াছিলেন। আর সবচেয়ে মর্মস্পর্শী সম্বর্ধনা জানাইয়াছিল কলেজের মেয়েরা। কলেজে মেয়েদের কমন-রুম ছিল অফিসের সংলগ্ন। আমি অফিসে

আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র সহি করিয়া বাহির হইয়া দেখি, মেয়েরা সব বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম, এইভাবেই ইহারা আমাকে পৃথক্ নিজস্ব বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল। ইহাদের নীরব প্রীতি আমার হৃদয়ে গাঁথা হইয়া আছে। ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক—কোনভাবেই আমি অনন্যসাধারণত্ব দাবি করিতে পারি না। তবু এতভাবে যে সবাই আমার প্রতি তাহাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইয়াছে ইহার প্রধান কারণ আমার গভীর সংসক্তি : এই কলেজের সঙ্গে আমি নিজেকে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত মনে করিয়া আসিয়াছি যে অন্য কোন বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচয় করার আকাঙ্ক্ষাও জাগে নাই। উত্তরকালে একদিন অক্সফোর্ড ও একদিন কেম্ব্রিজে গিয়াছিলাম, কিন্তু শুধু বেড়াইবার জন্য। স্বীকার করি এই অনুরক্তি মনের সংকীর্ণতার পরিচায়ক, কিন্তু ইহার জন্য আমার কোন অনুতাপ নাই। এই সংকীর্ণতাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কলেজ ছাড়িলেও ইহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইল না। একটা সূত্র রহিল প্রাক্তন ছাত্রদের সংসদ। তাহার অপেক্ষাও দৃঢ় বন্ধন প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরি। ইহার অপেক্ষা ভাল লাইব্রেরি আর কোথাও নাই, এমন কথা বলিব না। কিন্তু চল্লিশ বছরের নৈকট্যে ইহার সঙ্গে আমার যেন একটা রক্তের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রধান হইয়াছিল গ্রন্থকীট ও গ্রন্থরসিক অধ্যাপক তারকনাথ সেন। নিয়মকানুন কি ছিল জানি না ; সে বলিয়া দিল, আমার যখন যে বইয়ের দরকার আমি তাহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিব। দেশবিভাগের সময় নলিনী সরকার মহাশয় আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরির পুরানো বইয়ের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন। এই সময় এই দূরদর্শিতার স্পষ্ট পরিচয় পাই। এই লাইব্রেরির পুরাতন, অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক, অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতে পারি। অবশ্য আমার রচনার অকিঞ্চিৎকরত্বের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের বদান্যতার বিচার হইবে না।

২

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হিসাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম ১৯২৯ সালে আর অবসরগ্রহণ করিলাম ১৯৬০ সালে—একত্রিশ বছর পরে। ইহার মধ্যে শেষের বার একটানা ১৪ বছর, মোট চাকুরীর প্রায় অর্ধাংশ। প্রথম ছিলাম কনিষ্ঠতম অধ্যাপক, এবার হইলাম প্রবীণদের মধ্যে একজন ; শুধু পদমর্যাদায় নয়, বয়সেও। তখন এই পরিবর্তন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। তরুণ বয়সে মানুষ কনিষ্ঠদের সঙ্গে যত সহজে মিশিতে পারে, বড় হইলে তাহা পারে না। রাজশাহী কলেজে বদলি হওয়ার আগে ইংরেজির ও অন্যান্য বিষয়ের ছোট-বড় ছাত্রদের সঙ্গে বেশ একটা সান্নিধ্য বোধ করিয়াছি। ১৯৪৭ সাল হইতে যে অধ্যায় শুরু হইল সেই সময় যেন মনের সেই প্রসার চলিয়া গিয়াছে, ইংরেজির ছাত্রদের সঙ্গেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগে প্রবোধ ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ছাত্রদের সঙ্গেও আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল : আর এই দ্বিতীয়ার্ধে আর্টসের অর্থনীতি বিভাগে অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, ইতিহাসে শিপ্রা সরকার, অশীন দাশগুপ্ত প্রভৃতি খুব ভাল ছাত্রদের সম্পর্কেও তেমন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না।

ইংরেজির ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল অমলেন্দু দাশগুপ্ত : রাজশাহী যাওয়ার আগেই তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমরা এক জায়গারই লোক ;

বিক্রমপুরে আমাদের বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে এবং সেই পরিচয় দিয়াই সে বি-এ ইংরেজি অনার্স ক্লাসে ভর্তি হইয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছিল। রাজশাহী থাকিতে শুনিলাম, সে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পাইয়াছে, প্রথম শ্রেণীর কাছাকাছি আসিলেও অল্পের জন্য নামিয়া গিয়াছে। ইহার পর আমি আর তাহার খোঁজ রাখি নাই এবং পূর্বে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা হয় নাই। আমি তাহাদিগকে শুধু একবছর পড়াইয়াছিলাম ; খুব নৈকট্যও হয় নাই। শ্রীকুমারবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হইয়া ইংরেজির উচ্চতর বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন। ছোট-বড় সমস্ত বিষয়ে আমার সম্পর্কে তাঁহার সদাজাগ্রত উপচিকির্ষার কথা আমি একাধিকবার বলিয়াছি। বাহির হইতে এম-এ'র কিছু কিছু পরীক্ষক নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল। তিনি আমাকে একজন এইরূপ এক্সটার্নেল পরীক্ষক নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। একটি পরীক্ষার্থীর উত্তরের উৎকর্ষ দেখিযা আমি শুধু খুশি হই নাই, অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ছুটিতে কলিকাতায় আসিলে পর ট্যাবুলেটর ডক্টর নৃপেন সেনের সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন যে বাকি পরীক্ষকরাও এই পরীক্ষার্থীকে ঐরূপ নম্বর দিয়াছে। সুতরাং অমলেন্দু খুব বেশি নম্বর পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইল।

এম-এ পাস করিলেই অর্থোপার্জনের প্রশ্ন উঠে। অমলেন্দু অনেক বিষয়ে হাত দিয়াছে। প্রথম ছোটখাট জার্নালিজম্ করিয়াছে, তারপর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকুরী করিয়াছে, সাহিত্য হইতে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হইয়া বেশ কিছুদিন ভিয়েনায় কাটাইয়াছে। বোধ হয় এই সূত্রেই সে পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরিয়া আসিয়াছে ; লন্ডন টাইমস্ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট-বড় নানা কাগজে লিখিয়াছে এবং এখন স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছে। সাংবাদিক জীবনে ইহা খুব উচ্চ সম্মান, কারণ ইংরেজ আমল হইতেই স্টেটস্ম্যান খুব মর্যাদাশীল পত্রিকা। অনেকদিন আগে প্রখ্যাত ব্যবহারাজীব স্যার নৃপেন সরকার কলিকাতা হাইকোর্টে একটা মামলায় সওয়াল করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে এই পত্রিকা লন্ডন টাইমসের সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীন ভারতে এই পত্রিকার মর্যাদা কমে নাই। অমলেন্দু এই পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইয়াছি এবং তাহাকে অভি-নন্দন জানাইয়াছি। কিন্তু আমার মনে একটা আক্ষেপ থাকিয়া গিয়াছে। কর্মজীবনে আমাদের কক্ষপথ খুব বিভিন্ন হইলেও আমাদের মধ্যে আন্তরিক সংযোগ থাকিয়া গিয়াছে। বেশ কয়েক বছর আগে অমলেন্দু সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কে ইংরেজিতে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল। যতদূর মনে আছে ঐ প্রবন্ধসমষ্টি প্রথিতযশা সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ আই. এ. রিচার্ডসকে পাঠাইয়াছিল এবং রিচার্ডসের অনুকূল মন্তব্যও আমাকে দেখাইয়াছিল। এমন তাৎপর্যপূর্ণ লেখা আমি খুব কম পড়িয়াছি। এখন লেখাগুলির সারাংশ ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমি যে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম তাহা বেশ মনে আছে এবং অমলেন্দুর অন্য দিকের সাফল্য যত বেশিই হউক, আমার মনে হয়, যদি সে একাগ্রচিত্তে সাহিত্যতত্ত্ব-চর্চায় মনোনিবেশ করিত তাহা হইলে সে এমন কিছু করিতে পারিত, বিবুধজন যাহে আনন্দে করিত পান সুধা নিরবধি।

অমলেন্দুর পরে যে-সকল ছাত্রছাত্রী আমার আমলে ইংরেজি পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে কেতকী কুশারি। সে এখানে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায় এবং অক্সফোর্ডেও প্রথম শ্রেণীতে পাস করে। অক্সফোর্ডের প্রথম শ্রেণীর অনার্স একসময়ে দুর্লভ সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন আরও দুই-চারজন পাইতে থাকায় ইহার অভিনবত্ব কমিয়া গিয়াছে : যদিও মর্যাদা কমে নাই। আমি অক্সফোর্ডে পড়ি নাই। সুতরাং

আমার সমালোচনা প্রাংশুলভ্যে দ্রাক্ষার প্রতি শৃগালের ঔদাসীন্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবু আমি স্বীকার করি, কেতকীকে আমি অন্য পাঁচজন ভাল ছাত্রের মধ্যে একজন বলিয়াই মনে করিতাম ; তদধিক খাতির করি নাই। বরং আমি ও তারকনাথ সেন উভয়েই মনে করিতাম—সুরজিৎ সেন ইংরেজিতে তাহার অপেক্ষা ভাল, আর সুরজিৎ কেতকীর সঙ্গেই পরীক্ষা দিয়া অক্সফোর্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করিয়াছে। আমার উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়াছি। আবার বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে চলিয়া আসিব। কেতকী দেশে ফিরিয়া যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন কাজ করিয়াছিল। ১৯৬৪ সালে শেক্সপীয়রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আমরা 'A Book of Homage' নামে একটা প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ করি। তন্মধ্যে কেতকী খুব একটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিল শেক্সপীয়রের রচনাশৈলী-সম্পর্কে। কিন্তু পরে সে ইংরেজি ছাড়িয়া ইতিহাসের দিকে ঝুঁকিয়াছে ; শুনিয়াছি, অক্সফোর্ডে ইতিহাসে ডক্টরেট করিয়াছে। সে একখানা ভাল বই লিখিয়াছে—'A Various Universe'। ইহা আমি দেখিয়াছি। ইহার সর্বত্র বুদ্ধিদীপ্ত সম্পাদনার পরিচয় আছে কিন্তু মনে হয়, সেও সাহিত্য—ইংরেজি সাহিত্য—ছাড়িয়া ইতিহাসের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কেতকী অপেক্ষা অল্প ছোট একটি মেয়েকে মনে আছে—তাহার নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী। সেও কেতকীর মত বি-এ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বিদেশযাত্রা করে। সে বোধ হয় কেম্ব্রিজের ডক্টর হইয়াছে। ইহারা উভয়েই বিদেশিনী, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ স্বামীর স্ত্রী। যতদূর জানি, গায়ত্রী আমেরিকায় Comparative Literature-এর অধ্যাপিকা। Comparative Literature-বিষয়টি হয়ত খুব ভাল বিষয়, কিন্তু ইহা English Literature নয়। অথচ কেতকী ও গায়ত্রী উভয়েরই যোগ্যতা ছিল এবং প্রচুর সুযোগও ছিল, কিন্তু উভয়েই ইংরেজি সাহিত্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

এই সময়ের আর একজন ছাত্র খ্যাতিমান হইয়াছে—অরুণকুমার দাশগুপ্ত। সে একাগ্র-মনে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা করে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া যশস্বী হইয়াছে। নানা কারণে তাহার কাজে অনেক বাধাবিঘ্ন আসে। সে যে এইসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতটা লেখাপড়া করিতেছে, ইহা তাহার পক্ষে শ্লাঘার এবং আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় ; কিন্তু আমি তাহার সেমিনার প্রভৃতি বক্তৃতা শুনিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে তাহার গবেষণাও ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশ ও পটভূমিকে আশ্রয় করিতে চায়। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরীক্ষা করিয়াছি, তন্মধ্যে কখনও কখনও খুব মেধাবী পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রও দেখিয়াছি কিন্তু লেখকদের নাম জানি না। আমার ক্লাসের ছাত্র নয়, পরীক্ষাপত্রে উত্তরের উৎকর্ষের দ্বারা মুগ্ধ হইয়াই আপনার করিয়া লইয়াছি, এইরকম দুইজন ছাত্র স্মরণীয়—জ্যোতিঃভূষণ ভট্টাচার্য ও ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিঃ এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিল ; আমি ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একই পত্রের পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উভয়েই সমভাবে—নম্বরের দিক দিয়া শ্রীকুমারবাবু আমার চেয়ে বেশি—মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জ্যোতির রোগ হইল রাজনীতি ; সে নিজেও হয়ত এখন এই বর্ণনায় আপত্তি করিবে না, কারণ পর পর দুইবার মন্ত্রী হইয়া এখন সে রাজনীতি ত্যাগ করিয়াছে অথবা রাজনীতি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমি সব সময়ই তাহাকে রাজনীতি হইতে টানিয়া ইংরেজি সাহিত্য-চর্চায় নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সফল হই নাই। শিক্ষক হিসাবে সে খুব সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে ; ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়।

সে ইংরেজি সাহিত্য-সম্পর্কে ছোট ছোট দুই-একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহা কৌতূহল উদ্রেক করে—পরিতৃপ্তি দেয় না।

ভবতোষ এম-এ পাস করিয়া আমার তত্ত্বাবধানে কবি য়েট্স্-সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পি-এচ. ডি. হয়। আমার তত্ত্বাবধান সামান্য। কাব্য পড়াইতে পড়াইতে আমার মনে হইয়াছিল --কি মনে হইয়াছিল তাহাও বহুদিনের চর্চার অভাবে একটু অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে— যে য়েট্সের প্রথম যুগের ও শেষের যুগের কবিতার মধ্যে যে বৈষম্য সমালোচকেরা দেখিতে পান তাহা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নহে ; এই পরিবর্তনকে পরিণতি বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমার দেওয়া খুব অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে ভিত্তি করিয়া সে খুব সুন্দর একটি নিবন্ধ রচনা করে এবং পি-এচ. ডি. পায়। তারপর সে নানা জায়গায় কাজ করিয়াছে এবং কীটসের উপর একখানি বই লিখিয়া ডি.লিট উপাধি পাইয়াছে। এই গ্রন্থ আমি পড়িয়াছি। আমার মনে হয় যে সে যেন সাহিত্যচর্চা বা রসবোধের রাজপথ ছাড়িয়া মনোবিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং কবির কাব্য অপেক্ষা কবি বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে। ভবতোষই আমাকে পরিচয় করাইয়া দেয় তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ একজন গবেষণার্থীকে-- --ইহার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী। জগন্নাথ মরিসের কবিতা-সম্পর্কে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু কাজটা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কয়েক বছর পর আমি যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিলে সে আমারই তত্ত্বাবধানে হ্যামলেট-সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করে ; তাহা এই বহুবিতর্কিত, বহু-আলোচিত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদেশী সমালোচকেরাও ইহার উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু জগন্নাথও ইংরেজি সাহিত্যের কাজে টিঁকিয়া থাকে নাই। সে বাংলায় গবেষণা করিয়া ডি.লিট হইয়াছে এবং এখন বাংলার প্রামাণ্য অতিকায় অভিধান রচনায় ব্যাপৃত আছে। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে শৈলেন্দ্র-কুমার সেনের কথা বলিয়াছি ; সেও শেক্সপীয়র-সম্পর্কে দুই-চারটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে—যাহা বিদগ্ধসমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

কলিকাতার বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অনেক থীসিস দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে দুই-একটি বেশ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া মনে পড়ে বার্ণার্ড শ'য়ের সাহিত্য সমালোচনা-সম্পর্কে বৃন্দাবনবিহারী অগ্নিহোত্রীর এবং টি. এস. এলিয়টের সমালোচনার উপর বি. ভি. রামিয়ার। উভয় নিবন্ধই মৌলিকতায় ভাস্বর, কিন্তু অগ্নিহোত্রীর নিবন্ধ মুদ্রিতই হয় নাই। রামিয়ার উৎকৃষ্ট নিবন্ধটির মুদ্রণ, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি এত নিকৃষ্ট যে তাহা সুধীসমাজে পরিবেশন করা যায় না। ভারতবর্ষের বাহিরে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন যেমন নাগরাজন ও আমাদের ছাত্র হীরেন গোঁহাই—তাঁহারাও বেশিদূর অগ্রসর হয়েন নাই। প্রবীণদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে অধ্যাপক কণ্টক সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সঙ্গে মৌখিক আলাপ বেশি হয় নাই, কিন্তু লেখাপড়ার দিক হইতে বেশ সংযোগ ছিল। যতদূর জানি, তিনি কর্ণাটকের লোক, কিন্তু কাজ করিতেন বরোদায়। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের ফলে তিনি হয়ত গুজরাটিদের মধ্যে তেমন স্বস্তিবোধ করেন নাই ; কারণ, দেখিয়াছি তিনি বরোদা হইতে শিমলা, শিমলা হইতে হায়দ্রাবাদ—এইভাবে নানা জায়গায় পরিক্রমা করিয়াছেন। অতি আধুনিকদের মধ্যে সুকান্ত চৌধুরীর অভ্যাগম অভিনন্দনযোগ্য।

৩

আমাদের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। ম্যাথু আর্নল্ড বলিয়াছেন যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে হইলে যথাযোগ্য ক্রিটিক্যাল পরিবেশে [illegible] রচিত

হইতে হইবে ; আর্নল্ড অবশ্য ক্রিটিসিজম্ বলিতে সাহিত্য-সমালোচনার কথা বলেন নাই। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বাহিরে যে প্রবন্ধজাতীয় সাহিত্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উৎকর্ষের দ্বারা—হয়ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উদ্ভবের জন্য—স্বতন্ত্র মূল্যায়নশক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই বহুভাষাভাষী বিরাট ভূখণ্ড যদি ঐক্য বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে ইংরেজিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হইবে এবং আমাদিগকে ভালমন্দ বিচারবোধের অধিকারী হইতে হইবে অর্থাৎ নিজস্ব মূল্যবোধের ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর হিন্দীপ্রচারের ফলে ইংরেজি সম্বন্ধে হীনমন্যতা আসিয়া গিয়াছে। আমাদের আমলে যে হীনতাবোধ ছিল, তাহা সোজা সরল প্রজার রাজভাষা ব্যবহারে সংকোচ—simple inferiority। এখনকার হীনমন্যতাকে বলা যাইতে পারে ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স—পাছে হিন্দীর প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভক্তির অভাব হয়, সেই ভয়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সুবক্তা, বহুশ্রুত দর্শনানুরাগী লোক ; তবে তাঁহার সূক্ষ্ম দার্শনিক বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার প্রতিপত্তির প্রধান কারণ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা। ১৯৬৪ সালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষকদের সর্বভারতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এই সময় একটা শুভেচ্ছাবাণীর জন্য তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণকে প্রার্থনা করা হয়। শুভেচ্ছাবাণী দেওয়া রাষ্ট্রপতির একটা নিয়মিত কাজ ; তিনি যেখানে সেখানে শুভেচ্ছাবাণী বিতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া শুভেচ্ছাবাণী পাঠাইতে রাষ্ট্রপতি রাজি হইলেন না। আমি অনুমান করি যে তেলেগু ভাষাভাষী দক্ষিণ ভারতীয় প্রেসিডেন্ট হিন্দীর প্রবক্তাদিগকে চটাইতে ভয় পাইলেন বলিয়াই এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদগ্ধজনসভার সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিলেন না।

ইহার বছর-কয়েক পরের কথা বলিতেছি। ভ্যানকুভারে প্রথম বিশ্ব শেক্সপীয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইল। আমি এই কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক কর্মসমিতির সদস্য ছিলাম। ইহার বিশ্বজোড়া প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসাবে অধ্যাপক লেনাম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে এই কংগ্রেসের কর্মসূচি আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে দুই-চারজন ডেলিগেট পাঠাইবার কথা উঠে। আমার ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকার—কোন সরকারের সঙ্গেই যোগাযোগ নাই। সুতরাং আমি কিছু করিতে পারিলাম না। লেনাম সাহেব এখান হইতেই ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখিলেন এবং ভারত সরকারের সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায় দিল্লী গেলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। রাধাকৃষ্ণণ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের জন্য খ্যাত। তিনি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো ছিলেন। শত্রুমিত্র কেহই ইন্দিরা গান্ধীকে পাণ্ডিত্যের অপবাদ দিবে না ; তবু তিনি শেক্সপীয়রের প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এমন কথাও কেহ বলিবে না। কিন্তু তিনি ও তাঁহার সরকার বিশ্ব-শেক্সপীয়র কংগ্রেসের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করিলেন না। আর হিন্দী প্রচারের জন্য ব্যয়ের পর্বত-প্রমাণ আকার ও আয়তনের কথা ভাবুন।

আমাদের দেশের ইংরেজিবিরোধীরা কেহ কেহ জাপানের তুলনা দেন। জাপান ইংরেজি না জানিয়া বিজ্ঞানে ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। আমরা কেন পারিব না? তুলনাটা অনেক দিক দিয়াই অনুপযোগী। প্রথম ও প্রধান পার্থক্য এই যে জাপান আমাদের দেশের মত বহু ভাষাভাষী দেশ নহে ; সেখানে নিশ্চয়ই ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিভাগও হয় নাই। আর দুই-একটি কথা বলিব। যে আন্তর্জাতিক শেক্সপীয়র কংগ্রেসের জন্য ভারত সরকার একটি ডেলিগেটের ভাড়া ও ভাতা দিতে রাজি হন নাই, তাহার যুগ্ম উদ্যোক্তা ছিলেন আমেরিকার শেক্সপীয়র অ্যাসোসিয়েশন ও জাপানের শেক্সপীয়র অ্যাসোসিয়েশন। আমি নামজাদা লেখক নই, সুতরাং দেশী-বিদেশী কোনও লেখকসমাজের সঙ্গে আমার মেলামেশা হয় নাই। তবু

কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মুদ্রিত রচনা আমাকে উপহার দিয়া থাকেন ; জাপান হইতে কখনও কখনও দুই-চারিটি ইংরেজি প্রবন্ধ ও পত্রিকা পাইয়াছি। এইসকল রচনার গুণগত উৎকর্ষে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি।

আমাদের এই দুর্বলতা ইংরেজরাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন নিজেদের স্বার্থে, রাজার ভাষা প্রজারা অবশ্যই শিখিবে। সেই ভাষায় রাজার জাতির অধিকার প্রজারা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইবে এবং প্রজারা কখনও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিবে না, বিশুদ্ধ রচনা করিতে পারিবে না—ইহাও প্রজাপুঞ্জের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু ইহার কোনটাই স্বতঃসিদ্ধ নয়। খাঁটি ইংলিশম্যানরা মনে করিতেন যে, যে স্যার ওয়ালটার স্কট্‌কে এক সময়ে শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করা হইত, তিনি 'shall' ও 'will'-এর প্রয়োগ করিতে ভুল করিয়াছেন। আমরা কালা আদমী লালমুখের ইংরেজির বিশুদ্ধতা মানিয়া লইয়াছিলাম এবং ইংরেজরা আমাদের ইংরেজিকে 'Babu English' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও বেসুরো আওয়াজও শোনা যাইত। এক সময়ে (১৮৮৩—১৮৯৯) প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন ফে. জে. রো.। তিনি ওয়েব সাহেবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইংরেজি গ্রামার, ইডিয়ম, মোটকথা শুদ্ধি-অশুদ্ধি-সম্পর্কে একটা বই লিখিয়াছিলেন—যাহার পুরো নাম বোধ হয় ছিল 'Hints on the Study of English', কিন্তু সাধারণ্যে ইহা 'Rowe's Hints' বলিয়া পরিচিত ছিল। স্কুলে পড়ার সময় আমরা এই বই খুব পড়িয়াছি। ইংরেজির অন্যান্য ক্ষেত্রেও রো সাহেবের বই ছিল—যেমন শেক্সপীয়র, টেনিসন, বেকন প্রভৃতির সটীক সংস্করণ বা রূপান্তর। সাহেবের মেজাজও ছিল খুব রাজকীয়। কালাসাহেব পার্সিভেলকে তিনি ঈর্ষা করিতেন। ইহার অপেক্ষাও তীব্রতর গাত্রদাহের কারণ হইলেন কালাআদমী লালবিহারী দে—ইনি ক্রীশ্চান হইলেও ইঁহার মাতৃভাষা বাংলা। অথচ তিনি গোবিন্দ সামন্ত-সম্পর্কে যে মৌলিক ইংরেজি উপন্যাস লিখিলেন, তাহা বিলাতী সুধীসমাজে সমাদৃত হইল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটা প্রবন্ধে পড়িয়াছি, যে রো সাহেব তাঁহার গ্রন্থে অশুদ্ধ ইংরেজি বাক্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে লালবিহারী দের রচনা হইতে বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। লালবিহারীও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনিও রো সাহেবের বই হইতে অনেক ভুলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, এইজাতীয় অবিশুদ্ধ ইংরেজি যাঁহারা লিখেন, তাঁহাদের হাতে আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত কিনা। বাস্তবিকপক্ষে রো সাহেব—ইঁহার অধিকাংশ লেখাই আমি পড়িয়াছি—এমন কিছুই লিখেন নাই যাহা ভাষা ও ভাবসম্পদে লালবিহারী দের 'Bengal Peasant Life' বা 'Folk Tales of Bengal'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত আমেরিকানরা ইংরেজি সাহিত্যে জাতে উঠে নাই। এমার্সন, অলিভার ওয়েন্ডওয়েল হোমস, এডগার অ্যালান পোয়ে—ইঁহারা স্বীকৃতি পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের মনোভাব ছিল যে ইঁহারা ব্যতিক্রম। প্রখ্যাত ইংরেজি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গলস্‌ওয়ার্দি 'The Little Man' নাটিকায় আমেরিকানদের ভাষাকে ইংরেজি হইতে পৃথক ভাষা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু আমাদের নিজস্ব বিচারবোধ গড়িয়া উঠে নাই, আমরাও সাহেবদের এই ঔদাসীন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছি। ১৯২৯ সালে আমার ছাত্র শংকরনাথ মৈত্র একটা রচনায় লিখিয়াছিল, 'Walt Whitman the only poet who is American...'; বক্তব্য কথা ও বলিবার ভঙ্গি উভয়ই অবিস্মরণীয়। কিন্তু আজ শংকর ঠিক এই কথা বলিবে কি? শুধু অর্থবলে নয়, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মূল্যায়নশক্তি লাভ করিয়াই আমেরিকানরা এইভাবে নিজেদের সৃষ্টি ও সমালোচনাকে স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যদি ভারতবর্ষ ঐক্য বজায় রাখিতে চায়

তবে বর্তমানের ত্রিশংকুভাব কাটাইয়া উঠিতে হইবে, মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় কাঠের ঘোড়াকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে অর্থাৎ হিন্দীকে প্রাদেশিক ভাষার অধিক মর্যাদা দেওয়া হইবে না, ইংরেজিকে সর্বভারতীয় ভাষা বলিয়া মানিতে হইবে। প্রাথমিক স্তর হইতে উহা প্রধান ভাষা হইবে বা ইহা শিক্ষার মাধ্যম হইবে, আমি এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইংরেজিকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার ফলে মাতৃভাষারও উন্নতি হইবে। আমি ক্ষুদ্র লেখক। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে বেশ কিছুকাল একাগ্র-ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র পড়ার ফলে আমার ইংরেজি রচনাশৈলীর প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। অপর দিকে একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে যখন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলংকারের প্রভাবমুক্ত হইয়া বাংলা গদ্য ইংরেজি-জানা বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতির হাতে পড়িল, তখনই সে স্বচ্ছ সাবলীল পদবিন্যাসরীতির সন্ধান পাইল।

৪

স্বাধীন ভারতে যে চৌদ্দ বৎসর—প্রেসিডেন্সী কলেজে তিন দফা চাকুরীর ইহাই শেষ দফা—চাকুরী করিলাম, ইহার মধ্যে পুরানো আমলের সহকর্মীরা, যেমন—সুশোভন সরকার, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ সেন প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। নূতনদের মধ্যে অনেক পুরাতন মুখও দেখিলাম—যেমন আব্দুল ওয়াহাব মাহমুদ, ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, সরোজবন্ধু সান্যাল, জনার্দন চক্রবর্তী, শশাঙ্ক বাগচী। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে চাটগাঁ ও রাজশাহীতে কাজ করিয়াছিলাম। এই নূতন আমলে দেখিলাম প্রেসিডেন্সী কলেজ তাহার পূর্বের মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং মনে হয় কোন কোন দিকে মানের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একটা কারণ ছিল যে বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার প্রধান সহচর—ইঁহারা এই কলেজের সংবাদ রাখিতেন না, ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতেন না, ছাত্র হিসাবে তাঁহারা এখানে পড়েন নাই বা পড়িবার যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল না। সরীসৃপ মহাশয় সুশোভন সরকার, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখকে একটু ক্ষতি করিতে পারিলেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আর পশ্চিমবঙ্গের 'রূপকার' নূতন কিছু করিতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। মানোন্নতির আর একটা কারণ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে শুধু পাসকোর্সের পাঠ একেবারে তুলিয়া দেওয়া। অনেক বাহিরের ঘটনা এই সর্বথাকাম্য পরিণতির দিকে কলেজকে অগ্রসর করিতেছিল। যদি কোন একজন লোক এই অগ্রগতির জন্য কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন, তিনি অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ। এই পরিণতির ফলেই আমার মনে হইত প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য অন্যরূপ পাঠ্যক্রম ও স্বতন্ত্র পরীক্ষাব্যবস্থা চালু করা উচিত হইবে কিনা। অবশ্য এই-জাতীয় ভাবনা আরও অনেকের মনে উদ্রিক্ত হইয়া থাকিবে। ইহারই ফলশ্রুতি গণি কমিটির অটোনমাস বা স্বয়ংশাসিত কলেজ-সম্পর্কে প্রস্তাব। এখন অবশ্য 'সমতা', 'আভিজাত্যবিরোধ' (অ্যান্টি-এলিটিজ্‌ম্‌) প্রভৃতির যুগে উচ্চতর শিক্ষা প্রভৃতির কথা তোলাই বিড়ম্বনা। আমার মনে হয়, যে দেশে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল গত হইলেও সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ত্রিশের বেশি নয়, সেখানে পরিপূর্ণ সমতা আনা অসম্ভব নয়। যদি প্রাইমারি হইতে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সমস্ত স্কুল-কলেজ তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কেমন হয় ? এইজাতীয় প্রস্তাব অনেক পূর্বে শেক্সপীয়রের নাটকে বিপ্লবী বীর জ্যাক কেড করিয়া-ছিলেন। তিনি শুধু সাক্ষরতার অপরাধেই একজন লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন (2 *King Henry* VI ; iv ii).

পরিহাস ছাড়িয়া দিয়া আমার কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক। এই সময়ে যে-সকল

সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাণ্ডিত্য ও শিক্ষকতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত রাজশাহীতে যে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহা সমধিক পরিস্ফুট হয়। তাঁহার ঠাণ্ডা মেজাজ, সুবিবেচনা, তীক্ষ্ম বুদ্ধি কলেজের বৃহত্তর প্রশাসনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইত। আর্টস বিভাগে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি ইকনমিক্সের ভবতোষ দত্তের মধ্যে। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম অধ্যাপক হইয়া প্রবেশ করি তখন ইহাদের ক্লাসে আমি পড়াই নাই ; আমাকে ইহাদের ইংরেজির পরীক্ষার খাতা দেখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য ভাল ছাত্রদের মত সেও আমার নজরে আসিয়াছিল এবং পরের বছর সে কলেজ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ায় তাহার সঙ্গে দেখাশোনা হইত। কিন্তু তখন তাহার মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু দেখি নাই। কর্মজীবনে তাহার খুব কাছে আসিয়া তাহার সূক্ষ্মবুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য ও রসবোধের পরিচয় পাইয়া আমি খুব মুগ্ধ হই। সে এম-এ পাস করিয়া কিছুকাল রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে চাকুরী করিয়া লণ্ডন হইতে পি-এচ. ডি. হয়। ইকনমিক্স আজকাল আর্টসের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান ইহাকে তাহার দখলে আনিয়াছে। ইহার আধুনিক প্রবক্তাদের বুলি শুনিয়া মনে হয় ইহা শীঘ্রই occult সায়েন্স বা গূঢ়ার্থ পরাবিদ্যার অঙ্গ হইবে। অতি আধুনিকদেব তুলনায় ভবতোষ দত্ত বোধ হয় একটু সেকেলে ; তাহার বুদ্ধি স্বচ্ছ, ভাষা প্রাঞ্জল ; কাজেই তাহার এই শাস্ত্রব্যাখ্যা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। সে কিছুকাল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে বড় কাজ করিয়াছে এবং নানা দেশ ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। তাহার মনের ও চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ সরসতা। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহু দেশ ঘুরিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেও কাছের শিশিরবিন্দুগুলির মাধুর্য তাহার কাছে অম্লান রহিয়া গিয়াছে। আমি কলেজ ছাড়ার বছর চারেক আগে ফিজিক্স বিভাগে একজন অধ্যাপক আসেন—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নহেন বলিয়া আমি পূর্বে তাঁহার পরিচয় জানিতাম না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ্মবুদ্ধি ও আলাপ-আলোচনায় দক্ষতার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অধ্যাপক ঘোষাল বোধ হয় আমেরিকায় গবেষণা করিয়াছিলেন, কারণ ও-দেশ হইতে প্রত্যাগত অনেক ভারতীয়দের মুখে শুনিয়াছি যে ওখানকার পদার্থবিদ্‌মহলে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সুদীর্ঘ সম্পর্কে আরও অনেক শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে যাঁহারা কোন-না-কোনভাবে বরণীয়। শুধু বিশেষ স্মবণীয় কয়েকজনের কথা লিখিলাম।

যিনি আমার মতে সবচেয়ে অর্হণীয় তিনি কিন্তু একেবারেই আটপৌরে লোক এবং তিনি আমার মনে রেখাপাত করিয়াছেন অধ্যাপক হিসাবে নয়, অধ্যক্ষ হিসাবে। ইঁহার নাম সনৎকুমার বসু। ইঁহার এদেশীয় রেকর্ড খুব সাধারণ—বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ। পূর্বে—ডি. এন. মল্লিক, সারদাপ্রসন্ন দাস প্রভৃতির আমলে—বিশুদ্ধ গণিত প্রেসিডেন্সী কলেজে অনেকটা অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা জাতে ওঠে এবং স্থির হয়, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সিনিয়র সার্ভিসের একটি পদে বিশুদ্ধ গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতেও একটি পদ খালি হয়। আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক সনৎকুমার বসু তখন লণ্ডন হইতে পি-এচ. ডি. হইয়া ফিরিয়াছেন ; তিনি দুইটির জন্যই দরখাস্ত করেন। বলা যাইতে পারে এটা কাঁচা কাজ ; কারণ এইজাতীয় প্রার্থনায় প্রার্থী দ্বিতীয়টিই পান। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সনৎবাবু প্রথম শ্রেণীতেই নিযুক্ত হইলেন। বিশুদ্ধ গণিতে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি দুর্লভ বলিয়াই সনৎবাবুকে এই পদে

নিযুক্ত করা হইল। সনৎবাবু লন্ডন হইতে ডক্টরেট করিয়াছিলেন, চাকুরীতে থাকাকালেও একবার বছর-দুয়েক গবেষণার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়াছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়াও গণিতের গবেষণাবৃত্তি লইয়া সপরিবারে আমেরিকায় যান এবং সেখানেই হার্টফেল করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। এই-সমস্ত সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করিব প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার তেমন খ্যাতি ছিল না এবং তাঁহার গবেষণার সারবত্তা-সম্পর্কেও কোন কথা কোন গণিতজ্ঞের কাছে শুনি নাই। সনৎ বসুর অনন্যতার পরিচয় পাইলাম অন্যভাবে।

সনৎবাবু যে প্রথমেই সিনিয়র সার্ভিসে চাকুরী পাইয়াছিলেন, সেই কারণে চাকুরীতে তিনি খুব উঁচুতে উঠিয়া গেলেন এবং পেরেরা সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন। আমি তখন অবসর লইয়া পুনর্নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছিলাম। সেই সময় কোন সমস্যা দেখা দিলে সনৎবাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। তাহার মধ্যেও কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তাঁহার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই আমার অবসর-গ্রহণের অনেক পরে। অনেক সময় সংকটের মধ্যে মানুষের সুপ্ত অসাধারণত্ব স্ফুরিত হইয়া উঠে। জনরব আছে যে ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ সুগম করার জন্যই কামরাজ প্ল্যান চালু করিয়া মন্ত্রী-ছাঁটাই করা হইয়াছিল। ছোটখাট নিরীহ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দিক হইতে বিপদের কোন আশংকা নাই মনে করিয়া জহরলাল তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু কালক্রমে এই সাদাসিধে লোকটিই প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সংকটকালে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিলেন। অধিকন্তু কলুষিত রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় সাধুতার খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। আমি অন্যত্র লিখিয়াছি—এবং এখন দেখিতেছি তারকনাথ সেনও লিখিয়া গিয়াছে—জেমস সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজের শ্রেষ্ঠ প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু সংকটকালে সেই সুপণ্ডিত, পরিকল্পনায় নিপুণ, প্রশাসনে দক্ষ প্রিন্সিপ্যাল টাল সামলাইতে পারেন নাই। ওটেনকে লইয়া যে বিপর্যয় হইয়াছিল ইহা তাঁহার পূর্বাহ্ণেই থামাইয়া দেওয়া উচিত ছিল এবং পরেও তিনি ইহার সুরাহা করিতে পারেন নাই। আরও পরে, কূটবুদ্ধি চক্রান্তকারী আশুতোষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এই আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্ সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন। তাঁহার জায়গায় যিনি আসিলেন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব—তিনি তো কলেজের মস্তকচ্ছেদনে রাজি হইয়া স্বীয় মস্তক রক্ষা করিলেন। ব্যারো সাহেব যোগ্য লোক, কিন্তু সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের স্বরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। স্বদেশী প্রিন্সিপ্যালদের মধ্যে ভূপতিমোহন সেন ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সমধিক প্রসিদ্ধ। সংকটমোচন করা তো দূরের কথা, একজন ছেলেকে পরীক্ষা দিতে পাঠান হইবে কিনা এই সামান্য ব্যাপার লইয়া (স্থায়ী) প্রিন্সিপ্যাল ভূপতি সেন ও (অস্থায়ী) প্রিন্সিপ্যাল প্রশান্ত মহলানবীশ এমন তুলকালাম কাণ্ড করিলেন, যাহা হাস্যকরও বটে এবং লজ্জাকরও বটে। যাঁহারা নিজেরা এইভাবে সংকট সৃষ্টি করিতে পারেন তাঁহারা কোন্ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারেন ?

দেশবিভাগ মানিয়া লইয়া কংগ্রেসদল কর্তৃত্ব পাইল এবং কংগ্রেসের রাজত্ব অব্যাহত রহিল। যদিও কমিউনিস্টরা মিছিল মিটিং করিত, তবু কংগ্রেসের রাজত্বের অবসান ঘটিবে, ইহা কেহ ভাবে নাই। প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে বেশকিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মার্কসিস্ট যুবক প্রেসিডেন্সী কলেজে খুব হাঙ্গামা বাধায়, তাহারা নাকি অশোভন আচরণ করে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। আমি এইসব কথা শুনিতাম, এবং একদিন নিজে ইহার আভাস পাইয়াছিলাম। আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন বা প্রাক্তনীর কোন বিশিষ্ট সভ্যের মৃত্যুতে শোকসভা করিতে

কলেজে গিয়াছিলাম। একজন পুলিশ অফিসার আমাদিগকে দাঁড়াইয়া দুই মিনিটে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি কলেজের সীমানা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। আমরা সেই পরামর্শ শিরোধার্য করিলাম, কারণ সেই দিনই নাকি একটা হামলা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং এইরূপ নাকি প্রায়ই হইত। এই অভাবনীয় বিশৃংখলার মধ্যে সরকার নিষ্ক্রিয়। এইরূপ বলাবলি শুনিতাম যে শিক্ষামন্ত্রী—কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—আশ্বাস দিয়াছেন যে আসন্ন ইলেকশন চুকিয়া গেলে তাঁহারা কঠোরহস্তে ঐ নৈরাজ্য দমন করিবেন। বিরোধীরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরাও তাহাই মনে করিলেন। কমিউনিস্টরা আমাকে ধরিলেন, যে আমি কলেজের গোলযোগের একটা ফয়সালা করিয়া দিই। এইসব ব্যাপারে যাঁহাদের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজনের নাম করিব—ডাক্তার মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, কারণ সে আমার অনুজপ্রতিম এবং সেই কারণেই বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন উঠে না। কমিউনিস্ট পার্টি তখন দুই শিবিরে বিভক্ত, কিন্তু মণির সঙ্গে দুই শিবিরের নেতাদের মেলামেশা দেখিয়াছি। কলেজের হৈহল্লার সংবাদ আমি পূর্বেও শুনিয়াছি আর প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যাপারে আমার সহযোগিতা চাওয়া হইলে আমি সব সময়েই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত থাকিয়াছি।

যাহারা কলেজে হামলা করিয়াছিল তাহারা মার্কসপন্থী বটে, কিন্তু সি. পি. আই. বা সি. পি. আই. (এম)—ইহাদের কোন দলের সঙ্গেই এই নবীনদের জ্ঞাতিত্ব ছিল না। অল্প কিছুদিন পরই দেখা গেল ইহারা এক নূতন দলের সভ্য—যাহার নাম সি. পি. আই. (এম. এল.)। ইহারও নাকি এখন নানা উপদল হইয়াছে। যাহা হউক, রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমি ইহা বলিতে পারি যে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য-সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দও অবহিত ছিলেন না। আমি প্রথম অনুরোধ পাওয়ার এবং সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার পর একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার পর সাম্যবাদী ছাত্রবন্ধুরা সক্রিয় হইতে বাধ্য হইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের সরকার নিষ্ক্রিয় থাকিলেও অধ্যক্ষ সনৎ বসু চুপ করিয়া থাকিলেন না। সংকটমুহূর্তে এই নিরীহ আপাততুচ্ছ লোকটির দৃঢ়তা ও সাহস প্রকট হইল। কলেজের কয়েকজন ছাত্র ক্লাসে, বারান্দায়, গেটে, লনে—সর্বত্র উচ্ছৃংখল, দুর্বিনীত ব্যবহার করিয়াছে। কলেজের আভ্যন্তরীণ শৃংখলারক্ষার জন্য তিনিই দায়ী। গভর্নিং বডির মিটিং ডাকিয়া তিনি ইহাদের দণ্ডবিধান করিলেন। প্রধান দণ্ড হইল —কয়েকজন বড় অপরাধীর কলেজ হইতে বহিষ্কার।

এইবার নেতৃবৃন্দের টনক নড়িল ; তাঁহারা আশংকা করিয়া থাকিবেন ইহা শাস্তির প্রথম কিস্তি। ইলেকশন জিতিয়া সরকার আরও মারমুখী হইবেন। আর ছাত্রনেতাদের এই বহিষ্কার বা expulsion—ইহারও গুরুত্ব কম নয়। মণি আমাকে ফোন করিয়া বলিল, রাত্রি আটটায় জনৈকা ভদ্রমহিলার বাড়িতে ছাত্রেরা উপস্থিত থাকিবে, আমি যেন সেখানে যাই আর সে তো থাকিবেই। ওখানে যাইয়া দেখি, আগন্তুকদের মধ্যে আমিই প্রথম, তারপর আসিল কলেজের বিজ্ঞানের একজন ছাত্র, আর তারপর মণি। ইহার পর যাহাদের শুভাগমন হইল তাহাদের দেখিয়া আমি একটু হতচকিত হইলাম। ইহাদের বয়স ত্রিশের মত হইবে বলিয়া মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহারা তখন কোন কলেজের ছাত্র নহে : দুই-একজন বলিল, ইহাদের ল' কলেজে নাম আছে। আমার ধারণা হইল ইহারা কস্মিনকালেও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে নাই। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম যে আমার প্রত্যাশা ছিল যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইবে। অমনি প্রথম সারির দুইজন বলিয়া উঠিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা তাহাদের অনুগামী, তাহারা যাহা বলিবে ছাত্রগণ তাহাই করিবে ; সুতরাং ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলা

অনাবশ্যক ও অবান্তর। ইহার পর আমি সেই দিন আর উহাদের সঙ্গে কোন বাক্যব্যয় করি নাই। গৃহস্বামিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা মাতার ভঙ্গিতে ঐ নেতাদিগকে বলিলেন যে ছাত্রদিগকে নিঃশর্ত অগমতা স্বীকার করিতে হইবে বা ক্ষমা চাহিতে হইবে ; বারংবার তিনি একটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন—unconditional apology ; মণিও তাঁহার কথারই প্রতিধ্বনি করিল। উপস্থিত ছাত্রনেতারা অবিচলিতভাবে একই উত্তর দিল : সনৎ বসুকে আগাম লিখিয়া দিতে হইবে যে তিনি বহিষ্কার-আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। তারপর সেই দণ্ডাদিষ্ট ছাত্রেরা অ্যাপলজি করিবে। তবে ঐ প্রত্যাহারপত্র পূর্বে তাহাদের হাতে দিতে হইবে না। গৃহস্বামিনী, মণি বিশ্বাস বা তাহাদের বিশ্বাসভাজন লোককে দিলেই হইবে। দুই পক্ষ যখন এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন আমি সভাভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলাম।

দিন-দুই পরে মণি আমাকে ফোন করিয়া বলিল যে ছাত্রদের সঙ্গে তো ব্যবস্থা হইল। এখন আমাদিগকে সনৎ বসুর সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। প্রতিনিধিদলে থাকিব আমরা তিনজন আর দুইজন নাম-করা পলিটিকেল নেতা। আমি বলিলাম, আমাকে লইয়া যাইয়া লাভ নাই : কারণ ছাত্র প্রতিনিধিরা যাহা বলিয়াছে তাহাকে কোন মতেই নিঃশর্ত ক্ষমা-প্রার্থনা বলা যাইতে পারে না। মণি তর্কপ্রিয় লোক ; ফোনে অল্পস্বল্প তর্ক করিবার প্রয়াস করিয়া তর্ক ছাড়িয়া আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। সেই দিনই পরে সেই ভদ্রমহিলা সেই একই অনুরোধ করিলেন এবং আমি সেই একই উত্তর দিলাম এবং উভয়কেই ইহাও বলিয়া দিলাম যে আমাকে লইয়া গেলে তাহাদের অভিযানের পক্ষে সুবিধা হইবে না ; কারণ সেই দিনকার ঘটনার আমি যথাযথ বর্ণনা দিব। মুখে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত ইঁহারা আমাকে ছাড়াই সনৎ বসুর সঙ্গে দেখা করিলেন।

সেই সাক্ষাতের বর্ণনা মণির সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কাছেই পাইলাম। যতদূর মনে আছে মণির কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। মণি বলিল, ডক্টর সনৎ বসু পরমাশ্চর্য লোক। সেই দিন তাঁহার বাড়িতে যাইয়া দেওয়ালে ও দরজায় ছাত্রদের পক্ষাবলম্বীরা এমন সমস্ত অভদ্র—মণি আরও কড়া শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল—কথা লিখিয়াছে ও অশালীন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে যে আগন্তুকরা খুব লজ্জিত বোধ করিলেন। সনৎবাবু একটু পরে ঘরে ঢুকিলেন এবং পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলাপ-আলোচনায় ইঁহারা একটু আধটু ধৈর্যচ্যুতির পরিচয় দিলেও তাঁহার সৌজন্যে কোন ত্রুটি বা শান্ত সহজ কথায় কখনও তীব্রতার লেশ-মাত্র ছিল না। অথচ তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। মণি সনৎবাবুর সৌম্য শান্ত অথচ দৃঢ় আচরণে যেমন মুগ্ধ হইয়াছিল, তেমনি যাহাদের জন্য ওকালতি করিতে গিয়াছিল তাহাদের বিশ্রী আচরণে ক্ষোভ ও লজ্জা প্রকাশ করিল।

ইলেকশনের ফল কিন্তু সকল প্রত্যাশা উলটাইয়া দিল। কংগ্রেস একেবারে হারিয়া গেল এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। এই মন্ত্রিসভার প্রধান হইলেন প্রাক্তন কংগ্রেসী অজয়বাবু, কিন্তু প্রাধান্য পাইলেন নানা রঙের কমিউনিস্টরা। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ন্যস্ত হইল আমার পরম স্নেহভাজন এক মার্ক্সবাদীর হাতে। তাহাকে আমি পরে নিজেই বলিয়াছি কেমন করিয়া আমার সঙ্গে তাহার একটা shadow-boxing হয় এবং এই যুদ্ধে সে পরাস্ত হয়। অবশ্য কৃতিত্ব সবই সনৎ বসুর। মন্ত্রী প্রিন্সিপ্যালকে ডাকাইয়া শান্তির বাণী উচ্চারণ করিলেন ; 'ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ' নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি যেন বিতাড়িত ছাত্রদিগকে ফিরাইয়া লয়েন। আমি সনৎ বসুকে তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের বা মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। তিনি আমাকে বলেন—হয়ত - মণি বিশ্বাসদের ডেপুটেশনকেও বলিয়াছিলেন—যে তাঁহাকে ছাত্রেরা যে

অসম্মান করিয়াছে তাহা তিনি স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু ইহারা কলেজে এমন অসঙ্গত আচরণ করিয়াছে, বিশষতঃ শিক্ষকদের সঙ্গে এমন দুর্বিনীত ব্যবহার করিয়াছে যে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কোন অধ্যাপককে এইসব ছেলেদিগকে ক্লাস গ্রহণ করিতে বলিতে পারেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। সনৎবাবু বলিলেন যে কর্তা তাঁহাকে আবার ডাকাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি সনৎবাবুর নিকট হইতে একটা 'gesture'-এর প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি অন্য বিশেষ কিছু জানি না ; কিন্তু শিক্ষাবিভাগের আইন, আচরণবিধি খুব ভাল আয়ত্ত করিয়াছিলাম। চন্দসাহেব তো একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমারই ডি.পি.আই. অফিসের বড়বাবু হওয়া উচিত! আমি সনৎবাবুকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি মন্ত্রীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহাকে বলিবেন যে গভর্নিং বডির সভায় এই আদেশ স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং আপনার প্রবর্তনায় এই আদেশ রদ করিতে হইলে আবার গভর্নিং বডির সভা ডাকিতে হইবে। সেখানে সভাপতি একজন হাই-কোর্টের জজ ; বেসরকারি লোকও আছেন। তাঁহারা গোলমাল করিতে পারেন, কিন্তু হুজুর লিখিত আদেশ দিলে সরকারি কর্মচারী হিসাবে প্রিন্সিপ্যাল তাহা পালন করিবেন। এই লিখিত আদেশ মন্ত্রী কখনও দিতে পারিবেন না। কলেজের আভ্যন্তরীণ ডিসিপ্লিন-রক্ষার এক্তিয়ার প্রিন্সিপ্যাল ও গভর্নিং বডির। সেই আইন বদল করিতে এমনই সময় লাগে এবং বহু পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় তাহা সহজসাধ্যও নয়।' সনৎবাবু তাহাই বলিয়া-ছিলেন। মন্ত্রীমহাশয়কে একটু দম নিতে হইল। ইহার কিছুদিন পূর্বেই সনৎবাবুকে টপকাইয়া ভবতোষ দত্তকে ডি.পি.আই. করা হইয়াছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে সনৎ বসু আপীলও করিয়াছিলেন। এবার মন্ত্রীমহাশয় তাঁহাকে ডি.পি.আই. করিতে চাহিলেন ; অভিপ্রায় অর্থনীতিবিদ্ ভবতোষ দত্তকে অন্য পদে দিবেন। সনৎবাবু পুনরায় আমার কাছে আসিলেন। আমি এবারও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তিনি কলেজেই থাকিতে চাহেন। সুতরাং মন্ত্রীকে এবারও থামিতে হইল। অল্প-কিছু দিনেই মন্ত্রিসভার কমিউনিস্টপন্থীরা টের পাইলেন, যাহারা প্রেসিডেন্সী কলেজে আন্দোলন করিয়াছিল তাহারা তাঁহাদেরও বিরোধী এবং শুধু বাসী হইয়া যাওয়ার জন্যই তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্নকে আর জিয়াইয়া রাখা সম্ভব নয়। এই মন্ত্রিসভার পর আবার যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হইল, সেই সরকার আরও সংহত মার্কসিস্ট হইলেও সনৎ বসুর সেই অর্ডার বাতিল হয় নাই। ততদিনে বোধ হয় বসুমহাশয় নিজেও অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্পর্কে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি যখন কলেজের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং প্রিন্সিপ্যাল হয়েন তখন সবাই মনে করিয়াছিলেন যে একজন অতি সাধারণ মানুষ কপালগুণে বড় কাজ পাইলেন, কিন্তু যেদিন তিনি চলিয়া গেলেন সেইদিন অন্ততঃ কলেজের ভিতরের লোকেরা অনুভব করিলেন—একটা অসামান্য ব্যক্তিত্বের সাহচর্য হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন এবং নানাভাবে তাঁহারা সশ্রদ্ধ প্রশস্তি জানাইয়াছিলেন।

৫

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকেরা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়াইলে কোন বেতন পাইতেন না। তাঁহাদের পারিশ্রমিককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরোক্ষ অনুদান হিসাবে ধরা হইত। আমার কোন আর্থিক লাভ হইত না, কিন্তু তাহা হইলেও শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে এই মর্যাদাটুকু দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে জমানা বদল হইল। শ্যামাপ্রসাদবাবু দিল্লীতে গেলেন, এদিকে ভাগ্নে দিব্যেন্দুকুমারকে লইয়া কেলেংকারী হইয়া

গেল। তারপর স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের অর্থদপ্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের অপচয়-সম্পর্কে সজাগ হইয়াছে। তাহাকে আর ফ্রিডম ফার্স্ট ফ্রিডম সেকেন্ড বুলি দিয়া থামান যায় না। এইসব ডামাডোলের মধ্যে ইংরেজি বিভাগের ডক্টর সুনীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক ইংরেজি কবিতা পড়াইতেন এবং যেহেতু তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের লোক নহেন তাই তিনি বেতনভুক্ লেকচারার ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য আমাকে সুনীতবাবুর জায়গায় আধুনিক ইংরেজি কবিতা পড়াইতে আহ্বান করেন। আমি তেমন উৎসাহী ছিলাম না ; বিশেষতঃ অন্য কোন কলেজ হইতে কাহাকেও নিয়োগ করিলে সেই অধ্যাপকের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত। মোহিনীমোহন-বাবু বলেন, তখন নূতন সবেতন নিয়োগ করা কঠিন ব্যাপার ; এদিকে আধুনিক ইংরেজি কাব্যের ক্লাস বসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ১৯৪৯—১৯৫০ সালে এম-এ ইংরেজি ক্লাসে আধুনিক কবিতা পড়াইতে লাগিলাম। তারপর আরও অন্যান্য বিষয় পড়াইয়াছি। ঐ সময়েই শেক্সপীয়রের কমেডি-সম্পর্কে আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তাহা বিম্বৎসমাজে কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করে। যাঁহারা সেই গ্রন্থ পড়িয়া আকৃষ্ট হয়েন, তন্মধ্যে ছিলেন আমার এম-এ ক্লাসের শিক্ষক সুহাসচন্দ্র রায়। ১৯৫৫ সালে মোহিনীবাবু অবসর গ্রহণ করিলে সুহাসবাবু অস্থায়ী প্রধান হয়েন। এম-এ'তে শেক্সপীয়র-সম্পর্কে একটি পূর্ণ পত্র নির্ধারিত আছে ; এই পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে শেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটক পাঠ্য থাকে ; কিন্তু প্রথমার্ধের বিষয় হইল শেক্সপীয়রের সামগ্রিক বিচার। সুহাসবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে প্রথমার্ধের বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক ও জটিল ; ইহা পড়াইবার যোগ্যতা আমার আছে এবং একা আমারই আছে। কথাগুলি খুব সরল ; কিন্তু স্বল্পভাষী শিক্ষকের এই প্রশস্তিতে আমি অভিভূত হই। বই লেখা আমার পেশা ও নেশা ; সুতরাং আমি হয়ত অন্য বিষয়ে মন দিতাম। কিন্তু গত পঁচিশ বছর যে বিশেষভাবে শেক্সপীয়র-চর্চায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি তাহার মূলে রহিয়াছে সুহাসবাবুর প্রেরণা এবং ইহারই স্বীকৃতি জানাইতে আমি আমার 'Shakespeare's Historical Plays' গ্রন্থ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি।

এই সময়ই বাংলার প্রধান অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী আমাকে বাংলা বিভাগে সাহিত্যতত্ত্ব পড়াইতে অনুরোধ করেন এবং আমি রাজি হই। শ্রীকুমারবাবু প্রধান থাকিতেই বাংলায় এম-এ'তে পরীক্ষা করিয়াছি ; এখন বিভাগের একজন হইলাম। এখানকার অভিজ্ঞতা বিচিত্র। আমাকে পড়াইতে হইত অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক। প্রথমটির কথাই বেশি করিয়া মনে আছে। সে এক বিচিত্র ব্যাপার! দুই শত ছাত্র ; কিন্তু কোন দিন ক্লাসে একখানার বেশি বই দেখি নাই। এইখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠনের প্রধান দুর্বলতা এবং এই কারণেই বাংলায় এম-এ'দের শিক্ষা সবচেয়ে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহারা ধারাবাহিক-ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বাংলা সাহিত্য পড়ে না এবং সাহিত্যতত্ত্ব-সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে না। সামান্য (general) ও বিশেষ (particular)—কোন দিকেই ইহাদের অধিকার জন্মে না। অবশ্য ইহার গোড়ায় রহিয়াছে আশুতোষের অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা। তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম রচনা করা অসম্ভব, অথচ তিনি নিজে ছাড়া আর কোন উপযুক্ত লোক থাকিতে পারে ইহাও মানিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হইল তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি এবং দীনেশচন্দ্র সেনও বলিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র একবার বলিয়াছেন—সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও বাদ পড়িলেন, কেন বোঝা ভার। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিছু কিছু স্থান পাইয়াছিল। কি লেখা কোথায়

স্থান পাইয়াছিল তাহা দীনেশবাবু বলেন নাই। ইহা শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে ইঁহারা সবাই বাদ গিয়াছিলেন। আশুতোষ নিজের কথাই ভাবিতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অনুমান করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তিনি অন্য কারণে বিরূপ হইয়াছিলেন। আশুতোষের জ্যেষ্ঠাকন্যা কমলা তাঁহার জীবনে গভীর দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন। খুব অল্পবয়সে কমলার বিবাহ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অল্পবয়সেই দিব্যেন্দুর মৃত্যু হয়; তারপর আশুতোষ বিধবা কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এই বিবাহও বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু বিবাহ যখন সম্পন্ন হয়, তখন নাকি খুব গোলমাল হয়। অনেকে বিধবাবিবাহে আপত্তি করেন এবং প্রধান বাধা আসে পরলোকগত দিব্যেন্দুসুন্দরের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রদের বাড়ি হইতে। সেই কারণেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতি আশুতোষের মনে বিরূপ ভাব থাকিতে পারে। শুনিয়াছি, এই বিধবা কন্যাই আশুতোষের সংসারের কর্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহার মৃত্যুর পর শোকাহত পিতা চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া কমলা লেকচারের ব্যবস্থা করেন। আশুতোষ পিতৃভক্ত ছিলেন, কিন্তু মনে হয় বিধবা মাতার প্রতি তাঁহার আরও বেশি টান ছিল। পরলোকগত পিতার নামে তিনি যে ফিজিক্স/কেমিস্ট্রির গ্রাজুয়েটকে মেডেল দিয়াছিলেন তাহার কথা বেশি লোকের জানা নাই, কারণ ঐ জাতীয় মেডেল আরও অনেক আছে। কিন্তু বিধবা মাতার নামে যে জগত্তারিণী পদকের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মেডেল—ইহার প্রথম প্রাপক রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র। এই বিধবা মাতার আপত্তির জন্যই আশুতোষ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণেও বিলাত যাইতে রাজি হয়েন নাই। আশুতোষের শক্তিমত্তার (ও নীতিহীনতার?) সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায় ১৯১০ সালে তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ (ও পাসকোর্সে বি-এ)-কে graduate of great distinction (অনন্যসাধারণ মেধাবী গ্রাজুয়েট) হিসাবে চালাইয়া দিয়া ডেপুটিগিরিতে নিয়োগ। কে বলিবে কোন বিধবার প্রতি কারুণ্য বশতঃই তিনি বিপথগামী হইয়াছিলেন কিনা?

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র বাদ পড়ায় আর সকল বড় সাহিত্যিকও বাদ পড়িলেন। শুধু রহিলেন মুকুন্দরাম—বোধ হয় জে. এন. দাশগুপ্তের রিসার্চের দৌলতে—আর মধুসূদন, যাঁহার সম্পর্কে আশুতোষ নিজেই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলায় এম-এ'তে তন্ন তন্ন করিয়া পঠনীয় গ্রন্থকে অধ্যয়ন করিবার ট্র্যাডিশন গড়িয়া উঠিল না। আশুতেষের মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরেও এম-এ পরীক্ষার খাতায় দেখিয়াছি অধিকাংশ পরীক্ষার্থী 'দুর্গেশনন্দিনী'-র নায়কের নাম লিখে জয়সিংহ বা রাজসিংহ; মুষ্টিমেয় কয়েকজন জগৎসিংহ লিখিয়া উঠিতে পারে। পূর্বেকার সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে—বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমীপ্রভাব, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুধু রস গ্রহণের জন্য পাঠ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আর একটা বড় বাধা হইল বাংলায় সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার অভাব। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্চাঙ্গের রচনা যে বাংলায় না আছে তাহা নহে, কিন্তু অভিনিবেশসহকারে তাহা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা নাই। শ্রীকুমারবাবু যখন বিভাগীয় প্রধান হয়েন তখন তাঁহাকে এই অপূর্ণতার কথা বলি। তিনি অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বে কোন কৌতূহল ছিল না। তিনি বলিতেন পূর্ণযৌবনা উর্বশী যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বা অসিচর্ম পরিহিতা মিনার্ভা যেমন জুপিটারের মস্তক হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কবির কাব্য তেমনি সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়াই আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ

করে। ইহার রস আমরা আস্বাদন করিব এবং সেইজন্য ইহার যথাযথ বিশ্লেষণ করিব, কিন্তু যে পথে ইহা আত্মপ্রকাশ করিল তাহার অনুসন্ধান করিয়া লাভ কি? 'কোন কালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকাবয়সী'—উর্বশীকে এই প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিক। তবু আমার অনুরোধে তিনি সমালোচনা সংকলনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তিনি এমন একজন সহযোগী গ্রহণ করিলেন যিনি এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ; তাঁহার কিবা রাত্রি কিবা দিন! সুতরাং বলা যাইতে পারে আমার প্রস্তাব বানচাল হইল। অনেক পরে আমি নিজেই এই পথে নামিলাম। আমরা মধুসূদনকে 'মেঘনাদ' ও 'বীরাঙ্গনা'-র কবি বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি বিশিষ্ট তাত্ত্বিকও ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে; রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার মনে হয় লোকেন পালিত কবির রচনায় যে-সকল সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া না পড়িলে কবির বক্তব্যের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে 'সাহিত্য-কথা' লিখিয়াছেন তাহা যে-কোন সাহিত্যে অতুলনীয়। এই-জাতীয় কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া আমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গের অধ্যাপক-মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিলেন না। বাংলার অগ্রসর ছাত্রেরা উল্লিখিত প্রবন্ধাবলী পড়িবার এবং তাহাদের তাৎপর্য বিচার করিবার সুযোগ পাইল না, ইহা আক্ষেপের বিষয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জবলপুর ও যাদবপুর

১

জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ছয়টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন প্রফেসর ও একজন রীডার নিযুক্ত হয়েন। প্রফেসরকে আনা হয় আমন্ত্রণ জানাইয়া আর রীডার নিযুক্ত হয়েন স্থানীয় অধ্যাপকদের মধ্য হইতে। অবশ্য দুই-একটি বিষয়ে ব্যতিক্রম হয়। ওখানকার ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েন কুঞ্জিলাল দুবে। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন ; আবার নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের আইনসভার স্পীকারও নির্বাচিত হয়েন। সুতরাং দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হইলেন রেক্টর এবং রেজিস্ট্রারের খালি চেয়ারে বসিলেন নাগপুরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার। এমনি অনেক কর্মীই নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জবলপুরে আসেন। ইংরেজ আমলে জবলপুরে একটা ভাল কলেজ ছিল। স্বাধীন ভারতে লাইব্রেরির স্বাধীন ব্যবহারে অনেক বই খোয়া গিয়াছে ; তবু রিক্ততার মধ্যেও লাইব্রেরি দেখিয়াই এই কলেজের এককালের আভিজাত্য অনুমান করিতে পারিলাম। প্রকৃতপক্ষে ওখানে শিক্ষার এমন বিস্তৃতি বা গভীর চর্চা হয় নাই যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার তাগিদ থাকিতে পারে। ইহা মহাত্মাজির ও কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনরূপ বিষবৃক্ষের একটা ফল মাত্র। ইহার কিছুকাল পূর্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কাজে গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি, ওখানে সবই বিশৃঙ্খল, কিন্তু সবাই খুশি ; অ-মহারাষ্ট্রীরা তো হটিয়া গিয়াছে, আর চাই কি! জবলপুরে একটা হোটেলে উঠিয়াছিলাম এবং বেশ কিছুদিন ছিলাম। দুই-চারদিনের মধ্যেই এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার মেয়ের রিসার্চ উপলক্ষ করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কুশল জিজ্ঞাসা ও প্রতিজিজ্ঞাসার মধ্যেই তিনি বলিয়া বসিলেন, এখানে ভালই থাকিবেন। এখানকার পান্ডা ব্যক্তিরা এখন মারাঠিদের পিছনে লাগিয়াছেন, বাঙ্গালীদের ঘাঁটাইবেন না। উক্তিটি সুরুচিপূর্ণ নহে, তবে তাৎপর্যহীন নয়।

ওখানকার ভাইস-চ্যান্সেলর দুবেজি পেশায় বোধ হয় উকিল ছিলেন ; তারপর রাজনীতিতে যোগদান করেন। কিন্তু ইহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি যে তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল এবং যদিও জবলপুরের মত ছোট ও নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাপ্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত, তবু দেখিয়াছি, তিনি উচ্চমান রক্ষার জন্য সব সময় সজাগ থাকিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যেও এই সচেতনতা ছিল। আজকাল ডক্টরেট লইয়া অনেক কারচুপি হয় ; আর পরীক্ষক-নির্বাচনে ও পরীক্ষণে ১৯১৭ সাল হইতেই আমাদের রেকর্ড লজ্জাকর। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৯১০ সালে ইংরেজি এম-এ'তে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া পরীক্ষার্থীরা উঠিয়া গিয়াছিল। ন্যায়নিষ্ঠ স্যার আশুতোষ অবাধ্য ছাত্রদের অভিযোগে কান দেন নাই, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে তিনি শীলমহাশয়কে আর এম-এ'তে পরীক্ষক নিযুক্ত করেন নাই বা সাহস পান নাই। কিন্তু ইংরেজির প্রথম ডক্টরেট পরীক্ষায় তিনি শীলমহাশয়কেই পরীক্ষক করিলেন। পরীক্ষার্থীর উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর পরীক্ষক উঠিয়া গেলেন বটে—তবে তাহা মহীশূরের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদে ;—

কাহার অনুগ্রহে এই পদোন্নতি হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি জবলপুরে যাওয়ার পরই একটা থীসিস লইয়া একটু কুটতর্ক উপস্থিত হয় এবং সেই তর্কে আমিও জড়িত হই। উপাচার্য তর্কাতর্কি থামাইয়া দিয়া বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রি তখনই দেওয়া যাইতে পারে যখন পরীক্ষণ সন্দেহাতীত হইবে। কলিকাতায় এমন কথা শুনি নাই। এম-এ'তে তৃতীয় শ্রেণী লইয়া বহুকাল হইতেই অভিযোগ হইয়াছে। পরীক্ষার্থীকে ডিগ্রি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপাঙ্‌ক্তেয়তার অপযশও ঢালিয়া দেওয়া হইত। চিন্তামন দেশমুখ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নটা উত্থাপন করেন এবং বোধ হয় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইহার পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। জবলপুরে যে আলোচনা হয়—সেখানে তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহা তুলিয়া দেওয়া হউক অথবা তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ'কে আর একবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হউক। আমার বেশ মনে আছে যে দেশমুখমহাশয়ের প্রথম প্রস্তাবে ভাইস-চ্যান্সেলর ও রেক্টর বলিলেন, তৃতীয় শ্রেণী তুলিয়া দিলে এখন যেসব পরীক্ষার্থীকে ৪৮ (দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করার নিম্নতম সংখ্যা) দেওয়া হয় না, তাহাদিগকে ৪৮ দেওয়া হইবে অর্থাৎ পরীক্ষার মান নামিয়া যাইবে। এই যুক্তিতেই আলোচনাটা ওখানেই চাপা পড়িয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া অন্য এক চিত্র দেখিলাম। আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের মান অমনি নীচু ছিল--৪৫%। আমাদের কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণী তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীকে ৪৫ হইতে নামাইয়া ৪০ করা হইয়াছে। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জবলপুরে আমার বেশিদিন থাকা হয় নাই। বৃদ্ধা মা কলিকাতায় থাকিতেন। সেকেলে পুত্রবধূ শাশুড়ীর জন্য রান্না ও তাঁহার সেবাকে প্রাধান্য না দিয়া পারেন না, আর আমার মা দেখেন কলিকাতায় সবাই চাকুরী পায়, শুধু তাঁহার ছেলেই দূরে পড়িয়া আছে। সেই কারণে জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিলেও—কন্ট্রাক্ট সহি করিতে যাইয়া দেখি, তাঁহারা পাঁচ বছরকে দশ বছর করিয়া দিয়াছেন—আমি তাহার প্রতিদান দিতে পারি নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল অনেকটা রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু ছাত্রদের পড়াশোনায় উৎসাহ ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নতির দিকে লক্ষ্য ছিল। প্রথম দিন ক্লাসে যাইয়া দেখি—পনেরটি ছেলেমেয়ে এবং পনের জনেরই সম্মুখে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স (বাইওয়াটারের অনুবাদ)। আমি হোটেল ছাড়িয়া যখন বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে লাগিলাম, তখন আমার বাড়িতেও তাহারা আসিতে আরম্ভ করিল। তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যেও উৎসাহের লক্ষণ দেখিতাম; কিন্তু সরকারের নির্বুদ্ধিতায় তাহা বিকাশের সুযোগ পাইত না। মধ্যপ্রদেশে বহু জেলা, বহু কলেজ এবং অনেক কলেজই সরকারি। সরকারের একটা পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ছিল বটে, কিন্তু দেখিতাম যে একবার যদি চাকুরীতে ঢোকা যায়, তারপর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু চাকুরীর দৈর্ঘ্য বা সিনিয়রিটি অনুসারে প্রমোশন দেওয়া হইত। নানা গ্রেডের চাকুরী—অধ্যাপকদের ২/৩টি; অধ্যক্ষেরও দুই শ্রেণী--ডিগ্রি কলেজ ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আমার মনে হয়, ইহার ফলে কেহ কোথাও বেশি দিন টিঁকিতে পারিতেন না; গবেষণাদির কোন মূল্য নাই বলিয়া, যাঁহারা উৎসাহ সহকারে কিছু কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ নিভিয়া যাইত অথবা জাগতিক ব্যাপারে বিতৃষ্ণা আসিয়া যাইত। আবার দুই-চারজন কৃতী ছাত্র বিদেশে পাড়ি দেওয়ার বা অন্যত্র সুবিধামত চাকুরী খোঁজার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন।

জবলপুরে যাঁহাদের পড়াইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে একটি ছাত্রীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসবোধ আমাকে খুব আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার নাম এনা মুখার্জি। সে এবং আর একটি মেয়ে

নিয়মিতভাবে আমাকে তাহাদের প্রবন্ধ শোনাইতে আসিত। অপর মেয়েটিও ভাল ; কিন্তু এনার রচনা অনন্যসাধারণ। ওখানে এম-এ পরীক্ষায় আটটি লিখিত পত্র ছিল, আর লিখিত পরীক্ষার পরের দিনই মৌখিক পরীক্ষা হইত ; উহারও পূর্ণসংখ্যা ছিল ১০০। মৌখিক পরীক্ষা করিলাম আমি ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস্. স্বামীনাথন। প্রথানুসারে এই-জাতীয় মৌখিক পরীক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন বহিরাগত পরীক্ষক। স্বামীনাথন এনার একের পর আর এক উত্তরে মুগ্ধ হইয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, 'শেক্সপীয়রের পরবর্তী-কালে এমন কোন্ রচনা আছে যাহার মধ্যে শেক্সপীয়রের অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।' এনা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'এমিলি ব্রন্টের Wuthering Heights।' উভয় পরীক্ষকই একটু হতচকিত হইয়া তাহাকে সংক্ষিপ্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বলিলাম এবং সে এই উপন্যাসের জটিলতা, রহস্যময়তা, উদ্দাম আবেগ ও প্রকাশের সংযম, সরলতা ও কুটিলতা, গভীরতা ও বিস্তৃতির যে পরিচয় দিল তাহা আমাদিগকে অবাক করিয়া দিল। স্বামীনাথন তাহাকে আশি নম্বর দিলেন ; তাঁহার আরও একটু বেশি দেওবার ইচ্ছা ছিল। লিখিত আট পত্রের প্রত্যেকটিতেই এনা প্রথম শ্রেণীর নম্বর পাইয়াছিল। অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন আমার শিক্ষক ফিরোজ দস্তুর। কঠোর পরীক্ষক হিসাবে তাঁহার বদনাম ছিল এবং আমি অনেক সময় এইজন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিতাম। এবার এম-এ পরীক্ষার পরই জবলপুরে ইংরেজি বোর্ডের সভায় আসিয়া তিনি আমাকে প্রথমেই বলিলেন, 'তুমি এবার কি বলিবে?' এনা এখন ঘোরতর সংসারী। কলিকাতায় শ্বশুরালয়ের অনেক কর্তব্য আছে এবং পিতার অকালমৃত্যুতে তাহাকে জবলপুরের সংসারও দেখিতে হয়। লেখাপড়ার সংগে আর যোগ নাই। শুধু কচিৎ কখনও স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছোট ছোট রচনা লিখে—'Now and Again' অংশে। তাহার অপূর্ব রচনাশৈলী এবং আমাদের আলংকারিকেরা যাহাকে বলেন 'সহৃদয়তা' এই সকল রচনাকে মর্যাদা দান করিয়াছে। আমি তাহাকে এই-জাতীয় রচনাই বেশি করিয়া লিখিতে বলি, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে ; তাহার স্বামী অভিযোগ করে ইহা তাহার আলস্য। আমার মনে হয় লেখিকার 'সহৃদয়তা' ও রচনানৈপুণ্য থাকিলেও, সুধী, সহৃদয় পাঠক কোথায়?

২

জবলপুরে আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তাহাকে একটু প্রাধান্য দিব, কারণ ইহার বৃহত্তর দ্যোতনা আছে। আমি ওখানে যাওয়ার প্রাক্কালে জনৈক ইতিহাসবিদ্ —আমার প্রাক্তন ছাত্র—আমাকে একটু সতর্ক করিয়া বলিয়াছিল, 'ওটা শেঠ গোবিন্দদাসের জায়গা ; হিন্দীর পীঠস্থান। সুতরাং সতর্ক হইয়া চলিবেন।' ওখানে পঁহুছিবার ৩/৪ দিনের মধ্যেই এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক যে হিন্দী ভাষাভাষী ও মারাঠীদের মধ্যে বিরোধের কথা বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়াছি। কয়েকদিন পরেই আমার ছাত্রের সতর্কতার সার্থকতা এবং ঐ আগন্তুকের আশ্বাসের সারহীনতার পরিচয় পাইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে আমি ওখানে যাইয়া বিলম্ব না করিয়া ক্লাসে পড়ান শুরু করি ; আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা করি নাই এবং যখন সেই অনুষ্ঠান হইল, তখন আমার ছাত্রদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। তবু সেই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে আমাদিগকে নিজ নিজ বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আমি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, আমাদের সরকারি ভাষা যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ আন্তর্জাতিক লেনদেন, আনাগোনার জন্য ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন থাকিবেই। ইহার পরে

ওখানকার ইংরেজি সাপ্তাহিকে আমার উপরে খুব তীব্র এবং স্থানে স্থানে ক্রুরুচিপূর্ণ আক্রমণ করা হয়। কিছুদিন আগেই আসামে বাঙ্গালীদের নিগ্রহ করা হয় ; সম্পাদক আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে আসামের 'বঙ্গাল খেদা' অভিযানের কথা আমার মনে রাখা উচিত। এখন এই হিন্দী-প্রেমিক আসামে অনুপ্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন!

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে আমার জবলপুর ত্যাগের কিছুদিন আগে। সংসদ বা কোর্টের মিটিং হইবে এবং কোর্টের সদস্যরা কর্মসমিতির কয়েকজন সভ্য নির্বাচন করিবেন। আমি প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে পদাধিকারবলে কোর্টের সদস্য। অন্যতম সদস্য—ওখানকার বহুল প্রচারিত হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক—নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া ভোটের জন্য আমার বাড়িতে আসিলেন। আমার হিন্দীতে কথা বলিতে প্রধান অসুবিধা ছিল অবিশুদ্ধ উচ্চারণ ; যে-সকল ছাত্রছাত্রী আমার বাড়িতে পড়িতে আসিত তাহারা বলিত যে আমার শব্দগুলি ঠিক আছে , লেকিন উচ্চারণ বিকৃত বলিয়া আগন্তুকরা আমার কথা বুঝিতে পারেন না। আমি সাংবাদিক মহাশয়কে বলিলাম, তাঁহার বক্তব্য তিনি স্বচ্ছন্দে হিন্দীতে বলিতে পারেন, কিন্তু আমার অস্পষ্ট হিন্দী তিনি বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া আমি ইংরেজিতেই কথা বলিব। নির্বাচনে তিনি পরাজিত হইলেন এবং পরাজিত হইয়া তিনি পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রান্ত পরিচালনা-সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেন। ভোট-প্রার্থীরা সৌজন্যের প্রতিমূর্তি : ভোটদাতা আমিও তাঁহার সঙ্গে কোন অসৌজন্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; তবে ঠিক কাহাকে ভোট দিব এই কথা বলার রেওয়াজ নাই। ব্যাপারটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কিন্তু ওখানকার সরকারি কলেজের ইংরেজির এক তরুণ অধ্যাপক পরিহাসচ্ছলে উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা আমাকে বলিলেন। কি সূত্রে জানি না, সম্পাদকমহাশয় জানিতেন যে আমি বাংলায় গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকি। তিনি নাকি আমার নিয়োগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রান্তনীতির নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেন ; তাঁহার যুক্তি এই যে আমি বাঙ্গালী সাহিত্যিক এবং ওখানে বাঙ্গালী কালচার চাপাইবার চেষ্টা করিব। সেই তরুণ অধ্যাপক পরিহাসভরে যাহা বলিয়াছিল তাহা যতদূর মনে আছে লিখিলাম। তখন বিষয়টি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি নাই। এখন আরও অভিজ্ঞতা হইয়াছে এবং দীর্ঘ অবসর-জীবনে ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি।

১৯৬০ সাল। ভারতব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব চলিতেছে। রোটারি ক্লাবের সভ্য না হইলেও আমাকে ইংরেজিতে ঐ ক্লাবে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। সকল শ্রেণীর উচ্চপদস্থ লোকেরা শ্রোতা। ঐরূপ সর্বজনীন সভায় খামারিয়াতে (এটা দেশরক্ষা বিভাগের কলোনী) অনুরূপ বক্তৃতা দিয়াছি এবং G. C. F. (Gun Carriage Factory)-র বাঙ্গালী ক্লাবেও ভাষণ দিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। ওখানকার মূল বাঙ্গালী ক্লাব যে শতবার্ষিক কমিটি নির্বাচন করে, তাহার সভাপতি হয়েন স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সত্য বরাট ; কিন্তু সমস্ত উৎসবের পুরোভাগে আমাকে থাকিতে হইত। এদিকে নানা কলেজের, বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেরা মিলিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদের এক সংস্থা গঠন করিয়া শরৎচন্দ্রের জন্মতিথিতে সভা করিল। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর কুঞ্জিলাল দুবে ; তবু আমাকে পুরোধা করিয়াই যে ছেলেরা একত্রিত হইয়াছিল ইহা তো স্পষ্ট। আমি অবশ্য খানিকটা নির্লিপ্ত ছিলাম, তবু এইসব অনুষ্ঠান বর্জন করিবার কোন কারণও ছিল না। দুবেজি বাঙ্গালী ক্লাবের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। অনেক সময় ভূপালে থাকিতেন বলিয়া আমার সঙ্গে দেখাশোনা কম হইত ; ইহারই মধ্যে একদিন অনু-

যোগ করিয়াছিলেন যে আমরা বাঙ্গালীরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইলেও মাইকেল মধুসূদনকে তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দিই না। ইংরেজির সেই তরুণ অধ্যাপক একুশ বছর আগে যাহা বলিয়াছিল, সেইকথায় তখন আমল দিই নাই। সম্পূর্ণ অবসরজীবন যাপন করার একটা সুবিধা এই যে, বিচ্ছিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন স্থানের ঘটনাকে একত্র করিয়া দেখা যায় এবং তাহাদের সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যে মন্তব্যকে সেই তরুণ বক্তা এবং আমি পরাজিত প্রার্থীর প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটা গোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতা নিহিত রহিয়াছে। কট্টর হিন্দিওয়ালারা এই কথা মনে করিয়া শংকিত হইয়া থাকিবেন যে যাঁহাকে ইংরেজি পড়াইতে আহ্বান করা হইয়াছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রোপাগান্ডা করিয়া হিন্দীর আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করিবেন। সাম্রাজ্যবাদীরা এইরূপ অসহিষ্ণু হইয়া থাকেন। তিরিশ বছরের অধিককাল ধরিয়া যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করিতেছি, দোষ-ত্রুটিসত্ত্বেও ইহা আমাদের পরম সম্পদ আর হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ ইহার চরম শত্রু। 'জয় হিন্দ' আর 'জয় হিন্দী' পরস্পরবিরোধী।

৩

প্রাচীন গ্রীকদের প্রধান কাহিনী ট্রয়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গ্রীকরা শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও ট্রোজানদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কারণ ট্রয় নগরীর চারদিকে এক দুর্ভেদ্য দৈবনির্মিত প্রাকার ছিল। সমরে পর্যুদস্ত হইলে ট্রোজানরা ট্রয় নগরীতে আশ্রয় লইতেন এবং ফটক বন্ধ করিয়া দিলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। অবশেষে ধূর্ত ওডিসিউস এক ফন্দি আঁটিলেন। একদিন ট্রয়বাসীরা দেখিলেন বিফলমনোরথ গ্রীকরা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক অতিকায় কাঠের ঘোড়া ফেলিয়া গিয়াছেন। আনন্দাতিশয্যে তাঁহারা সেই ঘোড়াকে নগরীর মধ্যে আনিলেন এবং বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া পানাহারের পর রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। গ্রীকবীরেরা ততক্ষণে নগরীর বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গীসহ ওডিসিউস কাঠের ঘোড়ার জঠরে অপেক্ষা করিতেছিলেন ; সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা বাহিরে আসিয়া নগরীর ফটক খুলিয়া দিলেন এবং গ্রীক চমূ ট্রয় নগরী ধ্বংস করিল। সেই কাহিনী হইতে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে একটি কথা প্রচলিত হইয়াছে—গ্রীক্ দান বা ট্রয়ের ঘোড়া অর্থাৎ দুরভিসন্ধি প্রণোদিত সর্বনাশা উপহার।

শঠচূড়ামণি ওডিসিয়ুসের সঙ্গে ঋষিতুল্য মহাত্মাজির কোন চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই। গান্ধীজি জাতির জনক তিনি দেশকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মহান্ আদর্শের অবিনশ্বর ঐতিহ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়াও তিনি দেশকে দুইটি ট্রোজান ঘোড়া উপহার দিয়াছেন। তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তখন ভারতবাসীদের যে দুইটি সমস্যা তাঁহার মনকে পীড়া দেয় এবং যাহাদের সমাধানে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন, তাহাদের প্রথমটি হইল হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ। ভারতে পা দেওয়ার কিছুদিন পর তিনি সমাধানের সূত্র পাইয়া গেলেন। হিন্দুরা স্বাধীনতা চায় আর মুসলমানরা খিলাফৎ চায়। তিনি স্থির করিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এইরূপ রফা হইবে যে হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন জানাইবে এবং মুসলমানরা স্বরাজ-আন্দোলনের সামিল হইবে। এই মিলনের স্বর্ণসেতু হইবে—অহিংস নন-কোঅপারেশন (তিনি কোন ভাল ভারতীয় শব্দ না পাওয়ায় ইংরেজি শব্দটি গ্রহণ করিলেন)। মহাত্মাজি

ভুলিয়া গেলেন যে স্বাধীনতা স্বাধীনতার জন্যই কাম্য ; তাহা আপসরফার বিষয় নয়। মহাত্মাজির অদূরদর্শিতার ফল দাঁড়াইল এই যে, ইংরেজ এই-জাতীয় জোড়াতালি দেওয়া মিলনকে সহজেই ছিন্নভিন্ন করিয়া ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেল। এই বিষয়টি আমি সবিস্তারে 'India Wrests Freedom' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি।

মহাত্মাজির দ্বিতীয় কাঠের ঘোড়াটি হইল তাঁহার ভাষানীতি। ভাষাসমস্যা-সম্পর্কে তিনি আফ্রিকায় থাকিতেই সচেতন হইয়াছিলেন। তিনি ওখানে যাইয়া সমস্ত ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিতে শিক্ষা দেন। ওখানকার ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান। মুসলমানরা নিজেদের পরিচয় দিতেন 'আরব' বলিয়া ; অপরদিকে পার্শীরা বলিতেন যে তাঁহারা আদিম পারসিক জাতি ; মনে হয় প্রকারান্তরে ইঁহারা অ-ভারতীয় বলিয়া নিজেদের চালাইতে চেষ্টা করিতেন। ওখানে নানা সম্প্রদায়ের, নানা ভাষাভাষী লোকদিগকে গান্ধীজি ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে চেষ্টা করেন। গান্ধীজি-সম্পর্কে যে-সকল রচনা আমি পড়িয়াছি তাহা হইতে মনে হয়, ওখানকার ভারতীয়দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। ভারতীয়দিগকে বলা হইত 'কুলি' অথবা স্যামি (Sammy)। এই শেষোক্ত শব্দটি 'স্বামী'-র অপভ্রংশ। তামিল-ভাষীদের অনেকের নামের শেষেই 'স্বামী' দেখা যায়—রামস্বামী, লক্ষ্মণস্বামী, রঙ্গস্বামী, চিন্নস্বামী, রঙ্গস্বামী ইত্যাদি। মহাত্মাজির নিজের ভাষা গুজরাটি ; আমি যতদূর জানি, ভারতবর্ষীয় পার্শীসম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে গুজরাটিতে বাক্যালাপ করেন। কিন্তু ওখানে গান্ধীজি ভারতবাসীদের সভাসমিতির কাজকর্মে হিন্দীর প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেন বলিয়া মনে হয়। অথচ আঞ্চলিক ভাষার প্রতিও তাঁহার খুব দৃষ্টি ছিল। ১৯০১—১৯০২ সালে গান্ধীজি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন ; তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'I observed with sorrow even then the prominent place that the English language occupied in our affairs'. এই সময় তাঁহার বয়স ৩২/৩৩ বৎসর। ইহার বছর-দশেক পরে ১৯১২ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখেল যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তখন গান্ধীজি ভারতীয়দের সভায় তাঁহাকে মারাঠি ভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন, যদিও সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে মারাঠিরা একেবারেই সংখ্যালঘু হইয়া থাকিবেন ; এমন কি কোন মারাঠি নাও থাকিতে পারেন। এইখানেই মহাত্মাজির কিম্ভূতকিমাকার ভাষানীতির খসড়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। হিন্দী হইবে সরকারি ভাষা—মুসলমানদের খুশি করিবার জন্য তিনি হিন্দীকে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন—আর যে যাহার নিজের ভাষা বলিবে ; এক ভারতীয় যদি অপরের ভাষা না বোঝে তাহাতেও ক্ষতি নাই। গোখেল যদি মারাঠি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তবে শতকরা ১০ জনও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, একবার বোধ হয় আমাদের গ্রামাঞ্চলে মহাত্মাজি একটা বড় বন্দরে উপস্থিত ছিলেন এবং একটা সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে তাঁহারই সম্মানে বাংলায় লিখিত অভিনন্দনপত্র পঠিত হয় এবং তিনি উত্তর দেন গুজরাটি ভাষায়। তিনি বাংলা অভিনন্দন কতখানি বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার ভাষণ যে কেহই বুঝিতে পারেন নাই সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে স্পষ্ট ঘোষণা থাকে যে ইংরেজ সত্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে। সুভাষবাবুর কোথায় কি হইয়াছে সেই সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে আর ফিরিবেন না ইহা ক্ষুদে কর্তারা

বুঝিয়া থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ভাবিলেন যে আর গান্ধীনাম করিয়া কি হইবে? তাঁহারা অবলীলাক্রমে দেশবিভাগ গ্রহণ করিলেন, কারণ ভাবী প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ইকনমিক পলিসি বা অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু করিতে চাহেন। উত্তর প্রদেশের এই ইকনমিক্সের অর্থনৈতিক পলিসি পাকা করিতে মহাত্মা গান্ধীর ভাষানীতি সহায়ক হইবে। শুধু হিন্দী-ভাষী নেতারা কেন, খণ্ডিত পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের সাধারণ মানুষেরাও মহাত্মা গান্ধীর ভাষানীতির মধ্যে শুধু যে নূতন আভিজাত্যের সন্ধান পাইল তাহা নহে, নূতন সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ পাইল। ইহারই অল্পস্বল্প পরিচয় আমি পাইলাম জবলপুরে। মহাত্মাজির প্রবল ব্যক্তিত্ব দেশকে, বিশেষ করিয়া তাঁহার একান্ত অনুগামীদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রণীত গান্ধীচরিতে লিখিয়াছেন—গান্ধীজির ভাষানীতি বিস্তীর্ণ, বহুধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে ঐক্য আনিবে। কিন্তু ফলে কি হইল দেখা যাক। আমি যখন দিল্লীতে চাকুরী করিতাম (১৯২৭—২৯) তখন ইন্টারমিডিয়েট (বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক) ক্লাসে দুইটি সেকশন ছিল—হিন্দী সেকশন ও উর্দু সেকশন। দেখিতাম, হিন্দু ছেলেরা কখনও কখনও এক সেকশন হইতে আর এক সেকশনে চলিয়া যায়; মুসলমানরা অবশ্য উর্দু সেকশন ছাড়িত না। শুনিতাম যে দিল্লীর যে কথ্য ভাষা তাহা অনেকটা হিন্দী ও উর্দুর সম্মিশ্রণ। হয়ত ইহাকে ভিত্তি করিয়াই মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানীকে সরকারি ভাষা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ৯ কোটি মুসলমান যখন চলিয়াই গেল, তখন হিন্দী প্রেমিকরা হিন্দীকেই ভারতের সরকারি ও জাতীয় ভাষা বলিয়া চাপাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহার পরিচয় আমরা সকলেই পাইয়াছি ও পাইতেছি। এই হিন্দী গোষ্ঠীকে সংহত রাখার জনাই অতিকায় উত্তরপ্রদেশকে ভাগ করা হইল না, যদিও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য তাহার একান্ত প্রয়োজন ছিল ও আছে। ইহারই জন্য মধ্যপ্রদেশ নামে আর এক অতিকায় রাজ্য সৃষ্ট হইল, যাহার একমাত্র বন্ধন হিন্দীভাষার প্রাধান্য।

এইসব ব্যবস্থা করিয়া মহাত্মার অনুচরেরা শুধু বিভেদপ্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিলেন। উর্দুভাষাভাষীরা উর্দুকে কোন কোন প্রদেশে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শিখরা খালিস্তান ও পাঞ্জাবী সুবাকে সমার্থক করিয়া দুমুখী অভিযান চালাইতেছেন। মৈথিলী ভাষাভাষীরা আগেও বলিতেন, এখনও বলিতেছেন যে, তাঁহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দীর সম্পর্ক নাই। এদিকে ভোজপুরীও মাথা তুলিতেছে; ইহার কথা পূর্বে শুনি নাই। এক সময়ে গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার বেশ একটা সংযোগ ছিল। বছরে একবার তো ওখানে যাইয়া কয়েকদিন থাকিতে হইত; কখনও দুইবারও গিয়াছি। মহাত্মাজির মত ছিল যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের ভাগ হইবে এবং সেখানকার কাজকর্ম হইবে আঞ্চলিক ভাষাতে। ইহারই ফলে আসামীরা আসামে অসমিয়া চালু করিতে চাহিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ফলেই আসাম চার-পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ঢেউ মণিপুরে আসিয়াও পঁহুছিয়াছে। আন্দোলনের রকম দেখিয়া মনে হয়, অন্য প্রদেশবাসী যে-কোন লোক একটা নির্দিষ্ট দিনের পরে আসামে পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করিতে যাইবেন, তিনিই বিদেশী বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন। দক্ষিণ ভারতীয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া নাই। কর্ণাটক এক আইন পাস করিয়াছে যে, যে-কেহ ঐ প্রদেশে লেখাপড়া করিবে, সে অন্য ভাষাভাষী হইলেও তাহাকে স্থানীয় ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসাবে শিখিতে হইবে। এখন কোন সর্বভারতীয় শিক্ষাবর্ষ নাই—কোন জায়গায় জানুয়ারী, কোন জায়গায় এপ্রিল। এই বৈচিত্র্যের জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে। ইহার পর আরও বৈচিত্র্য আসিবে: প্রত্যেক প্রদেশ তাহার নিজস্ব নববর্ষ ধরিয়া বৎসর গণনা করিবে, সরকারি কাজে তাহা চালু করিবে, কারণ এখন জানুয়ারী হইতে

ডিসেম্বর পর্যন্ত যেভাবে বছর গণনা করা হয়, তাহার মধ্যে পরাধীনতার গন্ধ আছে। আমরা বিদেশের সঙ্গে আমাদের সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা সমাধান করিতে চেষ্টা করি এবং অন্য কোন দুই দেশের মধ্যে বিবাদ বাধিলে আমরা খুব মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে তাঁহাদিগকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা মিটাইয়া লইতে পরামর্শ দিই। কিন্তু বেলগাঁও সমস্যা, নর্মদা বা কাবেরী নদীর সমস্যা, চণ্ডীগড় সমস্যা প্রভৃতি কি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা মিটিয়াছে?

সাম্প্রতিক কালের (১৯৬০) একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিব। সূচনামন্ত্রী মহারাষ্ট্র-বাসী, কিন্তু তিনি কর্ত্রীকে খুশি করিতে সদাই ব্যগ্র। সুতরাং তিনি হঠাৎ ফতোয়া জারি করিলেন : সংবাদাদি প্রচারের সময় সূচনায় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' শব্দগুচ্ছটির পরিবর্তে 'আকাশবাণী' বলিতে হইবে। রেডিও শব্দটির প্রয়োগে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে ইহা 'ডাক্তার' 'মাস্টার' প্রভৃতির মত ভারতীয় ভাষায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতাম। মন্ত্রীমহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য করিয়া প্রচারকেরা 'আকাশবাণী' শব্দ দিয়া তাঁহাদের প্রোগ্রাম—ইহাও অবশ্য ইংরেজি শব্দ—আরম্ভ করিলেন। ইহাও খুব নির্দোষ ব্যাপার ; 'আকাশবাণী' কথাটি সহজবোধ্য এবং ইহা প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার মধ্যে তামিলভাষীরা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ দেখিতে পাইয়া আপত্তি করিলেন। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই আপত্তির কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী—যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতে ভয় পান না—ঘাবড়াইয়া গিয়া আবার 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' শব্দগুচ্ছটিকে যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। পত্রিকা পড়িয়া মনে হয়, বিষয়টি শুধু বিস্ময়কর নহে, হাস্যকরও বটে। তামিলভাষীরা শুধু মাদ্রাজ রেডিওতে 'আকাশবাণী' কথার প্রয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন ; সন্ত্রস্ত প্রধান-মন্ত্রী খোদ দিল্লী রেডিও হইতেই ইহা বাতিল করিয়া দিলেন। তামিলভাষীরা বেণী চাহিয়াছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বেণীর সঙ্গে মাথাও উপহার দিলেন।

এই সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে প্রতীতি হইবে যে, এই বহুধাবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে একত্র করিয়াছিল ইংরেজি ; তাহা উঠিয়া গেলেই আবার ইহা টুকরো টুকরো হইয়া যাইবে। আমি ভাষাবিদ্‌ও নহি, ইতিহাসবিদ্‌ও নহি। সাধারণবুদ্ধি হইতে দুই-একটি কথা বলিতে পারি। কালিদাসের নাটকে দেখি দুষ্যন্ত, কণ্বমুনি প্রভৃতি কথা বলেন সংস্কৃতে, আর শকুন্তলা, অনসূয়া প্রভৃতি কথা বলেন প্রাকৃতে। প্রণয়িনী শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়নিবেদনের সময় দুষ্যন্ত একটা দুর্বোধ্য ভাষার প্রাচীর খাড়া করিয়া প্রণয়নিবেদনের অন্তরঙ্গতা নষ্ট করিবেন ইহা বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। আমার ধারণা ইঁহারা একই ভাষা—অর্থাৎ শকুন্তলার ভাষায়ই—কথা বলিতেন। যে সংস্কৃত ভাষা কবি রাজা দুষ্যন্তের বা কণ্বমুনির মুখ দিয়া নিবেদন করিয়াছেন, তাহা মর্যাদাপূর্ণ বিবুধ জনসমাজের বা রাজকার্যের ভাষা ; পিতা ও কন্যা, বা প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ভাষা নহে। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ হইতেই বোঝা যায় যে ইহা বহু লৌকিক ভাষার সংযোজন ও সম্মার্জন হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। হয়ত ইহা হইতে আবার অনেক 'অপভ্রংশ' ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিজেও বহু ভাষা হইতে আহৃত হইয়াছে এবং পাণিনি ইহার ব্যবহারবিধিকে চূড়ান্ত রূপ দিয়া দেন। এইভাবে সংস্কৃত তক্ষশিলা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সরকারি কাজের বিবুধজনের আলাপ-আলোচনার এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। 'কথাসরিৎসাগর'-গ্রন্থের উৎপত্তি-সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এই মতের সমর্থন করে। গুণাঢ্য 'পৈশাচী' অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষায় 'বৃহৎকথা' লিখিয়াছিলেন ; তারপর সোমদেব ভট্ট সেই কাহিনী মর্যাদাসম্পন্ন রাজভাষা সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেন। একদিকে যেমন দক্ষিণ ভারতে

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে তেমনি আবার প্রাচীনকালের শংকরাচার্য হইতে আধুনিককালের লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের মাধ্যমে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন। এই কাজ এখন একমাত্র ইংরেজিই করিতে পারে। এইজন্যই উত্তরে অরুণাচল ইংরেজিকে মাতৃভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং দক্ষিণ ভারত 'আকাশবাণী'-কে হজম করিতে পারিতেছে না; কিন্তু ইংরেজি 'All India Radio'-তে তাহার আপত্তি নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুভাষাভাষী ভারতীয়দের মধ্যে গোখেলের মারাঠি বক্তৃতা এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লৌহজঙ্গ বাজারে গান্ধীজির গুজরাটী বক্তৃতা বাইবেলে বর্ণিত Tower of Babel-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ স্বর্গে উঠিবার জন্য সু-উচ্চ মনুমেন্ট তুলিতেছে দেখিয়া ভগবান আত্মরক্ষার্থে কারিগরদের মধ্যে ভাষাবিভ্রাট ঘটাইয়া দিলেন। কেহই কাহারও কথা বুঝিতে পারিল না; কাজেই মনুমেন্ট আর তৈরী হইল না। যাহাতে একে অপরের কথা বুঝিতে পারে, পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে সহজে পরিচয় লাভ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আজকাল অনেকে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হইতেছে। তিন বছরের বাচ্চাকেই শুধু ইংরেজি পড়িতে হইতেছে না, শুনিয়াছি, বাড়িতে ইংরেজির প্রচলন আছে কিনা ইহা দেখিবার জন্য বাচ্চার বাবা-মাকে ইন্টারভিউ করা হইতেছে। ইহাও একপ্রকারের বিকৃতি, কিন্তু সন্তানকে কিছু শিক্ষা দিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে দেখিয়া মার্কসিস্টরা অভিজাত-বিরোধিতা বা অ্যান্টি-এলিটিজমের জিগির তুলিয়া ইংরেজি শিক্ষা এবং অনার্স শিক্ষার পক্ষচ্ছেদ ঘটাইতেছেন। আমি মার্কসবাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত আছি, কিন্তু লেনিন ও তাঁহার পরবর্তীরা নানাদেশে মার্কসবাদের যে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সবিশেষ সংবাদ তেমন রাখি না। তবে মনে হয়, যেখানে এক পার্টি পরিচালিত সরকারই চিরন্তন বলিয়া কায়েম হইয়া থাকে, সেইখানে এলিটিজ্‌ম তো মজ্জাগত, রন্ধ্রগত হইতে বাধ্য। ইহাদের এলিটিজমের বিরুদ্ধে আপত্তি চালুনির সূচের ছিদ্রান্বেষণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদিগকে আর একটা কথা স্মরণ করিতে বলি। শিক্ষা বস্তুটিই আভিজাত্যনির্ভর; যে যত শিক্ষিত হইবে তাহার তত আভিজাত্য হইবে। শিক্ষার বন্টন আর সম্পদের বন্টন এক ব্যাপার নহে; টাটা-বিড়লার সম্পদ কাড়িয়া লইয়া তাহা বুভুক্ষু লোকের মধ্যে বন্টন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, সম্ভব হইলে তাহা বাঞ্ছনীয়ও হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইনের প্রতিভা বা বুদ্ধি এইভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের নাম উঠিয়া পড়ায় শিক্ষানীতির আর একটা দিক্‌ আসিয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়াছেন। কোন একটি প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অন্য প্রসঙ্গে টানিয়া নেওয়া উচিত হইবে না। তাঁহার সামগ্রিক মত বিচার করিতে হইবে। মহাত্মাজি বা তাঁহার অনুচরেরা যখন 'অংরেজি হঠাও' আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন যে ইংরেজি শিক্ষা চালু ছিল কবি তাহারই সমর্থনে 'শিক্ষার মিলন' বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আজ যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষাকে পঙ্গু করিতে ব্যগ্র, তাঁহারাই দেখিতেছি কবিকে পুরোধা করিতে চাহিতেছেন। কবি উপমার সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য রাখিতেন; তিনি বলিয়াছিলেন—মাতৃভাষা মাতৃস্তন্যের মত। অতএব কবিভক্ত আমরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়াইব না। শিশু প্রথম ছ'মাস মাতৃস্তন্য পান করে: তারপর পায়সান্নের সাহায্যে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়। ধরিয়া লই, শিশু বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ছয় বৎসর বয়সে প্রবেশ করিবে, আর ইংরেজি পড়িবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে এগার/বার বছর বয়সে।

যে শিশু পাঁচ বছর শুধু মাতৃস্তন্যের উপরই নির্ভর করে, সে মাতার স্বাস্থ্য শোষণ করে এবং নিজেও অপরিপুষ্টি রোগে ভোগে। ইংরেজি পড়া ও ইংরেজি মাধ্যমে সকল বিষয় পড়া এক বস্তু নহে। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি পড়া আরম্ভ হইত আর ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই সকল বিষয় পড়ান হইত ; তারপর ধীরে ধীরে ইংরেজি মাধ্যমের ব্যবহার করা হইত। সেই ব্যবস্থায় এখনও দোষ দেখি না। এখন যে ইংরেজি স্কুলে পড়ার অত্যধিক উৎসাহ তাহা এক পাগলামির বিরুদ্ধে আর এক পাগলামি—তবে মূল পাগলামি অপেক্ষা কম দোষাবহ।

আমার জবলপুর প্রবাস এবং একাকী সংসারযাত্রা যাহারা মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছিল, তাহাদের কথা বলিয়া এই প্রবাসপর্ব শেষ করিব। প্রথমেই নাম করিতে হয় আমার বহু-কালের সুহৃদ বিনয়ভূষণ দাশগুপ্তের শ্যালক সমর (শম্ভু) সেন ও রমেন (শিবু) সেনের। ইহারা আমার অভাব-অভিযোগ, সুখ-সুবিধার দিকে এমন অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিয়া-ছিল যে আমি কখনও অসহায় বা বিব্রত হই নাই। উহারাও আমার মতই জবলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী ; তবে আমার অপেক্ষা অনেক আগে গিয়াছিল। সমর ওখানকার বেঙ্গলী ক্লাবের একজন কর্মকর্তা ছিল ; সেই কারণে বাঙ্গালীদের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানেও আমি আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছি। স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে বৃদ্ধ—এখন পরলোকগত—মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বেঙ্গলী ক্লাবের সভাপতি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেন আমার সহকর্মী ইংরেজির রীডার গিরিশ চট্টোপাধ্যায়। একদিক হইতে সবচেয়ে স্মরণীয় সম্পর্ক হইল নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি জ্ঞানরঞ্জন সেনের পরিবারের সঙ্গে। জ্ঞান-রঞ্জনের ভ্রাতা ডাক্তার বিনয়রঞ্জন সেন ও বিচারপতি বিবেকরঞ্জন সেনের মত মেধাবী ও পরিশীলিতচিত্ত লোক বেশি দেখি নাই। জ্ঞানরঞ্জনের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দপ্রকাশ তখন ওখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন ; এখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। আনন্দ-প্রকাশকের তৃতীয় ভ্রাতা আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধি পায়। তাহার মাধ্যমে এই পরিবারের সঙ্গে আমার সংযোগ এখনও অক্ষুন্ন আছে।

৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন আর্টস বিভাগ-সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য ভাবী উপাচার্য ত্রিগুণা সেন—তিনি ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন—কয়েকজন লোককে পরামর্শের জন্য ডাকেন ; তন্মধ্যে আমি ও অধ্যাপক সুশোভন সরকার ছিলাম। আর্টসের বিষয়ের মধ্যে দুইটি বিষয়ে নূতনত্ব দেখিলাম আর দুইটি বিষয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিলাম। অনুপস্থিত দুইটি বিষয় হইল দর্শন ও সংস্কৃত। ত্রিগুণা সেন বলিলেন, 'ফিলজফি বিশেষ কেহ পড়ে না।' উত্তরে সুশোভনবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয় : 'ফিলজফি সকল দেশে ও সকল যুগে কম লোকে পড়ে। কিন্তু ইহার নাম হইতেই বোঝা যায় ইহা জ্ঞানের সারাৎসার। পৃথিবীতে এমন কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ফিলজফি পড়ান হয় না ?' ত্রিগুণা সেন একবাক্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সেই সঙ্গে সংস্কৃতও আসিয়া গেল। আর যে দুইটি নূতন বিষয় দেখিলাম তাহাও মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে। ইহাদের একটি Comparative Literature বা তুলনামূলক সাহিত্য আর একটি International Relations বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। প্রথমবারের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সাংবাদিকদের সাংসারিক জীবন-সম্পর্কে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইয়া মাদাম কুরি উত্তর দিয়াছিলেন, মহাশয়েরা ভুলিয়া যান যে আমি

বিজ্ঞানী ; বিজ্ঞানে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে বস্তুতে ; ব্যক্তি-সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নাই।' চিকিৎসাবিজ্ঞানী বিধান রায়-সম্পর্কে আমার তাহা মনে হয় নাই ; তাঁহার দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ থাকিত ব্যক্তির উপর, বিষয় অবান্তর। সেই কারণে তিনি যে-সমস্ত সংস্থা গড়িয়া গিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ কর্মচারীর আতিশয্যেই নিষ্কর্মা হইয়া পড়িয়াছে।

তুলনামূলক সাহিত্য বা Comparative Literature বিষয়ে পরামর্শদাতা হইলেন বুদ্ধদেব বসু। বুঝিতে দেরী হইল না যে ইহা স্থির হইয়াই আছে যে বুদ্ধদেববাবুই ইহার প্রধান হইবেন। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড খুব ভাল ; তিনি ইংরেজি ও বাংলায় সুলেখক। কিন্তু যে জাতীয় অভিজ্ঞতা বা গবেষণা থাকিলে ইংরেজি বা বাংলার প্রধান অধ্যাপক হওয়া যায় তাহা তাঁহার ছিল না, অথচ বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁহার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং তাঁহাকে সহজেই তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান করা যায়। কিন্তু এই বিষয়টি অস্পষ্ট ; আমাদের দেশে ইহা আর কোথাও পড়ান হয় না। জোর করিয়া বলিতে পারি না ; তবে আমার মনে হয় বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের তেমন বনিবনাও হইল না এবং বছর কয়েক পরে একটু তিক্ততার মধ্যেই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেন।

ঠিক সময়টা মনে নাই। তবে তখন বুদ্ধদেববাবু ছিলেন না। ত্রিগুণা সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন যে তুলনামূলক সাহিত্যে যাঁহারা পাস করে তাহারা বলে যে এই এম-এ'র চাকুরীর বাজারে কোন দাম নাই ; সুতরাং আমি যেন ইহার সিলেবাসের এমন পরিবর্তন করিয়া দিই, যাহাতে এই বিষয়ের ডিগ্রি মর্যাদা পায়। আমি সিলেবাসের একটা খসড়া করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গত কারণেই এই বিভাগ হইতে আপত্তি ওঠে যে তাঁহাদের বিভাগের ব্যাপারে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ কিছু করা অসঙ্গত হইবে। সুতরাং আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে, আমি আর ঐ বিষয়ে কোন সংবাদ রাখি না। তবে আমার মনে হয়, নানা সাহিত্যের এবং নানা ভাষার যেখানে পঠন-পাঠন হইতেছে, সেই জায়গায়ই তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ্যক্রম ফলপ্রসূ হইতে পারে। স্যার আশুতোষ সর্বভারতীয় ভাষার সম্মিলনের মধ্য দিয়া জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসে বাংলায় এম-এ'র সিলেবাস রচনা করিয়াছিলেন। জাতীয় সাহিত্য নামক আকাশকুসুম আকাশেই রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু বাংলার এম-এ'র পঠন-পাঠনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সাহিত্য খুব ফলপ্রসূ হইয়াছে একথা শুনি নাই।

অন্য আন্তর্জাতিক বিষয়ের পরামর্শদাতা হিসাবে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম জনৈক ইতিহাসের ছাত্রকে—তখন পেশায় ব্যারিস্টার। আমাদের আমলে ইন্টারন্যাশন্যাল ল' ইতিহাসের এম-এ'র পাঠ্যসূচির অঙ্গ ছিল। সুতরাং আমি মনে করিলাম, যাদবপুরে ইন্টার-ন্যাশন্যাল ল' বা আন্তর্জাতিক আইনই একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পঠিত হইবে। কিন্তু পরে শুনিলাম, ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (relations)—আইন নহে। বিষয় যাহাই হউক ব্যারিস্টারের তাহা মনঃপূত হইল না। তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা হইল। বক্ষ্যমাণ বিভাগের নাম হইল ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্স এবং ইহা সংযুক্ত হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে। এখনও এই বিভাগের বি-এ কোর্সকে বলা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর সেই পাঠ্যসূচি অতিক্রম করিয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী বা তৎসম্পর্কিত বিধিসমূহ অধ্যয়ন করে। এই বিষয়ের প্রধান হইয়া আসেন ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের সুহৃদ এবং আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহাধ্যায়ী পৃথ্বীশ চক্রবর্তী। কর্ম-জীবনের শেষপ্রান্তে এই পুরানো বন্ধুর সাহচর্য খুব প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। পৃথ্বীশ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে ছয় বৎসর এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিলাম,

সেই সুখস্মৃতি ম্লান হয় নাই। আমি ঐ বিষয়-সম্পর্কে কিছুই জানি না ; আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অনধিকারীর বক্তব্য। পৃথ্বীশ আমার বন্ধু এবং ঐ বিভাগের অন্যান্য কয়েকজন আমার ছাত্র অথবা ছাত্রস্থানীয়। ইহাদের সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হইতে মনে হইয়াছে ইহার বিভিন্ন অংশের সাযুজ্য হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইন্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স—ইহার মধ্যে 'এবং' শব্দটিই দুর্বোধ্য।

আমার নিজের কথায় ফিরিয়া আসি। আমার ও সুশোভনবাবুর সঙ্গে ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের যে প্রারম্ভিক আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে আমাদিগকে এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলার ভার লইতে হইবে অর্থাৎ সুশোভন-বাবু ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক হইবেন আর আমি ইংরেজির। আমি বিধান রায়ের সরীসৃপকে চিনিতাম ; সুতরাং চাকুরীর প্রত্যাশী হইলেও ত্রিগুণা সেনের কথায় কান দিই নাই। তখন সুশোভনবাবুর অবসর-গ্রহণ আসন্ন ; তাঁহার সঙ্গে ত্রিগুণাবাবুর আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইয়াছিল। দেখা গেল, পূর্ব-প্রতিশ্রুতিতে কিছু টালবাহানা আরম্ভ হইয়াছে। এই বিষয়ে সুশোভনবাবুর সঙ্গে একান্তে আমার কথা হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়বস্তু ঠিক মনে নাই। যাহা হউক তিনি ওখানে কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাকুরীর ঊর্ধ্ববয়ঃসীমা পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

যাদবপুরে ইংরেজির পাকাপাকিভাবে প্রধান হইলেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ। তিনি খুব উৎসাহের সহিত ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির প্রধানদের একটা সেমিনার হয় শ্রীনগরে। আমি জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ; তিনি যাদবপুরের। তখনও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ; কর্মোদ্যম অপ্রতিহত। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর। পরে শুনিয়াছি যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বাঁকিয়া বসিয়াছেন ; ঊর্ধ্ববয়ঃসীমা ৬৫ বছর অনেক দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে ; আর নয়। বিজ্ঞাপন দিয়া, সম্ভাব্য এ'কে, ও'কে, তাঁকে ধরিয়া কিছুই করিতে না পারিয়া কর্তারা ত্রিগুণা সেন মহাশয়কে সাদা চেক দিয়া দিলেন ; তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা নিযুক্ত করুন। ত্রিগুণা সেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং ১৯৬০ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদান করি। ছয় বছর কাজ করিয়া ১৯৬০ সালে ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইলে অবসর গ্রহণ করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ডাক্তার বিধান রায়ের ট্র্যাডিশন অনুসারে কেহ বড়-একটা শিক্ষার মানের কথা ভাবেন নাই। সকলেই নিজেদের লোককে চাকুরী দেওয়ার, আমাদের মত অবাঞ্ছিত লোকদের পথ রুদ্ধ করিবার কথাই ভাবিয়াছেন। ত্রিগুণা সেন মহাশয় কিছুটা ভাবিয়াছিলেন ; সেইজন্যই তিনি আর্টস ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে শুধু অনার্স-কোর্সে ছাত্র ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন ; জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সন্তান এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য করিয়া দেন এবং ইংরেজিকেই শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে তাঁহার অনেক স্বজন ও আশ্রিত ছিল ; ওখানকার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন লোকের অনুরোধেই চাকুরী দিলেন ; তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার কোন প্রয়াস করিলেন না। আমি এমন বেশ দুই-চারজনের কথা জানি যাঁহারা লেকচারার পদের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং হয়ত তাহারও যোগ্যতা নাই। পরে দেখি, সুপারিশের জোরে তাঁহারা রীডার হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। পরবর্তীকালে একসময় ডক্টর প্রতুল রক্ষিত নিয়োগ-সম্পর্কিত সকল কমিটিতে চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি

হিসাবে উপস্থিত হইতেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একটা কমিটির কথা বলিয়াছিলেন যে, তিনি দেখিতে পান লেকচারার প্রায় সকলেই দরখাস্ত করিয়াছেন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি-ধারী মাত্র একজন এবং তিনিই কনিষ্ঠতম। এই বিভাগের তদানীন্তন প্রধানকে প্রশ্ন করিলাম। ইনি প্রথম দফার লোক নহেন; তিনি স্পষ্টই বলিলেন, 'কেমন করিয়া ফাস্ট ক্লাস থাকিবে? এখানে যে যেখানে পারে নিজের লোক বসাইয়াছে। ফাস্ট ক্লাসরা তো অন্যত্র নিজের গুণানুসারেই চাকুরী পায়।'

ত্রিগুণা সেন মহাশয় খুব বুদ্ধিমান লোক। তিনি অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া গিয়াছেন, আবার অনেক উচ্চপদ অলংকৃত করিয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আবার বিপ্লবী, পৌরপ্রধান এবং রাজনীতিবিশারদ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহার আদর্শবাদ ও সবলতা নষ্ট হয় নাই। বোধ হয় এই কারণেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান হিসাবে তিনি কতকগুলি মৌলিক ভুল করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই খুব সাধারণভাবে থাকিতেন অথচ তাঁহার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব থাকায় তিনি নিজেকে খেলো করিতেন না। তাঁহার সরল বিশ্বাস ছিল যে, ছেলে-মেয়েরা যদি ভাল করিয়া পড়ে এবং শিক্ষকরা যদি ভাল করিয়া পড়ান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাইবে। মানুষের নিজের উপর বিশ্বাস থাকা উচিত; সুতরাং আমাদের ছাত্রদের আমরাই পরীক্ষা করিব এই নীতিতে বাহিরের পরীক্ষকের নিয়োগে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। সাক্ষাৎ আলাপ ও কার্যকলাপ দেখিয়া ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের মনোভাব-সম্পর্কে যে পরোক্ষ অনুমান করিয়াছিলাম তাহার বর্ণনা করিলাম। বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গের রূপকার; ব্রহ্মার মত তিনি রূপ দিয়াই খালাস। তবে সৃষ্ট বস্তুটি যাহাতে হাতছাড়া না হয় সেইজন্য নিজেই প্রেসিডেন্ট বা চ্যান্সেলর হইলেন এবং এই একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল যেখানে চ্যান্সেলরই কর্ম-সমিতির সভাপতি। তাঁহার বাড়িতেই মিটিং হইত এবং আইনতঃ অন্য কোন কমিটি, কাউন্সিল বা বোর্ডের কোন চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখিবার সময় কোথায়? '(তাঁহার) রয়েছে কর্ম, (তাঁহার) রয়েছে বিশ্বলোক'। তিনি কয়েকটি আশ্রিতের কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারিলেই খুশি আর তাঁহার সরীসৃপ কয়েকটি লোকের ক্ষতি করিতে পারিলেই পরিতৃপ্ত। ইহার বেশি কিছু করিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না।

সুতরাং ত্রিগুণা সেনের হাতে অনেক ক্ষমতা রহিয়া গেল। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে তিনি কি করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আর্টস ও সায়েন্সে তিনি প্রথম দিকে খুব ভুল করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় অপযশের বোঝা লইয়াই যাত্রা শুরু করে। ভাল শিক্ষক যে নিযুক্ত হয়েন নাই এমন কথা বলিব না। তবে 'কাচখণ্ড'রা প্রবল হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। অযোগ্য ছাত্রের প্রাবল্য সুশিক্ষাদানের পথে আরও বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটা স্কুল ছিল। তাহাকে যাদবপুর ছাড়া আর কেহ স্বীকৃতি দিত না। সুতরাং সাধারণতঃ যাহারা অন্যত্র জায়গা পাইত না সেই-জাতীয় ছাত্রই ওখানে পড়িত এবং তাহারাই হইল জনবিরল অনার্স ক্লাসের প্রধান সম্বল এবং চরম বিপত্তি। তিন বৎসরের অনার্স কোর্স পড়িয়া ইহারা যাইবে কোথায়? সুতরাং ইহাদিগকে পাস করাইয়া এম-এ ক্লাসে তুলিতে হইবে। এম-এ ক্লাসে আরও ছাত্র আসিত: সস্তা ফাস্ট ক্লাস পাওয়ায় লোভে বেশ কিছু ছাত্র আসিত আর এমন কিছু ছাত্র আসিত যাহারা হয়ত অন্যত্র পাসই করিতে পারিবে না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তি অথবা যাঁহারা কর্তাব্যক্তিদিগকে প্রভাবিত করিতে পারেন তাঁহারা সস্তার হাটে তাঁহাদের বাজে মাল ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এইজন্য ভর্তির সময় একটা

ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষা চালু করা হইল। যে লিখিত বি-এ পরীক্ষায় কম নম্বর পাইয়াছে, সে তো মৌখিক ইন্টারভিউতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে! পরীক্ষার যন্ত্রটিও বেশ নমনীয় ছিল। প্রত্যেকটি পত্রে দুইজন পরীক্ষক প্রশ্ন করিবেন ও পরীক্ষা করিবেন এবং এইখানে ভিতরের কর্তৃপক্ষের অনেকটা স্বাধীনতা থাকিত। কড়া পরীক্ষকদিগকে বাদ দেওয়া যাইত, তাঁহারা কঠিন প্রশ্ন করিলে তাহা ছাঁটিয়া দেওয়া যাইত এবং আরও দুইটি নিয়ম করা হইয়াছিল যাহার সুযোগ লইয়া অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে উতরান হইত। দুইজন পরীক্ষক যে নম্বর দিবেন তাহার গড় বা অ্যাভারেজ গ্রহণ করার রীতি চালু আছে এবং খুব বেশি পার্থক্য থাকিলে তাহা তৃতীয় পরীক্ষককে দেখান হইবে, ইহাই বিধি। শুনিয়াছি এখানে ব্যাপারটা দাঁড়াইল যে দুই পরীক্ষকের মধ্যে যাহার নম্বর বেশি তাহাই বহাল হইত এবং ইহার পরেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য কুড়ি নম্বর ছিল। ইহারও যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করা যাইত। এইসব কারণে যাদবপুরের ডিগ্রি কোন মর্যাদা অর্জন করিতে পারিল না। বিস্ময়ের কথা এই যে, ত্রিগুণা সেনের মত বুদ্ধিমান লোক এই ব্যবস্থা চালু করিলেন এবং ইহার যথেচ্ছ অপব্যবহারে চোখ বুজিয়া ছিলেন। আমি ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু কখনও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমন্ত্রণ পাই নাই। তবে একটা মনোভাব লক্ষ্য করিতাম—সবাই যাদবপুরের ডিগ্রিধারীকে তাচ্ছিল্য করে। পাব্লিক সারভিস কমিশনে যাইয়া দেখিয়াছি, মেম্বররা ইহাদিগকে পৃথক শ্রেণীতে ফেলিয়া বিচার করিতে চাহেন। আপত্তি হইতে পারে যে, মেম্বর, বিশেষজ্ঞ কেহই তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নহেন। কিন্তু একটা যুক্তির ব্যঞ্জনা তর্কাতীত—এমন একাধিক প্রার্থী কমিশনের কাছে উপস্থিত হইত যাহারা কলিকাতার বি-এ/বি, এস-সি আর যাদবপুরের এম-এ/এম, এস-সি এবং তাহাদের ব্যাচেলর ও মাস্টার ডিগ্রির মধ্যে বিরাট পার্থক্য—ধরুন শতকরা ২০। দুই বৎসরে এইরূপ অনন্যসাধারণ উন্নতি—ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

আত্মচরিতের অর্থই আত্মপ্রশংসা। ইহাই সাধারণ নিয়ম, যদিও সাধু-সন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পাপীরাও অনেক সময় নিজেদের কুকার্য বলিবার জন্যই এই প্রয়াস করিয়া থাকেন। আমি এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে অনেক আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকিব। গ্রন্থের শেষে সেই ব্যাপারেরও ছেদ টানিব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধি পরিবর্তন না করিয়া আমি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মান উন্নত করিতে চেষ্টা করি এবং মনে করি এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করি। ইহাও লক্ষ্য করি যে আমি যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তাহা ক্রমে অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরাও গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগকে সোজাসুজি পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে গেলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, যেমন তুলনামূলক সাহিত্যের সিলেবাস পরিশোধনের চেষ্টা করিতে যাইয়া খুব সহজেই ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি সরিয়া দাঁড়াই। কিন্তু ডক্টরেট কমিটিতে, ফ্যাকাল্টিতে, বিশেষতঃ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে আমি অগ্রণী ভূমিকা লইতাম এবং আমার মত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতাম। আমার আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে পারে কিন্তু মনে হইত, পরীক্ষায় উচ্চতর মান যাহাতে রক্ষিত হয় সেই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্তাব্যক্তিকে আমি সচেতন করিতে পারিয়াছিলাম। আমার নিজের বিভাগে আমি নিয়ম করিয়া দিলাম—প্রধানতঃ বাহিরের পরীক্ষকের প্রশ্নই গৃহীত হইবে। শুধু ব্যাখ্যার অনুচ্ছেদগুলি আভ্যন্তরীণ প্রশ্নকর্তা নির্বাচন করিবেন। আমি নিজে কোন বৎসর কোন পরীক্ষা করি নাই। কিন্তু দুই পরীক্ষকের দেওয়া সংখ্যার মধ্যে গড়-নির্ণয়ের ভার আমার ছিল। ভর্তির সময় কোন সুপারিশ গ্রহণ করিতাম না, এবং ছাত্রের লেখাপড়ার যোগ্যতা ছাড়া অন্য কোন মাপকাঠি অবলম্বন করিতাম না। প্রথম বৎসরের পরই আমি যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের বিশেষ

দাবি অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব দিলাম। কি হইয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় এই বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বোর্ডের স্বীকৃতি পায় ; কিন্তু ইহা আমাদের আর ঝামেলা করে নাই। শিক্ষক নিয়োগেও আমি অবিচলভাবে শুধু গুণগত মানদণ্ডই গ্রহণ করিয়াছি ; কখনও অন্য কোন চিন্তার দ্বারা দক্ষিণে বামে সরিয়া যাই নাই। এইভাবে অগ্রসর হইলে যে কখনও ভুলভ্রান্তি হয় না বা আমি ভুল করি নাই, এমন কথা বলিব না, কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই কাজে দুইটি লোক আমাকে খুব সাহায্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট-সম্পর্কে আমার মত পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমার মনে হয় ইহা আশুতোষের প্রচণ্ড অপকীর্তি। তারকনাথ সেনের বিরক্তি ছিল আমার বিরক্তি অপেক্ষা অনেক তীব্র। প্রেসিডেন্সী কলেজেই সব ভাল ছেলেমেয়ে পড়ে। আমি যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর তারক সেনের পরামর্শানুসারে প্রেসিডেন্সী কলেজের সব ভাল ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুরে আসিয়া ভর্তি হইতে লাগিল। ইহা একটা বিস্ময়কর পরি-বর্তন। যেখানে এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাস পড়ান হয়, সেই আশুতোষ বিল্ডিং যে-ভূমির উপর নির্মিত হয় তাহা পূর্বে বাজার ছিল এবং সেই বাজারের নাম ছিল মাধববাবুর বাজার। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসি, তখনও সেই বাজারের অন্তিম অবস্থা দেখিয়াছি। ভাল ছাত্রদের যাদবপুরে ঝুঁকিয়া পড়ায় বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া যায়। একদিন অপূর্বকুমার চন্দ আমাকে বলেন, 'আপনি যে মাধববাবুর বাজার খালি করিয়া যাদববাবুর বাজার ভর্তি করিলেন।' ইহার জন্য আমি তারকনাথ সেনের কাছে ঋণী। আমার মনে হয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের ইংরেজি বিভাগ এই ঋণগ্রহণের যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে।

আমার বেশি ঋণ তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ত্রিগুণা সেনের কাছে। আমি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি তখন বিধান রায় গত হইয়াছেন। ইহাতে বঙ্গের তথা ভারত-বর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাভবান হইল। অবশ্য জীবনের শেষভাগে কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী এই-সকল নূতন ইউনি-ভার্সিটি নির্মাণ করিতে ব্যস্ত থাকায় যাদবপুরের উপর তিনি বিশেষ নজর দিতে পারেন নাই। তবু বিরাট শনিগ্রহ অস্তমিত হওয়ায় তাঁহার বলয়ও স্তিমিত হইল এবং ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হইল। লোকটি সাদাসিধে ধরনের : বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ছেলেদের হস্টেল, অধ্যাপকদের বহু কোয়ার্টার্স ছিল : এই শেষোক্ত বসতবাটীর একটিতে এই বিপত্নীক লোকটি বৃদ্ধা মাতা ও দুই কন্যাকে লইয়া বাস করিতেন। ইহার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীদের সঙ্গে এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁহার বেশ যোগাযোগ ছিল। অথচ তাঁহার এমন একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল যে তিনি কখনও ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া যান নাই এবং মোহনির্মুক্ত দৃষ্টিতে অধ্যাপকদিগের কাজ বিচার করিতে পারিতেন। তাঁহার চালচলন, কথোপকথন ও প্রশাসনিক কাজে সচরাচরতা ও অনন্যসাধারণত্বের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ আমাকে মুগ্ধ করিত। খুব একটা অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব পাইলে তিনি কি করিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু যাদবপুরের মত মধ্যমায়তনের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি আদর্শ পরিচালক ছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে খুব পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু পাণ্ডিত্যের মূল্যবোধের অভাব ছিল না। সর্বভারতীয় ইংরেজি শিক্ষকসম্মিলনের যাদবপুর অধি-বেশনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পদাধিকার বলে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য তাঁহার রচনা নহে। উহা পাঠ করিয়া নিজের বিচিত্র ঘটনাবহুল বিপর্যয়-কণ্টকিত জীবনে ইংরেজি সাহিত্য

তাঁহার ন্যায় অবিশেষজ্ঞ পাঠকের মনে যে অ-লৌকিক আনন্দ ও সান্ত্বনা দিয়াছে, অল্প কথায় তিনি তাহার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিলেন।

ছাত্রভর্তি, শিক্ষকনিয়োগ, পরীক্ষাপরিচালনা, বিধিনিয়ম রচনা—সকল বিষয়ে ত্রিগুণা সেন আমার পরামর্শ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং বাধা পাওয়া তো দূরের কথা, সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে উৎসাহ দিয়াছে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। শুধু একটি দিলেই যথেষ্ট হইবে। একটা অস্থায়ী পদের জন্য আমি একটি নাম তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি। তিনি অন্য একজন প্রার্থীকে কিছু ভরসা দিয়া থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহার অফিসে বসিয়া আমার সুপারিশ-সম্বলিত চিঠি পান। কেন জানি না, হয়ত তিনি গাড়িতে উত্তর দিকে কোথাও যাইতেছিলেন। চত্বরের উত্তর প্রান্তস্থিত আর্টস ভবনে আসিয়া সেই প্রার্থীর কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাহার যোগ্যতার ফিরিস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। আমি বলিলাম, ইহা নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের উভয়কেই আমি জানি, উভয়েই বেশ যোগ্য, কিন্তু আমি যাহার কথা লিখিয়াছিলাম সে যোগ্যতর। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরের দিনই আমার সুপারিশমত নিয়োগের আদেশ হইল। আমি কখনও বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই ; একবার মাত্র ভোটযুদ্ধে নামিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছি। আর যখন যেখানে অধিষ্ঠিত হইয়াছি—পদাধিকার বলে গিয়াছি। সুতরাং কোথাও আদর্শ-চ্যুতির প্রলোভনই আসে নাই। তাই উচ্চ আদর্শের বুলি কপচাইতে আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। ১৯৬০ সালে যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি তখন লেখাপড়ার দিক দিয়া ইহার যে মর্যাদা ছিল, ১৯৬০ সালে আমার অবসর গ্রহণের সময় তাহা অনেকটা উঁচু হইয়া গিয়াছিল। এই কৃতিত্ব প্রধানতঃ ত্রিগুণা সেনের, তবে তিনি প্রতিপদে আমার কথা শ্রদ্ধাভরে শুনিতেন এবং গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইতেন ; এই হিসাবে আমিও একটু আত্ম-শ্লাঘা অনুভব করি। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, আত্মশ্লাঘা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমার সেবায় স্বীকৃতিস্বরূপ '১৯৬০ সালে আমাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট (ডি. লিট.) উপাধি প্রদান করে। ইহার পর আমার আটাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ইংরেজি বিভাগ 'Essays and Studies' নামে একটা প্রবন্ধসংকলন প্রকাশ করে—যাহার মধ্যে বিদেশী অনেক মনীষীর রচনা থাকে আর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লিখিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হয়। এই জাতীয় শ্রদ্ধার্ঘ পাইয়া সকলেই আনন্দিত হয়, আমিও হইয়াছি। কিন্তু আমি বেশি আনন্দিত হইয়াছি অভিজাত সংবাদপত্র স্টেট্‌স্‌ম্যানে (১৮.৭.৬০) ইহার সমালোচনা পড়িয়া। সুধী সমা-লোচক বিদেশী ও এদেশী প্রবন্ধগুলিকে একই নিরিখে বিচার করিয়াছেন এবং ইহাদের যথোচিত মূল্যায়ন করিতে যাইয়া গৃহজাত শস্যের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। হয়ত ইহা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই যে আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিলেন, ইহা বরণীয় ও স্মরণীয়। রাজনীতিক, মাতৃভাষাপ্রেমিক, হিন্দীভক্ত—ইঁহারা যত পাগলামিই করুন, ইংরেজি ভারতবর্ষে থাকিবে এবং ইহা কখনও অপ্রধান হইবে না। ইংরেজির যথাযথ চর্চা করিতে হইলে আত্মশক্তিতে এই জাতীয় বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। এই কারণেই এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আমি পরম চরিতার্থতার আস্বাদ পাইয়াছি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অমিয় মুখার্জি ও সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি

১

সুদীর্ঘ জীবনে অনেক বই লিখিয়াছি। বই লিখিতে গিয়া প্রথমে নিজেই একসঙ্গে গ্রন্থকার ও প্রকাশক ছিলাম। তারপর নানা প্রকাশকের সংস্পর্শে আসি। আমি বড় লেখক নই, জনপ্রিয় লেখকও নই ; সুতরাং প্রকাশকদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কথা নয় এবং ইঁহাদের সম্যক পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আমার আছে বলিয়াও মনে করি না। অনেকের কাছে প্রকাশকদের বদনাম শুনি ; কিন্তু এই বিষয়ে আমি খুব ভাগ্যবান। আমার কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক কখনও তিক্ত হয় নাই বা সৌহৃদ্যেরও অভাব হয় নাই। একটা কারণ হয়ত এই—আমার বার্ষিক রয়ালটি এত কম যে কেহ আমাকে ঠকাইতে প্রলুব্ধ হয়েন নাই। কেহ কেহ হয়ত সময়মত হিসাব পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, এই পর্যন্ত। এই বিষয়ে আবার সবচেয়ে অপরাধী হইলেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি, ভারতসরকারের সংস্থা, যাঁহাদের এই বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করা উচিত। আমাদের দেশে লেখক ও প্রকাশকের প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাদের দেশে ধনী ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব সীমিত এবং ধনীরাও বইয়ের ব্যাপারে ব্যয়কুণ্ঠ। যাঁহারা বই পড়িতে চান তাঁহারাও অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া পড়িতে পারিলে বই কিনিতে চান না ; আর বই এমন একটা ঋণ যাহা অধমর্ণ বা উত্তমর্ণ কেহই স্মরণে রাখেন না। আমার নিকট হইতে কেহ বই লইয়া ফেরত না দিলে তাহা যত সহজে ভুলিয়া যাই, টাকা লইয়া ফেরত না দিলে তত সহজে ভুলি না। অধমর্ণও সেইরূপ আর্থিক ঋণের জন্য সংকোচবোধ করেন, বইয়ের ঋণকে ঋণ বলিয়াই মনে করেন না ; তাই কিছুদিন পরেই ভুলিয়া যান। একে আমাদের দেশে পাঠকসংখ্যা সীমিত, তারপর সেই পাঠকদের আর্থিক সঙ্গতি আরও সীমিত। সেইজন্য প্রকাশকদের কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। ভাল বই হইলেই যে তাঁহারা বেশি বিক্রয় করিতে পারিবেন এমন মনে করার কোন কারণ নাই। সুতরাং তাঁহারা বই প্রকাশ করিতে আগ্রহী হন না আর বই ছাপা হইলে আমরা—গ্রন্থকারেরা মনে করি—নিশ্চয়ই খুব বিক্রী হইতেছে এবং দুই-চারজন বন্ধুবান্ধব আমাদের মন-রাখা কথা বলিয়া থাকেন। তারপর প্রকাশকের হিসাব দেখিলে আমাদের গভীর হতাশা এবং অবিশ্বাস হয়। মনে করি, আমরা বুঝি ঠকিয়া গেলাম। একটু চিন্তা করিয়া দেখি না যে আমরা নিজেরা মাসে কত টাকার বই কিনি এবং যে-সকল লোক আমাদেব প্রত্যাশাকে ফাঁপাইয়া তোলেন, তাঁহারা নিজেরা আমাদের বই কিনিয়াছেন কিনা অথবা তাঁহারা মাসে বা বছরে কত টাকার বই কিনেন।

ইহা অবশ্য সত্য যে প্রকাশন অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী তাম্বূলরসিক হেম নস্কর মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, গাঁটের পনের আনা বাহির করিলে পুরো টাকাটা ফেরত আসা চাই। নচেৎ সে ব্যবসা ব্যবসা নয়। অমন যে ক্ল্যারেন্ডন প্রেস বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস—যাঁহারা বাস্তবিকই বহু উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও নস্কর মহাশয়ের অর্থাৎ গাঁটের টাকাটা বাহিব করিয়া পনের আনা ফেরত না আসে—এই নীতি শিরোধার্য করেন। সুতরাং আমাদের সীমিতসম্বলসম্পন্ন এবং সীমিত বাজারের কারবারীরা যদি সৎসাহিত্য প্রকাশনে আগাইয়া না আসেন, তাঁহা-

দিগকে দোষ দেওয়া যায় না। পাঠ্য বই, শিশুদের বই প্রভৃতির অবশ্য ভাল বাজার আছে, কিন্তু সেই বাজারেও যোগ্যতা অপেক্ষা ভাগ্যের জোর অনেক বেশি। আমি যে-সকল প্রকাশকের সঙ্গে কাজ করিয়াছি তাঁহাদের সৌজন্য ও সততা সন্দেহাতীত এবং মোটা-মুটিভাবে বলা যায় যে তাঁহারা এই কাজের পক্ষে যোগ্যও বটে। তবে কেহই অনন্যসাধারণ নহেন।

অনন্যসাধারণ মানুষ মাত্র একজন দেখিয়াছি—তিনি অমিয়রঞ্জন মুখার্জি। আমি রাজ-শাহী যাওয়ার আগে আমার এক জ্ঞাতিদাদা তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দেন, কিন্তু আমার বদলির জন্য সেই পরিচয় সংস্রবে পরিণতিলাভ করে নাই। আমি রাজশাহী থাকাকালে আমার 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। আমার পক্ষে বই ছাপা, বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা কঠিন হইত ; এই সময় কলিকাতায় আকস্মিকভাবে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা এবং তাঁহাকে আমি এই গ্রন্থের প্রকাশনভার দিই। রাজশাহী ফিরিয়া কিছুদিন পরে দেখি—বইয়ের চেহারা অন্যরকম হইয়াছে, দাম বাড়িয়াছে, বিক্রি বাড়িয়াছে এবং আমার প্রাপ্যও বাড়িয়াছে। কিছুদিন পর কলিকাতা ফিরিলাম এবং অমিয়বাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তিনি বহুদিন গত হইয়াছেন, কিন্তু আমার সঙ্গে এই প্রকাশনসংস্থার সম্পর্ক অটুট রহিয়াছে। সর্বময় কর্তা চলিয়া গেলেও একটা ছোট সংস্থা এত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহা বড় একটা দেখা যায় না এবং দেশী ও বিলাতী সকল প্রকাশককে বাদ দিয়া আমি যে শুধু তাঁহার কথাই লিখিতেছি, ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্য, যাহা মৃত্যুর পরও এই সংস্থাকে সজীব রাখিয়াছে।

অমিয়বাবুর চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য ও বৈচিত্র্য-সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখিতে গেলে একখানা পৃথক বই লিখিতে হয়। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিব। তিনি আমার জ্ঞাতিদাদা দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ইঁহার শ্যালকেরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র, কিন্তু অমিয়বাবুর নিজের পড়াশোনার পুঁজি যৎসামান্য—স্কুলের কয়েক ক্লাস পর্যন্ত হইবে। কিন্তু নিজে বই না পড়িলেও বইয়ের দোকানের—বীণা লাইব্রেরির—সেল্‌সম্যান হিসাবেই তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ভাইপো কুমুদনাথ (দেবেন্দ্রনাথের পুত্র) আমাকে বলিয়াছে যে এই সময়ে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল কুড়ি টাকা, আর যখন তিনি মারা যান তখন তাঁহার সমগ্র এস্‌টাব্‌লিশমেন্টের ব্যয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা। এই বিবর্তনের ইতিহাস আমি জানি না। আমি যখন কলিকাতায় আসি তখন তাঁহার বেশ বড় কারবার, পূর্ব-পরিচিত অনেককে তিনি কাজ দিয়াছেন, পরে আমার দুই বিপন্ন আত্মীয়কেও চাকুরী দিয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি যে বীণা লাইব্রেরির এক সহকর্মীকে তিনি ভাল বেতনে কাজ দিয়াছিলেন এবং ঈর্ষাপরবশ হইয়া সেই ভদ্রলোক সরকারি নানা সংস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে নানা বেনামী চিঠি দিতেন। কিন্তু অমিয়বাবু সমস্তটা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিতে চাহিতেন না। যাঁহারা ম্যানেজমেন্টে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন, তাঁহারা চাপ দিতে লাগিলেন অথবা বোধ হয় সেই ভদ্রলোকও টের পাইয়াছিলেন। ঠিক মনে নাই কিভাবে ইহা ঘটিয়া-ছিল, তবে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। আমি যাঁহাদের চাকুরী করাইয়া দিয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে একজন হিসাবরক্ষকের সহকারী ছিলেন। অমিয়বাবুর সেরেস্তা তখন বড় হইয়াছে। ইনি দূরে একটা ঘরে বসিতেন। সেখানে বোধ হয় বই বিক্রির দপ্তর ছিল। অনেক দিন পরে দেখি তিনি তাঁহার চেয়ারে নাই। অমিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি একদিন অমিয়বাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া জানান যে তিনি খানিকটা টাকা সরাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন, আর পূরণ করিতে পারেন নাই। অমিয়বাবু যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। সুযোগ

হইলেই তিনি এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। অমিয়বাবু আর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই, এমন কি আমাকেও কিছু বলেন নাই। আমার বন্ধু ইন্‌করপোরেটেড অ্যাকাউন্টেন্ট ধীরেন গুহরায় অমিয়বাবুর অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। যুদ্ধের সময় ব্যাঙের ছাতার মত অনেক ব্যাংক মাথা চাড়া দিয়া উঠে—যাহারা বেশি সুদের ভরসা দেয়। এই জাতীয় উদ্যোক্তারা অমিয়বাবুকে আমানতকারী জুটাইয়া দিতে অনুরোধ করেন এবং অমিয়-বাবুর অনুরোধে—এবং বেশি সুদের আশায়—কিছু কিছু লোক এইসব ব্যাংকে টাকা রাখেন। যুদ্ধের মরশুম চলিয়া গেলে ইহাদের লালবাতি জ্বালাইবার পালা আরম্ভ হয়। ধীরেন গুহরায় আমাকে বলিয়াছেন যে এইসব ব্যাংক ফেল পড়িলে যাঁহারা অমিয়বাবুর কথায় টাকা রাখিয়াছিলেন, কিস্তিবন্দী করিয়া তিনি নিজে তাঁহাদের টাকা পরিশোধ করিয়া দেন।

অমিয়বাবুর প্রধান আনন্দ ছিল বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়নে। আমার বাড়িতে প্রত্যেক রবিবার বন্ধুদের—বিশেষ করিয়া ছাত্রাবস্থায় আমাদের সমসাময়িকদের—একটা আড্ডা বসিত। প্রতিবৎসরই নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে একদিন অমিয়বাবু একগাদা ভাল ক্যালেন্ডার, নানা আয়তনের ডায়েরি লইয়া আসিয়া আমার বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া যাইতেন। আমাদের আড্ডায় তাঁহার অংশগ্রহণের বিশেষ কিছু ছিল না। নিজে যে বিশেষ ধূমপান করিতেন তাহা নহে, কিন্তু পরার্থে ভাল সিগারেট রাখিতেন। যে রবিবার খুব ভাল সিগারেট পাইতেন, আমাদের আড্ডায় আসিয়া ধূমপায়ীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাঁহাদের হই-হুল্লোড়ে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। শীতের দিনে টেস্ট ক্রিকেট খেলা দেখা একটা বিলাস। ইডেন উদ্যানে খুব ভিড় হইত ; সদলবলে অমিয়বাবুও যাইতেন। ধীরেন গুহ-রায়ের কাছে শুনিয়াছি, খেলা অপেক্ষা অমিয়বাবুর লক্ষ্য ছিল বন্ধুদের আপ্যায়নে—মাঝে মাঝে চা এবং ঘন ঘন সিগারেট বিতরণে। আবার খেলোয়াড়দের মধ্যাহ্নভোজনের আগে তিনি বাড়ি আসিতেন বন্ধুদের জন্য খাবার বহন করিয়া লইবার জন্য। একবার খেলাটা এমন মোড় লইতেছিল যে, বিরতির পূর্বেই উহা শেষ হইয়া যাইতে পারে। অমিয়বাবুর খেলার দিকে লক্ষ্য কম, কাজেই ব্যাপারটা তিনি ঠিক অনুধাবন করেন নাই। বিরতির বেশ আগে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়াছেন—শেষের দিনে একটু ভাল আপ্যায়নের জন্য। কিন্তু খেলার গতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে সেই দিন বিরতির পূর্বেই খেলা শেষ হইয়া যাইতে পারে। হইলও তাই। খাবার প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া অমিয়বাবু দেখেন—বিরাট গড়ের মাঠে গুটি-দুই কাক বসিয়া আছে।

উপরের গল্প ধীরেন গুহরায়ের কাছে শোনা। আমার নিজেরও একটু অভিজ্ঞতা আছে। অমিয়বাবু বাঙ্গাল, কাজেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক ও মেম্বরও। যেখানেই বাঙ্গালী সেইখানেই দলাদলি। এক পক্ষের কয়েকজন উৎসাহী সদস্য অমিয়বাবুকে বলিলেন যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের টিউবওয়েলের জল খুব স্বাস্থ্যকর, সুতরাং অমিয়বাবুর তাহাই পান করা উচিত এবং বৈকালে ঐ ক্লাবের তাঁবুতে গড়ের মাঠের মুক্ত হাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। আমার কলেজের পড়ান ও অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতে দেরি হইত। অমিয়বাবুর সঙ্গে আমার কাজও থাকিত। আমি ঐ সময় রোজই ট্যাক্সি করিয়া বাড়ি ফিরিতাম। অমিয়বাবু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে আমি রোজ ফিরতি পথে তাঁহার দোকানে যাইব ; তাঁহারা রোজই গাড়িতে করিয়া গড়ের মাঠে যান ; সেইখানে তিনি কলসী-সহ ও দলবলসহ নামিবেন এবং গাড়ি আমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। তাঁহার দোকানে সহযাত্রীরা একত্র হইলে দোকানে এবং গাড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দলাদলির কথা রোজই শুনিতাম। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখর, তাঁহারা সবাই ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী ; কিন্তু ইহাও বুঝিতাম, ক্ষমতাসীন দলও অমিয়বাবুকে চায় আর অমিয়বাবু এই দলা-

দলিতে উদাসীন, হয়ত আমারই মত ইহার জটিলতা-সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আসিয়া অধিকসংখ্যক জানাশোনা লোকের সঙ্গে গল্প করিলেন এবং আমাকেও বাড়ি পঁহুছাইয়া দিতে পারিলেন, এই আনন্দই তাঁহার কাছে মুখ্য। এখন আমার মনে হয় যে হয়ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের টিউবওয়েলের জলের মাহাত্ম্যও ঐ সহযাত্রীদের উদ্ভাবিত কিংবদন্তীমাত্র।

এই-সকল কথা বলিবার জন্য অমিয়বাবুর কথা উত্থাপন করি নাই। প্রকাশক হিসাবে তাঁহার অনন্যতাই আমাকে চমৎকৃত ও বশীভূত করিয়াছে। তাঁহার নিজের কোন বিদ্যাবত্তা ছিল না বলিলেই চলে, তিনি যে চতুর ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন না, উপরি-লিখিত বর্ণনা হইতেই তাহা স্পষ্ট হইবে। তবু এই লোকটি বিদ্বানদের আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি যাঁহাদের লেখা ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন যদুনাথ সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ। কোন বইয়ের গুণাগুণ তিনি নিজে বিচার করিতে পারিতেন না। কিন্তু যতই সহজ সরল নমনীয় প্রকৃতির লোক হউন, তাঁহার যে-সকল কর্মচারী নির্বাচিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করিতেন, প্রুফ দেখিতেন, অনুরূপ পদে ইঁহাদের মত যোগ্য লোক আমি খুব কম দেখিয়াছি। মনে হয় এই বিষয়ে তাঁহার একটা instinct ছিল। উৎকৃষ্ট বই ছাপিতে হইলে সম্পাদন, পরিদর্শন নিখুঁত হইতে হইবে। এই জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে আসিল আমি কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারি নাই। তিনি যে অনেকভাবে ঠকিয়াছেন রসিক-বন্ধু ধীরেন গুহ-রায় তাহার মজার ফিরিস্তি দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সংস্থা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের মানের যাহাতে অবমাননা না হয়, সেইদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল এবং সেইজন্য তিনি ক্ষতিস্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইহাই তাঁহার চরিত্রের সেই গুণ যাহা অন্ততঃ আমি দেশী বা বিলাতী কোন প্রকাশকের দেখি নাই। ইহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা সহজবোধ্য হইবে।

ডক্টর রাসবিহারী দাশ কান্টদর্শনের উপর বাংলায় একটি বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখা গৌণ। দার্শনিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার একটা দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাই বইটির প্রধান অংশ। রাসবিহারীবাবু অসহায়। একে কাণ্ট ; প্রবাদ আছে তাঁহার 'ক্রিটিক অফ পিউর রিজন' বইটির পাণ্ডুলিপি জনৈক বন্ধুকে দেখিতে দিয়া-ছিলেন। ছ' মাস পর বন্ধু কাণ্টকে পাণ্ডুলিপি এই কথা বলিয়া ফেরত দিলেন যে ছ' মাসেই তিনি বিভ্রান্ত হইয়াছেন, আর ছ' মাস রাখিলে তিনি একেবারে উন্মাদগ্রস্ত হইবেন। তবু বুঝি না বুঝি, ইংরেজিতে কাণ্ট-সম্পর্কে বই পড়িতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলায় ? অপর দিকে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে লইয়াও সেই অবস্থা। দর্শন-সম্পর্কে তাঁহার ইংরেজি রচনা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ইহার দুরূহতা-সম্পর্কে একমত। আমি একদিন অমিয়বাবুর কাছে কথাটা উত্থাপন করিতেই তিনি উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি যেভাবে পেশ করিয়াছিলেন আমি প্রায় হুবহু তাহার পুনরুক্তি করিতেছি। যাহাতে সাধারণ ছাত্রেরা মুখস্থ করিয়া পাস করিতে পারে সেই জাতীয় নোট বা সহায়ক পুস্তকের বহুল বিক্রয় হইতেই তাঁহারা মুনাফা করেন। এই জাতীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মূল্যবান গ্রন্থ ছাপিযা যদি কিছু লোকসান হয় তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। তিনি এই বই ছাপিলেন এবং পরে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে একটু ধীরে ধীরে হইলেও প্রথম সংস্করণের সব বই তিনি বিক্রয় করিতে পারিয়াছেন। বহুদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহচর্যে আমি 'ধ্বন্যালোক ও লোচন' অনুবাদ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্যামাপ্রসাদবাবুর দ্বারস্থ হইয়া আমি যে কিরূপ নিরাশ হইয়াছিলাম তাহা পূর্বে

বলিয়াছি। আমি মূল সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় ও বাংলা অনুবাদ বাংলা হরফে ছাপিতে ইচ্ছা করি, কারণ বাঙ্গালী পাঠক দেবনাগরী হরফের সঙ্গে সুপরিচিত নহে ; তাহারা ব্যাকরণ কৌমুদী এবং রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যের টীকা বাংলা হরফেই পড়ে। আবার ইহাও সত্য যে বাংলা সংস্কৃতেরই দুহিতা ; মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি সঙ্গে থাকিলে সংস্কৃতে অব্যুৎপন্ন পাঠকের কাছেও এই গ্রন্থের অর্থ সুগম হইবে। সব প্রেস এই বই ছাপিতে পারিবে না। তারপর এইরূপ দুরূহ গ্রন্থ খুব বেশি জনপ্রিয় হইতে পারে না, অথচ আয়তনে বড় হইবে বলিয়া ইহার দাম বেশি হইবে। আমি অবশ্য খুব বেশি ঘুরি নাই। তবে যেসব প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন রাজি হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনিও কয়েক পৃষ্ঠা ছাপিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেন। অমিয়বাবুকে বলা মাত্র তিনি রাজি হইলেন এবং আমাকে লইয়া নানা প্রেসে গেলেন এবং ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা গ্রন্থকারেরা কোন রয়ালটি লইব না এই কথা বলিতেই তিনি নিজেও কোন মুনাফা করিলেন না এবং শুধু মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের খরচের ভিত্তিতে বইয়ের দাম ঠিক হইল।

এই বইটির পরের ইতিহাসও শিক্ষাপ্রদ। শিক্ষাদপ্তরের প্রধান প্রধান কাজে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র নিজেই শিক্ষামন্ত্রীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজস্ব পরামর্শদাতাও ছিলেন। মূল শিক্ষাদপ্তরের কাজে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন। তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল সংস্কৃত শিক্ষায়। তিনি সংস্কৃত কলেজের আমূল পরিবর্তন করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যার প্রসারের জন্য অন্য অনেক প্রকল্প গ্রহণ করিলেন। বিধান রায় তাঁহাকে এই বিষয়ে অনেক স্বাধীনতা দিলেন এবং হরেনবাবু সংস্কৃতের প্রসারকল্পে বেশ কিছু অর্থব্যয়ও করিলেন। অমিয়বাবু দুই কপি 'ধ্বন্যালোক-লোচন' সোনার জলে নাম লিখাইয়া হরেনবাবুকে উপহার দিলেন এবং কলেজ লাইব্রেরির জন্য তিনি এই মূল্যবান বই কিনেন—এই মর্মে দরখাস্ত দিলেন। হরেনবাবু কিছুই করিলেন না বা করিতে পারিলেন না। কিন্তু অমিয়বাবুর উৎসাহ ও অধ্যবসায় সান্ত্বনা পুরস্কার পাইল। বর্ষশেষে ডিরেক্টরের অফিসে কিছু অবশিষ্ট টাকা থাকে। অমিয়বাবু সংবাদ পাইলেন যে ডিরেক্টরের নিরক্ষরতা দূরীকরণ (Adult Literacy) বিভাগে কিছু টাকা পড়িয়া আছে এবং সেই বিভাগ হইতে বারখানি বই কেনা হইল। যাঁহারা অ-আ, ক-খ শিখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের রচনা খুব পুষ্টিকর খাদ্য বটে! এই ছোট্ট ঘটনাটি বিধান রায়-হরেন চৌধুরীর মস্তিষ্কের উপর অপূর্ব টিপ্পনী। অমিয়বাবু ধ্বন্যালোক গ্রন্থের নামই ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না ; কিন্তু এই গ্রন্থের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তিনি ক্ষতিস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁহার অকালমৃত্যু না হইলে এই মূল্যবান গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইত।

অমিয়বাবুর আর একটি অর্ধসমাপ্ত অভিযানের কথা বলিব। ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র খুব বেশী পড়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাটকের উল্লেখযোগ্য সংস্করণ বেশি প্রকাশিত হয় নাই। পার্সিভেলের সম্পাদনায় যে-সকল বই বাহির হইয়াছে তাহা ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার Faerie Queene-এর সম্পাদনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মাদ্রাজ হইতে মার্ক হান্টার যে 'জুলিয়াস সীজার' বাহির করিয়াছিলেন তাহার উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ সম্পাদকেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যদিও মার্ক হান্টার রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচারের ফেলো ছিলেন এবং তাঁহার অনেক রকমের সুযোগ ও সুবিধা ছিল, তবু এই বইটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন অবশ্য আমরা অন্ধকার যুগে পদার্পণ করিতে চলিয়াছি। কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগেও

শিক্ষাজগতের মেজাজ অন্যরকমের ছিল। অমিয়বাবুর মাথায় একটা আইডিয়া জাগ্রত হইল। শেক্সপীয়রের উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা একাধারে ছাত্রপাঠ্য বই হইবে, আবার তাহা রসিকজনের আনন্দের ভাণ্ডার হইবে। ইহার সাধারণ সম্পাদক হইব আমি আর আমার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত ব্যক্তিরা এক-একটি বইয়ের ভূমিকা ও টীকা লিখিবেন। চার-পাঁচখানা বই এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি বই বাজারে প্রচলিত সংস্করণের তুলনায় আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিল। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল সদানন্দ চক্রবর্তীর ম্যাকবেথ। একে আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তেমন মন দিতে পারিলাম না আর ক্রমে ইংরেজির মান নিম্নগামী হওয়ায় এই জাতীয় বিদগ্ধজনের ব্যবহার্য সংস্করণের বাজারও সংকুচিত হইল। কিন্তু অমিয়বাবুর প্রশংসনীয় উদ্যমের কথা আমি ভুলি নাই এবং আরও কিছু লোক ভোলেন নাই, কারণ মাঝে মাঝে পরিচিত অপরিচিত শেক্সপীয়র প্রেমিকরা এই সংস্করণের অনুসন্ধান করেন।

অমিয়বাবুর চরিত্র এত বিচিত্র, বিশিষ্ট ও মাধুর্যমণ্ডিত ছিল যে তাহার সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রকাশক হিসাবে তাঁহার অনন্যতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই ছেদ টানিলাম।

২

অমিয়বাবুর পরেই আর একজনের কথা বলিব, যদিও এইরূপ বিসদৃশ দুইটি লোক পাওয়া দুষ্কর। ইনি হইলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই ব্রাহ্মণ এবং উভয়েই বিদ্যোৎসাহী—এইখানেই সাদৃশ্য শেষ। অমিয়বাবুর বিদ্যার পুঁজি খুবই সামান্য আর সুনীতিবাবুর মত পণ্ডিতলোক যে-কোন দেশে বিরল। অমিয়বাবু বহু লেখকের বহু বই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সুনীতিবাবুর কোন বই প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আমার মন্তব্য লিখিতে গিয়া অমিয়রঞ্জনকে আর টানিব না। সুনীতিবাবু শুধু বিদ্বান নহেন, বিদ্যারসিকও। গণিত ও বিজ্ঞানের বাহিরে যাহা কিছু জানিবার আছে সেইখানেই তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। সেইজন্যই তিনি কোন একটি বিষয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ হইলেও তিনি ব্রাউনিঙ-বর্ণিত বৈয়াকরণের মত আজীবন ব্যাকরণের টুকিটাকির মধ্যে নিমগ্ন থাকার লোক ছিলেন না। বিদ্যাচর্চায় তাঁহার উৎসাহ ছিল—ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে; আর উৎসাহ ছিল সঙ্গীতে, শিল্পে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে; ইহা ছাড়া তিনি ছিলেন ভোজনবিলাসী, ভ্রমণ-বিলাসী এবং বৈঠকী গল্পবিলাসী। পরিণত বয়সেও তাঁহার ভোজনে শিশুসুলভ আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিয়াছি। তিনি কত দেশে এবং কোন্ কোন্ দেশে কতবার গিয়াছেন তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিবে না। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি চোখের ছানি কাটাইয়া ফ্রান্সে কোন কনফারেন্সে যাইবেন এবং পরের বৎসরে জার্মানীতে ঐ জাতীয় কোন কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন—এইসব সবিস্তারে আমাকে বলিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর। এই উৎসাহ-বৈচিত্র্যের অপর একটা দিকও আছে। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নহি। তবে ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে তাঁহার সবচেয়ে বড় কাজ বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of the Bengali Language সংক্ষেপে O. D. B. L.) যখন লিখিত হয় তখন তাঁহার বয়স ৩০/৩৫ মাত্র। কিন্তু ইহার পর তিনি অর্ধশতাব্দী বাঁচিয়া লেখা-পড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও এইজাতীয় কাজ আর করেন নাই। যতদূর জানি, দ্বিতীয়

সংস্করণ বাহির করিতে হইলে ইহার যে পরিবর্জন, সংশোধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন, তাহাও করেন নাই। দেশ-বিদেশে পণ্ডিতসমাজ এই বই পাইবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায়, শুনিয়াছি, কোন প্রকাশনসংস্থা তাঁহার অনুমতি লইয়াই এই বিরাট গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার ফটো লইয়া তাহা ছাপে। সুনীতিকুমার নিজেই রহস্য করিয়া বলিতেন, কোন ফরাসী পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'সুনীতি, আমরা আশা করিয়াছিলাম তুমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি হইলে কিনা একজন ভূপর্যটক (globe-trotter) !'

আমি যখন এম-এ পড়ি, তখন সুনীতিকুমার অ্যাংলো-স্যাকসন পড়াইতেন। কিন্তু আমি ঐ বিষয় পড়ি নাই বলিয়া তাঁহার ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহা কথার কথা নহে। আমার সহাধ্যায়ী ও পরবর্তীদের কাছে তাঁহার অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনিয়াছি। কাজেই তাঁহার কাছে যে পড়ি নাই ইহা একটা দুর্ভাগ্য। ১৯২৬—২৭ সালে তাঁহাকে শ্রীকুমারবাবুর বাড়িতে দেখিয়াছি। ইঁহারা উভয়েই স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ; ব্যবধান এক বছরের। যখনকার কথা বলিতেছি তখন যদুনাথ সরকার ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়াছেন এবং ইঁহারা উভয়েই তখন যদুনাথ সরকারের অনুগামী অর্থাৎ আশুতোষ-বিরোধী। শ্রীকুমারবাবুর কথা এখানে ছাড়িয়া দিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবু বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতার দলকে সংহত করিলেন, সরকারের (উভয় অর্থে—যদুনাথ সরকার ও বঙ্গ সরকারের) দলে তখন ভাঙ্গন শুরু হইল। আরও অনেকের সঙ্গে সুনীতিবাবু তখন ধীরে ধীরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর দিকে ভিড়িতে লাগিলেন। স্মরণীয় ব্যতিক্রম ছিলেন বিনয়কুমার সেন, তিনি কখনও প্রসাদভিক্ষু হয়েন নাই। শ্যামাপ্রসাদবাবু আবার হিন্দুমহাসভার নেতা ও সভাপতি হইলেন। হিন্দুমহাসভা—জনসংঘ—ভারতীয় জনতা—এই দলের প্রধান সমর্থন আসে উত্তর ভারত হইতে এবং এই সমর্থকরা সবাই হিন্দীপ্রেমিক। শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছের লোকদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ভাষাজ্ঞানী সুনীতিবাবু ; সুতরাং ইঁহাদের সান্নিধ্য এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবুর সান্নিধ্য সব সময়ই কিছু দক্ষিণা বহন করে। এই সময় সুনীতিবাবুর কথাবার্তায় এবং টুকিটাকি রচনায় হিন্দুমহাসভা-সমর্থনের আভাস পাওয়া যাইত। কেহ কেহ মনে করেন, হাসান সুরাবর্দী যে তাঁহার মত পণ্ডিতব্যক্তির সেনেটের সদস্যপদের মেয়াদ বাড়াইলেন না, সুনীতিবাবুর হিন্দুমহাসভাপ্রীতি ইহার অন্যতম কারণ। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কংগ্রেসের সমর্থনে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হইলেন। বেতন ভাল, অথচ কাজ কম। একদল হইতে অন্য দলে এইরূপ পরিক্রমা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। সুনীতিবাবুর বহুমুখী পাণ্ডিত্য থাকিলেও এই সঞ্চরণ-শীলতার জন্য আমিও তাঁহার প্রতি তেমন আকৃষ্ট হই নাই। একসঙ্গে ডক্টরেটের থীসিস পরীক্ষা করিয়াছি ; আমার মনে হইত তিনি অভিনিবেশ-সহকারে এইসকল কাজ করিতেন না। বিধান রায় মহাশয়ও ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনিই সুনীতিবাবুকে কাউন্সিল অর্থাৎ আমাদের লর্ড সভার প্রেসিডেন্ট করেন। তথাপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কে নূতন আইন পাস করিয়া যখন ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করার কথা ওঠে, তখন স্বভাবতঃই উঁচু মহলে সুনীতিবাবুর নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু বিধানবাবু তাঁহার অগোছাল কাউন্সিল চালনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে সুনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জটিলতা ও ঝামেলা সামলাইতে পারিবে না। একবার তাঁহার প্রতি আমি একটু বিরূপই হইয়াছিলাম। এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন—বাহিরের এক্সপার্ট হিসাবে আসিয়াছেন সুনীতিকুমার, তাঁহার অন্তরঙ্গ (বোধ হয় ছাত্র) এক ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং আমি। সুনীতিকুমার একটি প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিলেন ; তিনি কলিকাতার

দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ, লণ্ডনের ডক্টর (বোধ হয় বাংলা ব্যাকরণ-সম্পর্কে গবেষণার দ্বারা) এবং অধ্যাপনাও বিদেশেই করেন। সুনীতিবাবুর সঙ্গী তো এই প্রার্থীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি বলিলাম, স্থানীয় প্রার্থীদের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর এম-এ আছেন, তিনি জীবনীসাহিত্যের উপর থীসিস লিখিয়া ডক্টরেট পাইয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থ তথ্যপূর্ণ ; সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এখানে আসার পূর্বে যেখানে যেখানে কাজ করিয়াছেন—সর্বত্র তিনি অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য প্রতুল রক্ষিত সুনীতিবাবুদের প্রস্তাবিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বলিলেন যে যোগ্যতার যে ফিরিস্তি বিজ্ঞাপনে দেওয়া হইয়াছিল, তদনুরূপ যোগ্যতা ইঁহার নাই। সুনীতিবাবুর সঙ্গী খুব জোরের সহিত এবং একটু উগ্রভাবে তাঁহাদের প্রার্থীর গুণ ব্যাখ্যান করিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলর আমাদের চারজনকে আমাদের মতামত লিখিয়া দিতে বলিলেন। যাহা আমার মনে পীড়া দিল তাহা সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা ; তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতায় তিনি বিশ্বাস করেন এইরূপ মনে হইল না। তিনি যেন তাঁহার অনুগামী, শিষ্যস্থানীয় সহযোগীর প্রতিধ্বনিমাত্র। তবে একটা কথা বলিতে হইবে—আমি যে আমার মনোনীত প্রার্থীর লিখিত জীবনীসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলাম, বিদ্যানুরাগী সুনীতিকুমারের মনে তাহা গাঁথা হইয়া রহিল।

এতক্ষণ সুনীতিকুমারের যে বর্ণনা দিয়াছি তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও মানুষটির আসল পরিচয় দেয় না। আমার পরিচয়ের পরিধি সীমিত। সুতরাং খুব বেশি বিদ্বান লোক দেখি নাই। প্রবাদ আছে যে 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার বেশি পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের বিদ্যা অপেক্ষা আত্মম্ভরিতা অনেক বেশি প্রকট ও উৎকট। যাঁহাদের সত্যিকার পাণ্ডিত্য আছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে, তাঁহারা সমালোচনায় অসহিষ্ণু অথবা একবার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সেখানে অচল অনড়। ইহা মননশক্তির অপরিণতিরই সাক্ষ্য দেয়। সুনীতি-কুমার কিন্তু একেবারে অন্য ধাঁচের মানুষ ছিলেন। আগে জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছি ; তাহার মধ্যে যে বিদ্রূপ মিশ্রিত আছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। তবু তিনিই ইহা বলিয়া বেড়াইয়াছেন। আমরা বছর তিন-চার একসঙ্গে রবীন্দ্রপুরস্কার নির্বাচক কমিটির সদস্য ছিলাম। এখানে তাঁহার ও আমার মতের ঐক্য বড় একটা হইত না। কিন্তু দুই-একটা ছোটখাট ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমি সদস্য হওয়ার আগেই তিনি সদস্য ছিলেন। একবার সংবাদপত্রে কমিটির খুব বিরূপ সমালোচনা হয় ; অভিযোগ ছিল—কমিটি যে বইকে পুরস্কার দিয়াছেন তাহার নামই তাঁহারা ঠিক করিয়া লিখিতে পারেন নাই। ইহার পরের বছর আমি এই কমিটিতে আসি এবং ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই সুনীতিকুমার এই বেয়াকুবির দোষ ও দায়িত্ব সবটাই নিজের উপর লইলেন। এই-সরল স্বীকারোক্তিতে আমি খুব বিস্মিত হইয়াছিলাম ; কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একে অপরের উপর দোষ চাপায়, ইহাই মানুষের ধর্ম। এই বছরই কিনা মনে নাই, একবার এই কমিটিতে বেশ একটু মতদ্বৈধ হয়। সেইবার সুনীতিকুমার সভাপতি ছিলেন ; তিনি প্রস্তাব করিলেন যে তিনি ভাষাচর্চা করেন এবং সাহিত্য-বিচারের যোগ্যতা তাঁহার নাই। বিতর্কিত গ্রন্থগুলি আমার কাছে পাঠান হউক এবং আমি যে গ্রন্থ সুপারিশ করিব তাহাই কমিটি গ্রহণ করিবে। এইভাবে সেইবার আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হইল।

একটা বাংলা প্রফেসরশিপ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদের সঙ্গে যে আমার খুব মতবিরোধ

হয় সেই কথা পূর্বে বলিয়াছি। পরে বিশ্ববিদ্যালয় আমার মতই গ্রহণ করেন এবং আমার মনোনীত প্রার্থীই এই পদ পান। সুনীতিকুমার তখন জাতীয় অধ্যাপক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারই তাঁহার অফিস। তাঁহার বোধ হয় একটা কাজ ছিল পরামর্শপ্রার্থী গবেষক-দিগকে নির্দেশ দেওয়া। একটু আগেই বাংলার যে প্রফেসরের কথা বলিলাম, একদিন ইংরেজি সাহিত্যের এক অ-বাঙ্গালী অধ্যাপক তাঁহার কাছে উপস্থিত। ইনি জাতীয় গ্রন্থাগারে ইংরেজি চরিত-সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করিতেছেন এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্তন শিক্ষক বহুশ্রুত জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারের কাছে উপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। জাতীয় অধ্যাপকের পরামর্শক্রমেই তিনি আমার মনোনীত বাংলার প্রফেসরের কাছে আসিয়াছেন—কিভাবে চরিত-সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে তাহার পথনির্দেশের অপেক্ষায়। শ্রোতা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমিও অবাক হইয়া গেলাম। কমিটিতে আমি যে এই লোকটির থীসিসের কথা বলিয়াছিলাম বিনয়ী বিদ্যোৎ-সাহী সুনীতিকুমার তাহা ভুলিয়া যান নাই।

এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে ছায়াপাত করিলেও রেখাপাত করে নাই। কিন্তু পরে যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত ও তুলনাহীন। ১৯৬০ সালে আমার দুরন্ত হৃদ্‌রোগ (massive heart-attack) হয়। বাঁচিয়া উঠিলেও আমি খুব অসুস্থ ; সাহিত্য-অ্যাকাডেমির আঞ্চলিক সম্পাদক শুভেন্দুশেখর মুল সভাপতি সুনীতিকুমারের 'জয়দেব' গ্রন্থটি আমাকে লেখকের পক্ষ হইতে উপহার দিল। আমার অসুস্থতার কথা বলায় তিনি নাকি অনুরোধ করিয়াছেন যে আমি নিজে পড়িতে না পারিলে শুভেন্দু বা অন্য কেহ যেন আমাকে পড়িয়া শোনায়। অগত্যা বইখানি রাখিলাম এবং ধীরে ধীরে পড়িলাম। শুভেন্দু সেই সময় আমার কাছে কার্যোপলক্ষে প্রায়ই আসিত। সে বলিল যে সুনীতিবাবু আমার মতামত প্রত্যাশা করিবেন। আমি লিখিয়া দিলেই ভাল হয় ; অসুবিধা হইলে তাহাকে মুখে বলিলে সে জানাইয়া দিবে। আমি ধীরে ধীরে আমার মত লিখিলাম এবং খামে তাহা পুরিলাম ; খামটা সামনে রহিয়াছে, তখনও বন্ধ করি নাই। এমন সময়, কেন মনে নাই, আমার ছাত্র প্রতিভাকান্ত মৈত্র উপস্থিত। সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ এবং সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা নাই তাহাও সে জানিত। সামনের ঠিকানা লেখা খামটা চোখে পড়ায় তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল এবং চিঠি লেখার কারণ বলিয়া দিলে ঐ চিঠিটা পড়িবার অনুমতি চাহিল। আমার আর আপত্তি কি? কিন্তু সে চিঠিটা পড়িয়া অযাচিত পরামর্শ দিল, আমি যেন চিঠিটা ডাকে না দিই : কারণ আমার অভিমতে দুই-চারিটা প্রশংসাবাক্য থাকিলেও মোটের উপর উহা প্রতিকূল এবং বিশদ যুক্তিপূর্ণ বলিয়াই সেই প্রতিকূলতা লেখকের মনে বাজিবে। একজন বুড়ো মানুষকে আঘাত দিয়া লাভ কি? আমি এই দিকটা ভাবিয়া দেখি নাই। প্রতিভাকান্ত চলিয়া গেলে একটু ইতস্ততঃ করিলাম। তারপর ভাবিলাম, তিনি আমার মতামতের প্রত্যাশা করিয়াই শুভেন্দুকে দিয়া বইখানি পাঠাইয়া-ছিলেন এবং আমার সত্যিকার মতামতই দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে নীরবতা ও প্রিয় মিথ্যা-ভাষণ অপেক্ষা অপ্রিয় সত্যভাষণই শ্রেয়ঃ। তিনি যদি বিরক্ত হয়েন, আমি কি করিব? আমি চিঠিখানি সেই দিনই ডাকে দিয়া দিলাম এবং ব্যাপারটি একেবারে ভুলিয়া গেলাম। সপ্তাহখানেক পরে জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক বাড়ির ঠিকানা এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সনাক্ত করিয়া জানাইলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। কেন আসিয়াছেন আমি আন্দাজ করিতে পারি নাই। আমার জল্পনা করিবার সময়ও ছিল না, কারণ অচিরেই সশরীরে সুনীতিকুমার আমার ঘরে পদার্পণ করিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমার চিঠিতে নাকি গভীর

সাহিত্যজ্ঞান ও সূক্ষ্ম সাহিত্যবিচারের পরিচয় আছে, তাহার প্রশংসা করিতে করিতে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে নানা মজলিশী গল্প করিলেন।

ইহার পর তিনি বছর-তিনেক বাঁচিয়া ছিলেন। কয়েকবার আমার কাছে আসিয়া-ছিলেন এবং নানা গল্পগুজব করিয়াছেন। এইরূপ সহৃদয়তা এবং নিছক সত্যানুসন্ধানের দৃষ্টান্ত আমি আর দেখি নাই। আমি তখন সত্তর পার হইয়াছি, তিনি তো অনেকদিন আশী ছাড়াইয়াছেন। আমার কিছু দেওয়ার নাই, তাঁহারও আমার নিকট হইতে কিছু পাওয়ার নাই। কাজেই কোনক্রমেই কোন অভিসন্ধি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার আর একখানি বই পাঠাইলেন। ইহা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে লিখিত। তাঁহার মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে দশটা 'complex'-এ ভাগ করা যাইতে পারে—যেমন প্রাচীন মহাকাব্য, গ্রীক ট্র্যাজেডি, মধ্যযুগীয় রোমান্স, ফারদৌসীর শাহনামা, শেক্সপীয়রের নাটক, গেয়টের রচনাবলী ইত্যাদি। তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে এই বিরাট পট-ভূমিকায় রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। এই বইখানি পড়িয়াও আমি তাঁহাকে বেশ বড় চিঠি লিখিয়া আমার মতামত জানাই। তাঁহার বইখানি খুব বড় নহে, সুতরাং তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ পান নাই এবং সেই চেষ্টাও করেন নাই। তবে একটা ভাল কাজ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-সম্পর্কে সত্য ঘটনা অনেকেই জানেন, কিন্তু সঙ্গত কারণেই সেই কথা স্পষ্ট করিয়া কেহ পূর্বে বলেন নাই এবং এই সুযোগ লইয়া নিন্দুকেরা অপবাদ রটনা করিয়াছেন। প্রাচীন বয়সে, যখন সংশ্লিষ্ট সবাই প্রয়াত হইয়াছেন, তখন এই বহুশ্রুত গ্রন্থকার সত্য ঘটনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া একটা সৎকাজ করিয়াছেন। আমি যতটুকু বুঝি, তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মেরও বেশ স্বচ্ছ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—এই-সকল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের সংযোগ বা সাদৃশ্য কোথায়? গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে পারেন নাই। আমি আরও বলি, গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি—ইহাদের সঙ্গে তো রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈসাদৃশ্যই বেশি। যেখানে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেইখানেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি শেক্সপীয়র-প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাক্‌পটু হইলেও সুনীতিকুমারের বাক্‌সংযমও ছিল। সুতরাং ইহার পর একাধিকবার আসিলেও এই পত্রের কথা তোলেন নাই। কিন্তু অপরের কাছে আমার সাহিত্য-বিচারক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই বাংলা অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করিয়া তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। পুনরায় বলিব ইহার তুলনা দেখি নাই।

শেষবারের মত যে আসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার একটা পারিবারিক কাহিনী বলিয়াছিলেন—যাহা পুনরুদ্ধারযোগ্য। আমি জানিতাম তিনি পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র, কিন্তু কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে তিনি বাড়ির 'মেজদা' ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়া গেলেন—তাঁহার এক অগ্রজ ছিলেন এবং সেই অগ্রজের কন্যার বিবাহের কথা পাড়িলেন। প্রথমেই জানাইয়া দিলেন যে সেই ভ্রাতুষ্পুত্রী সধবা অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। পাত্রপক্ষ গঙ্গার ওপারের, বোধ হয় শিবপুরের বাসিন্দা। বিবাহের দিন সকালে দাদা কি-একটা কারণ দেখাইয়া পাত্রের বাড়ি গেলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে একটি লোক তাঁহার চিঠি লইয়া আসিল। তিনি পাত্রের বাড়ি হইতে জরুরি প্রয়োজনে অন্যত্র যাইতেছেন। তাঁহার ফিরিতে দেরি হইলে যেন শুভকর্মের কোন বিলম্ব না হয়। পাত্রপক্ষ যথাসময়ে আসিলেন এবং নির্দিষ্ট লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু পাত্রীর পিতা আর ফিরিলেন না; একদিন পর সুনীতিবাবুরা পুলিশসূত্রে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার দাদার মৃতদেহ

একটা ট্রেনে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পকেটে একটা চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষীর গণনা হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার কন্যা একান্ত আপন-জনের মৃত্যুর কারণ ('প্রিয়প্রাণহন্ত্রী') হইবেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন, ই'হার সবচেয়ে প্রিয় স্বামী ও পিতা। সুতরাং আত্মহত্যার দ্বারা তিনি কন্যার সাধব্য রক্ষা করিলেন। এই কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে ইহা বাস্তব ঘটনা, রোমান্স নয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে 'Truth is stranger than fiction' (বাস্তব গল্প অপেক্ষা বিস্ময়কর)। আমি বলিব 'Truth is stronger than fiction' (বাস্তব গল্প অপেক্ষা মর্মস্পর্শী)। সুনীতিবাবুর দাদার আত্মহত্যা আত্মাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঙ্গারামের মৃত্যু-সম্পর্কে তাহা বলা যায় না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারত কোন্ পথে ? (১)

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থরাষ্ট্রনীতি

১

আমার নিজের জীবনের ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া নানা বিষয়-সম্পর্কে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর নেওয়ার পর দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছি এবং যে-সকল কথা মনে হইয়াছে তাহা বলিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

আমাদের আমলে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে। অবশ্য ইহার আগেই ইংরেজি শাসনের অবসান ঘটাইয়া দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা হইয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত কিন্তু অবিরাম চেষ্টার মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে রুশ দেশে। সেখানে লেনিন সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া এবং রাজ-বংশকে নির্মূল করিয়া মার্কস্-বাদের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কস্ (১৮১৮—১৮৮৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব ; তাঁহার মতবাদকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া লেনিন ইহাকে চিন্তার জগতে নিবদ্ধ না রাখিয়া সামাজিক, সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে মার্কস্‌বাদের ব্যাখ্যায় প্রবিষ্ট হওয়ার অভিপ্রায় আমার নাই। ইহার ব্যাপক প্রভাব বিংশ শতাব্দীতে সকল দেশে অনুভূত হইয়াছে। আমি নিজে মার্কস্‌বাদী নই। ইহা যে ভ্রান্ত দর্শন তাহা আমি অন্যত্র—'Towards a Theory of the Imagination' গ্রন্থে—প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। লেনিন যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকে বলা হয় U.S.S.R.—ইহার মধ্যে মার্কস্‌বাদ বা কমিউনিজমের উল্লেখ নাই—তিনি ইহাকে বলিয়াছেন সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিক। সোশ্যালিজ্‌ম ব্যাপারটি নূতন নয়। ইহার মূল তত্ত্বটি এই : সমগ্র গোষ্ঠীর যে সম্পত্তি আছে, তাহা সবাই মিলিয়া সমানভাবে ভোগ করিবে, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। প্রবাদ আছে, যিশুখৃষ্টের প্রথম শিষ্যেরা এইভাবে জীবন যাপন করিতেন। এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা এখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাঁহারা নিজেদের আখ্যা দেন ক্রীশ্চান সোশ্যালিস্ট। যিশুখৃষ্টের পাঁচশত বৎসর আগে প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও সোশ্যালিস্ট বা সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের। তবে ইঁহারা কেহই মার্কসের মত সর্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের চিন্তা করেন নাই এবং কেহ লেনিনের মত এমন প্রশস্তক্ষেত্রে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইহার প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

ইঁহাদের সমালোচনা শেক্সপীয়র করিয়া গিয়াছেন। মার্কস্ বলুন, লেনিন বলুন—ইঁহারা মহামানব বটে, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, কল্পনার প্রসারে শেক্সপীয়রের তুলনায় নিকৃষ্ট। শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটক একেবারেই আজগুবি গল্প। সেখানে গঞ্জালো নামক এক সজ্জন আদর্শদ্বীপ গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—সেখানে তিনি এমন ব্যবস্থা করিবেন যে উচ্চনীচের পার্থক্য থাকিবে না। অমনি উপস্থিত এক রসিক শয়তান মন্তব্য করিল, সেখানে রাজগী থাকিবে না বটে কিন্তু বক্তা নিজে রাজা হইবেন!

এই মৌলিক বিরোধ মার্কস্‌বাদের মধ্যেও দেখা যায়। মার্কস্ সুপণ্ডিত দার্শনিক

ছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে পুঁজিবাদের পতন ও শ্রেণীহীন সমাজের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এই পরিবর্তনকে জোর করিয়া —যুক্তির পরিবর্তে violent disruption-এর দ্বারা চাপাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? প্রয়োগক্ষেত্রে মার্কসের প্রধান উত্তরসূরী লেনিন নিঃসঙ্কোচে একটি আপ্তবাক্য উপহার দিলেন : পৃথিবীতে তিন-চতুর্থাংশ মানুষ যদি নিহত হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু বাকী এক-চতুর্থাংশকে কমিউনিস্ট হইতে হইবে ('It would not matter a jot if three quarters of the human race perished; the important thing was that the remaining quarter should be Communist.') সেখানেও কিন্তু সোয়াস্তি নাই। খাঁটি কমিউনিস্ট কে তাহা লইয়া প্রথম হইতেই গোলযোগ শুরু হইল—স্তালিন না ট্রট্স্কি? লেনিনের নিজের মনেও এই সন্দেহ জাগিয়া থাকিবে। এইরূপ একটা কাহিনী প্রচলিত আছে : লেনিন তখন মৃত্যুশয্যায়। ক্ষমতা ধীরে ধীরে স্তালিনের হাতে যাইতেছে। লেনিন একনায়কত্ব ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন এবং সরকারি কাগজ প্রাভদায় উহা ছাপিতে দিলেন। মুশকিলের কথা। পরাজয়ের সম্মুখীন ট্রট্স্কি উহা ছাপিতে চাহেন। কিন্তু স্তালিন ব্যবস্থা করিলেন যে প্রাভদা কাগজের মাত্র একখানা কপিতে উহা ছাপা হইবে এবং মৃত্যুপথযাত্রীকে সেই পত্রিকাখানা দেওয়া হইবে। সাধারণ্যে প্রচারিত কাগজে উহা থাকিবে না। পলিটব্যুরোর বাহিরে মাত্র একজন লোক এই প্রবঞ্চনার কথা জানিতেন। তিনি লেনিনের পত্নী মাদাম ক্রুপসকায়া। কিন্তু স্তালিনের ভয়ে তিনি তখন মুখ খুলিতে সাহস পাইলেন না।

২

আমাদের স্বাধীনতা যে-ই অর্জন করুন এবং যে-ভাবেই আসুক তাহা গ্রহণ করিলেন জহরলাল নেহেরু। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সবাই এক গোষ্ঠীর অর্থাৎ সমমতাবলম্বী,—গান্ধীজির ভাষায় 'homogeneous'। কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও এবং সবাই উচ্চাভিলাষী হইলেও মহাত্মাজি জহরলালকে এত প্রাধান্য দিয়াছিলেন যে, দেশবিভাগের ট্র্যাজেডির পটভূমিকায় আর বিভেদের সূচনা না করাই সঙ্গত হইবে মনে করিয়া সর্দার প্যাটেল-প্রমুখ ব্যক্তিরা বৃহত্তর প্রশ্নে নেহরুর নেতৃত্ব মানিয়া লইলেন।

নেহেরু ও তাঁহার সহকর্মীরা সবাই মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য; সুতরাং লেনিন ট্রট্স্কি স্তালিন প্রভৃতির মত বলপ্রয়োগ করিয়া সংস্কারের পথে অগ্রসর হইলেন না। তারপর জহরলাল বাল্যকাল হইতে ভারতে ও বিদেশে উদারনৈতিক ভাবধারায় পরিশীলিত হইয়াছেন। সেই উদারনৈতিক ভাবধারা বামে ঘেঁষিয়া ফেবিয়ান (Fabian) সোশ্যালিজমের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। জহরলাল নির্বিচারে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি জয়গান করিলেন তাঁহারা নিজেরাই; তাঁহারা জোর গলায় বলিলেন, এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসির মাধ্যমে জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিয়া সোশ্যালিজম্ স্থাপন করিবেন। ইহার জন্যই জহরলাল অখণ্ড ভারতের মত আলেয়ার পিছনে না যাইয়া খণ্ডিত ভারতকেই গ্রহণ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, জিন্নার সঙ্গে সহযোগিতায় ও তর্কাতর্কিতে তাঁহার আপত্তি ছিল, কারণ জিন্না বড় ব্যারিস্টার হইলেও ইকনমিক্স জানেন না। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে তিনি নিজে ইকনমিক্সে বিশেষজ্ঞ। নেহেরু কিন্তু কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স

পড়েন নাই এবং তদপেক্ষা বড় কথা, তিনি দেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি একটা দরিদ্র দেশের মালিক; তাঁহাকে এক ধর্মহীন খাপ্পাবাজ ব্যক্তি বোলচাল দিয়া মোহিত করিয়া বড় একটা প্রোগ্রাম দিল। অধীনস্থ সচিবরা ইহার প্রোগ্রামে নানা ছিদ্র দেখাইয়া দিলে তিনি নাকি বলিলেন, 'ইহাকে বৎকিঞ্চিৎ (কুছ) দে দেও'; এই 'বৎকিঞ্চিৎ' মাত্র কুড়ি কোটি টাকা! প্রধানতঃ, নেহেরু ও তাঁহার কন্যা প'য়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশকে খুবই বিত্তশালী করিলেন। এই বিত্তশালিতার পরিচয় দিলেন ই'হাদেরই একজন তাঁবেদার সাম্প্রতিক একটা মামলায়।

এই মামলায়—Transfer Case No. 3 of 1982, Civil Appeals Nos 737 (E) of 1982—আসল বাদী হইলেন কংগ্রেস বা ইন্দিরা কংগ্রেস এবং এই পক্ষের অন্যতম কৌ'সুলী ছিলেন ভোলানাথ সেন। সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক রায়ে (৩০.৩.৮২) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি লিখিয়াছেন যে কৌ'সুলী ভোলানাথ সেন একটা আইনগত ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছেন যে অনেক ভোটার আছেন যাঁহাদের দশ পয়সা ব্যয় করিয়া ফর্ম কিনিবার মত সঙ্গতি নাই। উকিল ব্যারিস্টাররা মক্কেলের জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা দায়িত্বজ্ঞানহীন নহেন। ভোলানাথ সেন বেশ কিছুকাল কংগ্রেস সরকারের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন। ইহা সত্য যে প্রধান বিচারপতি ভোলানাথ সেনের যুক্তি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ইহাকে প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়াও দেন নাই। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন : 'Counsel should not grudge at least that modest achievement to our successive governments which have been fighting a relentless war against poverty.' বিচারপতিরা আইন ব্যাখ্যা করেন, নিজেদের রায় ব্যাখ্যা করেন না। সেই দায়িত্ব সহৃদয় পাঠকের। এই মন্তব্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস পাওয়া যায় না কি?

প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে নেহেরু যে প্রশাসনিক যন্ত্র বসাইলেন তাহাই ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য হইতে গভীরতর দারিদ্র্যের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। যখন কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে ব্রিটিশ প্রভুদের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল তখনই এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের বিপুল ব্যয় বহন করিতেন ধনী ব্যবসায়ীরা। কে একজন (খান আব্দুল গফুর খাঁ?) বলিয়াছিলেন যে মহাত্মাজির দারিদ্র্য বজায় রাখিতে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয়! কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার চার-পাঁচ বছর আগে ১৯১৫ সালে মহাত্মাজি শবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অস্পৃশ্যতা অমান্য করার জন্য আশ্রম ভীষণ আর্থিক সংকটে পড়ে। এক অজ্ঞাতপরিচয় শেঠজি (আম্বালাল সরাভাই?) অযাচিতভাবে তের হাজার টাকা দিয়া আশ্রমকে রক্ষা করেন। শেঠজির সদাশয়তা-সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতে চাহি না। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, ব্যবসায়ীদের বদান্যতা থাকিলেও বদান্যতার জন্য কেহ ব্যবসায় করে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করে লাভ করিবার জন্য এবং ইহাই যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যেখানে লাভ বেশি, সাধারণতঃ সেইখানেই ব্যবসায়ীদের ভিড় বেশি হইবে। কথাটা বার্ণার্ড শ' খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 'মিসেস ওয়েরেনের পেশা'-নাটকে। পেশাটা আন্তর্জাতিক হোটেল পরিচালনা এবং সেই হোটেলগুলি প্রকৃতপক্ষে মর্যাদাসম্পন্ন বেশ্যালয়। এই নাটকের চরিত্র স্যার—উপাধি হইতেই তাঁহার আভিজাত্য বোঝা যাইবে—জর্জ ক্রফটস বলিতেছেন, যে তিনি এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করেন কারণ ইহা ৩৫% ডিভিডেন্ড দেয়। তাঁহার ভ্রাতা একটা কারখানার মালিক যেখানে শতকরা লাভ মাত্র ২২, কিন্তু সেই কারখানার কর্মী বালিকারা যে বেতন পায় তাহাতে কোনরকমে জীবনধারণ হয় বা হয়

না। কিন্তু এই মালিকই আবার বহু টাকা ব্যয় করিয়া ক্রফটস বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমি বার্ণার্ড শ'য়ের নাটক-সম্পর্কে অনেক কথা বলিলাম। যে ফেবিয়ান সোশ্যালিজমের আদর্শবাদ জহরলালের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, শ' তাহার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং জহরলালের রচনায় অনেক জায়গায় বার্ণার্ড শ'য়ের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে। জহরলাল এই বিরাট দেশের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ধাঁচে এক সংবিধান চাপাইয়া দিলেন। বিপ্লবী কংগ্রেসের খরচ জোগাইয়াছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাঁহারা কথা বলেন না ; শ'য়ের The Applecart নাটকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে Breakages Limited পার্লামেন্টে আসে না, কিন্তু যাঁহারা আসেন তাঁহারা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে এই সংস্থার অভীষ্টই পালন করেন। সর্বত্রই ধনী ব্যবসায়ীরা সজাগ থাকেন। যখন কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ছিল না তখন তাঁহারা কংগ্রেসকে পুষিয়াছেন। এখন যে ব্যবস্থা হইল তাহার দ্বারা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস একেবারেই তাঁহাদের কুক্ষিগত হইল। এখন সাগর চুরির এত ঘটনা ঘটিতেছে যে ছোটখাট পুকুর চুরির দিকে লোকে আর দৃষ্টি দেয় না। আমি একটি ছোট্ট ঘটনার দ্বারা নেহেরুর ভ্রান্তবুদ্ধি ও অদূরদর্শিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিধানবাবুর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার কিছুদিন পর নেহেরু একবার কলিকাতায় আসিলেন এবং ময়দানে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত জনসভায় বক্তৃতা করিলেন। এই-সকল ব্যাপার এখনও হইয়া থাকে ; এইসব যাত্রার রাহা খরচ ও সভার ব্যয়-সম্পর্কে কেহ প্রশ্নও তোলে না। তবে মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা ফোটে না। স্বাধীনতার অল্পদিন পরে জহরলাল নেহেরু বলিলেন, ময়দানের সভার ব্যবস্থাদি কংগ্রেসের করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী যে-সকল জনসভায় উপস্থিত থাকেন, সেখানে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কংগ্রেসের ব্যাংক বই আনাইয়া দেখা গেল, তাহা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এইসব ব্যাপারে যখন বিধানবাবু ও নলিনীবাবু বিব্রত, ঘটনাচক্রে তখন দুইজন অর্থসচিবও উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় তাঁহাদের উপস্থিত থাকা উচিত নয় বলিয়া তাঁহারা উঠি-উঠি ভাব করিতেই নলিনীবাবু তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত হইল এবং তাঁহারা এই সদ্ব্যয়ের সূত্র সন্ধান করিলেন। সেই ব্যয় যাঁহারা বহন করিয়াছিলেন তাঁহারা কি খালি হাতে ঘরে ফিরিয়াছিলেন? ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পরে পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম ইন্দিরা গান্ধী আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে চরণ সিংহ লোকদলের পক্ষে নির্বাচনী সফর করিয়াছেন সামরিক বাহিনীর বিমানে কিন্তু তাঁহার ব্যয়—কয়েক লক্ষ টাকা—লোকদল পরিশোধ করেন নাই। ইন্দিরা বিবেচক লোক, লোকদলকে লইয়া বেশি ঘাঁটান নাই। ইহার অবশ্য প্রধান কারণ ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের টাকা কোথা হইতে আসে এই প্রশ্নও উঠিয়া পড়ে। সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী লিখিতে গেলে জনশ্রুতি ও পত্রিকায় পড়া সংবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার মত ইহা প্রমাণযোগ্য নহে ; তবে ইহা জীবন্ত এবং ইহাই ইতিহাসের অঙ্গ। যতদূর মনে হয়, একটা ইলেকশনে ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন এক মহারাণী। ইন্দিরাজি নিজে অথবা তাঁহার পক্ষীয় বক্তারা সামন্ত নৃপতিদের বহুকালের শোষণার্জিত বিপুল অর্থের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা দিয়া থাকিবেন। তদুত্তরে প্রাক্তন মহারাণী বলেন, ইহা সত্য তিনি সম্পদশালিনী : কি সূত্রে, কেমন করিয়া এই সম্পদ পাইয়াছেন তাহাও সুবিদিত। কিন্তু ইন্দিরা ইলেকশন প্রভৃতির জন্য যে টাকা ব্যয় করেন তাহার উৎস কি তিনি প্রকাশ করিতে পারেন?

দোষ ইন্দিরার নহে, দোষ তাঁহার পিতার। নেহেরু ইংল্যান্ডে স্কুলে পড়িয়াছেন, কলেজে পড়িয়াছেন, আইন পড়িয়াছেন : তাঁহার 'ব্যক্তিগত প্রতিনিধি' কৃষ্ণ মেনন তো জীবনের

বেশির ভাগ সময় ইংল্যাণ্ডেই কাটাইয়াছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলা হয় সকল পার্লামেন্টের জননী। সুতরাং নেহেরু সেই ধাঁচেই লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। এখন দুই দেশের মধ্যে একটু তুলনা করা যাক। আমাদের দেশের আয়তন গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় চৌদ্দগুণ, লোকসংখ্যা অন্ততঃ দশগুণ। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ড আমাদের একটা বড় প্রদেশ হইতেও ছোট। নেহেরু যে উত্তর প্রদেশের লোক, সেই প্রদেশের আয়তন ২৯৪৩৬৪ বর্গ কিলোমিটার, আর গ্রেট ব্রিটেনের আয়তন ২৪৪০৩০ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা যথাক্রমে (১৯৬০) ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ এবং ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টারি প্রথায় রাজ্যশাসনের ইতিহাস দীর্ঘ, ধারাবাহিক ও ক্রমভঙ্গহীন। ১০৬৬ খৃঃ ইংল্যাণ্ডে শেষবারের মত বিদেশী আক্রমণ হয়। ১২১৫ সালে রাজা জন যে ম্যাগ্না কার্টা বা স্বায়ত্তশাসনের সনদ দান করিতে বাধ্য হয়েন সেইখানে আধুনিক পার্লামেন্টের গোড়াপত্তন হয়। তাহার পর ১২৬৫ সলে সাইমন ডি মণ্টফোর্ড প্রজাদের প্রতিনিধি সম্বলিত পার্লামেন্ট স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা পরিণত ও পরিপক্ক হয় এবং ১৯১৮/২৮ সালে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ) ভোটাধিকার পায়। এই পরিণতির মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—দলগত শাসনব্যবস্থা বা পার্টি গভর্ণমেন্ট। মনীষী বার্ণার্ড শ' মনে করেন যে এই ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজা উইলিয়ম ও রাণী মেরীর রাজত্বে। যাহা হউক, সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিই হইল একদল শাসন করিবে আর একদল বিরোধী হইবে এবং ইহাদের মধ্যে বদলাবদলি হইবে। বলা বাহুল্য, দলীয় সংস্থা বজায় রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং ইলেকশনও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দিকে উন্নতি হইয়াছে। উপনিবেশবিজয় এবং শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ জাতি উত্তরোত্তর ধনসম্পদ আহরণ করিয়াছে আর বহু ব্যতিক্রম থাকিলেও শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে। রাজা জন অবশ্য ম্যাগ্না কার্টা বা বৃহৎ সনদ সহি না করিয়া শীলমোহর করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুশ বছর আগের রাজা অ্যালফ্রেড দিনেমারদের দ্বারা বিব্রত হইলেও প্রজাদের শিক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন নিতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যখন ভোটদাতাদের পরিধি বিস্তৃত হইল তখন সরকারের শিক্ষার প্রসারের দিকেও দৃষ্টি গেল। অন্য এক আইনে শিশুশ্রমিক-নিয়োগ বন্ধ হইয়া গেলে, জনৈক মন্ত্রী বলিলেন, এবার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রভুদের অর্থাৎ ভোটদাতাদের শিক্ষিত করার কাজে মন দিতে হইবে।

১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা অপরের ত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টায় অর্জিত হইল তাহাকে নেহেরু গ্রহণ করিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের হাত হইতে। স্বাধীনতা পাইয়াই তিনি ভারতে ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে ব্যবস্থা একটা ছোট্ট ধনী ও শিক্ষিত দেশে বহুদিনের অব্যাহত সাধনায় পরিণতিলাভ করিয়াছে, তাহা চাপাইয়া দিলেন একটা বিরাট, জনবহুল, অশিক্ষিত, দরিদ্র বুভুক্ষু দেশের উপর। যুদ্ধের সময় দেশে কালোবাজারী এবং মুনাফাখোর লোকের প্রাদুর্ভাবে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। নেহেরু বলিয়া বসিলেন, ইহাদের ধরিয়া ধরিয়া তিনি নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দিবেন। কিন্তু যে নির্বাচনের তিনি ব্যবস্থা করিলেন সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেই বিপুল ব্যয় হইল। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। ভাইসরয়ের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের মাত্র ছয়জন সদস্য ছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই পৃথিবীর বৃহত্তম ডেমক্র্যাটিক রাষ্ট্রে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর সংখ্যা দুই কুড়িতে পঁহুছিল। ইহাদের জন্য নূতন নূতন বিভাগ খোলা হইতে লাগিল, তাহার সচিব, যুগ্মসচিব, চাপরাসীতে সেক্রেটারিয়েট গমগম করিয়া উঠিল। এই যে অমিতব্যয়িতার যজ্ঞ শুরু হইল,

ইহার যজমান—ভারতবর্ষের অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণ। বড় বড় ব্যবসায়ীরা ও চোরাচালান-কারীরা বুঝিলেন, সরকারের এই আমীরশাহী গণতান্ত্রিক ভাবধারা বজায় থাকিলে তাঁহাদের সাদা ও কালোবাজার উভয়ই অটুট থাকিবে। দরিদ্রনারায়ণের কথা নারায়ণই ভাবিবেন আর দরিদ্রনারায়ণের দারিদ্র্য অক্ষুণ্ন না থাকিলে নেহেরুর বক্তৃতার অন্যতম মুখ্য বিষয়ই তো লোপ পাইবে!

ক্রমবর্ধমান সরকারী ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া এইবার রাজনৈতিক দলের দিকে তাকানো যাইতে পারে। কংগ্রেস বহু লোককে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সব লোকের কংগ্রেস-প্রার্থীদের মধ্যে জায়গা হইতে পারে না। তাঁহারা দল, উপদল করিলেন, আবার একদল বিপ্লবী ও সোশ্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টরা বিরোধী দলভুক্ত হইলেন। ইহাদের কথা বাদ দিলে চলিবে না। তবে প্রথমে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের চেহারাটা দেখা যাক্। রাজনীতিক দলগুলির কাছে দুই স্তরের নির্বাচন—প্রাদেশিক বিধানসভা ও সর্বভারতীয় লোকসভা। সুতরাং এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সবাই দেখিল যে, সকল যুদ্ধের মত এই যুদ্ধেরও রসদ জোগাইতে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং সংবিধানে নির্ধারিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ক্ষমতার মোহে ও প্রতিপত্তির লোভে নেহেরু ও তাঁহার সহকর্মীরা ইহা লক্ষ্য করিলেন না অথবা লক্ষ্য করিলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করিলেন না। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে ও জাতির জীবনে কখনও কখনও নৈতিক ভাবোদয় হইয়া থাকে; এইসব উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু ইহা সত্যভাষণের প্রেরণা জাগায়। এমনি একটা ঢেউ খেলিয়া গিয়াছিল ১৯৬০ সালে জনতা পার্টির অভ্যাগমে। রাজঘাটে প্রার্থনা করিয়া সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া তাঁহারা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে সংসদ-সদস্যরা মিথ্যা কথা বলিয়াই সংসদে প্রবেশ করেন, কারণ সংবিধান মানিয়া খরচ করিলে কেহ এম. পি. হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা নির্বাচনের ব্যয় অনেকটা বাড়াইয়া ধার্য করিয়া একটা বিল আনিবেন। অনেকে বলিল, অনেক ক্ষেত্রে অনেক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। হইবেও-বা, কারণ বিরাট দেশ, বিপুল জনসংখ্যা—যাহাদের অনেকেই নিরক্ষর, নিরন্ন। ইহাদিগকে একত্র করিয়া, বুঝাইয়া, উৎসাহিত করিয়া দূরে ভোটকেন্দ্রে লইয়া যাওয়া সোজা কাজ নহে। যাহা হউক, জনতার মহারথীরা শেষ পর্যন্ত বুঝিলেন, সত্য কথা বলিতে হইলে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইবে। কাজেই তাঁহারা থামিয়া গেলেন। কিছুকাল পর প্রধানতঃ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই জনতা দল ছত্রভঙ্গ হইল। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসিলেন। তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ দ্বিধাহীনতা। সুতরাং এইজাতীয় প্রশ্ন তাঁহার মনকে কখনও কণ্টকিত করে না।

সংসদে যাইবার জন্য ইলেকশনে নামিতে হইলে এবং ঠিকমত লড়িতে হইলে সদস্যপ্রতি লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—ইহাই ধরিয়া লইলাম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়সাপেক্ষ অফিস চালনা এবং সাংগঠনিক কার্য তো আছেই। ইহা ছাড়া আছে অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এইসব বাদ দিয়া শুধু একটি ইলেকশনের মোটামুটি খরচ ধরা যাইতে পারে। ধরিয়া লইলাম লোক-সভার সদস্যসংখ্যা ৫০০, এবং প্রাদেশিক সভার হাজার-চারেক সদস্যের জন্য ব্যয় এই ৫০০ জনের ব্যয়ের তিনগুণ। তাহা হইলে কংগ্রেসকে এই সাড়ে চার হাজার প্রার্থীর জন্য সর্ব-সাকুল্যে বিশ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। এই টাকা দেওয়ার জন্য কোন গৌরী সেন বা রাজা হরিশ্চন্দ্র বসিয়া নাই। আমরা কমিউনিস্ট রাজ্য নহি যে সরকার ও পার্টি অভিন্ন হইবে। এই টাকা জোগায় কে? শিল্পপতিরা রাজনৈতিক পার্টির ভাণ্ডারে প্রকাশ্যে টাকা দিতে পারেন কিনা, দিলে কত দিতে পারেন, এইসব প্রশ্নের অনেক আলোচনা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তবে ইহা ঠিক, কোন শিল্পপতির

পক্ষেই এই নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা মেটান সম্ভব নয়। তারপর ছোটখাট কুম্ভকর্ণও তো আছে! এইখানেই অপ্রকাশ্য ব্যবসায়ের বা কালোবাজারের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের রহস্য। জনতা সরকার ক্ষমতায় আসিয়া এই বাজারের দুই প্রধানকে আটক করিয়াছিলেন। তখন সংবাদপত্রে তাঁহাদের কার্যকলাপের বেশ বর্ণাঢ্য বর্ণনা দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের সম্পর্কে নানা গল্পও প্রচারিত হয়। এখনও তাঁহাদের নাম মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। একজন তো স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখিতে চাহেন না, কিন্তু রাজনীতির নেতারা তাঁহাকে ছাড়েন কই? তাঁহাকে ছাড়া কি রাষ্ট্রনেতাদের চলে? আমাদের চারদিকে ছোটখাট সমৃদ্ধিমান লোক দেখিতে পাই—যাঁহারা বেশ ধনাঢ্য, কিন্তু কি করেন তাহা ভাল বোঝা যায় না। কলিকাতার যে-কোন বাজারে গেলেই প্রতিদিনই দেখা যায়, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য যতই লেলিহান হউক, তাহা কিনিবার লোকের অভাব হয় না। সূর্যালোকে যে পৃথিবী চলমান, তাহাকে তো পাতালের অনন্তনাগই মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন!

যাঁহারা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পার্লামেন্টে আসিলেন, তাঁহারা অনেকেই প্রথমাবস্থায় লক্ষাধিপ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষমতার মালিক তাঁহারাই। মন্ত্রী হইলে কথাই নাই, কিন্তু বিরোধী হইলেও তাঁহারা ত্রাসের সঞ্চার করিতে পারেন। সরকারের গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়ার যে ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, তাহা আর কাহারও নাই; সুতরাং তাঁহারা আর নিজেদের ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলেন না। সরকারি দলের সভ্য হইলে নীরব বশ্যতাই প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইঁহারা প্রবেশ করিয়াই যে বেতন, দৈনিক ভাতা, অবাধভ্রমণ-ভাতার ব্যবস্থা দেখিলেন, তাহাতে মোহাবিষ্ট হইবেন না এমন লোক বিরল। তারপর পাঁচ বৎসর অক্লান্ত দেশসেবার পর তাঁহাদের জন্য পেন্‌শনের ব্যবস্থা হইল। ২৯ বৎসর সরকারি চাকুরীর পর আমি যে পেন্‌শন পাইয়াছি, তাহার চেয়ে সেই পেন্‌শন ভারী, বলা বাহুল্য, এইসব দেখিয়া ইহাদের ক্ষুধা—কালিদাসের ভাষায় —দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসী লেখা অর্থাৎ দিনে দিনে চন্দ্রের কলা যেমন বাড়িতে বাড়িতে পৃথিবীকে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করে, ইহাদের ক্ষুধাও তেমনই দিনের পর দিন বাড়িয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার উপমার সার্থকতা প্রকট হইবে। দেশসেবার জন্যই সংসদ-সদস্যরা জীবনধারণ করেন। যাঁহারা মন্ত্রী হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের জন্যও নানা ব্যবস্থা করা হইল। একটা ব্যবস্থার কথা বলিলেই সংবিধানিক, সংসদীয় গণতন্ত্রের চিত্র পরিস্ফুট হইবে। প্রত্যেক দপ্তরের সঙ্গেই একটা নাতিহ্রস্ব কমিটি আছে; এখানেও প্রশ্নোত্তর আছে, বিরোধী সদস্যও আছেন যাহাতে তাঁহারাও বঞ্চিত না হন। প্রত্যেক কমিটিরই রাজধানীতে এবং রাজধানীর বাহিরে অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় সভ্যরা সরকারি ব্যয়ে রাজধানীর বাহিরে কোন জায়গায় দরিদ্র দেশে যতদূর ভাল হোটেল পাওয়া যায়, সেইখানে বসবাস করেন এবং মন্ত্রীকে মূল্যবান উপদেশ দিয়া থাকেন। ইঁহারাও দেশবাসীর অবস্থা দেখিয়া এতই প্রীতিলাভ করেন যে নিজেদের জন্য আরও উপকরণ না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়েন। ইঁহারা দেশের সম্পর্কে এতই জ্ঞানবান এবং দেশের জন্য এতই দরদী যে স্থানীয় অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য রেলমন্ত্রকের পরামর্শদাতারা অধিবেশন বসাইলেন শ্রীনগরে, যদিও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রেলের নামগন্ধও নাই। ইহাকেও টেক্কা দিয়াছে পর্যটন দপ্তর; ইহার লক্ষ্য হইল বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করা—যাহাতে মহার্ঘ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে বছর ছ-সাত আগে এই দপ্তরের পরামর্শদাতারা সবাই অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি শহরে ঘুরিয়া আসেন। ইহাতে যে দেশী ও বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হইল, অস্ট্রেলিয়া হইতে

সেই অনুপাতে বিদেশী মুদ্রা আহৃত হইয়াছিল কিনা সেই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু ইহাতেও এই কমিটির সভ্যগণ নিরস্ত হয়েন নাই। সম্প্রতি জনৈক মেম্বর প্রস্তাব করিয়াছেন যে এই কমিটির সকল সদস্যকে ৪০ দিন বিশ্বপরিক্রমায় পাঠান হউক ; তাহা হইলে ইঁহারা ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করিয়া আসিবেন এবং তাহার ফলে অঢেল বিদেশী মুদ্রা লাভ হইবে। কমিটি এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

সর্বভারতীয় পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে নানা বিধানসভার সদস্য। তাঁহাদের ক্ষেত্র সীমিত ; সেখানেও বৈচিত্র্যের জলুসের অভাব নাই। সেখানে একজন সুবাদার অল্প-দিনের মধ্যেই কোটি কোটি টাকা তুলিয়া ফেলিলেন ; তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ—দেশহিতে ব্যয়। শুধু একটি শর্ত ; তিনি ইহার সর্বাধিনায়ক হইবেন। অন্যত্র যে খেলা দেখি, তাহার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল টীম বদল ; ইহার চলতি নাম—আয়ারাম গয়ারাম। এই খেলায় দিনে দিনে পরিবর্তমানা প্রতিভার পুরস্কারের যে অংক পত্রিকায় পড়ি, তাহা শুনিলে সিনেমার নায়ক-নায়িকারা স্তম্ভিত হইবেন। প্রশ্ন উঠিবে—যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই অর্থ জোগায় কে? এই খেলায় হরিয়ানা রাজ্য প্রধান ; তবে অন্যান্য রাজ্যও খুব পশ্চাৎপদ নহে এবং কোন কোন রাজ্য অন্য অনেক রকমে কীর্তিমান্ হইয়াছে। যাহা আজকাল চম্বল উপত্যকা নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য বহুকাল হইতেই পরিচিত ছিল। শোনা যায়, দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের জনৈক জ্ঞাতিভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া সদলবলে এই অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই দ্বাদশ শতক হইতে তাঁহারা লুঠতরাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চল ইঁহাদের লীলাক্ষেত্র। ইঁহাদের ঐতিহ্য যত দীর্ঘই হউক, আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজারা কিন্তু ইঁহাদের কার্যকলাপের কথা সবিস্তারে শুনি নেহেরুর ভারতবর্ষেই, যেখানে দস্যুসর্দার মান সিং 'রাজা' নামে খ্যাত হইলেন এবং—শোনা কথা—তাঁহার দলের বাজেয়াপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের অস্ত্রও ছিল! যাহা হউক ইঁহাদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে লাগিল ; সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে ইঁহাদের ক্ষয়ক্ষতি হইল, কিন্তু ইঁহারা কিছুতেই দমিলেন না। সম্প্রতি এক মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় প্রকাশ্যেই হার স্বীকার করিয়া পদত্যাগ করিলেন।

বার্ণার্ড শ' ব্রিটিশ ডিমক্র্যাসিকে বলিয়াছিলেন : The Applecart (আপেলবাহী গাড়ী), যাহাকে সহজেই উলটাইয়া দেওয়া যায়। উহাকে চালায় টাকা। আমাদের দেশের ডিমক্র্যাসি ভানুমতীর খেলা, ইহা ইন্দ্রজালের মত রহস্যময়—ইহাকে চালায় কালো টাকা।

৩

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বহুদিন পূর্বে (১৮৪৮) কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস্ খোলাখুলিভাবে বলিয়াছিলেন যে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। যে যেমন বুঝিয়াছেন, দুই শ্রেষ্ঠ মার্কস্‌বাদী নেতা লেনিন ও মাও রুশ-দেশে ও চীনে বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা চালু করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নেহেরু স্পষ্ট করিয়া কতটুকু বুঝিতেন জানি না। তিনি শান্তির ললিত বাণী আওড়াইয়া চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল নীতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পরিণামে চীনের দ্বারা পর্যুদস্ত হইলেন।

নেহেরু ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত ট্রেড ইউনিয়নিজম্ বা শ্রমিক আন্দোলনের পুষ্টি সাধন করিলেন। ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ রাজনৈতিক অধিকার পাইলেও

মিল ফ্যাক্টরীর শ্রমজীবীরা দেখিলেন যে তাঁহারা ঠকিয়া গিয়াছেন। ইউনিয়নের সাহায্যে রবার্ট ওয়েন নামক নেতা ই'হাদিগকে সংঘবদ্ধ করিলেন। মার্ক্স্ শ্রমিক আন্দোলনকেও নূতন মোড় দিলেন—তিনি কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বলিলেন, 'The proletarians have nothing to lose in it (the Communist revolution) but their chains. They have the whole world to gain.' অস্যার্থ—আসন্ন কমিউনিস্ট বিপ্লবে বিত্ত-হীনদের শুধু শৃঙ্খল ছাড়া কিছুই হারাইবার ভয় নাই আর শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ এই শ্রেণীর করায়ত্ত হইবে। এইখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চরম ও ভয়ংকর পরিণতি। বিত্তহীন শ্রমিকরা আন্দোলন করিয়া বিত্তের ন্যায্য অংশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এই শ্লোগান মানিয়া চলিলে তাঁহাদের অনেক-কিছু হারাইবার আছে—কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, নীতিবোধ। এই সত্য শরৎচন্দ্র অতি তীব্রভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 'পথের দাবী'-তে। এই গ্রন্থে ভারতী শ্রমিকদিগকে তাহাদের দাবি-সম্পর্কে সচেতন করিতেই শ্রোতাদের একজন বলিয়া উঠিল যে সে যন্ত্রের একটু এদিক-ওদিক করিয়া দিলেই সমস্ত কারখানা চুরমার হইয়া যাইবে। এই বিভীষিকার কল্পনাতেই ভারতী শিহরিয়া উঠিয়াছে। শ্রমিক, কৃষক, করণিক, শিক্ষক, চিকিৎসক—সবাই দেখিতেছি এই জিগির তুলিতেছেন। সবাই নিজেদের দাবি-সম্পর্কে সচেতন, কর্তব্য-সম্পর্কে, দায়িত্ব-সম্পর্কে চৈতন্যহীন। এই দুরবস্থা এত স্পষ্ট যে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন ; এবং বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে বিশ্বকোষ লিখিতে হয়। সর্বাপেক্ষা মজার বিষয় এই যে, কোন সংস্থায় কোন গোলযোগ দেখা দিলে সবাই বলেন, ইহা সরকার অধিগ্রহণ করুন। ট্রাম কোম্পানী হউক, বসুমতী পত্রিকা হউক, বেঙ্গল কেমিক্যাল হউক গোলমাল বুঝিলেই সমস্বরে রব উঠে সরকার দায়িত্ব নিন। ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে মালিক বিতাড়িত হয়েন, কর্মীদের বেতন ভাতা, ওভারটাইম, বোনাস সব পাকা হয়। কিন্তু কোম্পানীর লোকসান বাড়িয়াই যায় এবং তাহার বোঝা শেষ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মারফতে অর্ধাশনপীড়িত জনসাধারণকেই বহন করিতে হয়।

কেহ কেহ বলিতেন, ইহার জন্য মার্ক্স্‌কে দায়ী করি কেন? কাজে ফাঁকি দিয়া বেতন লইয়া সরিয়া পড়িবার অভ্যাস অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দায়িত্ব-হীনতার এইরূপ নিঃসংকোচ সরব সমর্থন ইতঃপূর্বে কোথাও দেখি নাই। এখন সর্বত্র চেয়ার থাকিলেও কর্মী থাকে না, কর্মী থাকিলেও কর্ম হয় না। অবশ্য কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সার্বিক বাধ্যতামূলক কাজের উল্লেখ আছে, কিন্তু যে প্রসঙ্গে এই উল্লেখ আছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় পুঁজিপতি মালিক ও জোতদার প্রভৃতির কথাই মার্ক্স্ ভাবিয়াছিলেন, কারণ জমিদার ও পুঁজিপতিদের ধ্বংসই তাঁহার বক্তব্য বিষয়। শ্রমিকরা শ্রম করিয়াই থাকেন ; শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবেন এই সন্দেহ মার্ক্সের মনে উদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে যথাসাধ্য যত্নের সহিত আমি মার্ক্স্‌দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছি এবং এই দর্শন ভ্রান্ত, তাহা গ্রন্থান্তরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে লেনিনের দার্শনিক রচনাও অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কর্মকান্ড তেমনভাবে অনুসরণ করি নাই। তবে সংবাদপত্র, সমসাময়িক ইতিহাস পড়িয়া মনে হয় যে তিনিও উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাইয়াছিলেন। কাজেই তিনি যে শৃঙ্খল পরাইয়া গিয়াছেন, তাহা রুশ সম্রাটের শৃঙ্খল হইতে বেশি অলঙ্ঘনীয়। বন্ধনহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মার্ক্স্‌বাদকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, আজ নূতন রুশ সাম্রাজ্যে (যাহাকে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহ বলা হয়) আবার স্বাধীন ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলন মাথা তুলিতে চেষ্টিত আছে এবং এই বিরাট সাম্রাজ্যকে লোহ যবনিকা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে।

৪

জহরলালের ভ্রান্তনীতির জন্য আমরা পড়িয়াছি উভয়-সংকটে। আমরা এই অর্থে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যে উভয় গোষ্ঠীর যাহা কিছু বর্জনীয় তাহা আমরা সযত্নে আহরণ করিতেছি। একদিকে পুঁজিবাদ ও কালোবাজার পার্লামেন্টারি ডেমক্র্যাসিকে প্রকাশ্যে ও অলক্ষ্যে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে ; ইহারা ইলেকশন সম্ভব করিতেছে এবং আয়ারাম গয়ারাম প্রভৃতির পরিক্রমার ব্যবস্থা করিতেছে। অন্যদিকে ইহা সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাদপীঠ ; ইহার উপর নির্ভর করিয়া মহারথীরা ঐশ্বর্যের আস্বাদ পাইতেছেন। অল্প কিছুদিন আগে একজন তরুণ মহারথী অর্থাৎ এম. পি.'র মৃত্যু হয়। বিধবার সঙ্গে শাশুড়ির বনিবনা হইল না, শাশুড়িও এম. পি. এবং আরও প্রতিষ্ঠাবতী এম. পি.। আমাদের সাধারণ লোকের ঘরেই শাশুড়ি ও বৌতে বনিবনা হয় না। এই-সকল উঁচুতলার লোকদের বাড়িতে মনোমালিন্য হওয়ার তো অনেক বেশি কারণ থাকে। বিধবা-বৌ শাশুড়ির বাড়ি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং যে বাড়ি ভাড়া করিলেন, পত্রিকায় পড়িলাম তাহার মাসিক ভাড়া ৬০০০, (ছয় হাজার) টাকা। প্রথম মনে করিলাম ভুল দেখিতেছি ; একটা শূন্য কম হইবে। পরে বুঝিলাম যে, তাহা হইলে তো ইহা খবরের কাগজের খবর হইত না।

কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের এই পাড়ায় ধীরে ধীরে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতেছি। বিগত ন' বছর অসুস্থ অবস্থায় বসিয়াই দিন কাটাই ; কাজেই প্রতিবেশীদের হালচাল দেখিতে পাই। দুই শ্রেণীর নূতন লোকের অভ্যুদয় বা অভ্যাগম হইয়াছে। উপকণ্ঠ বলিয়া পূর্বে বেশ খালি জায়গা ছিল ; সংলগ্ন খালি জমিতে বাংলো রকমের বাড়ি ছিল। সেইসব জায়গায় নূতন ধরনের বাড়ি উঠিয়াছে এবং নূতন অভিজাত শ্রেণী আসিয়া দখল লইয়াছে। ইঁহাদের জীবনধারণের পদ্ধতি আমাদের জীবনধারা হইতে অনেকটা আলাদা। কিছুদিন আগে কলিকাতার পুলিশবিভাগের জনৈক বড়কর্তা ট্র্যাফিক জ্যাম বা যানজটের বিষয়ে রেডিও বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির পর মনে করা গিয়াছিল কলিকাতায় মোটর গাড়ির সংখ্যা কমিয়া যাইবে ও পথের সমস্যা সহজ হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া সমস্যাকে কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন কুলীনরা খুব ভদ্র, তার চেয়ে বড় কথা, খুব ধনী। আমরা ক্বচিৎ ইঁহাদের চালচলনের সন্ধান পাই। বিশেষ প্রয়োজনে এই পাড়ায় আমার এক ছাত্রের বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল ; বোধ হয় তাহারা ভাইরা একটা সীমাবদ্ধ কলোনীতে থাকে। পর পর দাঁড়ান মোটর গাড়ি দেখিয়া আমি আন্দাজ করিলাম, এখানে মাথা পিছু অন্ততঃ একখানা গাড়ি আছে।

জহরলাল নেহেরু প্রবর্তিত যে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে আমরা বাস করি তাহার আর এক স্তরের কথা বলিব। প্রথমেই পাঁচ-ছয় বছর আগেকার একটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিব। আমার বাড়ি পরস্পরচ্ছেদক রাস্তার মিলনস্থলে। আমি বাহিরের ঘরেই বসিয়া থাকি। একদিন সকালে একটি কচি শিশুর কান্না এবং পাড়ার মহিলাদের ভিড় দেখিতে পাই। পরে কন্যাসমা প্রতিবেশিনী সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে একটি স্ত্রীলোক ছোট একটি মেয়েসহ এই পথ দিয়া যাইতেছিল। ঠিক আমার বাড়ির সম্মুখেই সে বসিয়া পড়ে এবং বিনা ক্লেশে আর একটি কন্যা প্রসব করে। ইহারা অগ্রসর হইয়া

প্রাথমিক সাহায্য দিয়াছে। আমি প্রশ্ন করিলাম, সধবা মা যখন সন্তান প্রসব করিল, তখন নিশ্চয়ই কন্যার পিতা কোথাও আছে ; সে কি করিল? সুজাতা যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই : কলিকাতার কাছেই ইহাদের বাড়ি। (অনুমান করি স্বামী সেখানেই থাকে) কিন্তু দেশে আহার সংস্থানের কোন উপায় নাই। কলিকাতায় ভিক্ষা করিয়া কোনক্রমে আহার জোটে।

পরিবারের কাজ পরিবারের লোকই করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং সেইজন্য পরিচারক ও পরিচারিকা নিয়োগ করার ব্যবস্থা দাসত্বের পরিচায়ক। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক বেকার এবং যৌথ পরিবার ভাঙিতে ভাঙিতেও ভাঙিতেছে না, সেই-সকল অনুন্নত দেশে এই প্রথা এখনও চালু আছে। পূর্বে সাধারণতঃ পুরুষ-ভৃত্য কাজ করিত, যদিও অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল পরিবারে বাসনমাজা বা ঐজাতীয় কাজের জন্য পার্টটাইম ঝি থাকিত। এইসব পরিচারিকারা সাধারণতঃ অসহায় বিধবা, বা কখনও কখনও কুলত্যাগিনী বা স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী। পুরুষ-ভৃত্য বা পাচকদের দেশে জমিজমার কাজ থাকিত এবং ফসল কাটার সময় তাহারা দেশে যাইত। নগদ টাকার জন্য বাড়ির কেহ কেহ কলিকাতায় আসিত এবং পাচক ও ভৃত্যের কাজ করিত। গ্রাম্য সংসার অটুট থাকিত। কিন্তু এখন অবস্থা হইয়া গিয়াছে অন্য রকমের। দেশে জমি নাই, বর্গাদার যে জমি চাষ করে তাহা সে একাই করিতে পারে, যদি-বা সহায়ক নেয়, এত সামান্য মজুরি দেয় যে তাহার দ্বারা সংসার চলে না। সুতরাং গৃহিণীরা শুধু সন্তান ধারণ করে না, পরিবার পালনও করে এবং সেইজন্য কলিকাতায় চলিয়া আসে ; স্বামীরা যদি সঙ্গে আসে তাহারা টুকিটাকি কাজের চেষ্টা দেখে, কিন্তু তাহারা বড় কিছু করিতে পারে না ; ভার্যাই তাহাদের ভর্ত্রী। আগে যে-রকম দেখিয়াছি, এখনকার পরিচারিকারা তাহাদের মত নহে। ইহাদের সংসার আছে, একসময় বাড়ি ছিল, এখনও পারিবারিক কর্তব্যবোধ আছে, কিন্তু উপায়হীনা।

৫

ইহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ভোলানাথ সেন বলিয়াছিলেন যে আমাদের দেশে গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য অনেক ভোটার দশ পয়সাও ব্যয় করিতে পারেন না। ভোটারদের দুরবস্থা এবং কংগ্রেস নেতার স্বীকারোক্তি জহরলালের সোশ্যালিজম ও ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচীর উপর তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করে। শুধু কলিকাতার কথাই বলি কেন, অন্যান্য বড় শহরেও একই অবস্থা। সেখানকার বস্তি-জীবনেও সম্ভ্রম নাই, লজ্জা নাই, প্রীতি নাই, শোভা নাই, কিন্তু কোন রকমে কিঞ্চিৎ আহার জোটে। বোম্বাই বর্তমানে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী : এখানে ধারাবি কলোনী চার বর্গ কিলোমিটার জায়গায় দশ লক্ষ লোককে আশ্রয় দিয়া এশিয়ার বৃহত্তম বস্তির সম্মান লাভ করিয়াছে। এইসব গ্রাম হইতে শহরে ক্রমবর্ধমান পরিক্রমা—ইহা এক দিক দিয়া মার্কস্-বাদেরও জয় সূচনা করে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস্ যে-সমস্ত সংস্কার দাবি করিয়া-ছিলেন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে নৈকট্য-সাধন বা পার্থক্যের অবসান তাহার অন্যতম (৯ নং)। কলিকাতায় বসিয়া আমি এই নৈকট্য বিশেষ করিয়া অনুভব করি। আমার ছেলেবেলা গ্রামে কাটিয়াছে। সেখানে কেরোসিনের ল্যাম্পে পড়িতাম এবং কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিতে নিবিড় অন্ধকারের অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হইতাম। এখন রাত্রিতে পড়াশোনা করি না, কিন্তু মিটমিটে অর্থাৎ জলমিশ্রিত কেরোসিন ল্যাম্পে আলোকিত ঘরে বসিয়া যখন বাহিরের রাস্তার দিকে তাকাই, তখন সত্তর বছর আগেকার সেই শিহরণ, সেই রোমাঞ্চ অনুভব করি। কংগ্রেস

সরকারই ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, মার্কস্‌বাদী সরকার গ্রাম ও শহরের এই সাদৃশ্যকে প্রায় পাকা করিয়াছেন।

গণভোটের দ্বারা কোথাও মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ভারতবর্ষেও হইবে বলিয়া মনে করি না। মাঝে মাঝে দুই-একটি অঙ্গরাজ্যে ইহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে সত্য, কিন্তু সেইখানে কোন সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ইহাদের সীমিত ক্ষমতার যে নমুনা দেখিতেছি তাহার কথা অচিরেই বলিব। পূর্বেই বলিয়াছি কংগ্রেসের তিন দশকের সোশ্যালিজমে শুধু দুইটি জিনিস স্ফীত হইয়াছে—দ্রব্যমূল্য ও জনসংখ্যা। মাঝে মাঝে কৃত্রিম উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতির একটা চিত্র তুলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহা হাস্যকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না, তাঁহাদিগকে যে কেবলই বর্ধিত হারে দুর্মূল্য ভাতা দিতে হয় তাহাই মূল্যমানের তথাকথিত স্থিতিশীলতার অলীকতা প্রমাণ করে। এদিকে সরকার দেশে নিষ্কর ঋণপত্র চালু করিতেছেন এবং বিদেশ হইতে সুদসহ প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করিতেছেন। আখেরে দেখা যায় যে এই উভয় ঋণের মাসুল যোগায় আপামর জনসাধারণ—যাহাদের অনেকেই বেকার ও অনশনক্লিষ্ট।

আর একটি উপায়ে এ দেশের উপর বোঝা বাড়াইয়া গিয়াছেন নেহেরু। অবাধে ইকনমিক পলিসি চালু করিবার জন্যই তিনি খণ্ডিত স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেন। অথচ যখন অন্তর্বর্তী সরকারের সভ্য হইলেন তখন অর্থমন্ত্রক দিলেন জিন্নার অনুগামী লিয়াকত আলিকে। তখনও ভারতবর্ষ পরাধীন উপনিবেশ ; তাহার কোন বৈদেশিক নীতি থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সহ-সভাপতি নেহেরু পররাষ্ট্রদপ্তর গ্রহণ করিলেন। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাঠাইয়া এবং চীনের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া ও সংঘর্ষ বাধাইয়া তিনি অজ্ঞতা ও অনধিকার-চর্চার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, যত্রতত্র ছোট-বড়—এক ইস্রাইল ছাড়া বোধ হয় সর্বত্র—দূতাবাস স্থাপন করিয়াছেন। এক সময় যখন এরোপ্লেন ছিল না, টেলিফোন, টেলেক্স প্রভৃতি দ্রুতগামী যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, তখন দূতাবাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং দূতদের উপস্থিতবুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারেই দূতাবাসগুলিকে বিদেশমন্ত্রকের নির্দেশমত কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ, এত ব্যয়বহুল এবং এত বেশি দূতাবাসের সার্থকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও শুনিয়াছি যে এইসব ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান লক্ষণ কর্মচারীর বাহুল্য। ইহাদের দ্বারা যদি কোন কাজ হইত তাহা হইলে আমাদের এখান হইতে এত প্রতিনিধিদল ও ডেলিগেশন পাঠাইতে হয় কেন? বিদেশী মুদ্রা ও স্বদেশী মুদ্রা—মন্ত্রী, সেক্রেটারিদের বিদেশভ্রমণের মহোৎসবের এই বিরাট ব্যয় জোগাইতেই যে-কোন দেশ দেউলিয়া হইতে পারে। ইহার উপর নেহেরু আবার একটা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করিলেন। প্রথম কথা, এই নেতিবাচক নামধেয় বস্তুটি এই পর্যন্ত ইতিবাচক কোন কাজ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ যে ইহার মধ্যে গেল তাহা হাস্যকর ব্যাপার এবং সেই কমেডি প্রতিনিয়ত পরিস্ফুট হইতেছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে জহরলাল বন্ধুদের—এবং শোনা যায়, মহাত্মাজির—পরামর্শের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জে নালিশ করিলেন এবং অদ্যাবধি ভারত সোভিয়েট ভিটো আঁকড়াইয়া আছেন। সুতরাং ভারত আর ইসরাইল একই পর্যায়ভুক্ত : শুধু ভিটো-দাতা বিভিন্ন। কিন্তু এই পোশাকী নিরপেক্ষতা দরিদ্র দেশের প্রশাসনিক বাজেটে শুধু বোঝার উপর কি শাকের আঁটি। আমি অর্থনীতি বা ইকনমিক্স জানি না। আন্দাজে বলিতে পারি, সহজভাবে আমাদের যাহা আয় হয় তাহা বিরাট প্রশাসন-যন্ত্রই নিঃশেষ করিয়া দেয়। সেই কারণেই

আমাদের প্ল্যানিং, আমাদের ডেভলেপমেন্ট অর্থাৎ উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা শুধু দারিদ্র্যই বাড়াইয়া দেয়।

যে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যে বাস করি আপাতদৃষ্টিতে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পৃথক, কারণ ইহারা মার্কস্‌বাদী। কিন্তু অর্থনীতিক দিক দিয়া ফল একই দাঁড়াইয়াছে। প্রবল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারের একটা বাহিনী রক্ষা করার প্রয়োজন। সেইজন্য এই সরকার সকলকে বেতন দেওয়ার ভার গ্রহণ করিলেন এবং ইউনিয়নের মারফতে ভোটযুদ্ধে জয়ের পথ প্রশস্ত করিলেন। কাজ করার দায়িত্ব উঠিয়া গেল, বেতন প্রমোশন নিশ্চিত হইয়া রহিল—ইহাই তো রামরাজ্য। কিন্তু এইভাবে সরকারি, বেসরকারি, লোকসান-দেওয়া অধিগৃহীত কারবারের কর্মচারী—ইঁহাদের সকলের বেতন মিটাইতে গেলে নূতন লোকের জায়গা করা যায় না। সেইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ওভারড্রাফট চাহিয়া কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ করিয়া আবার কেন্দ্রের কাছেই যোজনার টাকা ফেরত দিয়া ওভারড্রাফটের বদলে ঋণ লইতে হয়। এই-ভাবেই বেকারসমস্যা দিন দিন বাড়িয়া সমাধানের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এখন অফিস-কাছারিতে দুই শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। একদল কাজ না করিয়াই খুশি—বেতন, মহার্ঘ্য ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ইউনিয়ন করিবে, তাঁহারা কষ্ট করিয়া একবার যে-কোন সময় হাজিরা দিয়া যাইবেন। আর একশ্রেণী আছেন যাঁহারা খুব চটপটে। তাঁহারা দেখেন মন্ত্রী, এম. পি., সেক্রেটারিরা নানা সুবিধা আদায় করিয়া লয়েন, আর কাজ করিবার দায়িত্ব বা ঝামেলা বর্তায় তাঁহাদের উপর। সুতরাং তাঁহারা কাজ করিয়া কিছু রোজগার করিতে চান। ইঁহাদের একদলের ফিলজফি হইল টাইম মানে দশটা-পাঁচটা অফিসে থাকা—চা খাওয়া, গল্প করা, রেডিও শোনা ইত্যাদি আর কাজ করিতে হইলে ওভারটাইম ভাতা লইয়া পাঁচটার পর কাজে হাত দিতে হইবে। যাঁহারা আরও চটপটে, তাঁহাদের নজর আরও উঁচুতে। তাঁহারা শুধু বুদ্ধির দ্বারা দু'পয়সা কামাইতে চান। ইঁহাদের কথা বলিলে মহাভারত লিখিতে হয়।

আমি দুই-তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরও স্পষ্ট করিব। সবসময়ই দেখা যায়, কোন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের—ধরা যাক কেরোসিন—ন্যায্য মূল্যের দোকানের কাছে লাইন পড়িয়াছে। সবাই পাইবেন না ; সুতরাং সবাই তাড়াতাড়ি সামনে যাইতে উৎসুক অথচ তাহা সম্ভব নয়। যাঁহারা আগে আসিয়াছেন, তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া অধীর হইতেছেন, আর পিছনের লোকেরা খালিহাতে ফিরিবেন—এই ভয় পাইতেছেন। আশেপাশে কয়েকটি লোক ঘুরিতেছেন এবং ফিসফিস করিয়া বলিতেছেন, দাম বাড়াইয়া দিলে (প্রায় দ্বিগুণ) তাঁহারা তখনই প্রাপ্য পরিমাণের অধিক মাল দিতে পারেন। কেহ শোনেন, কেহ শোনেন না। আমরা যাঁহারা শুনি না, তাঁহারা ন্যায্য দাম দিই বটে কিন্তু জলমিশ্রিত কেরোসিন পাই। আমার বাড়ির একটি সদ্য-পাস-করা ছেলে একটা সংস্থানে শিক্ষানবিসী করে। ঐ সংস্থার পক্ষ হইতে সে ট্যাক্স জমা দিতে গিয়াছে। অফিসার তাহাকে পিয়নের সঙ্গে কথা বলিতে বলিল ; পিয়ন তাহাকে ফর্ম দিল, কিন্তু ফর্ম পূরণ করিয়াই তো সে আসিয়াছে। ইহার পর অফিসার যখন বুঝিলেন যে এই ছোকরা একেবারেই অর্বাচীন, তখন পিয়নকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি ইহাকে সব বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও নাই ? অফিসারের ঘরের বাহির হইতেই পিয়ন 'সব কথা' বলিল 'আমাকে পঁচিশ টাকা দিবেন, কুড়ি টাকা ওঁর আর পাঁচ টাকা আমার।' আমার বাড়িতে অতর্কিতভাবে আত্মীয়দের আসাযাওয়া হয়। তাহাদের টিকেটের সমস্যা ও তাহার সমাধান দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। রিজার্ভেশন যতদিন ইচ্ছা আগে করার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু কখনও পাওয়া যায় না, আবার সব সময়ই পাওয়া

যায়। কর্মচারী বলেন, সব জায়গা পূর্ণ হইয়া আছে আর তাঁহার অনতিদূরেই এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন—যিনি টিকেট ও রিজার্ভেশন সবই দিতে পারেন। শুধু অন্যনামে যাইতে হইবে। ইহার জন্য নানা সময় নানা রকমের কমিশন দিতে হয়; সবচেয়ে বেশি পূজার সময়। তখন ডবল দাম দিতে হয়। জনৈক সাংবাদিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, রেলের কর্মচারীদের সংযোগেই ব্যাঙের ছাতার মত বহু ট্র্যাভেল এজেন্সী গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগকে সংযত করা এবং ইহাদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা দেবতার অসাধ্য। সরকারি হাসপাতালে গেলে জায়গা পাওয়া যায় না; সেইখানেও সেই একই প্রক্রিয়া। তদুপরি সংবাদপত্রে যাহা পড়ি ও লোকমুখে যাহা শুনি, তাহা হইতে মনে হয় এখানে চরম অব্যবস্থা এবং রোগীর প্রতি চরম অবহেলা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সংখ্যায় ভারি, তাহাদের দেহে শক্তি আছে এবং নবলব্ধ ক্ষমতার আস্বাদে তাহারা বেপরোয়া। বড় ডাক্তাররা বলেন, মন্ত্রী প্রথমে এই চতুর্থ শ্রেণীকে সংহত করিয়া ডাক্তারদের হাত হইতে হাসপাতালের পরিচালনা এই শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে তুলিয়া দেন। তারপর ইহাদের মধ্যে নানা পার্টির বিরোধই মন্ত্রীর শক্তির ভিত্তি হইয়া উঠিয়াছে।

অসাধুতা ও বিশৃঙ্খলা কাহারও একচেটিয়া নয়। এই বিষয়ে কেহ মৌলিকতা দাবি করিতে পারে না। মার্কস্বাদি-চালিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান কৃতিত্ব হইল শিক্ষার মানকে নীচু করিয়া দেওয়া। সম্প্রতি তাঁহাদের একটি প্রস্তাব দেখিয়া হতচকিত হইলাম। হঠাৎ ইঁহাদের খেয়াল হইয়াছে কলিকাতার কলেজে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে, কিন্তু মফঃস্বলে তাহা নাই; অথচ সেখানে বহু মেধাবী ছাত্র থাকিতে পারে যাহারা অনার্স পড়ার সুযোগ পায় না। মফঃস্বলে হুগলী, বহরমপুর, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অনেক কলেজে অনার্স পড়িবার সুযোগ আছে। কিন্তু কতজন মেধাবী ছাত্র সেখানে অনার্স পড়িতেছে এবং পড়িলেও অনার্সসহ পাস করে? ইহা বাদ দিলেও আজকাল মফঃস্বলে চারটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং মেদিনীপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কলিকাতায় প্রায় প্রত্যেক কলেজেই অনার্স পড়িবার সুযোগ আছে; সেখানেও অধিকাংশ কলেজেই খুব কম ছাত্র শেষ পর্যন্ত অনার্স লইয়া পরীক্ষা দেয় বা পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এলাকা ছোট হইয়া আসিতেছে। যদি মফঃস্বলের মেধাবী ছাত্রদের জন্য এতই মর্মপীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজনবোধে সেইসব কলেজে অনার্স পড়াইবার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় যুক্তি 'premature over specialization' হইতে অনার্স ছাত্রদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই উৎকট ভাষাই ইহার প্রত্যুত্তর। এই বিষয়টি এতই লজ্জাকর যে ইহার উল্লেখই করিতাম না। শুধু জীবনসায়াহ্নে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখিতেছি, তাহার পরিচয় লিপিবন্ধ করিয়া গেলাম।

এই যে দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও কতিপয় ভাগ্যবানের বিলাসবহুলতা—এই ধরণীধারণের জন্য সহস্রফণা বিস্তার করিয়া আছেন দেশের আইনজীবীসম্প্রদায়; ইঁহাদের মধ্যে ভাল লোক নাই বা ইঁহারা ভাল কাজ করেন না এমন কথা বলিতেছি না। আমি নিজে দুইবার মামলা করিয়াছি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে ইঁহাদের কাছে ঋণ স্বীকার করি। একটা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমার বাড়ির ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলা। আমার ছাত্র—(পরে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতা কালীপদ মুখোপাধ্যায় আলিপুরের সরকারি উকিল ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহকারী আমার নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক না লইয়া আমার মামলা করিয়া আমাকে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মামলার বৃহত্তর ব্যঞ্জনা আছে। লেনিন মাত্র ছয় বছরের চেষ্টায় একটা অতি বিরাট বৈপ্লবিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বহু ভুলও করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে হয়ত তিনি নিজের ভুল বুঝিয়া

স্বৈরতন্ত্রের ও আমলাতন্ত্রের বিপদের উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি যতদিন সরকারী চাকুরী করিয়াছি, ক্যাপিটেলিস্ট স্বৈরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের অবহেলা, অসম্মান, ন্যায্য দাবির উপেক্ষা সহ্য করিয়াছি অথবা গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু অবসর গ্রহণের পরও দেখি, আমলাতন্ত্রের বহুদিনের পোষিত ক্রোধের উপশম হয় নাই। ১৯৬০ সালে জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করি, আর ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। কখনও কখনও অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল আমার পেন্‌শন দিতে আপত্তি করিলে আমি সতীশচন্দ্র দত্তগুপ্ত বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মামলাটির উল্লেখ করিয়া দিলে বিল পাস হইয়া যাইত। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকর্মী গোপীনাথ ও সরোজ সান্যালও যাদবপুরে চাকুরী করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি গেল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া আসার পর ১৯৬০ সালে সহসা সরকারের অর্থসচিব আমার পেন্‌শন আটকাইয়া দিলেন। আইন আমার পক্ষে হইলেও মামলা-মোকদ্দমা না করিয়া আমি আলাপ-আলোচনার দ্বারা সরকারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ফল না হওয়ায় ৯ই অক্টোবর হাইকোর্টে ২২৬ ধারা অনুসারে মামলা রুজু করিলাম। নোটিশ পাইয়া অর্থদপ্তরের ঝটিতি 'বদলে গেল মতটা'। সাত দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর অর্থদপ্তর পূর্বাদেশ বাতিল করিয়া আমার পেন্‌শন বহাল করিয়া দিলেন। এই সময় প্রেসিডেন্টের সরকার চালু ছিল। গভর্ণরের মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন আমার ছাত্রাবস্থার সমসাময়িক ও বন্ধুস্থানীয় বিনয়ভূষণ ঘোষ। তিনিই অর্থ-মন্ত্রীর কাজ করিতেন; তাঁহার এবং শিক্ষা-উপদেষ্টার অকর্মণ্যতায় আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছিলাম।

পরে এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে স্বাধীন ভারতের এই রক্ষাকবচ অর্থাৎ ২২৬ ধারা একটা বড় অবদান। স্বীকার করি, তুচ্ছ ব্যাপারে ইহা তুলিয়া মামলাবাজেরা কোর্টের সময় ও সরকারের অর্থের অপচয় করেন। কিন্তু যাহারা অপচয়ের সমুদ্রে ভাসি-তেছে তাহাদের শিশিরের বাহুল্যে ভয় করা চলে না। আমি দশমাস তদ্বির করিয়া যাহা পারি নাই, ২২৬ ধারার নোটিশ দিয়াই তাহা হাসিল করিয়াছিলাম। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আমার ইহা বেশি করিয়া মনে হইয়াছে যখন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাষাপথিক হরিনাথ দে' গ্রন্থ পড়ি। একটা আধা-গোপন রহস্য দিবালোকে টানিয়া আনিয়া হরিনাথ দে যে অন্যায়ভাবে পর্যুদস্ত হইলেন, ২২৬ ধারা তখন চালু থাকিলে তাহা সম্ভব হইত না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি : 'বছরের পর বছর কেটেছে, কেহ তো কহেনি কথা/...সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম সবার কাছে।' ('প্রকাশ')

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বাধীন ভারত কোন্ পথে? (২)

বিচার ও আচার

১

পুণ্যশ্লোক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার আমলে হাইকোর্টের জজেরা প্রায় সবাই সাহেব ছিলেন; সাধারণতঃ একজন বা কচিৎ দুইজন ভারতীয় থাকিতেন। এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীদের মধ্যে গুরুদাস একজন। তিনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও ন্যায়বান্ বিচারপতি ছিলেন। কথিত আছে যে পূর্বে হাইকোর্টের জজদের অবসরের কোন বয়ঃসীমা ছিল না; যতদিন সম্ভব বা ইচ্ছা তাঁহারা কাজ করিয়া যাইতে পারেন। সরকার পরে জজদের জন্য ষাট বছরে অবসরগ্রহণের বয়স নির্ধারিত করিয়া দেন। অবশ্য যাঁহারা এই আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—ইঁহাদের মধ্যে গুরুদাসও একজন—তাঁহারা ইহার আওতায় পড়িবেন না। গুরুদাস নাকি লিখিয়াছিলেন যে তিনিও ষাট বছর পূর্ণ হইলে অবসর লইবেন, কারণ নিয়োগকর্তার জজদের সম্পর্কে সেইরূপই অভিপ্রায়। আইনের খুঁটিনাটি দেখাইয়া তিনি চাকুরীতে টিঁকিয়া থাকিতে চান না। গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি.এল. (১৮৭৭), আশুতোষ ষষ্ঠ ডি.এল. এবং গুরুদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শরৎচন্দ্র সপ্তম ডি.এল. (১৮৯৭)। এইরূপ মেধাবী ছাত্র হাইকোর্টে ওকালতি করিবেন তাহাই আশা করা যাইত। কিন্তু পিতা বলিয়া দিলেন—ছেলে তাঁহার কোর্টে প্র্যাকটিশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু উকিল পূর্ব হইতে কেমন করিয়া জানিবেন কোন্ কোর্টে কোন্ কেস উঠিবে? সুতরাং তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ না করিয়া চাকুরী গ্রহণ করেন। ইহাকে আমি দেখি নাই। গুরুদাস-জামাতা জজ মন্মথ মুখার্জিকে দেখিয়াছি। নানা উপলক্ষে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিতেন; সকলের সঙ্গে গল্প করিতেন। তিনি তখন প্রবীণ জজ হিসাবে আপীল আদালতের প্রধান কোর্টে বসিতেন, যেখানে বড় বড় দেওয়ানী মামলা উঠিত। তিনি যখন প্রথম উকিল হয়েন, তখন গুরুদাস এই কোর্টে বসিতেন। তিনি জামাতাকে ঐ কোর্টে প্র্যাকটিস করিতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা মন্মথনাথ ফৌজদারী মামলায় মনোনিবেশ করেন এবং সেই কোর্টে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবরূপে পরিচিত হয়েন। প্রবীণতম সিনিয়র উকিলজজই বড় দেওয়ানী মামলা শুনিয়া থাকেন; মন্মথবাবুকেও একসময় তাহাই করিতে হইত। তিনি নাকি প্রায়ই রহস্য করিয়া বলিতেন, শ্বশুরের জন্য তিনি দেওয়ানী মামলা করিতে পারেন নাই; অথচ কর্মজীবনের শেষভাগে রাম ও শ্যামের মধ্যে কে সম্পত্তির প্রকৃত মালিক এই চিন্তায় তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। ইহার পরে এই দৃষ্টান্ত কয়জন জজ অনুসরণ করিয়াছেন? বরং সেদিন পত্রিকায় একটা সংবাদ দেখিতেছিলাম যে জজদের কোর্টে তাঁহাদের নিকটআত্মীয় মামলা করিতে পারিবে না—এইরূপ আইন হওয়া উচিত। এই জাতীয় একটা কথা যে উঠিয়াছে তাহাই তাৎপর্যপূর্ণ।

গুরুদাসবাবু চালচলনে খুব সাদাসিধে ছিলেন। ব্রহ্মণ্য নিষ্ঠার জনাই বোধ হয় তিনি উত্তমাঙ্গ অনাবৃত রাখিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তখন কলিকাতার রাস্তায় এত ভিড় হইত না। একদিন এক বিধবা বুড়ী তাঁহাকে পথে একটি কাজের জন্য ধরিলেন। কেহ

বলেন, বিধবা তাঁহার যজ্ঞোপবীত দেখিয়া অভুক্ত গৃহদেবতার পূজা করিয়া দিতে বলেন ; আবার ইহাও শুনিয়াছি যে তিনি বৃদ্ধার বোঝা তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহাই করিয়া থাকুন, বৃদ্ধা এই বিচারপতিকে আশীর্বাদ করিলেন, 'বাবা, তুমি দারোগা হইবে।' শেষের গল্পটা আরও মুখরোচক। মফঃস্বলে জনৈক মক্কেল—এক কোর্ট কি দুই কোর্ট ঠিক বলিতে পারি না—মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধারণা মামলার আসল বিচারক পেশকার ; হাকিম পেশকারের বশ। তিনি সবসময়ই পেশকারকে হাত করার জন্য উকিলকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু উকিল তাঁহার কথায় তেমন মন দেন নাই। সেইজন্য নিম্ন আদালতে হারিয়া হাইকোর্টে আসিয়া উকিলকে পেশকারের জন্য আগেই ২৫ টাকা—তখনকার দিনে ইহা মোটা টাকা—টেবিলে রাখিলেন। এখানকার উকিল বারবার বলিলেন, হাইকোর্টে পেশকারই নাই ; তবু মক্কেল খুব খুঁতখুঁত করিতে লাগিলেন যে, পেশকারকে বশীভূত না করার জনাই তিনি নিম্ন আদালতে হারিয়াছেন। মক্কেল কোর্টে আসিলেন—তখন একমাত্র বাঙ্গালী জজ গুরুদাস—ময়লা রং, চোগা চাপকান পরা আর মাথায় শামলা টুপি। আর সকল জজই লালমুখ। কিন্তু মামলাটা গুরুদাসের কোর্টে, এবং তিনিই সিনিয়র জজ। মামলাব ডাক হইল ; আমাদের মক্কেলের উকিল উঠিয়া সওয়াল করিতে লাগিলেন। প্রথানুসারে সিনিয়র জজ গুরুদাস তাঁহার সঙ্গে বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন আর জুনিয়র সাহেব জজ নীরবে বসিযা রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে উকিল অনুভব করেন যে কে যেন পিছন হইতে তাঁহার গাউন টানিতেছে। ফিরিয়া চাহিতেই মক্কেল বলিলেন, 'আমি আগেই বলিয়াছিলাম—পেশকারের মুখ সামলান। জজ সাহেব তো বেশ চুপ করিয়া আছেন। পেশকাব বেটাই যত চীৎকার করিতেছে।

২

গুরুদাসের মত ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি সর্বদেশে ও সর্বকালে দুর্লভ। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পূর্বে সিভিল কোর্টের পেশকারের বা ফৌজদারি মামলায় পুলিশের দুর্নীতির অপবাদ থাকিলেও জজদের সততায় লোকে বিশ্বাস করিত। ম্যাজিস্ট্রেট একাধারে পুলিশ প্রশাসনের প্রধান, আবার তিনি ফৌজদারি মামলার বিচারবিভাগেরও প্রধান। সেইজন্য বিচারবিভাগকে প্রশাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বহু দিন হইতে আন্দোলন হইযাছে। ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে অন্ততঃ রাজনৈতিক মামলায় বিচার অনেকটা প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বে রাজনৈতিক মামলায়ও অনন্যসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। মাত্র একজন আসামীর জন্য প্রথম স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় ১৯১৪ সালে, সম্রাট বনাম নগেন্দ্র বা মুসলমানপাড়া বোমার মামলায়। সেখানে ট্রাইবুন্যালের সদস্য ছিলেন প্রধান বিচারপতি জেনকিন্স এবং বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি ও হোমউড্। সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী ছিলেন এস. পি. সিংহ। এই মামলায় জেনকিনস্ সাহেব আসামীকে খালাস দিয়া যে রায় দেন, তাহা ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইঁহার ভাষার প্রসাদগুণও লক্ষণীয়। ব্যঙ্গরসিক, বিদ্রূপপরায়ণ সুইফট্ বলিয়াছেন যে আইনজ্ঞেরা প্রাকৃতজনকে বিভ্রান্ত করার জন্য এক উদ্ভট ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অপরে বুঝিতে পারে না। এইভাবে ইঁহারা সত্যকে বিকৃত করেন এবং বিচারবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেন। এই মামলার রায়ে বিভ্রান্তির বাষ্পটুকুও নাই—আছে সরল সহজ বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। যাহা সবচেয়ে আমার মনে ধরিয়াছে তাহা হইল বিচারক ও কৌঁসুলীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাভিত্তিক আস্থা। এস. পি. সিংহ স্পষ্ট

করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে বহু সাক্ষীর মধ্যে জন-দুইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর তাঁহার মামলা নির্ভর করে। যদি ইঁহাদের সাক্ষ্য কোর্ট বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে আসামী খালাস পাইবেন। জেনকিনস্ সাহেবও তাহা মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই পথে অগ্রসর হইয়া তিনি আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন। বহু পরে আসামী নিজেই প্রথমে লাট-সাহেবের কাছে এবং পরে Repentant Revolutionary নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে তিনি এই অপরাধ করিয়াছিলেন।*

এখন বিচারশালার সেই মর্যাদা নাই, সেই নিষ্ঠাও নাই। আমি অসাধুতার কথা বলিতেছি না। তবে মুক্তকণ্ঠে কি সেই দাবিও করা যায়? রায়বেরিলি ইলেকসনের মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ যখন রায় লিখিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে নাকি প্রলোভন দেখান হইয়াছিল যে তিনি সুপ্রীম কোর্টে উন্নীত হইবেন। ব্যাপারটা পার্লামেন্টে উঠিয়াছিল। প্রলোভনের বিষয়টি স্পষ্ট না হইলেও একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেন রাত্রিতে রায় লিখিতে ব্যস্ত জজের বাড়িতে সস্ত্রীক হাজির হইয়াছিলেন, তাহার তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক আইনমন্ত্রী (শিবশংকর?) একটা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আজকাল অসাধুতা দেখা যাইতেছে। ইহা কি শুধু পেশকার প্রভৃতির অসাধুতা? সম্প্রতি এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতিদের বদলি করা হইয়াছিল ; মনে করা হইয়াছিল তাহা রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু তাহা নহে ; প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই ; তবে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে যে মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছিল, তাহা আইনগত মতবিরোধ নয়। ইহাও নানা রকমের জল্পনাকল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও আমি মনে করিব, যে সর্বব্যাপী অসাধুতা বিচারকমণ্ডলীকে তেমন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তবু আইন-আদালতই অসাধুতার প্রধান আশ্রয়স্থল। জজরাও পরোক্ষভাবে ইহাকে পরিপুষ্ট করেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমল হইতেই প্রথম শ্রেণীর কৌঁসুলীরা জজ হইতে চাহেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তখনকার দিনে চার-হাজার টাকার ক্রয়ক্ষমতা খুব বেশি ছিল। কংগ্রেস সরকার বোধ হয় চাহিয়াছিলেন যে, বিচারপতিরা খুব বেশি ব্যক্তিত্বশালী হইলে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র খর্ব হইবে। সুতরাং জজদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইল। প্রথমে অন্যান্য বড় অফিসারদের বেতনও কমাইয়া দিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাহা আবার বাড়ান হইয়াছে ও হইতেছে। জজদের প্রাপ্তিযোগ আরেক দিক হইতে খর্ব হইল, কারণ অবসর গ্রহণের পর প্র্যাকটিস করিবার স্বাধীনতাও হরণ করা হইল। ত্রিশ বৎসরের স্বাধীনতায় দ্রব্যমূল্য হুহু করিয়া বাড়িয়াছে, অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রভৃতি যথেষ্ট বাড়িয়াছে। কিন্তু জজদের বেতন বাড়ে নাই। সেই কারণে যে-সব অ্যাডভোকেট বা ব্যারিস্টার জজ হয়েন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অনভিজ্ঞ। হয়ত তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাহা পরিপক্ক হয় নাই। এদিকে আমরা এক জটিল, বিস্তৃত কন্‌স্টিটুশন রচনা করিয়াছি এবং ছোটখাট ব্যাপারেও সংবিধানকে টানিয়া আনা যায়। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কেবলই কমিশন গঠন করিতেছেন এবং আইন পাস করিতেছেন। অনেক আইনই কাঁচা হাতের রচনা। সুতরাং মামলা বাড়িয়াই যাইতেছে এবং বকেয়া মামলা স্তূপীকৃত হইতেছে। অবিভক্ত বঙ্গে বোধ হয় কলিকাতা

* ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ৪৬ জন আসামী ছিলেন। সেইখানেও প্রধান জজ জেনকিনস্ সাহেব খুব নিরপেক্ষ রায় দিয়া অধিকাংশ আসামীকে খালাস দেন।

হাইকোর্টের জজ ছিলেন চৌদ্দজন। এখন জজের সংখ্যা তিনগুণ—কিন্তু পর্বতপ্রমাণ বকেয়া মামলা জমিয়া আছে। আরও বেশি জজ নিযুক্ত হইলে বকেয়া বাড়িবে বই কমিবে না।

৩

এই দুষ্টচক্র—অসাধুতা, কালোবাজারি, মুনাফালুণ্ঠন, ট্যাক্সফাঁকি—ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন ব্যারিস্টার, উকিলরা। একজন বড় কৌঁসুলীর দৈনিক ফি ১৭০০, কেরানী ১০০ টাকা। টাকা লইলেই যে তাঁহারা মামলা করিবেন, তাহা বলা যায় না এবং মামলা না করিলেও টাকা ফেরত দেন এমন কথা শুনি নাই। যাঁহাদের কোর্টে ইঁহারা প্র্যাকটিস করেন তাঁহারা ইঁহাদের জুনিয়র ছিলেন। সুতরাং জজের কাছে ইঁহাদের ভয় নাই। মক্কেলের জন্য ইঁহাদের মমত্ব নাই। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ফি অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু সেখানেও কতকগুলি বড় অ্যাডভোকেটেরই রাজত্ব এবং তাঁহাদের জুনিয়র হিসাবে কোর্টের অর্ধেক উকিল জীবিকা অর্জন করেন। এখানকার বড় উকিলরা অনেকে দিনে অন্ততঃ চারটি মামলা নেন, কিন্তু দুইটির বেশিতে মন দিতে পারেন না। বাকী দুই কোর্টে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। একজন জুনিয়র উকিলকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'জজ কি করিবেন? কোর্টের অর্ধেক উকিল তো প্রবীণদের অনুগ্রহে করিয়া খায়। জজ ইঁহাদিগকে কিছু বলিলে যে আন্দোলন হইবে, তাহা নির্বিরোধ জজরা জানেন। হাইকোর্ট বা জজকোর্ট—বড় ব্যবহারাজীবরা সকলেই কালোবাজারী; কেহই চেকে টাকা নেন না অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেন এবং সেই কালো টাকা বাজারে আসিয়া দ্রব্যমূল্য বাড়াইয়া দেয়। আমি বিশেষ করিয়া হাইকোর্টের ও সুপ্রিমকোর্টের বড় বড় কৌঁসুলীদের ব্যাপার জানি। জনৈক কৌঁসুলী একবার দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন—একদিনে তিনি চৌদ্দ হাজার টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে তিনি নির্জন কক্ষে মারা যান, সেই রাত্রিতে তাঁহার কাছে ছিয়াত্তর হাজার টাকার নোট ছিল। কিন্তু বছর কয়েক আগে তাঁহার পুরানো কলেজের একটি দরিদ্র ছাত্রকে মাহিনা বাবদ (২০×১২) ২৪০ দিবেন বলিয়া তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমি বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সেই অঙ্গীকার পালন করাইতে পারি নাই।

আজকাল আদালতের মর্যাদা যে কমিয়া গিয়াছে তাহার একটা বড় কারণ, দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩—১৮৭৪) হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাপ্রয়াত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত বিচারপতিরা যে ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি আইন পড়ি নাই; কাজেই মাত্র দুই-একটা মোটা দৃষ্টান্ত দিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইতে ন্যায়ালয়ের ক্ষয়িষ্ণু মহিমার চিত্র স্পষ্ট হইবে মনে করি। আদালতের দুইটা বড় বিভাগ আছে—Civil (দেওয়ানী) ও Criminal (ফৌজদারি)। এই দুই জায়গায় দুই রকম বিধান অনুসৃত হইবে—সিভিল কার্যবিধি আর ক্রিমিন্যাল কার্যবিধি বা Procedure Code। কিন্তু এই চুলচেরা বিভাগ সর্বত্র সম্ভব হয় না। সেইজন্য উভচর মামলাকে বলা হয় quasi-criminal অর্থাৎ ইহা মোটামুটিভাবে সিভিল কার্যবিধির দ্বারা পরিচালিত হইলেও, কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রমাণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যপ্রণালীর কড়া মানদণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রমাণ শব্দটি আসিয়াছে ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক হইতে, যদিও আদালতের কাজ ব্যবহারিক জগৎ লইয়া এবং আইনব্যবসায়ীর আর এক নাম ব্যবহারাজীব। ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ অকাট্য, অটল, অনড়, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জগতের মানদণ্ড পরিবর্তনশীল এবং সেখানে

সত্য-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন ব্যাপার। সেইজন্য সাধারণতঃ দেওয়ানী বা সিভিল মামলায় যাহা সম্ভব তাহাকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরিলে চলে। কিন্তু ফৌজদারি মামলায় বাদীর আর্জি তখনই প্রমাণিত হয় যখন সাধারণ বুদ্ধিতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর দেওয়ানী মামলা তখনই quasi-criminal বা অর্ধফৌজদারি মামলার পর্যায়-ভুক্ত হয় যখন বিতর্কিত বিষয়ে সন্দেহাতীত সাক্ষ্য উত্থাপিত হয় এবং কোথাও কোন ফাঁক থাকে না। এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদের ক্ষমতা কি এখনকার বিচারকদের নিকট প্রত্যাশা করা যায়? আমি খুব আশ্বস্ত বোধ করি না। একটি নমুনা দিতেছি। একটি দেওয়ানী মামলায় উচ্চতম ন্যায়ালয় রায় দিলেন এই আইনে 'প্রমাণ' শব্দের অর্থ সন্দেহাতীত প্রমাণ। পরবর্তীকালে সেই আদালতেই অন্য একটি মামলায় এবারকার বিচারপতিরা বলিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা পুনরায় নিরীক্ষা করা দরকার। যে ধারায় প্রমাণের উল্লেখ আছে, সেই ধারার সাতটি উপ-ধারা বা অংশ আছে; পূর্বের মামলা ছিল (১)নং উপধারা বিষয়ক; এখন বলা হইল (২) হইতে (৬)নং উপধারার মামলায় অতটা কড়াকড়ির প্রয়োজন নাই। এইসব ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার মোটামুটি সম্ভাব্যতা পরিমাপ করিলেই চলিবে। এই যে (১)নংকে বাদ দেওয়া হইল, তাহা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া ছিল যে (১)নং উপধারায় ফৌজদারি আইনের এক্তিয়ার বহাল রহিল। কিন্তু এই পয়লা নম্বরের মামলার ক্ষেত্রে নিম্নতর কোর্টের বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত করিলেন পূর্ববর্তী রায় পরবর্তী রায়ের দ্বারা বাতিল হইয়া গিয়াছে: এই আইন দেওয়ানী কার্যপ্রণালী (Civil Procedure Code)-এর অন্তর্গত। সুতরাং প্রমাণব্যাপারে কড়াকড়ি করার কোন প্রয়োজন নাই। যেখানে বিচারপতির বুদ্ধি এই মাপের, সেখানে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র।

সমস্ত মামলার ভিত্তি হইল প্রাথমিক অভিযোগপত্র বা আরজি—যাহার সার্বিক অভিধা pleadings বা plaint; ইহা দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয় শ্রেণীর মোকদ্দমায় দৃঢ় হওয়া উচিত। ইহাকে শিথিল করা হইয়াছে বলিয়াই আধুনিক কালে ন্যায়-বিচার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদ বা সেকশনে করা হইবে। এখানে শুধু ফৌজদারি আদালতের দুর্গতির কথা বলিব।

আমাদের Criminal Procedure Code বা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারাটি দেখিতে মনে হয় নিরামিষ রকমের। বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে সরকারি কৌঁসুলি (Public Prosecutor) চালু মামলা কোর্টের অনুমতি লইয়া তুলিয়া লইতে পারেন। সম্প্রতি জনৈক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এইজাতীয় মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যাধিক্যের (২—১) জোরে এই প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়াছেন ১৯৮০ স্মরণ করিতে হইবে যে এখন যিনি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, একদা রাজ্যপাল হিসাবে তিনি এই মামলা রুজু করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

আলোচ্য ৩২১ ধারা অনুসারে মামলা প্রত্যাহার করার যৌক্তিকতা লইয়া ইতঃপূর্বে দুইবার বিতর্ক উঠিয়াছিল। যেসব যুক্তিতে মামলা প্রত্যাহার করা যায়, তাহার একটি হইল রাজনৈতিক প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর নিহন্তাকে বাঁচাইবার জন্য যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে, কারণ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে মহাত্মা গান্ধী অনন্যপুরুষ, আর সে মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিলেন। অথচ ১৯৮০ সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি মামলাও এই ৩২১ ধারার প্রয়োগেই তুলিয়া দেওয়া হইল। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে মামলা সেইদিন প্রত্যাহৃত হইল তাহার সঙ্গে ফার্ণাণ্ডেজের মামলার মৌলিক পার্থক্য আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে সেই

পার্থক্যের উপলব্ধি নাই। ইহা সত্য যে রাজনৈতিক কারণে এই জাতীয় প্রত্যাহার সম্ভব। ক্যাবিনেটকে না জানাইয়া গভীর রাত্রিতে রাষ্ট্রপতিকে দিয়া ইন্দিরা গান্ধী যে জরুরী অবস্থা জারি করাইয়াছিলেন, তাহার সপক্ষে কেহ কোন কথা বলে না এবং স্বয়ং গান্ধী মহাভাগাও বলিয়াছেন, আর কখনও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে না। ইহার বিরুদ্ধে যে সারাদেশব্যাপী বিক্ষোভ তরঙ্গিত হইয়াছিল আমাদের তিন দশকের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। যে কোন রাজনৈতিক কারণে মামলা প্রত্যাহার করা যায় বলিয়া বর্তমান মামলার সংখ্যাগুরু জজদের একজন এই যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর শত্রুরা শত্রুতার জের মিটাইতে এই মামলাকে জিয়াইয়া রাখিতে চাহেন। দেশব্যাপী আন্দোলন, বিক্ষোভ ও বিপ্লব যাহাকে বলা যাইতে পারে political upheaval, তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা-সাধন বা political vendetta কে যে বিচারপতিরা সমান করিয়া দেখেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রশংসা করা যায় না। এই রায় পড়িয়া দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে : 'Thus, by implication, this country is governed by two sets of laws, one for the ordinary citizen and the other for the wielders of power.' অর্থাৎ এই রায়ের তাৎপর্য এই যে, এই দেশে দুইরকম আইনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল সাধারণ লোকের জন্য একরকম, আর ক্ষমতাসীন লোকদের জন্য আরেক রকম। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা জুয়াচুরি, জালিয়াতি করিলেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিবে না।

আধুনিক কালের আইনজীবীদের গগনস্পর্শী কীর্তিকলাপ কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বুড়ো এবং অকেজো হইলেও আমিও অন্ধ নই। ইঁহারাই মুনাফা লুণ্ঠন এবং অসাধু ব্যবসায়কে চালু রাখেন এবং ব্যতিক্রম থাকিলেও ইঁহারা নিজেরাও অংশতঃ এই কাজে লিপ্ত আছেন। আমরা যে সংবিধান রচনা করিয়াছি এবং প্রতিদিন যে আইন রচনা করিতেছি তাহা ইঁহাদের জন্য বিরাট ক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়াছে এবং অনেকটা ইঁহাদের কারসাজিতেই আমাদের ডিমোক্র্যাসী প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কোর্টে জবান-বন্দী দিতে যাইয়া কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, তিনি কি উকিল না বেশ্যা যে তাঁহার পেশা থাকিবে? বঙ্কিমচন্দ্র আজ জীবিত থাকিলে স্বীকার করিতেন যে এই উক্তির মধ্য দিয়া তিনি বেশ্যাদের উপর অবিচার করিয়াছেন। শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। এক বড় কৌঁসুলীকে নিযুক্ত করিয়া সলিসিটর নির্ধারিত দিনে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। জুনিয়রকে দিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া পরে একদিন বড় কৌঁসুলীর কাছে কথাটা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিলেন যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার নির্দিষ্ট জায়গায় সলিসিটরবাবুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন! বিচক্ষণ সলিসিটর বুঝিতে পারিলেন যে কৌঁসুলীমহাশয় পকেটস্থ আঠার শত টাকা ফেরত দিবেন না; সুতরাং আর কথা বাড়াইলেন না।

আর একজোড়া মহাপুরুষের কথা বলিব। ইঁহারা দুই ভাই বলিয়া ইঁহাদের নাম রাখিলাম সুন্দ ও উপসুন্দ। অগ্রজের দক্ষিণা যখন ৭৫০, টাকা, তখন তাঁহাকে একটা অন্তবর্তী আদেশের জন্য দরখাস্ত করিতে বলা হইল। তিনি জুনিয়রকে বলিলেন, ইহা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার এবং ইহার কোন প্রয়োজনও নাই। কিন্তু মক্কেলের প্রয়োজন আছে, এই গরজ বুঝিয়া তিনি পাঁচ মিনিটকে টানিয়া চল্লিশ মিনিট করিলেন এবং দুইদিনে করিলেন যাহাতে পনের শত টাকার উপচার পকেটে আসে। ইঁহার রকম দেখিয়া মক্কেল ইঁহার এক বন্ধুকে ধরিলেন যাহাতে আসল মামলাটা এই ব্যক্তি ঠিকমত করিয়া দেন। বন্ধু—ইঁহার নাম দেওয়া যাইতে পারে মহাসুন্দ—বলিলেন, 'এই কৌঁসুলী আমার 'ডেভিল' (কি সঙ্গত আখ্যা!) ছিল। কোন চিন্তা নাই : আমি কথা দিতেছি কৌঁসুলীর দিক

হইতে চেষ্টার কোন ত্রুটী হইবে না।' সময়মত কৌঁসুলীকে ১৮০০, টাকা, পেপার বুক প্রভৃতি দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি হাজির হইলেন না। পরে বন্ধুর চাপে নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ কবে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, ব্রিফ কোথায় ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া নিরস্ত হইলেন। টাকা অবশ্য তাঁহার পকেটেই রহিল। মহাসুন্দ বলিলেন, তাঁহার ডেভিলের কোন গাফিলতি হয় নাই। তিনি পরে মক্কেলকে সব বুঝাইয়া দিবেন। সেই 'পর' আর আসে নাই। সুন্দ, মহাসুন্দ—উভয়েরই শেষ ইচ্ছা—আপীল করিতে বল, আপীল করিব ; কিন্তু টাকা ফেরত দিব না। উপসুন্দ মহাশয়ের মক্কেল একটা অতিকায় সংস্থার একজন উচ্চ-পদস্থ অফিসার ছিলেন। অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে চাকুরী ছাড়িতে হয়। খানিকটা গায়ের জোরেই কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রভিডেন্ড ফণ্ডের একটা মোটা অংশ দিতে অস্বীকার করেন। নালিশ করিয়া অফিসার ঐ সংস্থার উপর রুল জারি করাইলেন। মামলার শুনানীর দিন কৌঁসুলী উপসুন্দ অনুপস্থিত ; সুতরাং রুল খারিজ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মামলাও গেল। সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া এবং এই শ্রেণীর লোকদের কার্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে, এই যে কৌঁসুলী হাজির হইলেন না, ইহার পশ্চাতে প্রবল প্রতিপক্ষের কোন কারসাজি ছিল কি? কেহ কেহ বলেন, দুই পক্ষ হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াই বহু ব্যবহারাজীবের সম্পত্তি আহৃত হইয়াছে। কোন পক্ষ হইতেই চেকে টাকা নেন না। সুতরাং ধরিবার উপায় নাই।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, প্রধানতঃ আর্থিক কারণেই প্রথম সারির ব্যবহারাজীবেরা বড়-একটা জজিয়তি গ্রহণ করেন না। যাঁহারা বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রতিদিন একদল দুহাজারী মনসবদারের দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারেন না। এই মনসবদারেরা নিজেরা ডবল কালোবাজারী ; প্রথমতঃ লোকের মামলা না করিয়াই অনেক টাকা রোজগার করেন, তারপর ট্যাক্সও ফাঁকি দেন। এইসব কথা কাহারও অজানা নয়। কাজেই ইঁহাদের আচরণ দেখিয়া লোকের সততার উপর আস্থাই শিথিল হইয়া গিয়াছে। আবার ইঁহারাই নাম-করা চোরা চালানকারী ও মুনাফাখোরদের প্রধান আশ্রয়স্থল। যে-কোন কৌশলে ইঁহাদের প্রথম লক্ষ্য হইল মামলা মুলতবী রাখা ; তাহা হইলেই তাঁহাদের মক্কেলরা ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারেন এবং যত দিন যাইবে সাক্ষ্যপ্রমাণ ততই অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। সেইজন্য আজকাল কতকগুলি আইনের বুলি খুব চালু হইয়াছে : stay order, injunction, special leave ইত্যাদি। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট আদালতে মামলা-নিষ্পত্তিতে বিলম্বকে আত্মহত্যার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মুনাফাখোর চোরাচালানদার-জর্জরিত ভারতবর্ষে অসাধু মক্কেলদের প্রধান লক্ষ্য হইল—সময় নেওয়া। সলিসিটর নামটা উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু পেশাটা ঠিক আছে। ইঁহাদেরও প্রধান কর্ম মামলা স্থগিত রাখা, ইনজাংশন পাওয়ার চেষ্টা করা। এইভাবেই জমান মামলার স্তূপ বাড়িতেছে, কালোবাজার, মুনাফালুণ্ঠন অব্যাহত আছে। বোধ হয় বকেয়া মামলার কথা স্মরণ করিয়া উদ্বেজিত জজরা নূতন মামলায় সহজেই স্থগিতাদেশ দিয়া নিষ্কৃতি পান। এইভাবে arrears বা বকেয়া বাড়িয়াই যায় এবং ব্যবহারাজীবদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্রে ('not a profession but a conspiracy') কালোবাজার, মুনাফালুণ্ঠন, চোরাচালান দিন দিন প্রতিপত্তিলাভ করিতেছে।

৫

এই যে প্রক্রিয়া ত্রিশ বছর ধরিয়া চলিতেছে ইহার ফলে স্বাধীন ভারতে বিচারের বিশুদ্ধতার মানও নামিয়া আসিয়াছে। আমি আইনজীবী নহি। খুব মোটা রকমের দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। Civil Procedure Code বা দেওয়ানী মামলার বিধিসমূহের একটি (Order no. 6) হইল যে আরজিতে ঘটনা (fact) স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ১৯২০ সালে মতিলাল বনাম যুধিষ্ঠির মামলায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রায়ে ইহাকে বলিয়াছেন—'The salutary law that the parties should be held *strictly* to their pleadings and should not be allowed to prove at the trial any fact which is not stated in the pleadings.' অর্থাৎ লিখিত আর্জি ও লিখিত জবাবে মামলার বিষয়ীভূত ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিতে হইবে ; ইহার অতিরিক্ত কোন ঘটনা পরে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। অথবা কোন ঘটনাকে অস্পষ্ট রাখিলেও চলিবে না। এই সতর্কতার একাধিক কারণ আছে। একটি কারণ বহুদিন পরে বিচারপতি বিজয়েশ মুখার্জি একটি মামলায় বলিয়াছিলেন, স্থানকাল, ঘটনার খুঁটিনাটি যাহারা আরজিতে স্পষ্ট করিয়া লিখেন না তাঁহারা প্রায়শঃই মিথ্যা মামলা রুজু করিয়া থাকেন। আরজিতে ইচ্ছা করিয়াই ফাঁক রাখিয়া দেন। পরে যেমন সাক্ষী যোগাড় করিতে পারিবেন তদনুসারে ঘটনা উদ্ভাবন করিবেন।

সাক্ষীরা ও মামলাবাজরা আগেও সুবিধামত মিথ্যা বলিতেন, এখনও বলেন। কিন্তু আইন-ব্যাখ্যার যে ধারা লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে ইঁহাদের মিথ্যাভাষণের পথ সুগম হইতেছে। ইহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না। আবর্জনার স্তূপ যত বড় হইবে তত বেশি মাছির উপদ্রব বাড়িবে। আমি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত The Code of Civil Procedure by D. F. Mulla হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি : 'It is well settled that pleadings should not be constructed with *strictness*.'—*p*. 413 অর্থাৎ আমি যদি 'ক'-এর নামে মিথ্যা দাবি আনিতে চাই, তাহা হইলে দাবির কথাটা আরজিতে লিখিয়া দিলেই হইবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে মামলাটি সাজাইতে কোন অসুবিধা হইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বিজয়েশ মুখোপাধ্যায় যেরূপ শ্যেনদৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, সেইরূপ শ্যেনদৃষ্টির এখন আর তেমন প্রয়োজন নাই। আধুনিক কালে তিনি ব্যতিক্রম।

আর একটা কারণে আইন-আদালতের অধোগতি হইতেছে। তাহা অনেকটা ভাষাগত এবং অনেকটা পূর্বে কৌঁসুলীদের যে কৌশলের কথা বলিয়াছি তাহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিচারশালাকে বলা হয় ধর্মাধিকরণ ; সুতরাং ধর্মের গতির মত ন্যায়বিচারের গতিও সূক্ষ্ম। সেই কারণেই আইনের ভাষা জটিল ও দুর্বোধ্য। আমরা যে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহার ফলে একদিন আমরা এমন অবস্থায় পেঁছুছিব, যে সুপ্রীম কোর্টে কেরলের কৌঁসুলী মালয়ালাম ভাষায় সওয়াল করিবেন আর দার্জিলিঙের কৌঁসুলী নেপালীতে জবাব দিয়া প্রলয়ের সৃষ্টি করিবেন। তাহার কথা ভাবিতেছি না। এখন ইংরেজিতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম-কোর্টে জিজ্ঞাসা, জেরা, সওয়াল ও রায়দান হয় বলিয়া আমরা খানিকটা সভ্যজগতেই আছি। কিন্তু আমরা ক্রমশঃ ইংরেজি পড়া-সম্পর্কে অমনোযোগী হইতেছি বলিয়া সব-কিছুরই মান নীচু হইতেছে। ইহা কোর্টের কাজকর্মেও প্রতিফলিত হইতেছে। আর একটা কারণ হইতে পারে যে, স্তূপীকৃত বকেয়া মামলা দেখিয়া বিচারপতিরা রায়দানে তেমন মনোযোগী হইতে পারেন না। দুই-চারজন ব্যতিক্রম সর্বত্রই আছে। কিন্তু উপরে জেনকিনস্ ও আশুতোষের

জোরালো, স্পষ্ট যে দুইটি রায়ের উল্লেখ করিলাম, সেই রকম রায় আজকাল বড় দেখা যায় না। আমার মনে হয়, যে ইংরেজি ভাষায় আইনের গ্রন্থ রচিত হয় সেই ভাষায় এখনকার ছাত্রেরা—আইনের ছাত্রেরাও—তেমন পরিপক্ক নহেন।

৬

আইনজীবীরা প্রচুর ঐশ্বর্য উপায় করিলেও মর্যাদা হারাইয়াছেন। সাম্প্রতিককালের একটি বিতর্কিত মামলার পুনরুল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট করিব। ১৯৮০ সালে অংশতঃ মার্কস্‌বাদীদের সাহায্যেই ইন্দিরা ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গেলেন মার্কস্‌বাদী সরকার—যাঁহারা ধীরে ধীরে নিজেদের ভিত পাকা করিয়া লইলেন। ইহা ইন্দিরার মনঃপুত হইতে পারে না। এই অনুমান করিয়া মার্কস্‌বাদীরা ঝটিতি পুনর্নির্বাচন চাহিলেন। বঙ্গে ইন্দিরাগোষ্ঠী তখন ছত্রভঙ্গ ; তাঁহারা ইলেকশনের জন্য প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা আপত্তি তুলিলেন যে ভোটারতালিকা ভুলে ভরা ; সুতরাং নির্বাচন এখন অসম্ভব। ইহা লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ও সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের হইল। নাম যাহারই থাক আসল বাদী-প্রতিবাদী হইলেন ইন্দিরা কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে মার্কস্‌বাদী পার্টি বা সরকার। প্রথম পক্ষের তিনজন বড় কৌঁসুলী হইলেন অশোককুমার সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায় ও ভোলানাথ সেন। তৃতীয়কে এখন বাদ দিতে পারি। অশোক ও সিদ্ধার্থ আমার ছাত্র। সিদ্ধার্থের সঙ্গে আমার খুব প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের কথা পূর্বে বলিয়াছি। অশোক শুধু ছাত্র নহে, আমার নিকট-আত্মীয়। আমরা উভয়েই বানারির ঘনশ্যাম সেনের বংশধর ; অশোক আমার এক পুরুষ আগে। ইহারা উভয়েই ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তির প্রতি যে ইহাদের লক্ষ্য আছে ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অশোক ইন্দিরার পিতার আমলে আইনমন্ত্রী ছিল ; সে বোধ হয় আরও রাশভারী দপ্তর চায়। দুঃখের বিষয়, ইন্দিরা তাহাকে এম.পি. পর্যন্ত করিয়া থামিয়া আছেন। সিদ্ধার্থ তো এখন পর্যন্ত পার্টিতেই আসিতে পারে নাই। এইরূপ অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে ইহারা এই মামলাকে রাজনৈতিক আকাশে উঠিবার সিঁড়ি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহারা এমন অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিল যাহাতে ইহারা নিজেদের উপর এবং ব্যবহারাজীব-সম্প্রদায়ের উপর কলঙ্ক লেপিয়া দিল।

দুইটি মামলা রুজু হইয়াছিল এবং দুইটিকে একত্র করিয়া পাঁচজন বিচারপতি ইহার নিষ্পত্তি করেন। দুইজন বিচারপতি বোধ হয় এই মামলার প্রথমাংশ শোনেন এবং যে মন্তব্য করেন তাহা হইতে অশোক ও সিদ্ধার্থসহ ইন্দিরাপক্ষীয় ব্যারিস্টাররা মনে করেন যে ঐ দুই জজ তাঁহাদের বক্তব্য-সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করেন না। যেভাবেই হউক, বিচারকের মন পূর্ব হইতে প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারে, এইরূপ মনে করিলে আইন-জীবীরা অন্য জজের কাছে বিচার চাহিতে পারেন—ইহার অনেক নজির আছে। কিন্তু ইহারা যেভাবে তাহা প্রকাশ করে, মূঢ়তায় অবিবেকিতায় তাহা তুলনাহীন। ইহারা দুইজন জজ-সম্পর্কে বলিয়া বসিল যে, বিচারপতিরা একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজেদের মামলায় (own cause-এ) তাঁহারা বিচারক হইতে পারেন না। এইরূপ রূঢ়তা ও ধৃষ্টতায় বিচারপতিদ্বয় প্রথমে ইঁহাদের লিখিত অভিযোগ চাহিলেন এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহা সহি করাইয়া লইলেন ; তারপর নির্দেশ দিলেন যে এই-সকল ব্যাবহারাজীব তাঁহাদের দুইজনের কোর্টে আর কখনও উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

তারপর চলিল নাকে খত দেওয়ার পালা ; ইহারা লিখিতভাবে অগমতা স্বীকার করিল, তাহা আবার কোর্টে সর্বসমক্ষে পড়িতে বাধ্য হইল। এইরূপ দুঃসাহসিকতা ও হীনতাস্বীকৃতির দৃষ্টান্ত আর কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? এইরূপ মনে করা কি ভুল হইবে যে 'ইন্দিরাকে তো জয়ী করা গেল না, সুপ্রিমকোর্টের প্র্যাকটিসটা যায় কেন?'

কোর্টের সঙ্গে বড় আইনজীবীর সংঘর্ষের কথা আরও শোনা গিয়াছে। ব্যারিস্টার-দের মধ্যে সবচেয়ে মুখরোচক হইল সিনিয়র এস. এন. ব্যানার্জির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। জনৈক জুনিয়র ব্যারিস্টার খুব পরিশ্রম করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া নিজের বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। কিন্তু জজ তখনই স্টেনোগ্রাফার ডাকিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রায় বলিয়া দিতে লাগিলেন। অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে তরুণ ব্যারিস্টার বসিয়া পড়িলেন ; তাঁহার মুখ দিয়া শুধু নির্গত হইল, 'I am amazed!' ইহা সাহেব জজের কানে গেল এবং তিনি রুষ্ট হইয়া ব্যারিস্টারকে আদালত অবমাননার অভিযোগের উত্তর দিতে মধ্যাহ্ন-বিরতির পর উপস্থিত হইতে বলিলেন। তরুণ ব্যারিস্টার তো একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন ; একে মামলা হারিয়াছেন, তারপর আসামীর কাঠগড়ায়! মধ্যাহ্ন-বিরতির সময় মিঃ ব্যানার্জি (পুরোনাম বোধ হয় শৈলেন্দ্রনাথ) বার লাইব্রেরিতে আসিয়া ঘটনাটা শুনিলেন এবং তরুণ কৌঁসুলীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, অপরাহ্নে তিনিই তাঁহার হইয়া যাহা বলিবার বলিবেন। কোর্ট বসিতেই ব্যানার্জিসাহেব উঠিয়া বলিলেন, 'হুজুর, আমার তরুণ বন্ধু খুবই অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা সীমিত, তাঁহাকে আর কিছুদিন সময় দিন। বছর কয়েকের অভিজ্ঞতা হইলেই, nothing that your lordships do will ever amaze him.' ব্যাপারটা ঐখানেই থামিয়া রহিল। লালমুখ আরও লাল হইল বটে, কিন্তু আর না ঘাঁটাইয়া সাহেব নূতন মামলায় মনোনিবেশ করিলেন।

বক্ষ্যমাণ মামলায় আর একটা লক্ষণীয় দিক আছে। জজ সাহেবরা এখানেও অবাক হইয়াছেন, কারণ এইসব বড় বড় কৌঁসুলীরা যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন, সওয়াল করার সময় তাহার মোটা অংশই বাদ দিয়াছেন। সেই pleadings বা আরজির প্রশ্ন!

আইন-আদালত যে কোথায় নামিয়াছে বা বড় বড় কৌঁসুলীরা নামাইয়াছেন, এই-সকল মামলা তাহার সাক্ষ্য বহন করে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

১

নেহেরু জীবিত থাকিতেই যে তাঁহার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা বহুবিদিত। এক সাংবাদিকের গ্রন্থে পড়িয়াছি যে ইহারই সূচনা হইয়াছিল কামরাজ প্ল্যানে নানা মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (?) পদত্যাগপত্র আদায়ে। যাহা হউক আনাচে-কানাচে ইন্দিরার নাম উচ্চারিত হইলেও নেহেরুর পরে প্রধানমন্ত্রী হইলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী ; ইন্দিরা তাঁহার মন্ত্রিসভায় একটি স্থান পাইলেন। লাল-বাহাদুরের স্বল্পকালীন মন্ত্রিত্ব স্মরণীয়। ছোট্ট মানুষটি, কিন্তু মনোবল ছিল খুব বেশি। সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় তাঁহার সরল অনাড়ম্বর চালচলন ; মনে হয় তিনি এই গরীব দেশকে চিনিতেন এবং হয়ত সোজা, সৎভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু জহরলাল যে বিরাট শাসনযন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন সদাচারী লোকই সহজে কিছু করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। তবে লালবাহাদুরের অভ্যাগম আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

লালবাহাদুরের পরে প্রধানমন্ত্রী হইলেন ইন্দিরা গান্ধী। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারটা বাদ দিলে লালবাহাদুরের আমলে তেমন কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নাই। ইন্দিরা গান্ধী একটানা এগার বছর রাজত্ব করিয়া ১৯৬০ সালে গদীচ্যুত হয়েন। ইহাতে বিস্ময়ের তেমন কিছু নাই। সংসদীয় গণতন্ত্রে এক পার্টির জায়গায় আর এক পার্টি আসে। বিস্ময়ের বিষয় ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন। তিন বৎসর পর তাঁহার বিরোধী দলগুলিকে একে-বারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া স্বীয় দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া তিনি পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হইলেন এবং হয়তো বহুকাল আসীন থাকিবেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্ধশতকের ইতিহাস পিতাপুত্রীর জীবনীর অংশ বলা যাইতে পারে।

পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার হিসাবে না পাইলে ইন্দিরা অত অল্পবয়সে হয়ত ক্ষমতালাভ করিতে পারিতেন না। তবু ইঁহাদের মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে মৌলিক পার্থক্য অনেক। জহরলালের মত ইন্দিরার পুঁথিগত বিদ্যা নাই। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অনেক বেশি তীক্ষ্ম এবং কখনও কখনও আদর্শবাদের কথা বলিলেও তিনি সর্বদাই বাস্তবে বদ্ধদৃষ্টি। এই কারণেই তিনি কাছের মানুষের দুর্বলতা সহজেই ধরিতে পারেন। অতি নিকটেই দৃষ্টান্ত রহিয়াছেন—বহুগুণা, চ্যবন ও সিদ্ধার্থশংকর রায়। চ্যবন পূর্বে বিরো-ধিতা করিয়া তাঁহার আশ্রয়ভিক্ষাকে 'গৃহে প্রত্যাবর্তন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বেশ কিছুকাল 'বনবাসে' রাখিয়া ইন্দিরা তাঁহাকে সমঝাইয়া লইলেন এবং তারপর একটা বড় চাকুরী দিলেন—কিন্তু ক্যাবিনেট হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা জনতা দলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমবতীনন্দন বহুগুণাই সবচেয়ে বেশি রব করিয়াছিলেন। বহুগুণাকে তিনি চিনিতেন ; সুতরাং তাঁহাকে নাকি বাড়ি যাইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন এবং পার্টিতে প্রধান করিয়া দিলেন। যখন বহুগুণাজি সম্পূর্ণ বশীভূত হইলেন, তখন ইন্দিরা এই ভয়ংকর উচ্চাভিলাসী জেনারেলের দিকে নজরই দিলেন না। সিদ্ধার্থশংকর নিজেই কবুল করিয়াছে যে এক সময় সে ইন্দিরার খুব আপনজন ছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টে মোকদ্দমায় হারার

পর ইন্দিরার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা। আইনজীবীরা পরামর্শ দিলেন আপীলে তিনি জিতিবেন, কিন্তু এলাহাবাদের রায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি যেন সাময়িকভাবে সরিয়া দাঁড়ান। ইন্দিরা কিন্তু ভয় করিলেন যে যিনি একবার গদীতে বসিবেন তিনি শেষ পর্যন্ত না নামিতেও পারেন। কাজেই এমারজেন্সী বা জরুরী অবস্থা জারি করিয়া সমস্ত বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করিতে চাহিলেন। এই প্রস্তাব ক্যাবিনেটে দিলে কথাটা চাপা থাকিবে না, নানা লোকে নানা প্রশ্ন তুলিবে, সুতরাং তিনি রাতারাতি প্রেসিডেন্টকে দিয়া জরুরী অবস্থা জারি করাইতে চাহিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁহার আপনার লোক। যখন নিজলিঙ্গাপ্পার কংগ্রেসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া তাঁহার বিরোধ হয়, তখন ফকরুদ্দিন আলি সাহেব তাঁহার পক্ষে ছিলেন—এইরূপ গুজব ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বোধ হয় সহি করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। প্রেসিডেন্টকে বুঝাইতে সঙ্গে গেল সিদ্ধার্থশংকর রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে সিদ্ধার্থশংকরের ভূমিকাটা গোলমেলে। শা' কমিশনে সিদ্ধার্থ সাক্ষ্য দিয়াছিল, যে সে সঙ্গে গিয়াছিল আইনজীবী হিসাবে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়। এই উক্তি তাহার রাজনৈতিক অপরিপক্কতা প্রমাণ করে। জরুরী প্রশাসনিক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী যাইতেছেন। এখানে আইনগত পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটর্ণী জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল প্রভৃতি রহিয়াছেন। সিদ্ধার্থশংকরের স্থান কোথায়? ইন্দিরা মনে করিয়া থাকিবেন সিদ্ধার্থ একান্ত অনুগত সেবক হিসাবেই গিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ পরে অন্যসুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার আজ পর্যন্ত ঠাঁই হইল না।

ইন্দিরার কার্যবিধি দেখিলেই বোঝা যায় যে তিনি সেই শ্রেণীর লোক যাঁহারা cannot bear a brother near the throne. বারংবার তিনি দেখিয়াছেন, যাঁহারা কাছের লোক তাঁহারা সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। বাবু জগজীবন রামকে উপলক্ষ্য করিয়াই তিনি নিজলিঙ্গাপ্পাদের সঙ্গে গোলযোগ করিয়াছিলেন ; সংকট মুহূর্তে নাকি বাবুজিই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে মন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সিনিয়র ; অতএব—। শেষে তো বাবুজি শত্রুপক্ষেই যোগ দিলেন। এই কারণেই ইন্দিরা সেইসব লোকের উপর আস্থা রাখেন যাঁহারা বেশিদূর উঠেন নাই বা কোন কালেই উঠিবেন না। ইহা সুবিদিত যে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহা ছিল প্রতিমন্ত্রীর হাতে। দিল্লীর লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর-সম্পর্কে তো একটা প্রবচন প্রচলিত ছিল যে তিনি লেফ্‌টেনান্ট এবং তাঁহার সহকারী এক নবীন যুবক গভর্ণর। প্রবাদ আছে যে মধ্যপ্রদেশের দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রই ইন্দিরার প্রথম উপদেষ্টা এবং মিশ্রজির নিজেরও এইরূপ ধারণা ছিল যে তিনিই প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু মধ্যপ্রদেশেই তাঁহাকে বনগমন করিতে হইল। দেবরাজ আর্স নিজেকে ইন্দিরা গান্ধীর অভিভাবক বলিয়া মনে করিতেন, আর বীরেন্দ্র পাতিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পদানত হইলেন। ইঁহাদের ভাগ্যবৈচিত্র্য ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটা ছোট্ট কিন্তু স্মরণীয় অধ্যায়।

ইন্দিরা গান্ধীর মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় কাহাকেও দেখা যায় নাই। পরাধীন ভারতবর্ষে ইহার তুলনা মিলিত এক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ে। আশুতোষের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া যে বিষয় ধরিয়াছেন সেখানে আশুগ্রাহিতা বা প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইন্দিরার লেখাপড়ায় ব্যুৎপত্তির কোনও পরিচয় নাই কিন্তু বিশ্বজোড়া তাঁহার কর্মক্ষেত্র। যখন যে সমস্যা উঠে বুদ্ধির দ্বারা তাহার সমাধান করেন। আশুতোষের সঙ্গে তাঁহার আর একটা সাদৃশ্য ব্যক্তিত্বের প্রভা ; ইহা অনির্দেশ্য। হয়ত প্রত্যেক মানুষেরই তা অল্প-

বিস্তর আছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক আছেন যাঁহাদের উপস্থিতিতেই অন্য সবাই আবিষ্ট হইয়া পড়েন। ইহা সবচেয়ে বেশি ছিল নেপোলিয়নের। শোনা যায়, স্পেন যুদ্ধে—ইহার অপর নাম পেনিনসুলার ওয়ার—প্রতিপক্ষীয় সেনাপতি আর্থার ওয়েলেশলী (পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে খ্যাত) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের উপস্থিতিই চল্লিশ হাজার কর্মঠ, অভিজ্ঞ সৈন্যের সমান। আশুতোষের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় প্রতিপক্ষ বড় বড় সাহেবদের মন্তব্যে। তাঁহারা তাঁহাকে মিত্র মনে করিয়া উচ্চপদ দিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর দেখিলেন, প্রতি পদক্ষেপে আশুতোষ নিজের পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তখন ইঁহাবা শংকিত হইয়াছেন ; ইঁহাকে পর্যুদস্ত করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরাজিত জাতির এই প্রতিনিধির কাছে রাজবাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আশুতোষ ও ইন্দিরার মধ্যে আর একটা সামান্য লক্ষণ—নীতিবোধের প্রতি উপেক্ষা। কার্যক্ষেত্রে কাজ হাসিল করিতে হইবে। সুতরাং সেখানে 'সুমতি-কুমতি'-র প্রশ্ন অবান্তর।

২

শুধু তুলনার জন্য আশুতোষের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম। ইন্দিরার রাজ্যশাসন-পদ্ধতিই বর্তমানে আমার আলোচ্য বিষয় এবং সেই কথাই একটু বিশদভাবে বলিতে চাই। ইন্দিরাকে আমি কখনও দেখি নাই। তাঁহার সাংসারিক জীবনের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের সম্পর্ক নাই। তবে ইহা ঠিক যে বিবাহের পর স্বামিগৃহে তিনি বেশি দিন থাকেন নাই ; বড়লাটের এক্জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি বা প্রধানমন্ত্রী পিতার সংসারের দেখাশোনা করাই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। তিনি নিজে বলিয়াছেন, পিতা তাঁহাকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারিণী করিতে চাহিলে তো তাঁহাকে পার্লামেন্টের সদস্য করিতেন। কিন্তু নিজে পার্লামেন্টের সদস্য না হইলেও তখনকার সদস্যদিগকে তিনি চিনিতেন ; তিনি জানিতেন, কোথা হইতে টাকা আনিয়া ইঁহাদিগকে সদস্য করা হয় এবং সদস্য হইয়াই কেমন করিয়া ইঁহারা ধন ও ক্ষমতার জন্য কাঙালপনা করেন। ইঁহাদের লোভ, মোহ ও মাৎসর্য কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ক্রোধ ও মদোন্ধতার পরিচয় তিনি এক সর্দার প্যাটেলে দেখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাহাও কত সহজে বশে আসে তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। রাজনৈতিক নেতারা প্রায় সবাই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ; সবাই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং বাহিরে ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদের দুর্বলতা ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ রাজনীতিতে ছিলেন না, রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর নাকি একটু খেদের সহিত বলিয়াছিলেন যে, জহরলাল ও লালবাহাদুর তাঁহার সঙ্গে কিছু কিছু পরামর্শ করিতেন, কিন্তু ইন্দিরা নাকি তাঁহাকে একেবারেই আমল দিতেন না। কেন দিবেন? এই সৌম্যমূর্তি প্রবীণ দার্শনিকের দুর্বলতা ও অস্থিরতা তাঁহার মত কে দেখিয়াছে? ইহার পর তিনি আর এই প্রেসিডেন্টকে গ্রাহ্য করিবেন কেন? পরে যখন সংকটমুহূর্তে দেখিলেন যে এই প্রেসিডেন্ট পদটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত, তখন তিনি যোগীন সরকারের হাসি-খুশি বইয়ের 'ঝাড়ুহাতে কানাই'-এর খোঁজ করিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী যে পার্লামেন্টের সদস্য বা রাজনীতিকদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করেন তাহার অন্যতর কারণ মূঢ় মূক জনগণের উপর তাঁহার প্রভাব। দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ মানুষ যাঁহাদের অনেকেই ইন্দিরাপন্থী কৌসুলীর মতে পাঁচ বছরে দশ পয়সা ব্যয় করিতে পারে না—তাহারা চিরকাল নিপীড়িত এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করা সহজ।

তিনি ইহাও জানেন যে ইহারা 'গান্ধীরাণী'কেই ভোট দিবেন ; এই রাজভক্তি ও ভাষা উভয়ই একটি আদিবাসী মেয়ের। ইন্দিরা গান্ধী আজকাল বোধ হয় একটু দম্ভভাষিণী হইয়াছেন, কারণ সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন যে চরণ সিংয়ের জন্মদিনে অনুষ্ঠিত কিষাণ সম্মিলনে যে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল, তাহার কারণ উদ্যোক্তারা দিল্লীতে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় রটাইয়া দিয়াছিলেন যে ওখানে গেলে ইন্দিরা গান্ধীর দর্শন পাওয়া যাইবে। ইহা অবিশ্বাস্য নয়। ইহা জানেন বলিয়াই তিনি জনগণের মঙ্গলার্থে বিশদফা কর্মসূচী রচনা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্র সঞ্জয় দিলেন চার দফা। দুষ্ট লোকে বলাবলি করিতে লাগিল ফোর টুয়েন্টি বা চার-শ' বিশ। ইহা শুনিয়াই কিনা জানি না, পুত্র চারের সঙ্গে এক যোগ করিয়া পাঁচ করিলেন। ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দিরা গান্ধী বেশ সোরগোল করিয়া দেশকে পুনরুজ্জীবিত করিতে নূতন করিয়া বিশ দফা কর্মসূচী প্রচার করিলেন। ইহা মানিয়া চলিলে দেশের, বিশেষ করিয়া গ্রামীণ দরিদ্রসমাজের প্রভূত উন্নতি হইবে ; সেইজন্য ইহার কোথায় কতটা কি রূপায়ণ হইল প্রধানমন্ত্রী মহাভাগা প্রতি মাসে সে বিষয়ে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিচিত্রবুদ্ধি ইন্দিরা গান্ধী জানেন ইহা সবটাই আতশবাজি। তিনি নিজে ইহাকে খুব গুরুত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ কিছুকাল পরেই আবার হুকুমনামা বাহির হইল—মাসে মাসে কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট আর পাঠাইতে হইবে না। যদি কাজের কথাই তাঁহার মনে থাকিত তাহা হইলে তিনি লক্ষ্য করিতেন যে তাঁহার একটা প্ল্যানিং বা যোজনা দপ্তর আছে : ইহা সেই মন্ত্রকেরই কাজ। আর যতদূর মনে হয় এই গ্রামে-গাঁথা দেশে এখন প্রধান কাজ হইল জন্মনিয়ন্ত্রণ, এবং সরকারি প্রচার শুনিলে মনে হয়, প্রোগ্রাম, প্ল্যানিং প্রভৃতির মধ্যে এই বিষয়টিই প্রাধান্য পায় অথচ এইদিকে আমাদের বিশেষ অগ্রগতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের সমর্থন তাঁহার প্রধান সম্বল, তাহারা কি কেবল শ্লোগান শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হইবে? মূঢ় ম্লান হইলেও তাহারা বধির নহে। অবশ্য কতকগুলি লোকের টাকা হওয়া চাই, তাহা না হইলে এই ক্রমবর্ধমান শাসনযন্ত্র এবং সদাচঞ্চল রাজনৈতিক গোষ্ঠী পোষ মানিবে না।

এই টাকা সাদা কি কাল তাহা বিচার করিলে ইন্দিরাজির চলে না। কংগ্রেসের দুই রূপ ; কৈশোরে ও যৌবনে ইন্দিরা মূল প্রতিষ্ঠানের আদর্শবাদ ও কর্মীদের ত্যাগের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া থাকিবেন। আমি তাঁহার জীবনচরিত বা আত্মজীবনী পড়ি নাই। কিন্তু ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে দেশ যখন স্বাধীন হইয়াছে, তখন তিনি জীবনের ও কংগ্রেসের অন্য রূপ দেখিয়াছেন। যে কারণেই হউক তিনি গৃহিণী না হইয়া পিতার গৃহের কর্ত্রী হইলেন। ব্যক্তিজীবনের মোহভঙ্গের পরই তিনি রাজনৈতিক জীবনের এই অন্য চেহারাটি দেখিলেন। যাঁহাদিগকে তিনি ত্যাগবীর বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমতালাভের তদ্বিরে ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। একটা ইংরেজি রূপকের সাহায্যে আমার অনুমানকে প্রকাশ করিব। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি কংগ্রেসকে দেখিয়াছেন একখানা ধোয়া জামার মত ; এখন যৌবনের প্রান্তদেশে পঁহুছিয়া, পিতৃগৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী হইয়া সেই সেলাই-করা ধোয়া জামার উল্টো পিঠ (সিমি সাইড্) তাঁহার চোখে পড়িল এবং এই পরিচ্ছদের ব্যয় কাহারা জোগায় সেই নগ্ন সত্যও তাঁহার কাছে ভয়ংকর স্পষ্টতালাভ করিল। এইজন্য তাঁহার কাছে সততা-অসাধুতার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি যে উত্তর করেন তাহার মধ্যে আদর্শে অবিশ্বাসের অর্থাৎ সিনিসিজম্-এর ব্যঞ্জনা থাকে। তিনি একবার বলিলেন, প্রশাসনিক দুর্নীতি সব দেশেই আছে। আছে, ইহা মানি কিন্তু পরিমাণের তারতম্য আছে, অথবা গণিতের ভাষায় বলা যায়, ১ এবং ১০০ উভয়ই পূর্ণ-

সংখ্যা কিন্তু উভয়ের মূল্য কি সমান? একদা তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, বিরোধীরা তো মাত্র তিনজন অসাধুকে চেনেন—ললিতনারায়ণ মিশ্র, বংশীলাল ও সঞ্জয় গান্ধী।

বিরোধীরা আরও অনেক অসৎ লোকের কথা বলেন ও বলিয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি শুনিয়াও শোনেন নাই। কিন্তু ললিতনারায়ণ মিশ্রের আকস্মিক মৃত্যুর রহস্য-সম্পর্কে যে নানা অর্ধস্পষ্ট গুজব প্রচলিত ছিল তাহা কি প্রধানমন্ত্রীর কানে পঁহুছায় নাই? যে বংশীলাল মহাশয়ের হাতে তিনি দেশরক্ষার ভার দিয়াছিলেন তাঁহার সততা ও নিষ্ঠা-সম্পর্কে তিনি কি সন্দেহাতীত প্রমাণ পাইয়াছিলেন? ইঁহাকে যে কংগ্রেস হইতে ছয় বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাহার কারণ কি? ইহাও দেখা যাইতেছে যে তিনি নিজে ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিলেও বংশীলাল মহাশয়কে ক্যাবিনেটে ফিরাইয়া আনেন নাই। সুতরাং এই বিষয়ে মানুষের জিজ্ঞাসা অপরিতৃপ্তই রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জয় গান্ধীর প্রসঙ্গে আসিলে জনতা আমলের দুইটি কমিশনের কথা বলিতে হয়—শা' কমিশন ও মারুতি কমিশন। জে. সি. শা' ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হইলেও কমিশনে বসিয়া তিনি বিচারপতিসুলভ স্থৈর্য ও বাক্‌সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামীদিগকে সাক্ষ্য দিতে ডাকিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাক্ষ্যই দিলেন না: যতদূর মনে হয়, তিনি ইঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তবে কি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এই বিষয়ে আইন ঠিকমত জানিতেন না? তারপর শা' মহাশয় নিজেই এত কথা বলিতেন, যে পাঠকের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি পূর্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিয়া শা' কমিশনের রিপোর্টকে জনসাধারণের নিকট হইতে সরাইয়া লইলেন। মারুতি কমিশন কিন্তু ঐ পথে যায় নাই। কোন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় নাই; ইহার সিদ্ধান্ত মুদ্রিত ও লিখিত দলিলের ভিত্তিতে রচিত। রিপোর্টে কোথাও কমিশনাধিপতির পক্ষপাতিত্বের আভাস নাই, কোথাও অতিশয়োক্তি নাই। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধী ও তাঁহার মাতার আচরণ যে বিধিবহির্ভূত ও অসঙ্গত, তাহা কমিশন অকাট্য সাক্ষ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। যতদূর জানি ভারতসরকার এই রিপোর্ট-সম্পর্কে কোন প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই এবং ইহার যুক্তিপ্রমাণ খণ্ডন করারও কোন চেষ্টা করেন নাই।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী কয়েকদিন আগে (আগস্ট, ১৯৮০) বহিঃ-শুল্কে অফিসারদের সভায় একটা বড় বক্তৃতা দিয়া থাকিবেন। রেডিওতে ইহা খুব ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এই বক্তৃতায় মন্ত্রিমহোদয় অফিসারদের খুব উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা যেন অকুতোভয়ে স্মাগলার বা চোরাই চালানকারীদের অনুসরণ করেন এবং যাঁহারা এইভাবে সরকারের কর ফাঁকি দেন, তাঁহাদের কারবারকে বন্ধ করিতে সাহায্য করেন। ইহা শুনিয়া আমার সাম্প্রতিক কালের একটা তিন-অংক-বিশিষ্ট ঘটনা মনে পড়িল। এই নাটকের প্রথম অংক আরম্ভ হয় ভারতের পূর্বভাগে। বিবাহসূত্রে আমার নিকট-আত্মীয় এক তরুণ বহিঃশুল্কে অফিসার বড় চোরাচালানি সংস্থার পিছু লইল। ইহাকে আশেপাশে অনেকেই সতর্ক করিত, দূর হইতে ফোনে অপর পক্ষও সমঝাইত। কিন্তু এই নির্ভীক অফিসার বলিত যে সে তাহার কর্তব্য করিয়া যাইবে। এই সময় ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় অংকে এই অফিসার ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে বদলী হইল। সেইখানেও প্রতিপক্ষের শাসানি থামিল না এবং ইহাতে অফিসারের কর্মোদ্যম কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না; তারপর অল্প দিনের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে সে প্রাণ দিল। তৃতীয় অংক সংঘটিত হইল জনতা সরকারের আমলে। শোকের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে

বিধবা পত্নী কিঞ্চিৎ রব করিতে শুরু করিল কিন্তু সেই জমানায়ও বিশেষ ফল হইল না। কিছুদিন পর ইন্দিরা ফিরিয়া আসিলেন। বিধবাকে প্রচুর সম্পত্তি দেওয়া হইল এবং মোটা পেন্‌শনও দেওয়া হইল। ইহার সঙ্গে ঠাঁটপাট সহ তদন্তের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু যতদূর জানি, তদন্ত বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। পরশুরামের একটা গল্প আছে 'বদন চৌধুরীর শোকসভা'। ইহার শেষের দিকে উপস্থিত হইয়াছেন এক পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ী—যিনি বেশ মুখরোচক হিন্দীবাংলামিশ্রিত বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই কায়দায় অবিমিশ্র বাংলায় আমি এই ঘটনার বর্ণনা শেষ করিব। প্রতিপক্ষীয় ব্যবসায়ী যেন বলিতেছেন, আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা করি। এ তো বহুৎ আচ্ছা। এই ব্যবসায়ের ফলে একজন অফিসার মারা গেলেন। হর্ন বাজাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেও কোন কোন পথচারীর প্রাণ যায়। ইহাতে আপসোস করিতে গেলে তো সবরকমের যানবাহন বন্ধ করিতে হয়। তরুণী বিধবার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা তো বহুৎ বহুৎ আচ্ছা। তবে তদন্ত?—পরশুরামের অন্য একটি চরিত্রের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 'কুছ্‌ভি নেহি! কুছ্‌ভি নেহি!'

ইন্দিরা গান্ধী কি করিবেন? তাঁহার প্রধানতম সহকর্মী দশ বৎসর ইনকাম-ট্যাক্সের হিসাব দাখিল করিতে ভুলিয়া গেলেন; তিনি বলিলেন, তিনি চেকে বেতন নেন, তাঁহার ট্যাক্স তো গোড়াতেই কাটা হয়, না হইলেও সহজেই ধরা যায়; কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টাররা যে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকার কাঁচা নোট নিতেছেন, তাহার প্রতিকার কি? উকিল-ব্যারিস্টাররা বলিবেন যে তাঁহাদের মক্কেলরা যে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা করিতেছেন, সেই দিকে সরকার আগে দৃষ্টি দেন না কেন? ব্যবসায়ীরা বলিবেন, তাঁহারা প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায় করেন, শ্রমিক হইতে কৌঁসুলী এবং আরও লোককে না পুষিলে তাঁহারা মুনাফা করিতে পারিতেন না এবং অজস্র লোকের কর্মসংস্থান হইত না। কিন্তু যেসব চোরাই চালানদাররা রাত্রির অন্ধকারে কোটি টাকা করিতেছেন, তাহা বন্ধ করে কে? শেষোক্ত কারবারীরা বলিবেন—সর্বস্তরের পাহারাদারদের সুখনিদ্রার ব্যবস্থা করিতেই তো তাঁহাদের অর্ধেক টাকা চলিয়া যায়। অসাধুতা এত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা এত গভীরে গিয়াছে যে ইহাকে সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। শেক্সপীয়রের অন্যতম প্রধান চরিত্র শঠাধম ফলস্টাফ বলিয়াছিলেন, চোরেরা যদি একে অপরের সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা না করে, তবে সব জাহান্নামে যাক্। আমাদের হইয়াছে সেই অবস্থা। একটা ছোট্ট গল্প বলিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইব। আমার ছাত্র দেবু মুখার্জি সব খেলায় সেরা—ফুটবল, হকি, টেনিস এবং ক্রিকেট (ব্যাট এবং বলে উভয়তঃ)। কিন্তু সে খুব সোজা প্রকৃতির লোক। কলিকাতায় আসিয়া ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য ব্যাংকে চাকুরী পায় এবং এরিয়ান ক্লাবে খেলিতে আরম্ভ করে। এই চরিত্রবান্ যুবক দলবদলের খেলায় নামে নাই; আগাগোড়া এরিয়ান টীমে খেলিয়াছে এবং পরীক্ষা পাস করিয়া নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া ব্যাংকের ম্যানেজার হইয়াছে। একদিন এক চটপটে ঋণপ্রার্থীর সঙ্গে কথা হওয়ায় তাহার কেমন সন্দেহ হয় এবং উপরওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করিলে জানিতে পারে যে, এই ঝানু লোকটি ভূসম্পত্তির ভূয়া দলিল দেখাইয়া পূর্বে এই ব্যাংককে বেশ কিছু টাকা ঠকাইয়াছে। তারপর তাহার আর হদিশ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, দেবু এই ঋণপ্রার্থীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিল, কাগজপত্রের পরীক্ষা হইল এবং ঠিক হইল দুই হাজার টাকা দস্তুরীর বিনিময়ে ঐ ত্রুটিপূর্ণ দলিলের ভিত্তিতে দেবু তাহাকে একটা মোটা টাকা ঋণ দিবে। নির্ধারিত দিনে দেবুর ঘরে সাদা পোশাকে দুইজন পুলিস এবং একজন সাক্ষী চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেবু তাহাকে ঋণের চেক দিল এবং সে একখানা খাম বাহির

করিয়া দেবুকে দিতে গেল। একটু সময় লওয়ার জন্য দেবু তাহাকে ঐ খাম-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্মিতমুখে বলিল, দেবুর ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাবার জন্য সামান্য উপহার। এদিকে পুলিসের দৃঢ়মুষ্টিতে ঋণপ্রার্থীর প্রসারিত হস্ত আটকা পড়িয়া গেল। খামখানি খুলিয়া দেখা গেল, 'একশ টাকার উনিশখানি নোট'! অর্থাৎ এইখানেও একশত টাকার ঠগবাজি। এই ছোট্ট ঘটনাকে সম্প্রসারিত করিলে আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে।

৩

দুইটি ইংরেজি কথা আজকাল খুব প্রচলিত হইয়াছে : charisma অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের দিব্যপ্রভা আর credibility বা বিশ্বাসযোগ্যতা। ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার গতিবেগপ্রাবল্যে শাসনক্ষমতায় পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পার্লামেন্টে তাঁহার একক গরিষ্ঠতা আছেই, দলে কেহ মাথা তুলিতে সাহস পান না, আর বিরোধীরা এমন ছত্রভঙ্গ হইয়াছেন যে ইন্দিরা মুখ খুলিলেই তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ বর্ষণ করেন। কিন্তু ইন্দিরার credibility দেশে-বিদেশে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহার খুব কাছের লোক ছিলেন। বোধ হয় জয়প্রকাশের স্ত্রী প্রভাবতী ইন্দিরার সখীর মত ছিলেন। সত্য কি মিথ্যা জানি না, শুনিয়াছি জয়প্রকাশ একবার বলিয়াছিলেন, 'ইন্দুর সঙ্গে মত-বিনিময়ের বা আলাপ-আলোচনার অসুবিধা এই যে ইন্দু সত্যকথা বলে না!'

ইন্দিরা প্রথম যখন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, তখন আপোসে ঠিক হইল মোরারজি দেশাই ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু ইন্দিরা ডেপুটিকে ডেপুটির মর্যাদা দেওয়ার লোক নহেন। ইন্দিরার তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প সময়ের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহার সুপারিশকে অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সঞ্জীব রেড্ডিকে মনোনীত করিলেন। ইহাকে সামান্য পরাজয় মনে করিয়া এবং প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে কোন বিপদের সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে উদিত না হওয়ায়, তিনি সঞ্জীব রেড্ডির নাম প্রস্তাব করিলেন। পরে (দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রের ইঙ্গিতে?) তিনি রেড্ডির নির্বাচনে তাঁহার নিজের বিপদের সম্ভাবনায় শংকিত হইয়া কনসেন্স ভোটের জিগীর তুলিলেন অর্থাৎ কংগ্রেসের লোকেরা কংগ্রেসপ্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য নহেন। তাঁহারা বিবেকের নির্দেশ মানিবেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল ; ইন্দিরা-প্রস্তাবিত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডি পরাজিত হইলেন এবং বিজয়ী প্রার্থী ভি. ভি. গিরির স্ত্রী শ্রীমতী গিরি আনন্দাতিশয্যে ইন্দিরাকে জড়াইয়া ধরিলে, সমবেত প্রেস ফটোগ্রাফাররা আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই রমণীর ছবি তুলিয়া ফলাও করিয়া ছাপিলেন। এই ভোটযুদ্ধে ইন্দিরা যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যিনি একজনের নাম প্রস্তাব করেন এবং আর একজনের নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তাঁহাকে ভয় করা যায়, মান্য করা যায় কিন্তু তাঁহার কথায় আস্থা রাখা যায় না।

ভি. ভি. গিরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। ইন্দিরা তাঁহার ক্ষমতা সংহত করিলেন। ক্রমে দুইটি ঘটনা ঘটিল যাহা তাৎপর্যপূর্ণ : ইন্দিরাজির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোরারজি দেশাই এবং দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র যাঁহাকে মহাভাগা প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা বলা হইত— ইঁহারা উভয়েই ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। ইন্দিরার চরিত্রে দুইটি গুণের সমন্বয় হইয়াছে— তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসাধারণ সাহস। বুদ্ধি হাতের কাছের জিনিস খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে, কিন্তু গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। আর দুঃসাহসিকতা মত্ততার মত, তাহা

মানুষকে অসতর্ক করিয়া ফেলে। এই শেষের মত্ততায় তিনি রাজনারায়ণের সঙ্গে ১৯৭২-এর নির্বাচনে কতকগুলি ছোটখাট, কিন্তু মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিলেন। সেইজন্যই তাঁহাকে কিছু বেশি মূল্য দিতে হইল। তিনি সংবিধান সংশোধন করিলেন এবং সেই সংশোধনগুলির আয়ু পিছনের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার কাছে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার এমন বিপদ দেখা দিল, যে একদিন রাত্রির মধ্যেই জরুরী অবস্থা ও মিসা আইন জারি করিতে হইল! এইভাবে নৈতিক পরাজয়ের মধ্য দিয়া তিনি রাজনৈতিক জয় লাভ করিলেন।

একটা প্রবচন আছে যে নৈতিক শক্তি দৈহিক শক্তি অপেক্ষা দশ গুণ বড়। আর ইহাও সত্য যে বুদ্ধি খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে, কিন্তু খুব গভীরে যাইতে পারে না। এই বুদ্ধিমতী মহিলা বড়-ছোট অনেককে জেলে পুরিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না যে, 'stone walls do not a prison make/nor iron bars a cage'. জেলে অন্তরীণ বন্দীদের নৈতিক শক্তিই ইন্দিরাকে পরাস্ত করিল। ইন্দিরা অবশ্য হটিবার পাত্র নহেন। তিনি দ্বিগুণ শক্তিতে রণাঙ্গণে নামিয়া বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়া পুনরায় ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন। তিনি মোরারজি দেশাই ও চরণ সিংহের মধ্যে চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিবার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু যেই মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, ইন্দিরাজি বলিলেন যে তিনি এই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবেন না। ইন্দিরা অথবা ইন্দিরাপন্থীরা এই পরামর্শ ও সমর্থন না করার সংকল্পের মধ্যে অবিরোধিতা দেখাইতে যাহাই বলুন না কেন, ইন্দিরা শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে আর এক দফা অবিশ্বস্ততার প্রমাণ দিলেন।

ইহার পরেই নির্বাচন হইল এবং আপামর শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণ ইন্দিরাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করিলেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজালের জয়। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসযোগ্যতা একটুও বাড়ে নাই। তিনি প্রথমটিতে বেশি বিশ্বাস করেন। সেইজন্য গোষ্ঠীনিরপেক্ষদের সম্মেলন, শীর্ষবৈঠক, এশিয়াড ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান প্রভৃতি চোখ ধাঁধান ব্যাপার লইয়া মত্ত আছেন ; মাঝে মাঝে উল্লেখ করিলেও বিশ দফা প্রোগ্রাম যেন ঝিমাইয়া পড়িতেছে আর দ্রব্যমূল্যের অপ্রতিহত বৃদ্ধিতে জনসাধারণের দুর্দশার একশেষ। তাহাদের কাছে নয়নাভিরাম জলুস অপেক্ষা মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের তাগিদ বেশি। সুতরাং চটকদার ব্যাপারে লোকের মন বেশিদিন মোহিত থাকিবে কি?

প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক আমেরিকা সফর শেষ করিয়া দেশে ফেরার পর (আগস্ট ১৯৮২) তাঁহার অনুগামীরা খুব রব করিয়া বলিলেন যে, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বে তিনি আমেরিকা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন। বিশেষতঃ তারাপুর পরমাণুবিক সংস্থার জন্য ইউরেনিয়াম সরবরাহ লইয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, ভারতের অনুকূলেই তাহার মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই এই প্রচারের শূন্যগর্ভতা প্রকট হইতেছে। জনৈক প্রাক্তন মার্কিন দূত বলিয়াছেন, ভারত যাহা পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছে বেশি। ইহা অবিসংবাদিত যে, ইন্দিরা ও তাঁহার অনুগামীরা যাহা বলিতেছেন, মার্কিন মুলুক হইতে তাহার সমর্থন মিলিতেছে না। ইন্দিরা ভাবিলেন, রুশ-আফগানিস্তান ব্যাপারটাতে তিনি স্পষ্ট ভাষণ দিতে না পারায় তাঁহার নিরপেক্ষতা যথেষ্ট স্বীকৃতি পাইতেছে না বা বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। গাঁয়ে ছোটকালে দেখিয়াছি, সর্বত্রই দুই-চারজন ব্রাহ্মণ বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সকল অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। আজকালকার রাষ্ট্রদূতদের একটা বড় কাজই হইল নিমন্ত্রণ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, ধরিয়া লইলাম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি নিগূঢ় আলোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব

হইয়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ইন্দিরাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং ইন্দিরা সদলবলে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ততঃ কিম্?

বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম, এই নয় দিনব্যাপী সফরে খানাপিনা, বক্তৃতাদি অনেক হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রেগন আলাপের জন্য রাখিলেন মাত্র ৪৫ মিনিট। তিনি ইন্দিরার সম্মানে যে ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেইখানে ইহা অপেক্ষা বেশি সময় দিয়া থাকিবেন। তারপর পূর্ব হইতেই বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে তাঁহাদের আলাপ-আলোচনার কোন নির্দিষ্ট সূচি বা অ্যাজেণ্ডা থাকিবে না অর্থাৎ আলাপ হইবে কিন্তু আলোচনা হইবে না। সেইজনাই কোন যুক্ত ইস্তাহারও বাহির হইল না। এই কারণেই ইন্দিরা দেশে ফিরিয়া যাহা ইচ্ছা বলুন, অপর পক্ষ নীরব। আর একটা লক্ষণীয় বিষয় আছে। যদি আমেরিকা ভারতের কথা শুনিয়াই থাকে, তবে ভারত আবার ফ্রান্সের দ্বারস্থ হইতেছে কেন?

স্বদেশে ইন্দিরার ব্যক্তিত্বের মহিমা এখন তুঙ্গে, কিন্তু স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার বিশ্বস্ততা ক্ষীয়মাণ। যে ব্যক্তিত্ব আস্থা সঞ্চার করিতে পারে, তাহার জলুস না থাকিলেও ক্ষতি নাই; বরং কাজ ভাল হয়। কিন্তু যে জলুস আস্থা সঞ্চার করে না তাহা ফাঁপা ও অকেজো।

৪

আমি গ্রন্থের শেষের দিকে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারত সরকারের কঠোর সমালোচনা করিলাম এবং যেহেতু গত দুই দশকে ইন্দিরা গান্ধীই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান ব্যক্তি, সেইজন্য তিনিই আমার সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি এবং সাহসের জন্য আমি তাঁহাকে প্রশংসা করি। তিনি মহাত্মাজি ও নিজের পিতৃদেবের নিকট হইতে যে উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে ভুল-পথে চালাইয়াছে। মহাত্মাজি প্রকৃতই মহাত্মাজি; কিন্তু যে জাতির তিনি জনক বলিয়া পূজিত হয়েন, তাহাকে তিনি দুইটি আত্মঘাতী অস্ত্র দিয়া গিয়াছিলেন। একটি হইল খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজসাধনাকে যুক্ত করা। স্বাধীনতা স্বাধীনতার জন্যই কাম্য; ইহাকে আপোসরফার বিষয় করিলে, ইহার সঙ্গে কোন 'যদি' যুক্ত করিয়া দিলে দেশমাতৃকাকে আঘাত করা হয়। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংযুক্ত করার ফলেই প্রায় পঁচিশ বছর পরে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল। এই বিভাগ যখন হয়, তখন ইন্দিরা রাজনীতিতে প্রাধান্যলাভ করেন নাই। বরং পাকিস্তানকে পরাস্ত ও দ্বিখণ্ডিত করিয়া তিনি অংশতঃ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

মহাত্মাজির দ্বিতীয় আত্মঘাতী অস্ত্র -হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা এবং ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠন করা। এক সময়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে এবং বহু পরে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। মহাত্মাজির একরোখা ভাষানীতির ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ আবার মাথা তুলিয়াছে। ইন্দিরার ভাষাবিষয়ে কোন গোঁড়ামি নাই, কিন্তু তিনি হিন্দীভাষাভাষী ভূখণ্ডের বাসিন্দা, সুতরাং হিন্দীর বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাঁহার পায়ের তলার ভূমিই কাঁপিয়া উঠিবে। কিন্তু এই দোটানায় পড়িয়া আঞ্চলিক ভাষার প্রবক্তাদিগকেও তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ইন্দিরাজির পিতা যে-বোঝা চাপাইয়া গিয়াছেন তাহা আরও ভয়ংকর। পিতা ও পিতার আশেপাশে সবাইকে ইন্দিরা দেখিয়াছেন। অনেকটা হরবল্লভের কায়দায়, ইঁহারা

ভাবিলেন, ইংরেজই যদি ভারত ত্যাগ করিল, তবে আর দুর্গানাম অর্থাৎ মহাত্মাজির নাম করিয়া লাভ কি? মহাত্মাজি নাকি কংগ্রেসের রাজনৈতিক কাজ-কারবার বন্ধ করিয়া ইহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বাহবা নন্দলালের' মত যাঁহারা প্রথমে দেশের সেবা করিয়া পরে পুরস্কার পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা কি হইবে? দেশে পার্লামেন্টারি শাসনপদ্ধতি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রকারান্তরে সেই ব্যবস্থাও হইয়া গেল। তাহাই সহস্র ধারায় অসাধুতা আনিয়া দিয়া ধনীকে আরও ধনী করিল এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করিল। এই ব্যবস্থা ইন্দিরা গান্ধী দেশের উপর চাপান নাই, তিনি ইহার ভারবাহী এবং ফলভোগী। তিনি প্রত্যেক পদক্ষেপেই ইহাকে নিজের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন এবং প্রায়শঃ সাফল্যলাভ করেন। এই পদ্ধতির সমালোচনা আরম্ভ হইতেই একদল বলিতে শুরু করিলেন যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বা ডিমোক্র্যাসি যখন ঘুণে ধরিয়া গিয়াছে, তখন ইহাকে বাতিল করিয়া দিয়া একজন প্রেসিডেন্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হউক। ইহা তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া করিতেছেন, না কাহারও ইঙ্গিতে করিতেছেন, তাহা অনুমানসাপেক্ষ ; কিন্তু কোন্ ভাবী প্রেসিডেন্টের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা হইতেছে তাহা অতিশয় স্পষ্ট।

ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে, যেমন সুশৃঙ্খল শাসন দেখা গিয়াছিল জরুরী অবস্থার সময়। আমি ধর্মমতের প্রশ্ন তুলিতেছি না, পারিবারিক কর্তব্যের কথা বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, বাদশাহ ঔরংজীবের সময় ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নাই। ঔরংজীবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ সালে ; ইহার পরের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসকে পলাশীর জন্য অপেক্ষাপর্ব বলা যাইতে পারে। ডিমোক্র্যাসীকে তুলিয়া দিয়া প্রেসিডেন্টকে একচ্ছত্র ক্ষমতাসীন করিলে সেই অর্ধশতাব্দীরই পুনরাবৃত্তি হইবে। ডিমোক্র্যাসী হইল স্কুল-কলেজে পরীক্ষা লইয়া বিদ্যার বিচার করার মত বস্তু। ডিমোক্র্যাসীর অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু ইহার পরিবর্তে যে কোন রকমের স্বৈরতন্ত্রী—একটি লোকের বা একটি পার্টির—প্রশাসন চালু করিলে তাহার ফল আরও ভয়ংকর হইবে।

আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নহি এবং কোন রকমের রাজনীতি করি নাই। সুতরাং শাসন-ব্যবস্থা-সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার অধিকার দাবি করি না। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ব্যয়বহুলতাকে ছাঁটিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেই শাসনযন্ত্র মজবুত হইবে। যাহাকে আপার হাউস বলা হয়, অর্থাৎ রাজ্যসভা, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতি, তাহার তো অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য আশ্রিতপালন। ইহার সঙ্গে আছে কমিটি, কমিশন প্রভৃতি। যখন যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিলাম, তখন এই জাতীয় বস্তুর সঙ্গে দেখা হইত। ভাইস-চ্যান্সেলর ত্রিগুণা সেনের অনুরোধে এই-সকল কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসিতে হইত, অন্ততঃ ইঁহাদের কথা শুনিতে হইত। জবলপুরেও এই অভিজ্ঞতা কিছু কিছু হইত। অধিকাংশ সময় মনে হইত যে, কমিটি বা কমিশনের মেম্বররা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহাই জানেন না বা জানিলেও ভুলিয়া গিয়াছেন। আর চিন্তামন দেশমুখ ছাড়া এই শ্রেণীর এমন একজনকেও দেখি নাই যিনি শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা-বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন বা যাঁহার চিন্তা করার যোগ্যতা আছে। একদিন একটি ফতোয়া জারি করিয়া বিদেশী দূতাবাস বাবদ খরচ এবং মন্ত্রী সেক্রেটারি প্রভৃতির ভ্রমণ-ভাতা অর্ধেক করিয়া দিলে এবং অবান্তর ভ্রাম্যমাণ কমিটি-সমূহকে ছাঁটিয়া দিলে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহাতে ঋণ-ভার অনেকটা কমিবে।

আমার এইসকল মন্তব্য একেবারেই অনধিকারীর অব্যাপারেষু ব্যাপার। তবে ইহা

ঠিক যে আমি আশাবাদী এবং আমার মনে হয় যে আমাদের আসল প্রয়োজন নৈতিক পরিবর্তন বা ধর্মবুদ্ধির জাগরণ। ধর্ম কথাটা একটু গোলমেলে। সুতরাং আমার বক্তব্য একটু স্পষ্ট করিতে হইবে। ধর্ম বলিতে আমরা ভগবান্, পরলোক, পাপ-পুণ্যের ফলাফল প্রভৃতি বুঝি। সেই ধর্ম মানুষকে অলোকিক, পারলৌকিক শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে টানিয়া নেয়। ইহা বুদ্ধিনিষ্ঠ যুক্তি, লৌকিক লাভালাভের অতীত এবং ইহা বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষা শাস্ত্রীয় আচারকে প্রাধান্য দেয়। মার্কস্‌বাদীরা বলেন, ইহা মাদকদ্রব্যের মত এবং কালে কালে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীরা বা পুঁজিপতিরা দরিদ্র শ্রমজীবীদের এই অহিফেন সেবন করাইয়া নিজেরা উহাদের পরিশ্রমলব্ধ ধন ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাকে আমরা ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলি, তাহা এই অহিফেনের কাজ করিয়া অন্যায়, অত্যাচার, পরিশ্রমলুণ্ঠনের সহায়ক হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যখন মার্কস্‌বাদ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহাও বিচারহীন, অলৌকিক, অপৌরুষেয়, স্বপ্রমাণ অহিফেনতুল্য ধর্মে পরিণত হইল। এই সমালোচনা অনেকেই করিয়াছেন এবং যেখানে মার্কস্‌বাদ প্রাধান্য পাইয়াছে সেইখানে ইহা ক্যাথলিক চার্চ বা অস্পৃশ্যতানির্ভর ব্রহ্মণ্যধর্মের মতই যুক্তিহীন। ইহাও এক প্রকারের মাদক। আমি শুধু একটি দৃষ্টান্ত দিব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্তালিন-শাসিত রুশদেশ কতকগুলি রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করিল। ইহার মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া একটি। এক সময় এই আশ্রিত রাষ্ট্র রুশ-'মুক্তি'র বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিল, তখন মোক্ষদাতা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ শুধু 'principles of the Revolution'-এর দোহাই দিয়াছিলেন। 'রুশবিপ্লব' এখানে হিন্দুর বেদ ও খ্রীষ্টানের বাইবেলের মতই স্বতঃপ্রামাণ্য, যুক্তিতর্কের অতীত বস্তু অর্থাৎ এক প্রকারের অহিফেন।

ইহা ছাড়া ধর্ম জাগতিক পেশা হিসাবেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছাত্রের ধর্ম অধ্যয়ন, সৈনিকের ধর্ম যুদ্ধ করা, শ্রমিকের ধর্ম শ্রম করা। ইহার পশ্চাতেও অলৌকিক নিয়ন্তাকে খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রপন্নগীতায় অথবা অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে আছে : ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। যে কাজে নিযুক্ত আছি সেই কাজ করার জন্য হৃষীকেশের দোহাই দেওয়ার দরকার কি? বাইবেলে সেন্ট পল বলিয়াছেন, যে-কাজে যে নিযুক্ত আছে সেইখানে লাগিয়া থাকাই তাহার ধর্ম এবং দুর্নীতির প্রতিমূর্তি স্যার জন ফলষ্টাফও বলিয়াছেন যে, রাহাজানি, ছিনতাই তাঁহার পেশা বা ধর্ম এবং সেই কাজ চালাইয়া যাওয়ায় কোন পাপ হইতে পারে না।

আমি যে ধর্মবোধের কথা বলিতেছি তাহা এই উভয় ধর্ম হইতেই স্বতন্ত্র। ইহা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ন্যায়ান্যায়বোধ। স্বার্থবুদ্ধি, পরিবেশের প্রভাব, ঐতিহ্যগত সংস্কার, ধর্মান্ধতা এই বোধকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তবু ইহা সকলের মধ্যেই আছে এবং পরিশীলিত মন অন্য সকল প্রভাব হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয় জীবনে আমার কালেই ইহা দুইবার জাগ্রত হইতে দেখিয়াছি। একবার এই বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল লর্ড কার্জনকৃত দেশবিভাগের তাড়নায়। আমার বাল্যকালে ইহার শেষ আভা দেখিতে পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি, 'ষাট হাজার সগর সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করল।' এইরূপ একটা জোয়ারকে প্রত্যক্ষ করি ১৯২০—১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়। আবার কোন মহাত্মাজি ও নেতাজি আসিয়া দেশের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিবেন এই প্রত্যাশা অবশ্যই করিব, কারণ ইঁহারা ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবন্তি যুগে যুগে।

—:★:—